শিল্পপুষ্পাঞ্জলি।

শিল্প, সাহিত্য, সরল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

শ্রীকালিদাস পাল ও শ্রীবিহারীলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম বর্ষ।

সম্বৎ ১৯৪৩। ১২৯৩ সাল। খ্রীঃ ১৮৮৬ অব্দ।

কলিকাতা।

৩৭৪ নং আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো

আর্টিষ্ট প্রেশে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৯৪৩।

সূচীপত্র।

চিত্র-সূচী।

(লি,—লিথোগ্রাফ প্রতিকৃতি। কা, খো,—কাষ্ঠ খোদিত প্রতিকৃতি)।

চিত্র সূচী।

তাজমহল। ২৮৯

শিল্পপুষ্পাঞ্জলি।

শিল্প, সাহিত্য, সরল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথম খণ্ড।

১৯৪২ সম্বৎ। ১২৯২ সাল।

সূচনা।

যাঁহার ইচ্ছায় জগতে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহারই করুণার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

বহুদিন হইতে আমাদের ইচ্ছা ছিল, যে একখানি শিল্পবিষয়ক পত্র প্রকাশ করি, কিন্তু এতদিন ভরসা করিয়া, সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, মনে নানা সন্দেহের উদয় হইত। কিন্তু, দেখিতেছি ক্রমেই আমাদের দেশীয়গণের শিল্পে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে ; এই সময়ই শিল্পবিষয়ক পত্র প্রকাশের উপযুক্ত সময়, এই সময়ে ধীরে ধীরে সাধারণের সমক্ষে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের শিল্পবিষয়ক কীর্ত্তি সকল উপস্থিত করিতে পারিলে, বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা। পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে, মনে পুনরায় সেইরূপ গৌরব লাভের চেষ্টা হইতে পারে।

বিজ্ঞান বিষয়ে, সাহিত্য বিষয়ে, রাজনীতি সমাজনীতি বিষয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পত্র আছে, এজন্য আমরা প্রথমতঃ কেবল শিল্প বিষয়েই আলোচনা করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম, যে আমাদের দেশে আজিও শিল্পের এতদূর উন্নতি হয় নাই—অথবা শিল্পপ্রিয় এত অধিক লোক নাই—যে কেবল শিল্পের উন্নতির জন্যই আমাদের এই পত্র পাঠ করেন ; এই জন্য, প্রধানতঃ শিল্পবিষয়ই আমাদের লক্ষ্য হইলেও, সাধারণতঃ পাঠকের পাঠোপযোগী প্রবন্ধ

সকল, প্রয়োজন মত চিত্রাদির দ্বারা সজ্জিত করিয়া, প্রকাশিত করিব।

কেবল শিল্পবিষয়ের আলোচনা করিবার আর একটি প্রতিবন্ধক আছে। স্বর্গীয় শ্যামাচরণ শ্রীমানি মহাশয় যখন "আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী" রচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের মান্যবর অধ্যক্ষ এচ্ এচ্ লক্ মহোদয়ের নামে ঐ গ্রন্থ উৎসর্গ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন তিনি তদুত্তরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে সে প্রতিবন্ধক কি, সাধারণে বুঝিতে পারিবেন, এই জন্য সেই পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"The subject of it, is one, which demands for its proper treatment, opportunities for investigation and for technical study, wich have not hitherto been easily attainable by your countrymen, and the consequence is, that while the paths of Literature and Science are being perseveringly and worthily trodden by scholarly Bengalis, that of Art is almost wholly neglected by them. I am not forgetting that there has been a Ram Raz and that there still is a much more able Art-critic than Ram Raz, namely Babu Rajendralala Mitra. This exception serves to point the rule, wich certainly has been the neglect of the study of Art anong educated Hindus,"

এ প্রতিবন্ধক আজিও বর্ত্তমান—যদিও ঈশ্বরেচ্ছায় শিক্ষিত দেশীয়গণের শিল্পবিষয়ে সহানুভূতি জন্মিতেছে সত্য, কিন্তু শিল্পচর্চ্চা যে পরিমাণে হওয়া উচিত, তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে না। শিল্পশিক্ষা (অন্ততঃ Art of Drawing) সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। শিল্পশাস্ত্রের ক্ষেত্র প্রশস্ত। মানবের জীবিকা ও সুখস্বচ্ছন্দ লাভোপযোগী সমস্ত কর্ম্মই প্রায় এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রোক্ত চতুঃষষ্ঠী কলা-শাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রেরই নামান্তর। সুতরাং শিল্প-শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তৎ-পক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই উদ্দেশ্য-শূন্য, (এই সময়ে একটি বন্ধু বলিলেন, যুবকের উদ্দেশ থাকুক না থাকুক, পিতার উদ্দেশ্য আছে,—"পাশ করা ছেলে দরে বিকোয়")। যিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলেন, তিনি, হয় আইন নয় চিকিৎসাবিদ্যা অবলম্বন করিলেন দুই একজন ইঞ্জিনীয়ারিংএ পদার্পণ করেন; যিনি বিলাতে গেলেন, তিনি হয় বারিষ্টার—নয় সিবিলসার্জ্জন হইয়া আসিলেন। যাঁহার ভাগ্যে এণ্ট্রান্স বই ঘটিল না, তিনি কি করিবেন ভাবিয়া আকুল। তাই বলিলাম আমাদের শিক্ষা অধিকাংশ স্থলেই উদ্দেশ্যশূন্য।

আমাদের বিবেচনায় বাল্যশিক্ষা লাভ হইলেই যুবকের এবং তাঁহার অভিভাবকের ভাবিয়া দেখা উচিত, কত দিন তাঁহার শিক্ষার পক্ষে কত ব্যয় করিতে পারিবেন, কত দিন পরে তাঁহার উপার্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে। উপার্জ্জন প্রয়োজন হইলে—কি উপায়ে তিনি উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। তৎপরে তদুপযুক্ত শিক্ষা করাই তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ শিক্ষাকেই আমরা "ব্যবসায় শিক্ষা" বলিব। ব্যবসায় শিক্ষার সঙ্গে যে জ্ঞানবৃদ্ধিকর শিক্ষা করিতে নাই আমরা এমন কথা বলিতেছি না—প্রত্যুত যিনি যে কার্য্যেই লিপ্ত থাকুন—জ্ঞান স্ফূর্ত্তিকর শিক্ষাও মানব মাত্রেরই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আমাদের শিল্প-জীবনের শৈশবে, উচ্চশিক্ষিত বিলাত-প্রবাসীদিগকে নিজে কিছু বলিতে চাই না;

তবে যখন তাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছি তখন কিছু না বলাও ভাল দেখায় না। সেই জন্য গত বর্ষে (১২৯১) ১৫ই মাঘের নববিভাকর হইতে "বিলাতে ভারতবাসী" নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এ প্রবন্ধ হয়ত অনেকেই পড়িয়াছেন, কিন্তু আমরা আজ তিন মাস পরে আবার সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। আমাদের বিশ্বাস এরূপ প্রবন্ধের উপদেশ আমাদের চক্ষের সমক্ষে অহর্নিশি বিরাজিত থাকা উচিত।

"বিলাত যাওয়ার ক্রমেই রেওয়াজ বাড়িতেছে। যখন রামমোহন ও দ্বারকানাথ বিলাতে গিয়াছিলেন সেই এক দিন, আর এই এক দিন!" * * * * "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিলাত-প্রবাসের ধূম ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে।"—(সেই জন্যই বিলাত-প্রবাসেচ্ছুদিগের এই প্রবন্ধটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য)।

"বিদ্যালাভের জন্যই অধিকাংশ লোকের বিলাতাবাস।" * * * * "বিদ্যার মধ্যে আইনবিদ্যার দিকেই ঝোঁক অধিক। ডাক্তারি তাহার নীচে। কৃষিবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দুই চারি জন কৃষিবিদ্যা শিখিতেও গিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার্থীও নাই এমন নহে। কল-কারখানার কাজটা প্রায়ই কেহ শিখিতে যান না। বাঙ্গালা হইতে একটি লোক কল-কারখানার কাজ শিখিয়া আসিয়াছেন আর একজন শিখিতে গিয়াছেন। বোম্বাই অঞ্চলের একটি লোক শিল্প এবং একটি তাড়িতের কাজ শিখিতে গিয়াছেন।"

"ভারতের ১৫৬ জন লোক এখন বিলাতে আছেন।" * * * * "ইহাঁদিগের মধ্যে বিদ্যার্থী বা পদার্থী ১৩১ জন। হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।" * * * * "হিন্দুর ভিতর আবার বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক।" * * * * "বিদ্যালাভে বাঙ্গালীদের উৎসাহ সকলের অপেক্ষা অধিক। কিন্তু তাই বলিয়া যে আমরা আহ্লাদে আটখানা হইতেছি এমন নহে, আমরা দেখিতেছি বঙ্গ প্রদেশ অপেক্ষা বোম্বাই প্রদেশের ভাগ্য অনেক ভাল। বোম্বাই প্রদেশের ১০টি ভারতসন্তান স্বাধীন বাণিজ্যার্থ বাণিজ্য-প্রধান বিলাতে বাস করিতেছেন, বাঙ্গালীর ভাগ্যে কি এ সুখ কখনও ঘটিবে? সে আশা আমাদের নাই। বাঙ্গালী আ[illegible] সব কাজ করিতে পারেন, ব্যবসায় বাণিজ্যের বেলাই তাঁহাদের সর্ব্বনাশ! এ কলঙ্ক বাঙ্গালীর যে কোনকালে ঘুচিবে আমাদের ত এমন মনে হয় না।"

"হিসাব দেখিয়া বঙ্গের জন্য এই দুঃখ হইল, সমগ্র ভারতের জন্যও দুঃখ করিবার কারণ আছে। সমগ্র ভারতের ৪৭ জন (বিলাতে) আইন শিখিতেছেন, হইবেন ব্যারিষ্টার। দেশশুদ্ধ লোক আইন-ব্যবসায়ী হইলে যে স্বদেশের অধিক উন্নতি হইবে আমাদের এমন মনে হয় না। আইনের দিকে এত না ঝুঁকিয়া কল-কারখানা শিল্পাদির দিকে ঝুঁকিলে কি ভাল হয় না? খাঁটী শিল্প একটি বোম্বাইবাসী শিখিতেছেন। কল-কারখানা একটি বঙ্গবাসী শিখিতেছেন, ইহা কি বড়ই পরিতাপের বিষয় নহে?"

অবশ্যই পরিতাপের বিষয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অনেকে (যাঁহারা অর্থাভাবে বিলাতে শিল্পাদি শিখিতে যাইতে পারেন না) বলিবেন, বিলাতে শিল্পাদি শিখিবার বৃত্তি নির্দ্ধারিত না হইলে আমরা শিল্প শিখিতে যাই কি রূপে? তদুত্তরে আমরা এক্ষণে এই মাত্র বলিতে পারি, শিল্প-ছাত্রবৃত্তির জন্য বাখরগঞ্জবাসীদের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের নিকট সকলে আবেদন করুন। উদার গবর্ণমেণ্ট কখনই আমাদের ন্যায্য প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু যদিও গবর্ণমেণ্ট দুই একটি বৃত্তি স্থাপন করেন, তাহাই কি যথেষ্ট? আমরা বিবেচনা করি, আমাদের দেশীয় রাজা মহারাজাগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিল্পাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উন্নতি কল্পে বৃত্তি স্থাপন করিলে ভাল হয়।

সে কথা যাউক—এখন আশার কথা ছাড়িয়া দেখা যাউক—আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী—আমরা, সমবেত চেষ্টায় যদি কিছু উন্নতি সাধন করিতে পারি। আমাদের ক্ষমতা অল্প, জ্ঞান অল্প, বহুদর্শন নাই—তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখি—চেষ্টা করিতে দোষ কি? দেশের কৃতবিদ্য লোকেরা কি আমাদের সাহায্য করিবেন না?

মহাভারতীয় দৃশ্যাবলী।

প্রথম সংখ্যা।

আমরা এই পত্রিকায় মহাভারতীয় ঘটনাবলীর চিত্র সংখ্যাক্রমে দিব স্থির করিয়াছি। কিন্তু শুধু চিত্র সকল স্থানে বুঝিবার সুবিধা হইবে না, এই জন্য যে বিষয়টি চিত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, সেই বিষয়ের ঘটনাটিও এই প্রস্তাবে বর্ণিত থাকিবে। আমাদের এই সংখ্যার চিত্রের বিষয় এই—

"সত্যবতীসুত ব্যাসদেব তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস (মহাভারত) রচনা করেন। রচনা করিয়া কি প্রকারে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন এই রূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা সত্যবতীতনয়ের চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়া, তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন ও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত তথায় আবির্ভূত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত এক আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। হিরণ্যগর্ভ আসন পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুমতি করিলে, বেদব্যাস তাঁহার আসনের সন্নিধানে অতি প্রীত মনে ও প্রফুল্ল নয়নে উপবেশন করতঃ সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, ভগবন! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদবেদাঙ্গ উপনিষৎ এই সকলের সারসঙ্কলন—ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের সম্যক নিরূপণ করিয়াছি এবং জন্ম, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব ইহার নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ইহার বিবরণ করিয়াছি, ভূতভাবন ভগবান যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান ও অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থ স্থান, ইহারও কীর্ত্তন করিয়াছি। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধকৌশল, জাতিবিশেষ লোকযাত্রা-বিধান এই সকলেরও সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে, একজন ইহার উপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না। ব্রহ্মা, তাঁহার অভিমত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন, কিন্তু তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া ঐ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তুমি জন্মাবধি সত্য বৈ কখন মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্ব্বদা ব্রহ্ম বাদিনী বাণী মুখে উচ্চারণ করিয়া থাক, এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সুতরাং এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়াই পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে। যাদৃশ, অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ তাদৃশ তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর, তিনিই লেখক হইবেন। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ভগবান সত্যবতীসুত গণেশকে স্মরণ করিলেন। গণপতি স্মৃতিমাত্রই তথায় উপস্থিত হইলে, ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার যথোচিত সৎকার ও আসন প্রদান করিয়া কহিলেন, হে গণনায়ক! মনঃসঙ্কল্পিত মহাভারতাখ্য গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি আপনি তাহার লেখক হউন। বিঘ্ননাশক গণেশ বেদব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন মুনে! যদি লিখিতে লেখনী



"ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবম্ অবুদ্ধ্বা মা লিখ ক্বচিৎ।
ওমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ॥"

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১ম অধ্যায়।)

ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি। ব্যাসদেব বলিলেন, হে বিঘ্ননাশক! কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহার যথার্থ অর্থ বোধ না করিয়া আপনিও লিখিতে পারিবেন না। গণাধিপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন (চিত্র দেখ)।—(কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারত, আদিপর্ব্ব প্রথম মুদ্রাঙ্কন—৩।৪ পৃঃ)—এই চিত্রে দৃষ্ট হইবে, বিঘ্ননাশক গণনায়ক ব্যাসদেবের কুটির সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া, মহাভারত লিখনচ্ছলে সমগ্র ভারতের বিঘ্ন বিনাশে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ব্যাসদেব গণেশকে নিবিষ্ট রাখিবার জন্য কূটার্থ শ্লোক-ব্যূহ রচনা করিয়া গ্রন্থ মধ্যে নিবিষ্ট করিতেছেন।

শিল্প কি?

শিল্পপুষ্পাঞ্জলির বিজ্ঞাপন দেখিয়া এক জন বন্ধু আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রাহকদিগকে শিল্পপুষ্পাঞ্জলি দিবে; বল দেখি শিল্প কি? শিল্প-জগতের সীমা কতদূর?" প্রশ্ন শুনিয়া ভাবিলাম "যথার্থই ত শিল্প-জগৎ যে অসীম, এ মহাড়ম্বর-যুক্ত নামের সার্থকতা করিব কি রূপে?" বাস্তবিক আমরা নামটি মিষ্ট হইবে বলিয়াই এই পত্রিকার ঐরূপ নাম দিয়াছি, এ পত্রের ওরূপ নাম দেওয়াতেই যে আমাদের স্কন্ধে কতদূর গুরুতর দায়ীত্ব পতিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। যতই শিল্পশাস্ত্রের সীমা অন্বেষণ করি, ততই আমাদের ভয় হয়, সাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব কি? কিন্তু ভয় করিলে কি হইবে, বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাতে সাধ্যমত যত্ন করিতে হইবে। সিদ্ধিলাভ হয় আমাদের সৌভাগ্য—যদি বিফলমনোরথ হই?—লোকের নিকট নিন্দাভাজন হইব কি?

এক্ষণে দেখা যাউক শিল্প কি? শিল্পশাস্ত্র বলিলে কোন্ কোন্ বিষয় সেই সীমা মধ্যে পতিত হয়? ইংরাজীতে যাহাকে "Fine Arts" বলে, যাহা অস্মদেশে পূর্ব্বে "সূক্ষ্ম শিল্প" ও এক্ষণে "সুকুমার কলা" শব্দে অনুবাদিত হয়, তাহা অসংখ্য হইলেও ইংরাজী অবিধানে, পদ্য-রচনা (Poetry), গীতশাস্ত্র (Music), চিত্রবিদ্যা Painting), স্থাপত্য (Architecture) এবং ভাস্কার্য্য-(Sculpture)-কে মাত্র ঐ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাগ প্রাচীন কালের, এক্ষণে আরও অনেক প্রকার শিল্প কার্য্য পাশ্চাত্য প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, বৈদেশিক শব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা লইয়া ভাবিবার প্রয়োজন কি? আমাদের' প্রাচীন ভারতে শিল্পের কতদূর সীমা ছিল দেখা যাউক।

চতুঃষষ্টিকলা যে শিল্পশাস্ত্রের নামান্তর তাহা "সূচনাতে" বলা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের মুখের কথা অপেক্ষা আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের বাক্য বোধ হয় অধিক প্রীতিকর হইবে, এই জন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের লিখিত "বার্ত্তাশাস্ত্র বা জীবিকাতত্ত্ব" হইতে "শিল্প" শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"শিল্প—শিল্প একটি বহু বিস্তৃত জীবিকা। ইহার শাখা প্রশাখা যে কত, তাহর ইয়ত্তা করা যায় না। নিত্য নূতন শিল্প প্রচারিত হইতে পারে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন জীবিকাশাস্ত্রে যে সকল শিল্পের উল্লেখ আছে তাহার কতক অংশ লুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার অতিরিক্তও কতকগুলি নূতন শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালে শিল্পকে "কলাবিদ্যা" বলিত। এই কলা-বিদ্যা বা শিল্প-বিজ্ঞান পূর্ব্বে ৬৪ চৌষট্টি প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।" ৬৪ প্রকার কি কি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ১।—গীত—গীত কি? তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গীতে কোন শিল্প সংযোগ আছে কি না এবং গীত-শিল্পের দ্বারা লোকের অর্থোপার্জ্জন হয় কি না—তাহা সকলেই জানেন, সুতরাং গীত বুঝাইবার জন্য শব্দান্তর প্রয়োগ করিতে হয় না।

"২। বাদ্য—বাদ্য গীতের সহচর, সুতরাং ইহাও প্রসিদ্ধ।

"৫২। ধারণমাতৃকা—পূজার নিমিত্ত, ধারণের নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত রেখাময় যন্ত্র রচনা করিতে জানা। ***।

"৫৩। সম্পাদ্যকর্ম্ম—মণি মুক্তাদি রত্নের কৃত্রিম নির্ণয় করা এবং কৃত্রিম রত্ন প্রস্তুত করা।

"৫৪। মানসীকাব্যক্রিয়া—অন্যের মনের ভাব ছন্দের দ্বারা প্রকাশ করা, এরূপ কৌতুক আর নাই।

"৫৫। কোষছন্দোবিজ্ঞান—শব্দশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া।

"৫৬। ক্রিয়াবিকল্প—একটি কার্য্য বহু উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করা।

"৫৭। ছলিতকযোগ—পর প্রতারণার কৌশল। ইহাও এক প্রকার বাজী বিশেষ।

"৫৮। বস্ত্রগোপনক—এক বস্ত্র লইয়া অন্য প্রকার বস্ত্র দেখান। অর্থাৎ কার্পাস বস্ত্রকে রেশমী বস্ত্র করিয়া দেখান। এ শিল্পটির মর্ম্ম আমরা বুঝিতে অক্ষম।

"৫৯। দ্যূতপ্রভেদ—নানাপ্রকার জুয়াখেলা। ***।

"৬০। আকর্ষণক্রীড়া—ইহাও একপ্রকার খেলা বটে, কিন্তু ইহা যে পুর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

"৬১। বালক্রীড়নক—বালকদিগের জন্য নানাপ্রকার খেলনা প্রস্তুত করা, এই শিল্পটি পুর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

"৬২। বৈয়াসকী বিদ্যা।

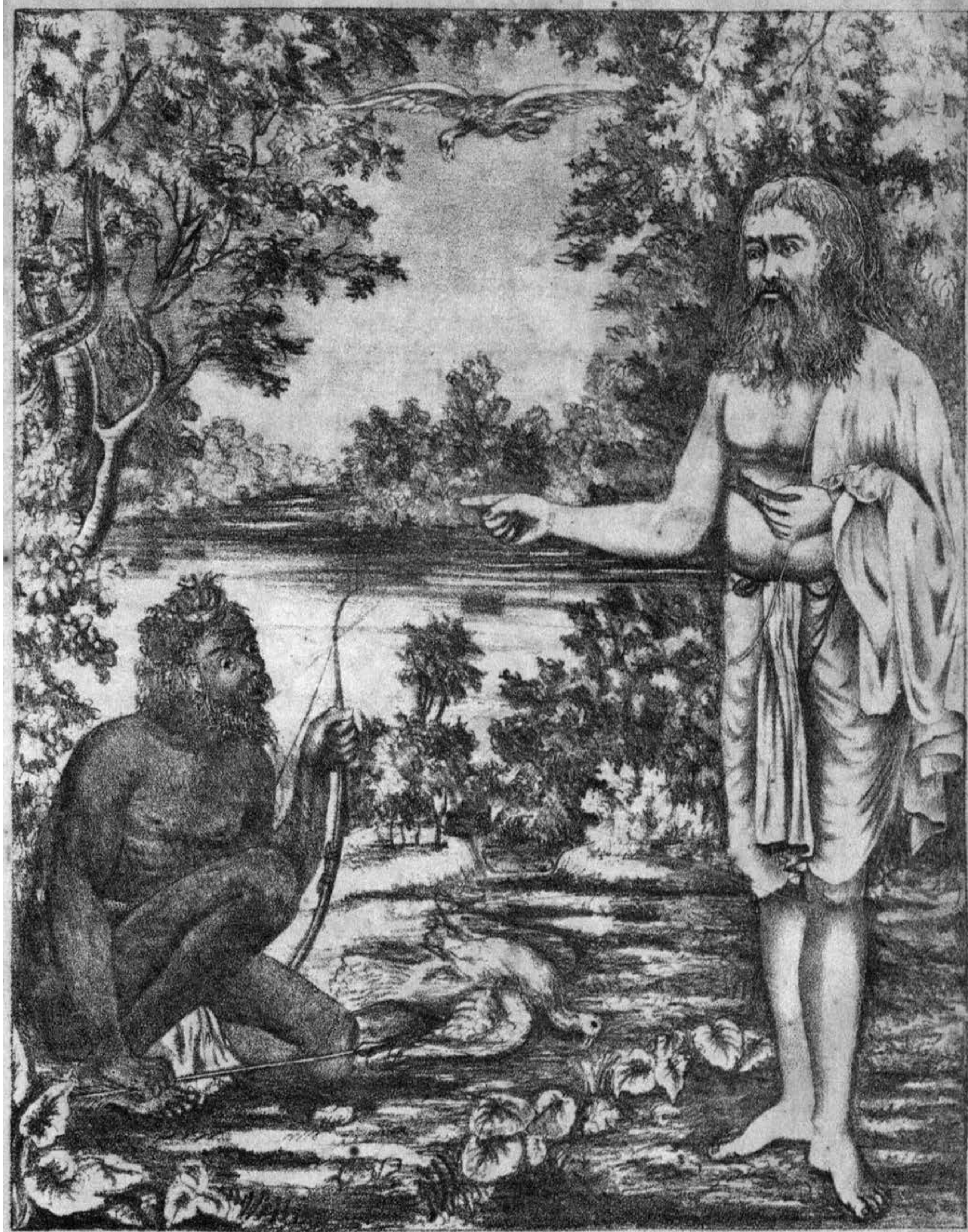
"৬৩। বৈজয়িকী বিদ্যা।

"৬৪। বৈণায়কী বিদ্যা।

এই তিনটি শিল্পের অর্থ আমরা জানি না। সুতরাং ইহার আংশিক ভাবও পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না।"—বিজ্ঞানদর্পণ, ১২৮৯, কার্ত্তিক, পৌষ)

উল্লিখিত কয়েক ছত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে চতুঃষষ্টি-কলার সকল এক্ষণে চলিত নাই, যাহা আছে তাহার কোনটি বা আংশিক প্রচলিত আছে, কালে তাহার আর প্রয়োজন হইবে না। কোন কোনটির বা পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক শাখা প্রশাখা হইয়াছে। কোন কোনটিবা এক্ষণে প্রচলিত না থাকিলেও পুনঃ প্রচলিত হওয়া উচিত।

আমরা শেষ দ্বিবিধ শিল্পের বিষয় যথাসাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এতদ্ব্যতীত আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের আলোচনাতেও আমাদের দৃষ্টি থাকিবে এবং আশা করি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সাহায্যে কতক কৃতকার্য্যও হইতে পারিব, তাহার পর জগদীশ্বরের হাত।



"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতঃ।"

শ্লোকের উৎপত্তি।

(রামায়ণ।)

(চিত্র দেখ।)

(১)

চিরশান্তি নিকেতন পুণ্য তপোবন !
(প্রকৃতি দেবীর সুখ-নিবাস ভবন)
তমসার তীরদেশে
বিমল শ্যামল বেশে
মানব-মানস মোহি' শোভি'ছে কেমন,
চিরশান্তি নিকেতন পুণ্য তপোবন।

(২)

হিংসিত হিংসকে হেথা শত্রুভাব নাই ;—
পশুপক্ষীগণ সুখে খেলি'ছে সদাই—
লতায় ফুটেছে ফুল,
গুঞ্জরি'ছে অলিকুল ;
আকুল ব্যাকুল বায়ু সৌরভে সদাই—
ব'য়ে ব'য়ে সুগন্ধি করে ধাওয়া ধাই।

(৩)

এ হেন প্রশান্ত পুণ্য আশ্রম প্রদেশে—
বাল্মিকী প্রশান্তবেশে ভ্রমেণ হরিষে—
শুনিয়ে পাখীর গান—
সৌরভে মাতায়ে প্রাণ—
হইয়ে বিভোর, মরি, স্মরিয়ে ভবেশে—
ভাবিয়ে জীবের গতি কি হইবে শেষে—

(৪)

আত্মহারা হ'য়ে মুনি ভ্রমে বনে বনে,
কতই ভাবের খেলা খেলিতেছে মনে ;
চক্ষু দুটি দৃষ্টি হারা—
চেয়ে আছে শুধু তা'রা ;
আঁখি তারা ছেড়ে মন গেছে কোন খানে !
যাঁ'র মন সেই জানে অন্যে নাহি জানে।

(৫)

মুনির সম্মুখে, হায়, কত শোভা, মরি—
মুনি চেয়ে আছে—কিন্তু আপনা পাসরি'—
একটি বৃক্ষের 'পরে
মনঃ সুখেতে বিহরে
ক্রৌঞ্চ-বধূ সহ ক্রৌঞ্চ মুখামুখি করি'
জানে না যে পাছে কাল—লবে প্রাণ হরি'।

(৬)

হায়! হায়!—একি! একি!—কেন হেন হলো ?
অকস্মাৎ ক্রৌঞ্চ মরি' ভূতলে পড়িল।
উড়ে ক্রৌঞ্চী চীৎকারিয়ে
ক্রৌঞ্চ ভূতলে লুটায়ে
ত্যজে প্রাণ—মুনিবর—নয়নে দেখিল—
উদ্ভ্রান্ত নয়নে মনে মিলন হইল।

মুনি চারিদিকে চায়, দেখে কৃতান্তের প্রায়, ধায় ব্যাধ লইতে ক্রৌঞ্চেরে।
দেখে, শোকে ক্ষোভে মুনি, শুনি সে চীৎকার ধ্বনি, বলিলেন কাতর অন্তরে—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতঃ ॥"

শোকেতে উৎপন্ন এই চারি চরণ অন্বিত ;
শ্লোক নামে সে অবধি ভূতলে হ'লো বিদিত।

শ্রী—

কনকলতা।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল। এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। পূর্ব্বদিক আরক্তিম হইয়াছে মাত্র। পাখীগণ কলরব করিয়া এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছে। রাজগৃহের অদূরবর্ত্তী প্রান্তর লোকে লোকারণ্য। একধারে একটি উচ্চ ভূমির উপর রাজা বল্লভশক্তি স্বীয় পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। রাজার সম্মুখের ভূমি পরিষ্কার—সাধারণ লোকে চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে,—যেন কি দেখিবার জন্য ব্যগ্র।

কিসের এ জনতা ?—আজ উজ্জয়িনী নগরাগত দুই জন মল্লের সহিত রাজান্নপ্রতিপালিত মল্লগণ মল্লযুদ্ধ করিবে, রাজা উভয় পক্ষীয় বীরের বলাবল পরীক্ষা করিবেন ;—অন্যান্য ব্যক্তিরা দেখিয়া কৌতুহল চরিতার্থ করিবে।

রাজার সম্মুখস্থ পরিষ্কার ভূমির মধ্যস্থলে মালবদেশীয় বীরদ্বয় বীরমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। রাজান্নপালিত মল্লগণ এক পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। রাজার আদেশ হইবা মাত্র মহারাজের প্রধান মল্ল বীরবল রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে, জনতা মধ্য হইতে কে বলিল ;" মল্লগুরুর এত শিষ্য থাকৃতে, নিজের বাহুবল অগ্রে পরীক্ষা করা ভাল হ'চ্চে না।"

তচ্ছ্রবণে, রাজার আদেশে প্রধান অমাত্য বলিলেন, "এ কথা কে বল্লে ? অগ্রসর হয়ে এস। মহারাজ তাকে দেখ্‌তে চান।"

এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র একজন যুবা মৃদুগমনে মহারাজের আসন সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল।

যুবা গৌরকান্তি। বয়স বিংশতি বর্ষ হইবে। দেহগঠন যেন বলে মাখা।

প্রধান অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, " তুমিই কি ঐ কথা বলে ছিলে ?"

যুবা শিরোনমন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

এবার রাজা স্বয়ং বলিলেন, " আমি আগত বীরদ্বয়ের দেহগঠন দেখে, বীরবলকেই উহাদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করেছি, তাই তাকেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছি ; আমি মনে করি, অন্য মল্লগণ ঐ বীরদ্বয়ের সমকক্ষ না হতে পারে।"

যুবা নম্রস্বরে বলিলেন, "মহারাজ, অধীনের বাচালতা মার্জ্জনা কর্‌বেন ; আপনার সৈন্যগণকে এতদূর হীনবল জ্ঞান কর্‌বেন না। মল্লগুরুর অন্য শিষ্যের কথা দূরে থাকুক, আমিই তাঁর অশীর্ব্বাদে, বীরদ্বয়ের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে কুণ্ঠিত নই।"

রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, " তুমি ঐ দুইজন বীরকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত কর্‌তে পার ?"

যুবা নম্রস্বরে বলিলেন, " মহারাজের অনুমতি হ'লে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখি।"

মহারাজের অনুমতি হইল। বীরবল নিবৃত্ত হইলেন, তাহারই শিক্ষিত যুবা রঙ্গে প্রবেশ করিলেন।

যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবা একে একে দুইজন মালবী মল্লকে পরাস্ত করিলেন ; চতুর্দ্দিক হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মহারাজ বল্লভশক্তির আদেশে বীর যুবা তাঁহার সমীপে পুনরানীত হইলেন। রাজা স্বহস্তে যুবার গলায় বিজয়মাল্য অর্পণ করিয়া বলিলেন, "বৎস ! এরূপ অল্প বয়সে তোমার এরূপ বিক্রম দর্শনে আমি বড়ই পরিতুষ্ট হয়েছি। যাও এখন বিশ্রাম করগে,অপরাহ্নে রাজসভায় আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রো।"

যুবা শিরোনমন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

রাজা পরিজনগণের সহিত রাজগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সাধারণ জনগণও স্ব স্ব গন্তব্য পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

যুবা পরাজিত বীরদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভাই ! আমার ইচ্ছা তোমরা দুজনে আমার সহিত বন্ধুতা কর। তোমাদিগকে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হ'লে আমি বড় সুখী হ'ব।"

এই বলিয়া উভয়ের করস্পর্শ করিলেন। সেই স্থানে আরও কয়েকটি লোক উপস্থিত ছিল। তন্মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "ভাই জয়েন্দ্র, এঁরা দুজন যদি আমাদের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হন, তা হলে আমরাও সুখী হ'ব।"

এই বলিয়া বীরদ্বয়ের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন "চলুন, পবিত্র বন্ধুতার প্রথম আস্বাদ অনুভব করবার জন্য, একত্রেই স্নানাহার করিগে।"

বীরদ্বয় এখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু এ যুবার সৌজন্য দর্শনে আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। সকলেই নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা বঙ্গের সুসময়ের কথা বলিতেছি। কিন্তু সে সময়ের ঐতিহাসিক তত্ত্ব কিম্বদন্তীজালে জড়িত।

মানুষের স্বভাব এই একজনের নিকট কোন গল্প শুনিলে অপরের নিকট বলিবার সময় তাহার সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য, সেই গল্পকে অলঙ্কৃত করিয়া বলে। এই রূপে কালে "সত্য গল্প" নানালঙ্কারভূষিত হইয়া, ক্রমে প্রথম বর্ণ দুইটি হারাইয়া "গল্পে" পরিণত হয়। লিখিত ইতিহাস না থাকিলেই, ইতিহাস এই রূপে উপন্যাসে পরিণত হয়। আমাদের উপন্যাসও যে তাই আমরা এ কথা বলিব না—কাহারও "তাই" বলিতে ইচ্ছা হয় বলিবেন, আমাদের তাহাতেও আপত্তি নাই।

এক্ষণে বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। জয়েন্দ্র ও বীরবল নগর মধ্যস্থ একটি অট্টালিকার একটি কক্ষে উপবিষ্ট আছেন। উভয়ের কথোপকথন চলিতেছে। সেই কথোপকথনের মধ্য হইতে কিয়দংশ আমরা পাঠকগণকে উপহার দিব।

বীরবল বলিলেন, "বৎস, আমি যে তোমার পিতা এ কথা কেবল তোমার প্রতিপালক ও আমার প্রিয়তম বন্ধু সুযজ্ঞই জানেন, আর কেহ জানে না। এ কথা আমি কাহাকেও বলি নাই, আজ উপযুক্ত অবসর পেয়ে তোমাকেই বল্লাম, কাহারও নিকট প্রকাশ করো না। আমার যা উদ্দেশ্য তা সফল হবার উপক্রম হয়েছে। আজ মহারাজ তোমার উপর যেরূপ সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাতে নিশ্চয়ই কালে তুমি তাঁর অতুল বিশ্বাসের পাত্র হ'বে সন্দেহ নাই। এখন তুমি সুযজ্ঞকে যেমন পিতার ন্যায় মান্য কর তেমনি কর; পরে যেমন কর্ত্তব্য হয় করা যাবে।"

জয়েন্দ্র এতক্ষণ বীরবলের বাক্য আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতেছিলেন, এখন আরও আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, "পিতঃ, আমি আপনাকে যেরূপ মান্য করে থাকি, আর আপনিও আমাকে যেরূপ স্নেহ ক'রে থাকেন, পূর্ব্বাপর, আপনার সহিত পিতা-পুত্র সম্বন্ধ জানা থাক্‌লে যে এ'র চেয়ে অধিক হ'তো, তার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু, যদি আপনি আমার পিতা, তবে আমাকে এরূপ অন্যের গৃহে রেখেছেন কেন?"

বীরবল বলিলেন, "বৎস, সকলি সময়ে জান্‌তে পারবে, এক্ষণে আমি যাই, আর একটু পরেই বৈকালিক সভা হ'বে, তুমিও যেও।"

এই বলিয়া বীরবল চলিয়া গেলেন।

জয়েন্দ্র সেই খানে বসিয়াই কত কি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার বন্ধুগণ মালবদেশীয় মল্লদ্বয়ের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। জয়েন্দ্র, গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা কবিলেন।

তদ্দর্শনে তাঁহাদের একজন বলিলেন, "অতঃপর যখন আমরা বন্ধুত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হ'তে চল্লাম, তখন পরস্পরের নিকট ওরূপ অভ্যর্থনার প্রয়োজন কি?"

অনন্তর সকলে উপবিষ্ট হইলে নানাবিধ আলাপে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। সকলেই সুখে বিভোর।

পাঠক, এই সময় এই মিত্রভাবদ্ধ যুবক কয়টির পরিচয় দিই।

প্রথম ভীমসিংহ—ইনিই জয়েন্দ্রের অতি প্রিয়তম বন্ধু। ইনি সুযজ্ঞের ভ্রাতৃপুত্র এবং জয়েন্দ্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ। ইনিই প্রাতঃকালে মালবদেশীয় বীরদ্বয়কে স্নানাহারে আহ্বান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রীদত্ত—ইনি একজন ব্রাহ্মণ পুত্র। ইনিও জয়েন্দ্রের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু সহপাঠী।

তৃতীয় চন্দ্রপ্রভ—ইনি ক্ষত্রিয় ও সকলের অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ।

মালবদেশীয় বীরদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যশোবন্ত ও কনিষ্ঠের নাম বলবন্ত। ইহাঁরাও ক্ষত্রিয়।

এই বন্ধু কয়টির বলিষ্ঠ দেহগঠন দর্শন করিলে নয়ন প্রীত হয়, মনে আনন্দ হয়।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীদত্ত বলিলেন "ভাই জয়েন্দ্র, চল রাজসভায় যাবার উদ্যোগ করা যাক।"

অনন্তর সকলে সেই কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠিক এই সময়ে রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে যুবরাজ বিক্রমশক্তি পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। ইনিও জয়েন্দ্রের তুল্যবয় এবং রূপেও তাঁহার অনুরূপ, কিন্তু গুণে তাঁহার তুল্য নন। ইনিও জয়েন্দ্রের ন্যায় বীরবলের নিকট মল্লবিদ্যা শিক্ষা করেন, কিন্তু জয়েন্দ্রের ন্যায় মল্লযুদ্ধ কৌশলে দক্ষ হইতে পারেন নাই—সুধু তিনি কেন সে রাজ্যের কোন যুবাই যুদ্ধ কৌশলে জয়েন্দ্রের তুল্য নয়। এই জন্য রাজকুমারের তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব ছিল। তিনি তাঁহাকে দুই চক্ষের বিষ দেখিতেন। কিন্তু জয়েন্দ্র

নিজ স্বাভাবসিদ্ধ সারল্য গুণে রাজকুমারের সে ঈর্ষাভাব বুঝিতে পারিতেন না।

রাজকুমার একমনে ভাবিতেছেন "জয়েন্দ্রের মল্লবিদ্যা শিক্ষা সার্থক! আমি বৃথা এতদিন রঙ্গধূলি মাখ্‌লাম—যশ তার হ'লো—কেন আমি পিতাকে বলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেম না—আমি কি পার্‌তেম না?—কে বল্লে, পার্‌তেম,না—যাই হউক আর পদে পদে অপমান সহ্য হয় না—সুযজ্ঞ একজন সামান্য ক্ষত্রিয়—শুনেছি তার পিতা আমার পিতামহের ছত্রধারী ছিল—তার পুত্র পদে পদে আমাকে অপমানিত কর্‌চে—আর সহ্য হয় না—জয়েন্দ্র জীবিত থাক্‌তে আমার আশা মাত্র নাই—নিশ্চয়ই তাকে বিনাশ কর্‌তে হ'বে—দেখি কিসে কি হয়—" এই বলিয়া মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দেখ, যে ব্যক্তি বাল্যাবধি কখন কোন অনিষ্ট করে নাই—তারি প্রাণবধে ইচ্ছা—জগতের গতি চমৎকার—অথবা খলের স্বভাব সাধারণের স্বভাব হইতে স্বতন্ত্র। খলের নিকট ভাল মন্দ জ্ঞান নাই,—আত্মপর বিচার নাই—নিজের স্বভাবের গতিকে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতাই তাহার নাই। তাহার স্বভাবের গতিকে মন যাহা করিতে বলিবে, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে। রাজপুত্র হইলে কি হয়—স্বভাবের গুণেই লোকে জগতে পূজ্য অথবা নিন্দনীয় হয়—

যুবরাজ একবারও ভাবিলেন না যে, যদি এই নিন্দার কাজ করি তবে লোকে কি বলিবে—কিম্বা এরূপ চিন্তাও করিলেন না "কেন আমি তাহাকে নষ্ট করিব, সে নিজের চেষ্টায় যশ উপার্জ্জন করিতেছে—আমিও কেন চেষ্টা করি না—সে দুইজন মল্লকে জয় করিয়া এই রাজগৃহের প্রজাগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতেছে—আমি কেন সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া চক্রবর্ত্তী রাজা বলিয়া জগতের নিকট পূজ্য হই না—"

এরূপ চিন্তা তাঁহার মনে একবারও উদিত হইল না—কিন্তু খল স্বভাবের অনুরূপ চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল—তিনি কেবল এইরূপ ভাবিলেন— আমি যশ পাই না পাই তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আর একজন যশলাভ করিবে কেন?" অন্যে যাতে যশের অধিকারী না হয়—জয়েন্দ্রের যাতে উন্নতি না হয়—যাহাতে লোকে তার কথা মুখে না আনে এই তাঁর ইচ্ছা—কিন্তু যখন দেখিলেন—তাহার অভ্যুদয়ে প্রতিবাদী হইবার কোন উপায় নাই—তখন স্থির করিলেন—হত্যা দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করাই কর্ত্তব্য!

যুবরাজ এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন পরিচারক আসিয়া বলিল "যুবরাজ, মহারাজ আপনাকে রাজসভায় ডাক্‌চেন।" কাজেই যুবরাজকে এ কর্ত্তব্য চিন্তায় বিরত হইয়া রাজসভাতেই যাইতে হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজসভায় সিংহাসনে মহারাজ বল্লভশক্তি উপবিষ্ট আছেন। পার্শ্বে জয়েন্দ্র প্রধান মন্ত্রীর সহিত একাসনে আসীন। গুণপক্ষপাতী রাজার প্রসাদে আজ তাঁহার এই সম্মান।

জয়েন্দ্রের বন্ধুগণ বীরবলের সহিত অদূরে উপবিষ্ট। আজ-পুত্রের এত সম্মান, দেখিয়া পিতার মন অবশ্য আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে—সে আহ্লাদের ভাব বীরবলের মুখেই প্রকাশিত—কিন্তু লোকে বুঝিতেছে তাঁহারই শিষ্য আজ এত সম্মান লাভ করিল, ইহা দেখিয়াই তিনি সুখী। বাস্তবিক শিষ্যে আর পুত্রে প্রভেদ কি? গুণের পুরস্কার দর্শনে আপামর সাধারণেই সুখী।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা বলিলেন, "দেখ, জয়েন্দ্র, আমি তোমার বীরত্বে যে কি পর্য্যন্ত তুষ্ট হয়েছি, তা আর কি বল্‌বো—কিসে যে তোমার বীর্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার হবে আমি তা কিছুই স্থির করতে পার্‌চি না, আমি মনে করেছি অতঃপর তুমি কুমার বিক্রমের সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হও—তোমাদের দুজনকে অহর্নিশ একত্রে দেখ্‌লে, আমার মন বড় পরিতুষ্ট হবে। তুমি সমরশাস্ত্র বিশেষ রূপে শিক্ষা কর, আমি শীঘ্রই তোমাকে সেনাপতি বীরেন্দ্র সিংহের সহ-কারী করে দিব।"

এই সময় যুবরাজ বিক্রমশক্তি রাজসভায় প্রবেশ করি-লেন। জয়েন্দ্রকে প্রধান মন্ত্রীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহার মনের ভাব যে কিরূপ হইল, তাহা বর্ণনা করা সহজ নয়—তিনি যাহাকে যমের কোলে দিতে ইচ্ছুক সে তাঁহার পিতার কোলে!

রাজা পুত্রকে বিস্মিত দর্শনে বলিলেন "বৎস, গুণের পুর-স্কার করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে আজ হ'তে তুমি জয়েন্দ্রকে বন্ধুবলে গ্রহণ কর—তোমাদের দুটিকে একত্রে, দুটি যমজ ভ্রাতার ন্যায় দেখ্‌লে আমি পরম প্রীত হব। তচ্ছ্রবণে যুবরাজের মনে কি ভাবের উদয়

হইল। তিনি কিয়ংক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়াই বলিলেন—"পিতঃ, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

এই কথা বলিয়া তিনি সহাস্য বদনে জয়েন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—

"এস, ভাই, তুমি আমি এক গুরুর শিষ্য, আজ হ'তে দুজনে সহোদরের ন্যায় সুখে কালক্ষেপ কর্‌বো"—

এই বলিয়া যুবরাজ জয়েন্দ্রকে যেন বিপুল স্নেহভরে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। সকলে রাজকুমারের সরলতা দর্শনে মোহিত হইলেন। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিকটস্থ আর এক জনকে বলিলেন—

"দেখ্‌লে হে, আমাদের যুবরাজ কেমন অমায়িক।"

উত্তর। "না হবে কেন? কেমন পিতার পুত্র।"

এ কথা রাজার কর্ণে গেল। তিনি পুত্রের প্রশংসায় পুলকিত হইলেন।—সকল পিতাই হইয়া থাকেন।

যুবরাজও সে কথা শুনিয়াছিলেন—তিনি শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন মাত্র—কিন্তু সে হাসির প্রতি কেহ লক্ষ্য করিল না।

একি আশ্চর্য্য! যুবরাজ এই মাত্র যাঁহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, তাঁহাকেই বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন—যুবরাজ কি পিতার বাক্যে শত্রুভাব ত্যাগ করিলেন, না তাঁহার মনের অভিসন্ধি মনেই রহিল।—সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বরই জানেন।

কিয়ংক্ষণ পরে রাজসভা ভঙ্গ হইল।

* * * * * *

সভাগৃহের দ্বিতলস্থ বাতায়নে দুইটি বালিকা দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা এতক্ষণ সভা দেখিতেছিল। সভা ভঙ্গ হইলে একটি আর একটিকে বলিল—"কেমন দেখিলে, ভাই?"

অপরটি অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—

"ভাল।"

"তবে চল, যাই, এখন ত আর সভায় কিছু নাই।"

এই বলিয়া অপর বালিকার হস্ত ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

এই বালিকা দুইটির প্রথমা রাজকন্যার সহচরী চন্দ্রপ্রভা। দ্বিতীয়া স্বয়ং রাজকন্যা কনকলতা।

(ক্রমশঃ)

নলিনী।

নৌকা মগ্ন!—আশা ভগ্ন!

(গীতিকা)

১

"হাস্‌ রে তরু! হাস্‌ রে লতা!
আমিও হাসি তোদের সনে।
অনেক কেঁদে, আজকে হাসি
ভাস্‌ছে আমার নতুন প্রাণে।
ওরে ও তরু লতা!
শোন্ রে কথা,
বলি তোদের কানে কানে;—
যে আমায় ব্যথা দেছে,
সে যে আজ আস্‌বে কাছে,
সকাল বেলা ব'লে গেছে
সখী তা'র,—
"কেঁদ না—কেঁদ না তুমি আর।"

২

"আমি বল্লেম তা'কে,—
কেন, সখি, কাঁদবো না?

সবাই যদি হাস্‌বে, তবে
কাঁদ্‌বে কে আর বলনা ?
আমি জানি, সখি, তোমার সখী
বড়ই সুখী হয়
দেখ্‌লে আমার্ চোক্কের্ জল্,
তা বই সুখী নয়।
তাই তো আমায়্ কাঁদায়্ এত
মর্ম্মে দিয়ে বেদনা।
ঐ দেখ ঐ দেখ, সখি, সরসী থেকে
কোমল কমল পাতা তুলে,
হতাশ হয়ে চোক্কের জলে
পূর্ণ কোরে ঐ রেখেছি, সই।
কমলপাতা শুকিয়ে গেছে,
নয়ন-বারি শুখালো না।
না ভুল্‌লে, সই, তোমার সই সে ছলনা,
পরেও এ জল শুখা'বে না শুখা'বে না।

৩

"ওরে ও তরু লতা, এবার ব্যথা
ব্যথা পেয়ে যা'বে ;
যে মোরে দেছে ব্যথা, আস্‌বে হেথা,
কইবে কথা, অশ্রু মুছে দেবে।
সখী তা'র বলে গেছে ;—
'চাঁদের আলো খেল্‌বে যখন্
নীল্ আকাশে ;
ফুলের্ সুবাস উড়্‌বে যখন
ধীর্ বাতাসে ;
কালো অলি ফুলের কলি
কিম্বা ফোটা ফুল
চিন্‌বে নাকো, পালিয়ে যা'বে,
লাগ্‌বে ধোঁকার্ ভুল ;
আকাশ হ'বে জোছ্‌না মাখা,
নীলের গায়ে ধবল রেখা ;
সে তখন দিয়ে দেখা,
কান্না ফিরে নেবে।'

৪

"কান্না ফিরে নেবে ?—
কান্না ফিরে নেবে ?
তবে কি এসে সে রে, নয়ন-নীরে
ভেসে যা'বে ?
আমি না হয় কাঁদ্‌ছি দুখে,
আমি না হয় মলিন মুখে
জ্বালার শিখা সচ্চি বুকে,
সে কেন কোমল প্রাণে অশ্রু-বাণে
দুঃখ পা'বে ?
বল্ রে বল্ তরু লতা।
কেন, রে এমন্ কথা
বোল্লে সখী তা'র ?
নয়ন-ধারে নয়ন-ধারে
ধারের প্রতিকার ?
না না, আমি আমার তা'রে
আমার মত নয়ন-ধারে
এমন,কো'রে ভাস্‌তে দেবো না।
আমার সে সরলপ্রাণা
তাই তো তা'র নাইকো জানা
সুখ দুঃখ কা'রে বলে,
তবে তা'য় নয়ন-জলে
ভাসা'ব না—ভাসা'ব না।

৫

"তাই বলি, রে তরু লতা।

যা'রা যত আছিস্ হেথা,
সবাই মিলে ঘুচাস্ ব্যথা
আমার তা'র।
এখন্ থেকে হাস্‌তে সুরু
কররে সব লতা তরু!
হাসির্ রেখা যা'ক্ রে দেখা
চারি ধার।
কাঁদ্‌লে পরে কান্না আসে,
হাস্‌লে ঝরে হাসির ধার।
এই জগতে অনেক্ জগৎ আছে,
হাসির্ জগৎ কেবল্ তোদের কাছে।
হাস্‌বি যখন্ তোরা,
আপ্‌নি সুধার ধারা
তোদের্ হৃদয় হ'তে
বোয়ে যা'বে স্রোতে
কোমল হৃদে তা'র;
হাস্‌বে সে আমার
কত হাস্‌বে সে আমার!"

[ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইল—সন্ধ্যা আসিল—তখন রূপেন্দ্র, নদীতটস্থ ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন।]

৬

"নদীর্ পারে পাহাড়্ আড়ে
নাম্‌লো রাঙা রবি।
পূর্ব্ব ধারে সুধাধরে
জাগ্‌লো চাঁদের ছবি।
আলো ঠেলে আঁধার আসে,
ঠেলা ঠেলি কিসের আশে?
ও——বুঝেছি——
তপন্-ভয়ে গোপন্ হোয়ে
আঁধার ছিলো দূরে,
এখন্ সময় পেয়ে চোল্লো ধেয়ে
আলো মুখে পূরে।
কিন্তু হেথা চাঁদ পেতে রূপের ফাঁদ
হীরের দীপে জ্বাল্‌লে আলো;
আবার পালায়্ আঁধার্ কালো।
"আমারো প্রাণের আঁধার যা'বে ঘুচে,
যা'বে ঘুচে আঁধার-মাখা
বিষাদ্ রেখা।
এই চাঁদকে হারিয়ে রূপে—হারিয়ে আলোয়
সেই চাঁদ মোর এই এখনি
দেবে দেখা।
"থাম্ রে নদীর জল!
"থাম্ রে কল কল!
থাম্ রে বায়ু, একটু খানি;
খানিক দাঁড়া চুপটি কোরে;
একবারটি শুন্‌তে দে রে,
ঐ বুঝি আসছে—দাঁড়া—শুনি,
দাঁড় বুঝি পোড়ছে জলে ওই,
দাঁড়্ ফেলার শব্দ আসে; না না—কই কই?
জোছনা জলে ভাসে, তবু সে নাহি আসে,
জোছনা গিরিশিরে গড়ায়ে পড়ে ধীরে,
জোছনা তরুদলে কত যে ঝল মলে,
জোছনা ফুলে ফুলে ঘুমায়ে পড়ে ঢুলে,
জোছনা দূরে কাছে, জোছনা আগে পাছে
গড়া-লুটি খায়,
জোছনা ঘুম-ঘোরে চায়।
তবু সে আমার পাশে নাহি আসে
কিসের তরে?
জোছনা দেখেও কিরে, চায় না ফিরে,
রৈলো দূরে?
না না, সে তেমন নয়,

হয়ত সে বোঝেনি রে সন্ধ্যে কা'রে কয়,
তাইতে তা'র এত দেরি হয়।"

[রূপেন্দ্র নদীতীরস্থ শৈলশিখরে, দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এবং নলিনীর আগমন অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিতেছেন এমন সময় এদিকে]—

৮

নদীর বারি বইছে খর টান,
আপন মনে যাচ্ছে চোলে
জোছ্না মাখা প্রাণ।
আকাশেও আপন মনে জলদ চলে,
নামটি জলদ, জলদগতি গেছে ভুলে!
জোছনা-নেসায় বুঝি মেঘ
ঘুমের ঘোরে যাচ্ছে চোলে
তাই নাইকো বেগ।
এমন সময় নদীর তীরে
কে ওই এলো ধীরে ধীরে,
বনের দেবীর ছবি—কেমন না?
বনদেবী নয় নলিনী যে,
বনের ফুলের সাজে সেজে,
ঐ দাঁড়ালো, থাম্‌লো ছোট পা।
তখন্ মেঘ সরিয়ে, ব্যস্ত হোয়ে,
চেয়ে দেখে চাঁদ,
চাঁদের চেয়েও এ চাঁদ ভাল,
চাঁদ ধর্‌বার ফাঁদ।
চাঁদ ছাড়িয়ে অনেক্ দূরে
অবাক হোয়ে চুপ্‌টী কোরে
ছোটো বড় হাজার হাজার
তারা চেয়ে রয়,
তারায় তারায় হ'চ্ছে কথা—
'ঐ চাঁদটি চাঁদই বটে,
এ চাঁদ চাঁদই নয়।
নদীর তীরের চাঁদের ছায়া
এ চাঁদ সুনিশ্চয়।'

৯

রূপ সোহাগী নলিনী তখন
ধীরে ধীরে নৌকা'পরে,
ক'ল্লে আরোহণ।
ঝুল্‌ছে পিঠে খোলা চুল,
দুল্‌ছে কাণে ফুলের দুল,
ফুল-সোহাগী, ফুলে ফুল,
ফুলের নলিনী।
গলায় দোলে ফুলের মালা,
ফুলের মুকুট ফুলের বালা,
ফুল-প্রতিমার ফুলের খেলা,
ফুলের দোলনী।
ফুল-সাজনির ফুলের কুড়ি
উঠ্‌ছে ফুটে তাড়াতাড়ি,
ও—নয়ত ফোটা, দেখার ঘটা,
চক্ষু মেলে চায়;
নলিনীর রূপটি দেখে
ফুলেরা চোখে চোখে
রূপের মধু খায়।
নলিনী ভাব্‌ছে মনে ফুলের পানে
চেয়ে চেয়ে—
'ফুলেরা আমার চেয়ে দেখ্‌তে ভাল।'
ফুলেরা ভাব্‌ছে মনে—
'আমাদের গরব মিছে—
নলিনীই রূপ-জগতে আলোর আলো।'

১০

নলিনী—
কোমল করে খুল্লে দড়ি,



স্রোতের দিকে তরীর পাড়ি ;
হেলে দুলে নৌকা চলে,
নলিনী হাওয়ায় দোলে ,
অজড় ফুলে জড় ফুলেতে জড়াজড়ি।
দু'ধারে শৈল-শ্রেণী,
মাঝারে জলের বেণী,
কুলুকুল্ জলের ধ্বনি
ধীর সমীরে ছড়াছড়ি।
নলিনীর প্রাণের প্রাণ,
সেথানে দাঁড়িয়ে আছে,
নলিনী আস্‌বে কখন
কেবলি ভাব্‌চে মনে।
এখানে তরীর'পরে
নলিনী ভাব্‌ছে মনে—
'আমার সে ভাব্‌ছে কত
যাব গো কত ক্ষণে।'

১১

নলিনী ধোল্লে গান,
হাওয়ায় ভেসে উঠ্‌লো তান।
সে গান এই—

"হীরের বরণ চাঁদের কিরণ ভাস্‌ছে জলে,
কিরণমাখা জলে ভেসে চল্‌রে তরী ত্বরায় চোলে।
ও মেঘ, চাঁদকে ঢাকিস্ না, দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে
তরী যেমন ভেসে যায়
তেম্নি তুইও গগন গায়
চলরে হেসে ভেসে ভেসে হাওয়ায় দুলে
আমি যাই জলে জলে, চল তুই মেঘ কুলে কুলে।"

ক্ষুদ্র নৌকা নলিনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কতদূর চলিয়া গেল। নলিনী এই কতক্ষণ যে মেঘখণ্ডকে সম্বোধন করিয়া গান গাহিতেছিল, সেই মেঘখানা সহসা বাড়িয়া উঠিল। অন্যান্য মেঘ আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। চাঁদ মেঘাচ্ছন্ন হইল। এমন সময় দেখিতে দেখিতে প্রতিকুল বায়ু তুফান তুলিল।

১২

ক্ষুদ্র তরী অধীর হোচ্ছে
ঘোর তুফানের ঘায়।
নলিনী আকাশ পানে চায়।
মেঘের গায়ে ছুট্‌ছে মেঘ,
ওলট্‌ পালট বায়ুর বেগ,
ক্ষুদ্র তরী—যায়—যায়—যায়—
ফুলের মুকুট উড়ে গেল,
ফুলের মালা ছিঁড়ে গেল
চিকন চিকুর এলোমেলো
আঁচল খানি ওড়ে।
জলের ঢেউ পাগল হোয়ে
ধাক্কা মারে তরীর গায়ে—
ক্ষুদ্র তরী তোড়ের ঘায়ে
ওলট খেয়ে পড়ে।

১৩

ডুব্‌লো জলে নৌকো খানি
ডুব্‌লো জলে কোমল প্রাণী
ডুব্‌লো জলে রূপের আশা
ডুব্‌লো জলে ভালবাসা
কোমল জলে কোমল দেহ ডুব্‌লো রে।
চাঁদ ডুবেছে মেঘের কোলে
এ চাঁদ ডুব্‌লো নদীর জলে
দুচাঁদ ডুব্‌লো, আঁধার হ'লো
এক পলকে সকল গেলো
রূপেন্দ্রের ভরাট আশা ভাঙ্‌লো রে!
জলের স্রোতে, আকুল চিতে
নলিনী ভেসে যায়,
অবশ হ'লো কোমল দেহ
জানে না সাঁতার তায়,
উঠ্‌তে যত যত্ন করে
ডুব্‌ছে তত দেহের ভরে
ভাস্‌ছে জলে এলো চুল
ভেসে গেল গায়ের ফুল।
উপর পানে একেক বার
হাত দু'খানি ওঠে
মগ্ন মুখে ভাঙা কথা ফোটে—
"নাথ!—যাই—যাই।"
আর কথা নাই।

১৪

নদীর তীরে শৈল চূড়ে
রূপেন্দ্র দাঁড়িয়ে ছিলো,
ঝড়ের জোরে রক্ষ ধোরে
জলের পানে চেয়ে ছিলো।
এমন্ সময় চম্‌কে হৃদয়
শুন্‌তে পেলে কাণে—
"নাথ! যাই—যাই!—"
অম্নি রূপেন্ চেঁচিয়ে বলে
আকুল হ'য়ে প্রাণে—
"প্রিয়ে! ভয় নাই।"
রূপেন্দ্র—এই না বো'লে, পূর্ণ বলে
শৈল চূড়া হ'তে,
নলিনীর রক্ষা হেতু ঝাঁপিয়ে পড়ে
তুফান্-পাগল্ স্রোতে।
ডুব্‌লো জলে দেহের ভরে
উঠ্‌লো ভেসে খানিক পরে
দেখ্‌লে চেয়ে চারি ধারে
কোথাও কিছুই নাই—
অনেক দূরে ক্ষীণ স্বরে
শুন্‌লে শুধু—"যাই।"

এমন সময় পালটা দিয়ে
তুফান বায়ু গর্জ্জে ধেয়ে

দ্বিগুণ আকুল ক্ষুদ্র তটিনী।
হা! রূপেন কোথা!—হা! কোথা নলিনী।*

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

স্বর্গীয় মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ।

"He, who will not reason, is a bigot; he, who cannot is a fool, and he, who dares not is a slave."

SIR W. DRUMMOND.

যে মহাত্মা, উল্লিখিত মহাবাক্যটি আপনার জীবনের লক্ষ্য করিয়াছিলেন—যিনি, বাঙ্গালার অতি হীনাবস্থার দিনে, বাঙ্গালীর ন্যায্য স্বত্বের জন্য প্রাণপণে যুঝিয়াছিলেন—সেই প্রসিদ্ধ বাগ্মীবর মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ ১২২১ সালের আশ্বিন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর মিলেট-(Jean Francois Millet)-ও এই সালে জন্মিয়াছিলেন। ইনি স্বর্গীয় রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। যে সময় মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্ম সংস্কার-কার্য্যে ব্যাপৃত—যে সময় জন ষ্টুয়ার্ট মিল, শিশুবয়সেও পিতার পার্শ্বে বসিয়া রাজনৈতিক ও দার্শনিক কূটতর্ক সকল বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই মহাত্মা ভারতভূমে অবতীর্ণ হন। ইঁহার পিতা গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ সামান্য মাত্র উপার্জ্জন দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিবার প্রতিপালন করিতেন। তিনি প্রথমতঃ রামগোপালকে সেরবোর্ণ (Mr. Sherbourne) সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। সেকালে কলিকাতার লোকে সেরবোর্ণের নিকটেই ইংরাজি শিখিত। বিখ্যাত স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরও তাঁহার নিকট ইংরাজি শিখিয়াছিলেন।

রামগোপাল মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁহার মেধা দর্শনে, তাঁহার পিতার আত্মীয়েরা তাঁহাকে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবার পরামর্শ দেন। কোন্ পিতা, পুত্রের উন্নতি কামনা না করেন? তাদৃশ দুরবস্থাতেও রামগোপালের পিতা রামগোপালকে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স নয় কি দশ বৎসর। মেধাবী রামগোপাল, আপনার গুণে শীঘ্রই শিক্ষকগণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। শুধু শিক্ষক কেন? যে রামগোপালের সঙ্গে দুইটা কথা কহিত, সেই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। ভারতপূজ্য ডেবিড্ হেয়ার (David Hare) সে সময়ে হিন্দু কলেজের তত্ত্বাবধায়ক সমিতির একজন সভ্য, তিনিও রামগোপালের মেধা, পরিশ্রম ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। ডেবিড্ হেয়ারের একটি প্রধান গুণ ছিল—তিনি সর্ব্বদা ছাত্রদিগের পারিবারিক সম্বাদ লইতেন। যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, রামগোপালের পিতাকে অতি কষ্টে বেতন যোগাইতে হইতেছে, তখন তিনি রামগোপালকে বিনা বেতনে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে, এই বিদ্যালয়ে তাঁহার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত সখ্য হয়।

রামগোপাল সর্ব্বদা পিতার কষ্টের কথা ভাবিতেন, এবং যত শীঘ্র তাঁহার সহায় হইতে পারেন, সে বিষয়ে সতত সচেষ্ট ছিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে, অনবরত পরিশ্রম ও স্বভাবসিদ্ধ মেধার গুণে, তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সময়ে ডিরোজিও (Henry Lewis Vivian Derozio) নামে এক ব্যক্তি হিন্দু কালেজে চতুর্থ শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। ইঁহার উপদেশে রামগোপাল ও তাঁহার সঙ্গীগণ হিন্দু আচারের সীমা উল্লঙ্ঘন করেন।

এই রূপে রামগোপালের বয়স ক্রমে ১৭ বৎসর হইল। এই সময়ে ডেবিড্ হেয়ারের ইচ্ছানুসারে এণ্ডার্সন (Mr.-Anderson) সাহেব রামগোপালকে জোসেফ নামক একজন

* যে ছন্দে এই কবিতাটি লিখিত হইল, উহা পড়িতে অনেকের ভাল লাগিবে না, কিন্তু একটু বুঝিয়া পড়িলে আটকাইবে না। নিতান্ত কথায় পড়ার মত না পড়িয়া একটু সুরের মাত্রা দিয়া পড়িলে ছন্দের ছাঁদ পাওয়া যাইবে।—লেখক।

য়িহুদি সওদাগরের নিকট নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রামগোপাল সংসার চিন্তায় জড়িত হইয়াও বিদ্যার বিমল-জ্যোতিঃ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এরূপ কথিত আছে প্রতি শনিবার (য়িহুদিদিগের বিশ্রাম দিন) তিনি হিন্দুকালেজের প্রথম শ্রেণীতে আসিয়া বালকদিগের সহিত শ্রুতলিখন প্রভৃতিতে যোগ দিতেন; অধিকন্তু মাণিকতলায় শ্রীকিষন্ সিংহের বাগান বাটিতে (Academic Association) 'একাডেমিক এসোসিয়েসন' নামে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত এক সভা ছিল, তথায়ও তিনি নিয়মিত উপস্থিত হইয়া তর্কবিতর্ক অভ্যাস করিতেন। ডিরোজিও এই সভার সভাপতি ছিলেন, তৎকলে গভর্ণর জেনেরেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্ণেল বেন্সন্ (Colonel Benson) সর্ব্বদা ঐ সভায় যোগ দিতেন।

এই সময় জোসেফ, রামগোপালের উপর আপনার ব্যবসায়ের সমস্ত ভার দিয়া বিলাত গমন করেন। রামগোপাল ঐ কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে, জোসেফ ফিরিয়া আসিয়াও তাঁহাকে আপনার হাউসের সর্ব্বময়কর্ত্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময় জোসেফ কেলসেল (Mr. Kelsall) সাহেবকে আপনার অংশীদার করেন।

এই সময় রামগোপালের বাল্যসখা রসিককৃষ্ণ জ্ঞানান্বেষণ নামে একখানি পত্র প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। রামগোপাল সময়ে সময়ে ঐ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাহাতে তাঁহার ঐ বিষয়েও বিলক্ষণ অনুরক্তি জন্মে। জ্ঞানান্বেষণ উঠিয়া গেলে, তিনি উদ্যোগী হইয়া বেঙ্গল স্পেক্টেটর (Bengal Spectator) নামে এক পত্র প্রচার আরম্ভ করেন। কিন্তু বিষয় কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে তিনি উহার ভার নিজে বহন করা অসম্ভব ভাবিয়া স্বীয় বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের হস্তে উহার সম্পাদকতা অর্পণ করেন। তিনি সময়ে সময়ে উহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে জোসেফ ক্যালসেলে বিবাদ হওয়ায় ক্যালসেল নিজে স্বতন্ত্র বাণিজ্যাগার স্থাপন করেন। এণ্ডার্সন সাহেবের পরামর্শে রামগোপাল, ক্যালসেলেরই তত্ত্বাবধায়ক হন। ক্যালসেল তাঁহাকে এত বিশ্বাস করিতেন ও এত ভালবাসিতেন যে, কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহাকে আপনার অংশীদার করিয়া লইলেন। তখন হইতে Keesalls, Ghose & Co. নামেই কারবার চলিতে লাগিল। যাহা হউক কিছুদিন পরে ইনি নানা কারণে ক্যালসেলের নিকট আপনার অংশ বুঝিয়া লইয়া ব্যবসায়ে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে রামগোপাল রাজনীতি প্রভৃতির চর্চ্চার জন্য "Society for the acquisition of General Knowledge" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে ছিলেন। ১২৫০ সালে তিনি টমসন্ (Mr. GeorgeThompson) নামক একজন প্রসিদ্ধ বক্তাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। টমসনের পার্লেমেণ্টারি ধরণের বক্তৃতায় কলিকাতা যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে নৃত্য করিতে লাগিল। রামগোপাল সেই বৈদ্যুতিক আলোকে পথ দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, লোককে বুঝাইবার প্রকৃত উপায় কি? কালে রামগোপালের বক্তৃতাতেও বৈদ্যুতিক অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছিল। টমসনের পরামর্শে তাঁহাদের সভা "Bengal British India Society"তে পরিণত হয়। ঐ সভাই বর্ত্তমান Indian Association-এর জননী।

ক্যালসেলের নিকট আপনার অংশ বুঝিয়া লইয়াই, রামগোপাল কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এণ্ডার্সন সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সময় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট রামগোপালকে ছোট আদালতের জজীয়তি অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে গবর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত হইলে, স্বাধীনভাবে দেশহিতকর কার্য্যে যোগ দিবার ব্যাঘাত ঘটিবে। কিছুদিন পরে এণ্ডার্সন সাহেবের পরামর্শে, তিনি R. G. Ghose & Co. নামে একটি ব্যবসায়াগার নিজেই স্থাপন করেন। তাহাতেও তিনি বিশিষ্ট লাভবান হন, কিন্তু তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমরা স্থানাভাবে দিতে পারিলাম না।

আমরা তাঁহার বক্তৃতাদির বিষয়ে দুই একটি মাত্র কথা বলিয়াই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। তিনি সময়ে সময়ে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সকল অমূল্য। আমাদের অল্প পরিসর পত্রে তাহার সমালোচনের স্থান নাই। সমালোচনা করিয়াও তাহার গুণ বুঝান সহজ নয়—সে গুলি নিজে না পড়িলে তাহার গুণ বুঝা দুরূহ, এজন্য আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করিব না। রামগোপাল সাধারণ হিতকর কার্য্যে কিরূপ আন্দোলন করিতেন Black Acts-এর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

ঐ সময় ইউরোপীয় ও ভারতবাসীকে সমান আইনে বাধ্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করেন। সম্প্রতি ইলবার্ট বিল

লইয়া যেরূপ গণ্ডগোল হইয়া গেল, ইংরাজ ও বাঙ্গালীতে তখনও সেইরূপ হইয়াছিল। রামগোপাল প্রভৃতি তখন নব্যসম্প্রদায়ের নেতা। বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ঐ বিষয়ে বিষম আন্দোলন হইয়াছিল। রামগোপালের "Black acts" বিষয়ক প্রবন্ধ আজিও আছে, দেখিলেই সে কালের ব্যাপার বেশ বুঝা যাইবে।

রামগোপালকে সাধারণ হিতকর কার্য্য মাত্রেই দেখা যাইত। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য সম্বন্ধীয় বা যে কোন অনুষ্ঠান হউক না কেন, রামগোপালকে তাহারই মধ্যে দেখা যাইত। সামান্য শারীরিক কষ্টে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। যখন তিনি তাঁহার জীবনের শেষ বক্তৃতা করেন, সে সময়ে তাঁহার শরীরে সাংঘাতিক রোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার উপর তাঁহার একমাত্র অবশিষ্ট কন্যার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তাহার কিয়দ্দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রামগোপাল ১২৭৫ সালে তাঁহার পবিত্র ভার রাখিয়া পবিত্রতম প্রদেশে প্রস্থান করেন। আক্ষেপের বিষয় এই, বাঙ্গালাদেশে এরূপ উপযুক্ত বাঙ্গালীর একখানি উপযুক্ত বাঙ্গালা জীবনচরিত আজিও প্রকাশিত হইল না।

S. S. H.

প্রযুক্ত-বিজ্ঞান।

এই পত্রিকায় আমরা, সরলবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য শিল্পে প্রযুক্ত হইয়া, আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তু সকল প্রস্তুত হইতেছে—যাহাকে ইংরাজীতে Applied science বলে—আমরা, তাহাকেই **প্রযুক্ত-বিজ্ঞান** নামে অভিহিত করিয়া, প্রকাশ করিব। এই প্রযুক্তবিজ্ঞান-স্তম্ভে আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উৎপত্তি-ইতিহাস ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তৃত রূপে বিবৃত করিব। ইহাতে যে কেবল একজন লেখকের লেখাই প্রকাশিত হইবে তাহা নহে। এই স্তম্ভে প্রকাশোপযোগী-বিষয়ক প্রবন্ধ মাত্রই প্রকাশিত হইবে। কোন প্রবন্ধে মতভেদ ঘটিলে, যদি কেহ প্রতিবাদ করেন, তাহাও এই পত্রে প্রকাশিত হইবে (সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই এই রূপ)। ফল কথা, আমাদের ইচ্ছা, সকল বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইয়া সত্য মতই প্রতিষ্ঠিত হয়।—(শি, সং,)

১—সাবান।

সাবানের প্রয়োজন।

দেহ রক্ষা যেমন প্রয়োজন, রক্ষিত দেহ নীরোগ হইয়া থাকাও তেমনই প্রয়োজন। যদি রোগের জ্বালাতেই জীবনের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে বাঁচিয়া সুখ কি? অপরিষ্কার দেহ যে রোগের মূল, তাহা সকলেই জানেন। তথাপি বিশেষ করিয়া বলি: যে কথা লোকে প্রয়োজনীয় জানিয়াও মনে রাখে না, সে কথা বার বার বলিলে মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে। ঘর্ম্মের সহিত দেহ হইতে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ নির্গত হয়, উহা যদি শরীর হইতে বিযুক্ত না করা যায়, তাহা হইলে উহা লোমকূপ বদ্ধ করিয়া, পুনরায় ঘর্ম্ম নির্গমনের পথ রুদ্ধ করে। ঘর্ম্মের সঙ্গে আর শরীরের মল নির্গত হইতে না পারিয়া শরীর মধ্যে থাকিয়া রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। মলযুক্ত বস্ত্রাদিতেও শরীরের এই অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই শরীর ও বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তৈলাক্ত পদার্থ জল দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে উঠাইয়া ফেলা যায় না, সেই জন্যই সাবানের প্রয়োজন।

সাবান কি?

সাবানের প্রয়োজন একপ্রকার বুঝা গেল এক্ষণে দেখা যাউক, যে সাবানের এত প্রয়োজন সেই সাবান কি পদার্থ?—যে বস্তু তৈল পদার্থ ও ক্ষারযোগে উৎপন্ন হয়, এবং যাহা জলযোগে ফেনিল হইয়া অন্য পদার্থকে মলশূন্য করে, তাহাই সাবান নামে পরিচিত। কিন্তু ঐ তৈল ও ক্ষার মিশ্রণের প্রকার আছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

সাবানের ইতিবৃত্ত।

এইক্ষণে, এই মহান উপকারী পদার্থ কি রূপে মানব-সমাজে প্রথম প্রচারিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে পণ্ডিত-গণ অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছেন,

তাহা এই স্থানে দেওয়া গেল। অতি পূর্ব্বকালে সাবানের ব্যবহার আদৌ ছিল না। সাবানের অনুরূপ শব্দ আমাদের ভাষায় নাই। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, সাবান আমাদের দেশে ছিল না, ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। এই দ্রব্য আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু ইহা অধুনা যে প্রয়োজনে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, সেই প্রয়োজনে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত না, এই মাত্র। অনেকেই জানেন কেলিকো ছিট্ সাবান না হইলে রং করা যায় না। ঐ কেলিকো ছিট্ আমাদের দেশে প্রায় ২০০০।৩০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং ততদিন পূর্ব্বে সাবান না থাকিলে, সাবানের কার্য্য কি রূপে সম্পন্ন হইত? আমাদের দেশীয় সাবান ঢাকা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আজ কাল কলিকাতাতেও সাবান প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশের ন্যায় ইউরোপে প্রাচীন কালে সাবান ছিল না। অরিষ্টটেল (Aristotle) এবং (Plato), কনিয়া (Konia) নামক এক প্রকার ক্ষার-জলের উল্লেখ করেন। ঐ ক্ষারজলে তৎকালে তৈলাক্ত পত্রাদি পরিষ্কার করা হইত। পৌলস ইজিনিতে—Paulus (Ægineta)-র সময় গোঁড়া চূর্ণের দ্বারা দ্রব্যাদি পরিষ্কার করা হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদিও তাঁহারা ক্ষারের ব্যবহার অবগত ছিলেন, তথাপি সাবান প্রস্তুত করিতে জানিতেন না। সর্ব্ব প্রথমে ইতিবৃত্তবিৎ প্লিনি-(Pliny)-র গ্রন্থে সাবানের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি ছাগমেদ ও বিছ গাছের ক্ষার দ্বারা সাবান প্রস্তুত করিবার কথা বলিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ গালেন-(Galen)-এর গ্রন্থে গোঁড়া চুণ এবং গো, ছাগ বা মেষের চর্ব্বি দ্বারা সাবান প্রস্তুতের কথা দেখা যায়। তৎকালে কঠিন ও কোমল দুই প্রকার সাবানেরই উল্লেখ দেখা যায়। সাবানের বহুল প্রচার রাজ্ঞী এন-(Anne)-এর সময় হইতে। তৎপরে ক্রমে এতদূর উন্নত হইয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন প্রকারের তৈল।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সাবান তৈল ও ক্ষার যোগে উৎপন্ন হয়। প্রথমে দেখা যাউক, তৈল কয় প্রকার।—তৈল প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, স্থায়ী (fatty) ও অস্থায়ী (volatiie)। যে তৈল গাঢ় তাহাকে স্থায়ী তৈল বলে, ইহা আবার দুই প্রকার। এক প্রকার শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। আর এক প্রকার সহজে শুষ্ক হয় না। যে তৈল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় তাহাকে অস্থায়ী তৈল বলে। ইহাও দুই প্রকার; এক সুগন্ধ (Essential) অপর মেটে (Mineral)। এই উভয়বিধ তৈলের মধ্যে স্থায়ী তৈলই সাবান প্রস্তুত পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে সকল স্থায়ী তৈল সাবান প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে তাল তৈল (African Palm oil), নারিকেল তৈল, চর্ব্বি, বিলাতি জলপাই তৈল (Olive oil), মাছের তৈল, গাঁজার তৈল ইত্যাদি। মসিনার তৈল, এরণ্ড তৈল প্রভৃতি হইতেও সাবান প্রস্তুত হইতে পারে। দেখা যাইতেছে সাবান প্রস্তুত করিতে যে স্থায়ী তৈল ব্যবহৃত হয়, তাহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—ঔদ্ভিদ ও জান্তব। উদ্ভিদ হইতে যে তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায় আমরা তাহাকেই ঔদ্ভিদ বলিব, এই শ্রেণীর মধ্যে নারিকেল তৈলই প্রচুর পরিমাণে এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, বাদাম তৈল, অলিভ তৈল প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে। জান্তব তৈল বা চর্ব্বির মধ্যে শূকরের চর্ব্বিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, মেষ-মেদেও সাবান হয়, এতদ্ব্যতীত ঘোড়া, গোরু, মৎস্য প্রভৃতি হইতে যে সাবান হয় তাহা অতি নিকৃষ্ট। অনেক সময়ে ঔদ্ভিদ ও জান্তব তৈল মিশ্রিত করিয়াও সাবানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সাবান ব্যবহৃত না হইবার কারণ।

এই সময়ে একটি কথা মনে হইল। আমাদের দেশের হিন্দুগণ সাবান ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন, তাহার কারণ এই—যে,ইহাতে চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সত্য বটে তৈলেও সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু কোন সাবান নিরবচ্ছিন্ন তৈলে প্রস্তুত হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার উপায় না থাকাতে তাঁহারা ধর্ম্মলোপভয়ে গাত্রে মেদ মর্দ্দন করিতে কুণ্ঠিত হন। এই জন্য আমাদের হিন্দু সমাজে সাবানের পরিবর্ত্তে আজিও ব্যাসম, খইল, সাজিমাটি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই সকল দ্রব্যে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। কেন হয় না, তাহা স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং সাবান যাহাতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে, সে চেষ্টা করা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমরা হিন্দুদের বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করিতে চাই না, আমাদের

ইচ্ছা, তৈল নির্ম্মিত সাবান আমাদের দেশে যাহাতে প্রস্তুত হয় সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যতদিন তাহা না হয়, আমারা ইচ্ছা করি, ততদিন হিন্দুগৃহস্থগণ একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনাদের ব্যবহার্য্য সাবান আপনারাই প্রস্তুত করিয়া লন। এই উদ্দেশে আমরা এই প্রবন্ধের শেষে অল্প পরিমাণে সাবান প্রস্তুত করিয়া লইবার প্রক্রিয়া প্রকাশিত করিব।

ক্ষার। সাবানে তৈল ও ক্ষার ব্যবহৃত হয় বলিয়াই, আমরা নানাপ্রকার তৈলের কথা বলিয়াছি, এইবার ক্ষারের কথা বলিব। ক্ষারও দুইপ্রকার—পটাস ও সোডা। ক্ষারপ্রসূ বৃক্ষাদি দগ্ধ করিয়া যে ক্ষার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই পটাশ জন্মে। অনেকে জানেন আমাদের দেশে রজকেরা কদলীবৃক্ষ হইতে একপ্রকার ক্ষার সংগ্রহ করে, উহাও ঐ পটাশ। পটাশ হইতে কোমল সাবান প্রস্তুত হয়। সোডা হইতে কঠিন সাবান প্রস্তুত হয়।

ক্ষার জল। উপরে বলা হইয়াছে দুইপ্রকার ক্ষারে দুইপ্রকার সাবান হয়। কিন্তু ক্ষার ও তৈলে গুলিয়া জাল দিলেই যে সাবান হয় এমন নয়। ক্ষার হইতে অগ্রে সাবানে ব্যবহারোপযোগী ক্ষারজল প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ইংরাজীতে ঐ ক্ষারজলকে সাবানওয়ালারা ল্যে (Ley বা Lye) বলিয়া থাকেন। কঠিন সাবানের ব্যবহারই অধিক। এজন্য অগ্রে কঠিন সাবানের ক্ষারজলের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে। সোডা-ক্ষারকে সাবানওয়ালারা Alkali বলিয়া থাকেন। বাজারে যে সোডা পাওয়া যায় তাহাকে কার্বনেট অব সোডা (Carbonate of Soda) বলে। উহা হইতে কার্বনিক (Carbonic Acid) এসিড্ বাহির করিয়া লইলেই, উহা কষ্টিক সোডা হয়। তখন ইহা সাবানে ব্যবহার উপযোগী হইয়া থাকে। একটি তলদেশে ছিদ্রযুক্ত লৌহপাত্রে গোঁড়া চূণ বিছাইয়া, তাহার উপর সোডা বিছাইয়া, তাহার উপর চূণ, তাহার উপর সোডা, এই রূপ বিছাইয়া, অর্দ্ধেক পাত্র পূর্ণ কর; পরে তাহার উপর জল ঢালিয়া দিয়া পাত্রটি উত্তমরূপে আবৃত করিয়া রাখ, একদিন পরে উহার নিম্নদেশের ছিপি খুলিয়া দিয়া, তাহা হইতে জল চোয়াইয়া একটি সীসাপাত্রে গ্রহণ কর। ইহাই উত্তম ক্ষারজল। বড় বড় কারখানায় এই উপায়েই ক্ষারজল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু অল্প পরিমাণে ক্ষারজল প্রস্তুত করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা পরে বলিব। এই ত গেল, সোডা হইতে ক্ষারজল প্রস্তুত করিবার নিয়ম। এক্ষণে পটাস হইতে ক্ষারজল প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ ক্ষারপ্রসূ বৃক্ষের পাতা ডাল প্রভৃতি পোড়াও। পোড়ান হইলে, ভস্মগুলি একত্র করিয়া জলদ্বারা কর্দ্দমবৎ কর। পরে ঐ কর্দ্দম একত্রিত করিয়া তাহার মধ্যদেশে চূণ দিয়া উত্তম রূপে ঐ চূণ আবৃত কর। এক্ষণে ঐ অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া ঐ দুই দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত ও পরিষ্কার কর। ইহাও ক্ষারজল।

সাবানপাক। ক্ষারজল প্রস্তুত হইলে, উহা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া রাখিয়া একখানি কটাহ জালে চড়াইয়া দিবে, ঐ কটাহ, তাম্র, লৌহ বা মৃন্ময় হইলেও ক্ষতি নাই। যে তৈলে সাবান প্রস্তুত হইবে, তাহা জালে চড়াইবে, এবং উহা গলিয়া উঠিলে তাহাতে ক্রমে ক্রমে ক্ষারজল মিশ্রিত করিবে। সাবান ধরিয়া না যায় এজন্য একখানা হাতা বা তাড়ু দ্বারা ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। এই রূপ করিতে করিতে ঐ দুই দ্রব্য পরস্পর মিলিত হইবে। ১০০ ভাগ তৈলে ১৪ ভাগ ক্ষারজল আন্দাজ করিয়া দিবে। ভাগ ঠিক হইলে, মিশ্রিত পদার্থ ঈষৎ মিষ্টস্বাদ হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ পদার্থ যখন আটা হইবে—হাতায় লাগিয়া থাকিবে, তখন উহাতে লবণ দিবে। ১০০ ভাগ তৈলে আন্দাজ ১৫।১৬ ভাগ লবণ দিতে হয়। এই অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ রাখিলে পরে সাবানের জলীয় অংশ তলদেশে যাইবে, তৎপরে কিয়ৎক্ষণ জাল নিভাইয়া রাখিয়া কটাহের নিম্নদেশস্থ ছিদ্র দিয়া ঐ জল বাহির করিয়া দিবে। তৎপরে আরও কিয়ৎক্ষণ জাল দিলে ঐ সাবান আরও একটু ঘন হইবে, তখন উহাতে আর একটু ক্ষারজল দিয়া সিদ্ধ করিয়া নামাইয়া লইবে।

কটাহ। এইক্ষণে, সাবান জাল দিবার জন্য যে রূপ কটাহের প্রয়োজন, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। যে কটাহে সাবান জাল দেওয়া হইবে, উহার আকার এরূপ হওয়া উচিৎ যে, উহা হইতে, জাল দিবার সময় মিশ্র পদার্থ না পড়িয়া যায়। ঐ কটাহের নিম্নে একটি ছিদ্র ষ্টপ দিয়া বন্ধ করা থাকিবে।

উনান। যে উনানে উহা চড়াইয়া জাল দেওয়া হইবে, তাহা এরূপ হওয়া উচিত, যেন জাল দিবার সময় অগ্নি কটাহের চারিদিকে না লাগে, কেবল তলদেশেই লাগে। এরূপ না হইলে সাবান ধরিয়া যাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত

অধিক। সাবান জাল দিতে পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহার করা প্রশস্ত, কিন্তু সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, নহিলে ধরিয়া উঠিতে পারে।



বার প্রস্তুত করিবার প্রথা।

এই সাবন জমাইবার জন্য কাষ্ঠময় বাক্স ব্যবহৃত হয়, উহা এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, উহার চারিখানি ইচ্ছা করিলেই পৃথক করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সাবান পাক শেষ হইলে তাহা এই বাক্স মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে উহা উত্তমরূপে জমিয়া গেলে তার দিয়া কাটিয়া বার (Bar) প্রস্তুত করিবে। পার্শ্বস্থিত চিত্রটি দেখিলে বার প্রস্তুত করিবার প্রণালী স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সাবান।

উপরে কঠিন ও কোমল দুই প্রকার সাবানের উল্লেখ করা গিয়াছে এবং দুই প্রকার সাবান যে দুই প্রকার ক্ষার হইতে উৎপন্ন হয় তাহাও বলা গিয়াছে। কিন্তু কঠিন সাবান আবার তিন প্রকার হইতে পারে, বিশুদ্ধ (Nucleus) মসৃণ (Smooth) এবং পূর্ণ (Fulling)।

বিশুদ্ধ সাবান

সিদ্ধ সাবানে লবণ দিবার পরই, যে সাবন পৃথক হইয়া ও গোল গোল ডেলা হইয়া উঠে তাহাতেই বিশুদ্ধ সাবানের জন্ম। ইহাতে, গ্লিসিরিণ, জল প্রভৃতি থাকে না বলিয়াই ইহাকে বিশুদ্ধ সাবান (Nuclues Soap) বলে।

মসৃণ সাবান।

যদি সাবান গোলা হইতে জল পৃথক করিয়া, পুনরায় তাহাতে গোলা দিয়া সিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে ইহা আর দানাদার হইতে পারেনা। সাবান পাক করিবার প্রণালী বলিবার সময় আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে জলের ভাগ অধিক থাকে এবং ইহার দানা না থাকাতে মসৃণ আকার হওয়াতেই ইহাকেই মসৃণ সাবান (Smooth Soap) বলে।

পূর্ণ সাবান (Fulling Soap) সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। সাবান গোলা সিদ্ধ করিতে করিতে উত্তম রূপ

পূর্ণ সাবান।

সুসিদ্ধ হইলে অর্থাৎ বিলক্ষণ আটার ন্যায় হইলে, তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ দিবামাত্রই সমস্ত জমিয়া যায়, তৎপরে কিয়ৎক্ষণ অগ্নির তাপে থাকিলেই সমস্ত কঠিন হইয়া উঠে। ইহা বার সোপের অপকৃষ্ট জাতি।

এই সমুদায় সাবানেই ইচ্ছামত রং করা যাইতে পারে।

রঙ্গিন সাবান।

সাবানে রঙ করিতে প্রধানতঃ সিনাবার (Cinnaber), রক্ত ক্রোম (Red chrome), কোরালাইন (Coraline), ফুসিন (Fuschine), অলট্রামেরিন্ (Ultramarine) প্রভৃতি ব্যবহৃদ হইয়া থাকে।

রঙ করিবার প্রণালী।

সাবানের রঙ করিতে হইলে, প্রথমে যে রঙ হইবে, সেই রঙ গ্লিসিরিণে মর্দ্দন করিয়া লইবে, পরে সাবান-পিণ্ডে মিশাইলেই তাহাতে রঙ হইতে পারে। আর এক প্রকারে সাবান রঙ করা যায়,—সাবান জল-হীন করিয়া যে সময় আবার অল্প পরিমাণ গোলা দেওয়া হয় সেই সময় ঐ সাবানে কোন রঙ অল্প পরিমাণে দিয়া নাড়িয়া লইলে সেই সাবান মার্ব্বল প্রস্তরের ন্যায় দেখায়। সাবানে উদ্ভিজ্জজাত (জাফাণ) প্রভৃতি ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

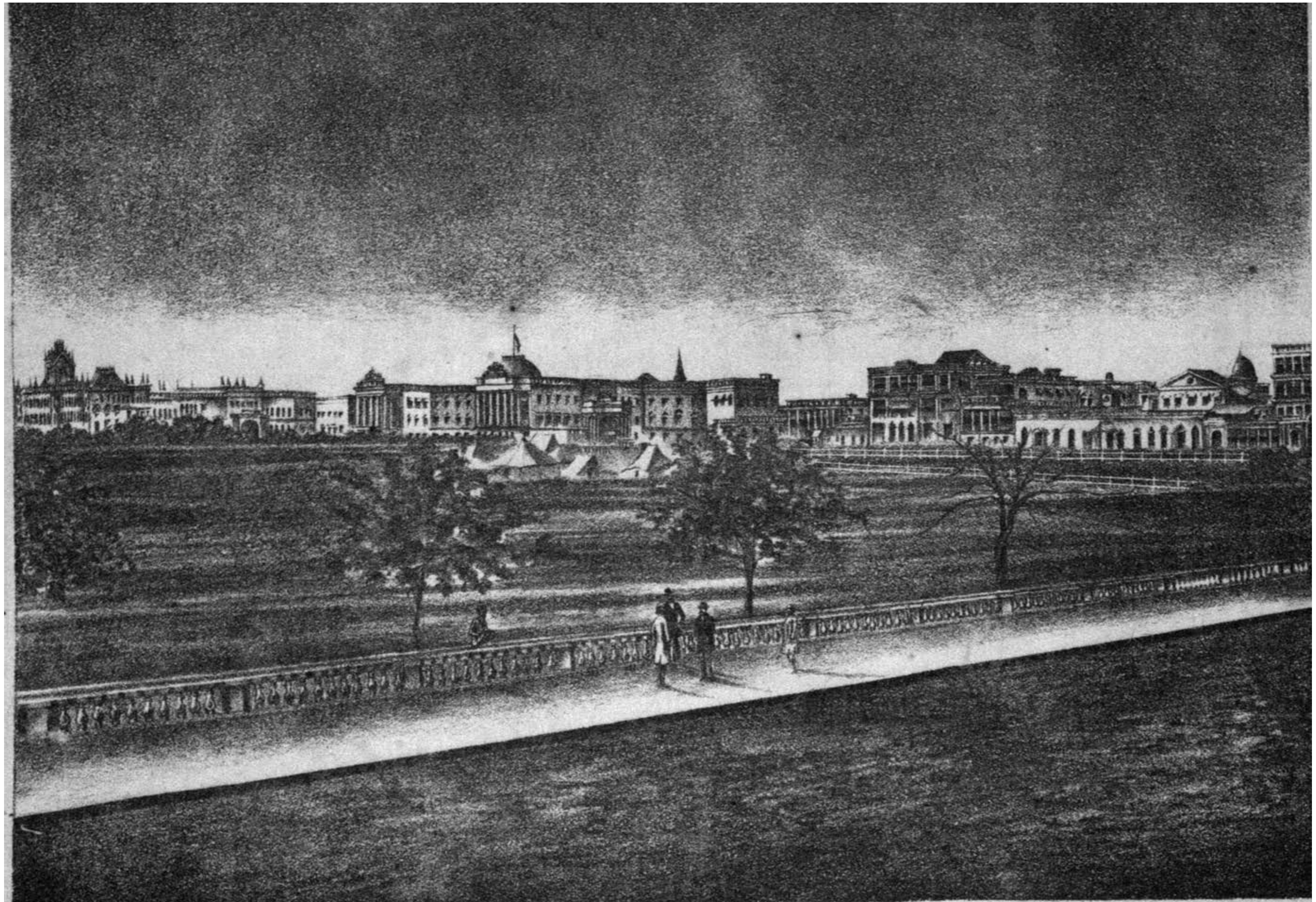
সুগন্ধি সাবান।

সুগন্ধি সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য প্রধানতঃ দুই প্রকার প্রণালী অবলম্বিত হয়। এক প্রকার—প্রস্তুত করা সাবানে সুগন্ধি মিশাইয়া, দ্বিতীয় সুগন্ধি সাবানের জন্য স্বতন্ত্র সাবান প্রস্তুত করিয়া। প্রস্তুত করা সাবানে দুই প্রকারের সুগন্ধি দেওয়া যায়। প্রথমতঃ ভাল কঠিন সাবান সরু সরু করিয়া কাটিয়া তাহার সহিত উত্তম রূপ সুগন্ধি মিশ্রিত করিয়া লইতে হয় তৎপরে রোলারে পেষিয়া পাত করিয়া কাটিয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ তামার কড়ায় চড়াইয়া ভাল সাবান দ্রব করিয়া তাহাতে সুগন্ধি মিশাইয়া লইতে হয়। খুব ভাল সুগন্ধি সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার জন্য সাবান প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে সকল মসলাই উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

বাজারে কার্ব্বনেট অব সোডা কিনিতে পাওয়া যায়।

গৃহ ব্যবহার্য্য অল্প পরিমাণ সাবান প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

ঐ কার্ব্বনেট অব সোডা, পরিষ্কার জলে গুলিয়া, শামুকে চুণ মিশাইতে হইবে। মিশ্র দুগ্ধের ন্যায় হইলে উহা আগুনে চড়াইবে। কিয়ৎক্ষণ জাল দিয়া উহার উপর হইতে একটু গোলা তুলিয়া, তাহাতে নাইট্রিক এসিড দুই চারি ফোটা দিয়া দেখিবে বুদ্বুদ উঠে কি না, যখন বুদ্বুদ না উঠিবে



কলিকাতা – এস্‌প্লানেড – ময়দান।

সেই সময় ঐ পাত্র নামাইয়া একদিন ঢাকিয়া রাখিবে। তার পর উপরের ক্ষার আলাহিদা করিয়া লইবে। দেখিও যেন অধিক বাতাস না লাগে। তৎপরে কতকটা নারিকেল বা তিল তৈল বা উভয় তৈল মিশাইয়া (অন্য স্থায়ী তৈলেও হয়) একটা কটাহে জ্বালে চড়াও, ঐ তৈল বেশ জ্বাল হইলে তাহাতে প্রস্তুত করা ক্ষারজল দিতে থাক এবং মিশ্র পদার্থ নাড়িতে থাক যেন না ধরিয়া উঠে, যখন ঘন হইয়া আসিবে তখন অল্প লবণ দিয়া নাড়িতে থাকিবে, ইচ্ছা হয় সুগন্ধ দ্রব্য দিতে পার। উহা জমিয়া গেলেই গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য সাবান হইবে।

উপসংহার।

আমরা এই খানেই সাবান প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। বিলাতে বহু প্রকার সাবানের প্রচলন আছে। আমাদের দেশেও সাবান বিশেষ রূপে চলিত হওয়া উচিত। মনুষ্য শরীর হইতে তৈলাক্ত এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়। ঐ মলা যাহাতে লাগে, তাহা হইতে উহা দূর করিতে হইলে ক্ষারের প্রয়োজন। কিন্তু শুদ্ধ ক্ষারের তীব্রত্বে মানব শরীর এবং অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষতি হয় এজন্য তীব্রত্ব হীন ক্ষারজ সাবানের প্রয়োজন।

শ্রীসা—

—০:০—

কলিকাতার ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।—কলিকাতার প্রাচীনত্ব—আইন-ই-আকবরীতে কলিকাতার উল্লেখ—কালীক্ষেত্র—পুরাণে উল্লেখ—প্রাচীন কলিকাতার বিস্তৃতি—পীঠস্থান ও তীর্থ—বল্লালসেনের সময়ে কলিকাতার অবস্থা—মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয়—আজম্-উল্-মুলক্—সম্রাট আকবর—তোডরমল্ল—আকবরের সময়ে কলিকাতার অবস্থা—সুন্দরবনের উৎপত্তি—কলিকাতার ভগ্ন দশা।

আমরা এক্ষণে কলিকাতার যেরূপ অবস্থা দেখিতে পাই, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার এ সকল কিছুই ছিল না। দুই শত বৎসরই বা বলি কেন? দশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল, আজিকার দিনে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র *। কলিকাতার সুখ স্বচ্ছন্দ ক্রমেই বাড়িতেছে।

যদিও বর্ত্তমান কলিকাতা নগর বহুদিনের নয়, কিন্তু এই স্থান বহুদিন হইতে এই নামে পরিচিত। আইন-ই আকবরীতে এই স্থান এই নামেই উক্ত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে কলিকাতাকে সাতগাঁও-(সপ্তগ্রাম)-সরকারভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে *। এই গ্রন্থ সম্রাট আকবরের প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত পণ্ডিত ও যোদ্ধা আবু-উল্-ফজল্ কর্ত্তৃক রচিত হয়। সুতরাং আকবরের সময়ে কলিকাতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না।

কিন্তু আকবরের সময়ে কলিকাতার যেরূপ

* কলিকাতা কত শীঘ্র শীঘ্র উন্নত হইতেছে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় যে চিত্র (এস্‌প্লানেড ময়দান) দিয়াছি, উহার সহিত ঐ স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলে ৮।১০ বৎসরে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে কতক বুঝিতে পারা যাইবে। স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষাও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।—(প্রঃ বিঃ, সং)

* "The Sirkar of Satgauw, contained, among others, the three towns of Calcutta, Barbakpur, Bakuya jointly paying into the Imperial Exchequer the annual sum of Rs 23,405." * * * "The spelling given in the Ai'n is 'Kalkatta' as pronounced by the natives now-a-days."—J. B. KNIGHT's *Calcutta*, P. I.

উন্নত অবস্থা দেখিতে পাই, সেরূপ উন্নত অবস্থা কাল সাপেক্ষ। সুতরাং আরও প্রাচীন কালে কলিকাতার কথা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আইন-ই-আকবরীর পূর্ব্বের অন্য কোন গ্রন্থে কলিকাতার উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু এক্ষণে যে স্থানে কলিকাতা অবস্থিত, ঐ স্থানে কালীক্ষেত্র নামে কোন স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী কোন কোন পণ্ডিত বলেন পুরাণাদিতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। কালীক্ষেত্র একটি বিখ্যাত পীঠস্থান। পুরাণ প্রসিদ্ধ একান্ন মহাপীঠের একটি মহাপীঠ। 'প্রাচীন পীঠের উপর কালীর মন্দির নির্ম্মিত নহে' *। কালীক্ষেত্র বহুলা নামক স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহুলা অধুনা বেহালা নামে পরিচিত, দক্ষিণেশ্বর আজিও আছে †।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে, এই স্থান অতি প্রাচীন এবং পূর্ব্বাপর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত। ইংরাজাধিকারের সূচনা হইতেই কালীক্ষেত্রের সীমা সঙ্কুচিত হইয়া আধুনিক কালীঘাটে পরিণত হইলেও, উহা আজিও তীর্থ বলিয়া বিশেষ পরিচিত। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানের অন্য কোন প্রাচীন বিশেষ বিবরণ জানিবার উপায় নাই।

তৎপরে একেবারে বল্লালসেনের সময়ে এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় *। সে সময়ে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ সহর। তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এখানে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হইত।

আইন ই-আকবরীতে লিখিত আছে বল্লালসেন খ্রীঃ ১০৬৬ অব্দে রাজা হন। তিনি দেশহিতকর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

খ্রীঃ ১২০৩ অব্দে বাঙ্গালাদেশ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইলেও এই স্থান প্রায় আরও শত বৎসর কাল স্বাধীন হিন্দু রাজার অধীন ছিল।

বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীন হইলে, ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন শাসন কর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইত। সপ্তগ্রাম ঐ সকল প্রদেশের একটি। এ অঞ্চল মুসলমানাধিকৃত হইলেই, সপ্তগ্রাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান সম্ভবতঃ সপ্তগ্রাম প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল। সম্রাট মহম্মদ তোগলক যে সময় দিল্লীর সিংহাসনে, আজম-উল্-মুল্‌ক্ সে সময় সপ্তগ্রাম শাসন করিতেছিলেন। এ সময়ে বঙ্গের শাসনকর্ত্তারা কেবল মুখে দিল্লীর শাসন স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্য্যে প্রায় স্বাধীন ছিলেন।

কিন্তু এ সময়েও কলিকাতার বিবরণ কিছু জানিবার উপায় নাই। তৎপরে সম্রাট আকবরের সময়ে আবার কলিকাতার কথা দেখা যায়।

---

* গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

† "Calcutta is a place known from remote antiquity. The ancient Hindus called it by the name of KALIKSHETRA. It extended from *Bahula* to *Dakhinashar*. *Bahula* is modern *Behala*, and the site of *Dakhinashar* still exists. According to the puranas a portion of the mangled corpse of SATI or KALI fell somewhere within that boundary; whence the place was called *Kalikhshetra*. Calcutta (Kalikata) is a corruption of *Kalikshetra*. In the time of Bola'lsen it was assigned to the descendants of *Sera*.—*Pundit* PADMANAV GHOSHAL's *letter, dated Calcutta, July* 1873 *in the* INDIAN ANTIQUARY.

* গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

† এই পত্রিকার ২৫পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে * চিহ্নিত টীকা দেখ।

জেলাল-উদ্দীন মহম্মদ আকবর সাহ খ্রীঃ ১৫৫৬ অব্দ হইতে ১৬০৫ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেন। খ্রীঃ ১৫৪২ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি মানসিংহ, তোডরমল প্রভৃতির সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খল বঙ্গদেশ, স্বকরতলগত করিয়াছিলেন।

তোডরমল্ল আকবরের সাম্রাজ্যের একটি রাজস্ব-হিসাব প্রস্তুত করেন। উহা "ওয়াশিল তুমার জমা" নামে বিখ্যাত। তাহাতে মোগল সাম্রাজ্য অষ্টাদশ সুবায় বিভক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশ ঐ ১৮ সুবার একটি। বঙ্গ আবার ১৮ সরকারে ও ৬৮২ মহলে বিভক্ত। এ দেশের রাজস্ব ১,০৬,৮৫,৯৪৪ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম ঐ আঠার সরকারের একটি এবং কলিকাতা একটি মহল ছিল। খ্রীঃ ১৫৮২ অব্দে ঐ হিসাব প্রস্তুত হয়।

কিন্তু আকবরের সময়েই কলিকাতা অঞ্চলের দুর্দ্দশার দিন উপস্থিত হইয়াছিল। "১৫৮৫ অব্দে বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় ভয়ানক ঝড় ও সমুদ্রের আক্রমণে দক্ষিণদিক নষ্ট হইয়া যায়। প্রায় দুই লক্ষ প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। একটি মন্দির অবলম্বন করিয়া কতকগুলি লোক রক্ষা পায়। তৎপরে ঘোর ভূমিকম্প হইয়াছিল। গঙ্গার অসংখ্য শাখার বেগ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনেক স্থান নষ্ট হইয়া যায়। তদবধি দক্ষিণদেশ ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। যে দুই একজন অধিবাসী ছিল, তাহারাও মগদিগের উৎপাতে বাসস্থান পরিত্যাগ করে। প্রায় দুইশত বৎসর হইল সুন্দরবন সম্পূর্ণ রূপে অরণ্য হইয়াছে।" এই সুন্দরবন কলিকাতার কতক অংশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সময় হইতে কলিকাতার আবার ভগ্নদশা হয়। কালীঘাটের সন্নিকটের অবস্থা কতক ভাল ছিল বটে, কিন্তু সুন্দরবনের নিকটে সামান্য গ্রামের আকারে ঐ সকল স্থান অবস্থিত ছিল মাত্র। ঐ স্থানে দুই চারি ঘর অল্পবিত্ত কৃষকের কুটির ব্যতীত অন্য কিছু প্রায়ই দৃষ্ট হইত না। খ্রীঃ ১৬৪৮ অব্দের পর পর্য্যন্তও কলিকাতার সেই দশা ছিল, পরে ইংরাজেরা এই স্থান স্বায়ত্ত করিবার পর হইতেই ইহার উন্নতির দশা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি—বঙ্গদেশে কোম্পানির প্রতিপত্তির সংক্ষেপ বিবরণ— কলিকাতার তাৎকালিক অবস্থা।—সম্রাট ঔরঙ্গজেব-প্রদত্ত সনন্দ—হেজেস্ সাহেব—বেহারের বিদ্রোহ—ইংরাজদিগের প্রতি সুবাদারের সন্দেহ—জব চার্ণক—কাপ্তেন নিকলসন—ফৌজদারের সহিত বিবাদ—হুগলী আক্রমণ—সুবাদারের ক্রোধ ও পাটনা,মালদহ,ঢাকা ও কাসীমবাজারের কুঠী অধিকার—ইংরাজের বিপক্ষে সৈন্য প্রেরণ—ইংরাজগণের সুতানুটীতে পলায়ন—হিজলীতে পলায়ন ও দুর্দ্দশা—সুবাদারের সহিত সন্ধি—কাপ্তেন হিথ—মক্কাযাত্রীদের উপর উৎপাত—সম্রাটের আদেশ—ইংরাজগণের বঙ্গে পুনরাগমন—কলিকাতার সূত্রপাত—চাণক স্থাপন—চার্ণকের মৃত্যু—কলিকাতা প্রভৃতির অবস্থা।

কলিকাতার উন্নতির কথা বলিবার আগে, যাঁহাদের হইতে এই উন্নতি, তাঁহাদের বঙ্গদেশে আগমনের কথা এই খানে সংক্ষেপে বলা উচিত।

"মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একদল ইংরেজ বণিক ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন (১৬০০)। ১৬১১ অব্দে তাঁহাদিগের বাণিজ্যতরী পিপ্লী পর্য্যন্ত আইসে। যখন ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার ও আফজুল খাঁ বেহারের সুবাদার ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা এক বৎসরের জন্য পাটনায় কুঠী করেন (১৬২০)। অনন্তর (১৬৩৪) তাঁহারা সম্রাটের নিকট পিপ্লীতে

* গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব প্রথম খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

কুঠী করিবার আদেশ পান। একদা সাহজাহান বাদসাহের একটী কন্যার কাপড়ে আগুণ লাগিয়া তাঁহার দেহ দগ্ধ হয়, বৌটন নামক একজন ইংরেজের চিকিৎসায় তাঁহার আরোগ্য-লাভ ঘটে এবং সম্রাট পুরস্কার দিতে চাহিলে বৌটন প্রার্থনা করেন, যে, ইংরেজেরা যেন বাঙ্গালায় নিষ্করে বাণিজ্য করিতে পারেন (১৬৩৪)। বাদসাহ এই মর্ম্মের আদেশ পত্র দিলে, বৌটন তৎসহ এদেশে আসেন, এবং সুজার অন্তঃপুরবাসিনী কামিনী বিশেষের পীড়া শান্তি করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা পান (১৬৩৯)। এই সময় হইতে ইংরেজেরা সুজার প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন, হুগলী ও বালেশ্বরে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইলেন এবং বিনা করে বাণিজ্য দ্রব্যজাত আমদানী রপ্তানী করিতে লাগিলেন।" *

এই রূপে বঙ্গদেশে ইংরাজের ব্যবসায় বাণিজ্য একপ্রকার বেশ চলিতেছিল। কিন্তু এখনও তাঁহারা কলিকাতায় পদার্পণ করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দের উৎপাতে, মুসলমান সুবাদারের ফৌজদার প্রভৃতির উৎপাতে দুই দশ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অনেক মধ্যবিত্ত লোক নিরাপদ হইবার জন্য কলিকাতার সন্নিহিত প্রদেশে, এমন কি সুন্দরবনের মধ্যেও আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

এই সময়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট। ইংরাজেরা খ্রীঃ ১৬৭ অব্দে তাঁহার নিকট হইতে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার কর স্বরূপ তাঁহাদিগকে বার্ষিক ৩০০০ টাকা দিতে হইবে এই রূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই সময়ে হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও কাশীম-বাজারে ইংরাজদিগের কুঠী ছিল। কুঠী সমূহের শাসনকর্ত্তা হুগলীতে থাকিতেন। খ্রীঃ ১৬৮১ অব্দে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ হেজেস্ সাহেবকে বঙ্গদেশীয় কুঠী সমূহের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান।

খ্রীঃ ১৬৮২ অব্দে বেহারে একটি বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহীরা ইংরাজদিগের কোন অনিষ্ট করে নাই, ইহাতে সুবাদার, ইংরাজেরা বিদ্রোহে লিপ্ত আছেন মনে করিয়া, সে বৎসর তাঁহাদের বাণিজ্য বন্দ করিয়া দেন। খ্রীঃ ১৬৮৫ অব্দে ইংরাজেরা সুবাদার সায়েস্তা খাঁর নিকট ভাগীরথী মোহানায় একটি দুর্গ স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুবাদার তাহাতে আরও অসন্তুষ্ট হন। ফল এই হইল, দুর্গ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া দূরে থাকুক, সুবাদার ইংরাজদের নিকট নির্দ্দিষ্ট মাশুল বর্দ্ধিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন।

এই সময়ে জব চার্ণক *.কুঠী সমূহের শাসন-কর্ত্তা হইয়া হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সুবাদারের আদেশে ক্রুদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডে সম্বাদ পাঠাইলেন। খ্রীঃ ১৬৮৬ অব্দে কাপ্তেন নিকল্‌সন দশখানি রণতরী ও কতকগুলি সৈন্য লইয়া ভাগী-রথীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হন। কাপ্তেন সাহেবের উপর চট্টগ্রাম আক্রমণের আদেশ ছিল।

এই সময়ে ফৌজদারের কয়েকজন মুসলমান সিপাহীর সহিত ইংরাজ সৈনিকের বিবাদ হয়। তাহাতে ইংরাজেরা হুগলী নগরে গোলাবর্ষণ করেন। ফল এই হইল সুবাদার পাটনা মালদহ, ঢাকা ও কাসীমবাজারের কুঠীগুলি অধিকার করিলেন এবং ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। চার্ণক বিপদ বুঝিয়া স্বীয় দলবল লইয়া সুতানুটিতে পলায়ন করিলেন (খ্রীঃ ১৬৮৬ অব্দ ২০এ ডিসেম্বর)। ইহাকেই বর্ত্তমান কলিকাতার প্রথম সূত্রপাত বলা যাইতে পারে।

* বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ৪৭।৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

* Mr. Job Charnock অথবা Jobus Charnock.

কিন্তু এখানে আসিয়াও তাঁহারা নিরাপদ হইলেন না। সুবাদারের সৈন্য এখানেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। চার্ণক তখন নিরুপায় হইয়া হিজলীতে পলায়ন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি ডিরেক্টরগণের নিকট সম্বাদ পাঠাইলেন। তিনমাসকাল তাঁহাকে এখানে থাকিতে হইয়াছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অনুচরগণের অর্দ্ধাধিক নষ্ট হয়। এই রূপ বিপদে পড়িয়া চার্ণক সুবাদারের সহিত সন্ধি করিয়া আবার সুতানুটীতে পুনরাগমন করেন।

এদিকে ডিরেক্টরগণের আদেশে কাপ্তেন হিথ তাঁহাদের সাহায্যার্থ আগমন করেন। তিনি সুবাদারের সহিত সন্ধি বিচ্ছিন্ন করিয়া সকলকে লইয়া মান্দ্রাজে প্রস্থান করেন। পথে তাঁহারা বালেশ্বর নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন (১৬৮৮)।

বাঙ্গালায় বাণিজ্য বন্ধ হইলে, ইংরাজেরা জলপথে মক্কাযাত্রীদিগের উপর পীড়ন আরম্ভ করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে পুনরায় বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন, চার্ণক পুনরায় স্বীয় দলবল লইয়া বঙ্গে আসিলেন। এবার সুতানুটীতেই তাঁহারা কুঠী স্থাপন করিলেন (খৃীঃ ১৬৯০ অব্দ ২৪এ আগস্ট)। এই হইতেই কলিকাতা নগরের যথার্থ সূত্রপাত হইল।

চার্ণক অতুল সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যে স্থানে নিজের থাকিবার বাঙ্গালা করেন, সেই স্থান এক্ষণে চাণক (বারাকপুর) নামে প্রসিদ্ধ। এখানে ইংরাজদের ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার জন্য বাজার বসিত। ১৬৯২ অব্দে চার্ণকের মৃত্যু হয়।

এই সময়ে কলিকাতার পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী স্থান সকলে বহুলোকের বাস হইয়াছিল। লোকে মহারাষ্ট্রীয় (বর্গী) গণের উৎপাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য দলে দলে এ সকল স্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। এই রূপে এ প্রদেশের অবস্থা ক্রমে আবার উন্নত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তখনও স্থানে স্থানে দুর্গম অরণ্য এবং তাহাতে ব্যাঘ্রাদির ভয় ছিল। এখন যে স্থানকে বৈঠকখানা বলে, ঐ অঞ্চলের কোন স্থানে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া অরণ্য পথে নানা স্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়া ঐ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিত, পরে যে যথায় ইচ্ছা ক্রয় বিক্রয় করিয়া আবার ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে ঐ স্থানে আসিয়া মিলিত হইত। এরূপ কথিত আছে, তাহারা আমোদ করিয়া ঐ বৃক্ষতলকে তাহাদের বৈঠকখানা বলিত, তাহা হইতেই ঐ স্থানের নাম বৈঠকখানা হইয়াছে*। এই বৃক্ষ খৃীঃ ১৭৮০ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

(ক্রমশঃ)

* Received its name from the famous old tree, which stood there and formed a "Baitak-khana" or resting place for the merchants who traded to Calcutta and whose caravans rested under its shade. "Here the merchants met to depart in bodies from Calcutta to protect each other from robbers in the neighbouring jungle, and here they dispersed when they arrived at Calcutta with merchandise for the Factory"—J. B. KNIGHT'S CALCUTTA.

চিত্রবিদ্যার উপযোগিতা।

চিত্র মানব জীবনের প্রধান এবং প্রথম আমোদজনক। যখন মানুষ বনে বনে ভ্রমণ করিত, কাঁচা মাংস আহার করিয়া প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিত—গাছের বাকল, পশুচর্ম্ম প্রভৃতিতে শরীরের আচ্ছাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিত—যখন তাহারা উলঙ্গ থাকিতেও লজ্জিত হইত না, তখনও তাহারা স্বীয় শরীরের সৌন্দর্য্য বিকাশের জন্য নানা বৃক্ষের পত্র পুষ্পের রসে, পর্ব্বতজাত গৈরিক বা অন্য প্রকার বর্ণযুক্ত প্রস্তর দ্বারা দেহ চিত্রিত করিত। সুতরাং চিত্রের প্রতি যে মানুষের স্বাভাবিক অনুরক্তি তৎপক্ষে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

যে বিষয়ে মানুষের স্বাভাবিক অনুরক্তি এতদূর, সে বিষয় মানুষের অবশ্য শিক্ষণীয়। এই জন্য জার্ম্মনি, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্য প্রদেশ সমূহে সামান্য রূপ চিত্র বিদ্যা (Elementary drawings) সাধারণ শিক্ষা-(General education)-এর অন্তর্ভুক্ত। ঐ সকল দেশে সাধারণ লোকে সকলেই অল্পাধিক চিত্র করিতে জানে।

অনেকে হয়ত হাসিতে হাসিতে বলিবেন, দেশ শুদ্ধ লোক চিত্রকর হইলে তোমাদের চিত্র কিনিবে কে? তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই, সঙ্গীত যেমন মানুষের স্বভাবদত্ত সুখের উপকরণ, চিত্র বিদ্যাও ঠিক তাহাই। সকল ব্যক্তিই আপনা আপনি গাহিয়া থাকে—গাহিয়া সে নিজে সুখী হয়। গাহিয়া জগতকে মোহিত করিতে পারে কয় জন? তেমনি চিত্র অঙ্কিত করিতে সকলেরই সাধ হয়, হয়ত নিভৃতে চেষ্টাও করেন—শেষে অন্যের চক্ষে ভাল লাগিবে না বলিয়া, যত্নের ধন নষ্ট করিয়া ফেলেন।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যগণ মোটামুটি চিত্রশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, এবং সকল দেশেই যে ইহা চলিত হওয়া উচিত তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

চিত্র আর কাব্য একই। অথচ চিত্রের রস সকলে অনুভব করিতে পারে, কাব্যের রস অনুভব করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্রপট দেখিলে অসভ্যতম গারো, খশ হইতে সুসভ্যতম ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি সকলেরই আনন্দ হইবে। কিন্তু কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের রসাস্বাদন করিবার ক্ষমতা কয় জনের আছে? এই জন্য একজন বিখ্যাত চিত্রকর বলিয়া গিয়াছেন "চিত্র সর্ব্বজাতীয় ভাষা"। এই চিত্র বিদ্যার অবস্থা আমাদের দেশে কতদূর শোচনীয়, তাহা ভাবিতেও শরীর সিহরিয়া উঠে। কত দিনে যে এ দেশে এ বিদ্যার প্রচুর উন্নতি হইবে তাহা ভাবিয়া স্থির করা কঠিন। কিন্তু কালের মাহাত্ম্যে ক্রমে সকলের চিত্ত এ দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। জগদীশ্বর করুন শীঘ্রই দেশের সুদশা ঘটুক, দেশের লোকের মন এই রূপ বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে থাকুক, তাহা হইলে দেশের সুদশা অচিরে হইবে, সংশয় কি? চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সুকুমার কলা সভ্যতার প্রধান অঙ্গ, সভ্যদেশ মাত্রেই শিল্প ভাস্কার্য্যাদির আদর প্রভুত। এমন কি ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সুরুচি সম্পন্ন চিত্র সংগ্রহ করা অশন বসন সংগ্রহের ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল দেশে সামান্য কৃষকের গৃহ-ভিত্তিও অন্ততঃ আট দশ খানি চিত্রে সজ্জিত থাকে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ মোটামুটি চিত্র করিতে জানার আর একটি গুণ আছে। কোন বিষয়ে একটি চিত্রের ভাব মনোমধ্যে উদিত হইলে এবং ঐ চিত্র অন্য চিত্রকরের দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়া লইতে হইলে, নিজে যদি নিজের মনোভাবের একটি মোটামুটি আলেখ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ চিত্র যত মনোমত হইবে, অন্য উপায়ে সেইরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই কারণ—একের মনোভাব অন্যে কখনই যথাযথ চিত্রিত করিতে পারিবে না। প্রমাণ—কোন উপন্যাসের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া পাঁচজন চিত্রকরকে যদি চিত্র প্রস্তুত করিতে দেওয়া যায় এবং তাঁহারা যদি সকলেই স্বতন্ত্র ভাবে চিত্র প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে ঐ পাঁচখানি চিত্র পাঁচ প্রকার হইবে অথচ সম্ভবতঃ কোন খানিই লেখকের মনোগত ভাবের ব্যঞ্জক হইবে না, পক্ষান্তরে যদি ঐ লেখক নিজে একখানি মোটামুটি আলেখ্য প্রস্তুত করেন, তদ্দৃষ্টে যে কোন চিত্রকর চিত্র প্রস্তুত করিবে নিশ্চয়ই তাহা লেখকের মনোগত ভাবের ব্যঞ্জক হইবে, তৎপক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এতক্ষণ যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম তাহা বুঝাইতে

পারিলাম কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, আমার মূল বক্তব্য—সামান্য রূপ চিত্র কার্য্য (Elementary Drawings) সাধারণ শিক্ষা-(General Education)-র অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

উপসংহারে বক্তব্য এই, এই নগরীর এবং অন্যান্য স্থানের কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে, ক্রমে যে অন্যান্য স্থানে হইবে তাহার আশা করা যায়। কিন্তু সেই আশা যত শীঘ্র ফলবতী হয় ততই ভাল।

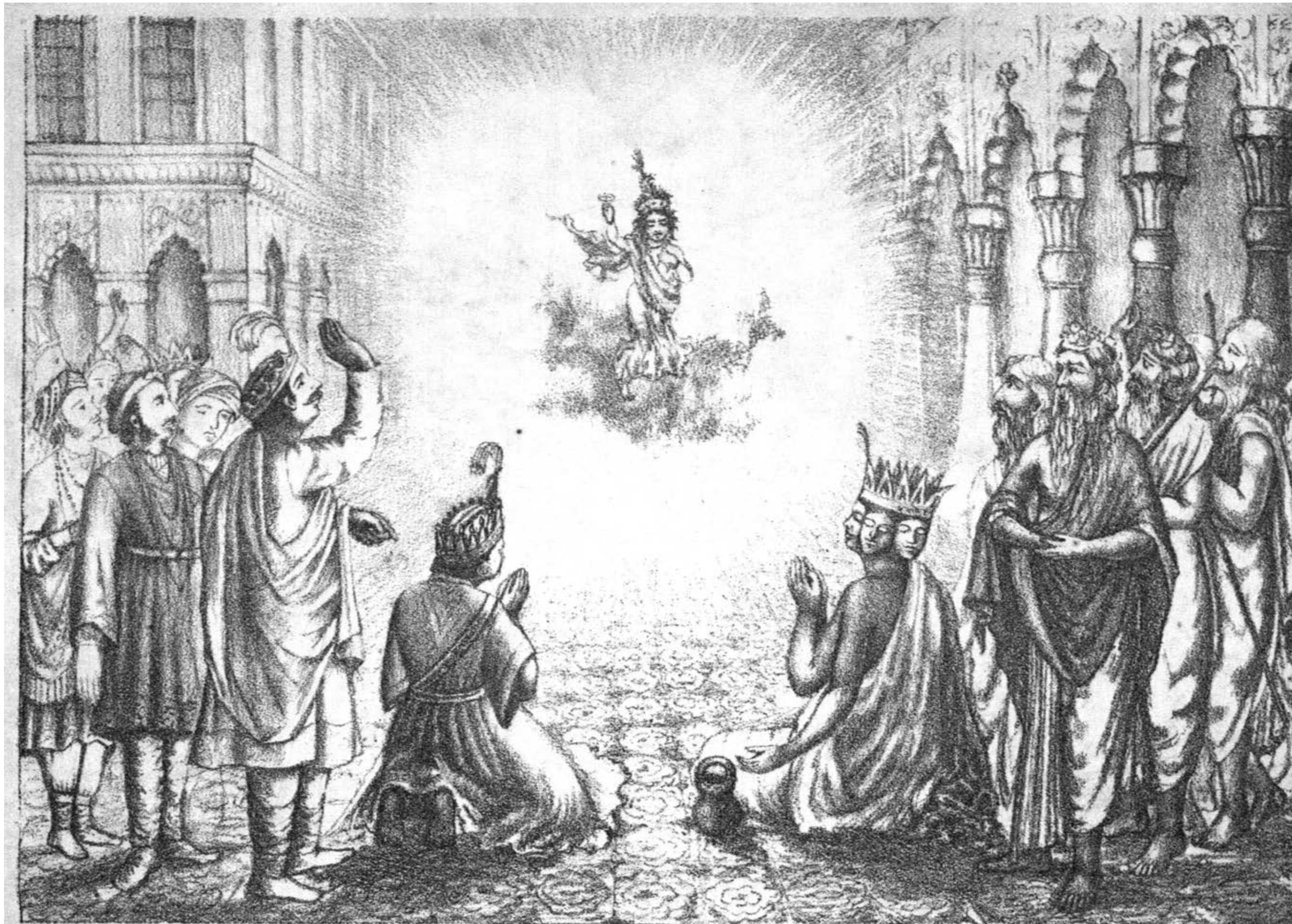
শ্রীবিঃ—

রামচরিত।

প্রথম সর্গ।

বাণিগো, প্রণমি পদে, কর দয়া দীনে
দয়াময়ি! দগ্ধিতেছে রোগের যন্ত্রণা
দেহ মোর; কার্য্যচিন্তা দহি'ছে অন্তর।
কিসে শান্তি পাব এ সময়? দয়াময়ি,
করিয়াছি মনে তাই, রাম নামামৃত
পান করি, জুড়াইব মনের যাতনা।
রবে কিনা রবে প্রাণ!—ক'দিন বাঁচিব?
প্রাণপাখি এ পিঞ্জর ছেড়ে পলাইবে
কবে? কে বলিতে পারে? তাই—যে কদিন
রব ভবে, রাম নামে মাতাইব প্রাণ।
তাই—এ প্রবল আশা! পঙ্গুর পর্ব্বত-
লঙ্ঘনের আশা সম নিয়ত নিষ্ফল।
কিন্তু কেন গাইব না "রাম রাম" বুলি?
ভবে কেবা নাহি গায়? জগত মোহিতে
ইচ্ছা যার ভাবুক সে 'গাব কি না গাব।'
রোগের শয্যায় শুয়ে, প্রাণের আরাম
লভিবার আশে, হায়, যে চায় গাহিতে
সে কেন ভাবিবে, মাগো, সে সকল কথা?
গাব প্রাণ ভরি' আজ লভিব আরাম,
প্রাণারাম রাম নামে ভাসিবে হৃদয়,
সে সুখে ভুলিব আজ রোগের যাতনা
অমৃত সাগর মাঝে ডুব দিলে পরে
প্রাণের যাতনা জ্বালা ঘুচিবে নিশ্চয়।
নন্দন কানন মাঝে সর্ব্ব দেবগণ
নিরানন্দ মনে বসি'; হায় রে, এখন—
অমরার শোভা আর নাহি কিছু হেরি।
রাবণ সমরে জিনি অমর-ঈশ্বরে
রাজলক্ষ্মী লয়ে গেছে স্বর্ণলঙ্কাধামে।
কমলার অদর্শনে অমর-আলয়
আনন্দবিহীন আজি রয়েছে নীরবে
হায়রে, বিহনে যথা কুসুমিতা-লতা
মহীরূহ শুষ্কদেহ রহে দাড়াইয়ে।
এ হেন আনন্দহীন নন্দন কাননে,
আছেন নীরবে বসি সর্ব্বদেবগণ।
দেহ স্থির—নাহি ছায়া, নাহি স্বেদ অঙ্গে
না নড়ে চক্ষের পক্ষ্ম—কিন্তু মর্ম্মভেদী
কি যে ভয়ঙ্কর শোক বিকসিছে মুখে
মা হারা যে, সেই জানে; অন্যে কি বুঝিবে?
কতক্ষণ পরে, মরি! ছাড়িয়া নিশ্বাস,
কহিলা অমরপতি—"হায়! দেবগণ,
মাতৃহীন হয়ে মোরা রহিব কেমনে?
কমলার অদর্শনে অমর জীবন
নিতান্ত দুর্ব্বহ হ'বে। অমর-আলয়ে
তিল আধ থাকিবার নাহিক বাসনা।

চল এবে যাই, সবে মিলে ব্রহ্মলোকে
যথা এবে পদ্মযোনি ; জিজ্ঞাসি তাঁহারে
কতদিনে যন্ত্রণার হবে অবসান ?”
মহেন্দ্রের মনোইচ্ছা তখনি পূরিল।
আনিল মাতলি রথ ; চাপিলা সদলে
দেবরাজ। চলে রথ অনম্বর পথে।
চক্রের মধুর রব নাহি এবে আর।
যেন ক্রন্দনের রোল উঠিছে ঘর্ঘরে।
কতক্ষণে দেবরথ গেল ব্রহ্মলোকে—
নামিলেন দেবগণ পুরীর বাহিরে।
উত্তরিলা পরে, সবে সভার ভিতরে।
ধ্যানে ছিলা পদ্মযোনি দেখিলা চাহিয়া
গাহিলা মহর্ষিগণ “জয় জয় রাম।”
ছুটিল সুধার ধারা—অমৃতের নদী
প্রবাহিল দশদিকে। দেবগণও ভুলি’
সব ব্যথা গাইলেন “জয় জয় রাম।”
প্রাণারাম রাম নামে ভরিল ভুবন।
কি এক মধুর ভাবে হৃদয় বিভোর
সবাকার। কথা আর নাহি কার মুখে।
চাহিয়া ইন্দ্রের পানে কতক্ষণ পরে
কহিলেন পদ্মযোনি —“শুন, দেবরাজ,
যে মানস করি সবে এসেছ এখানে
জানি সবি। তোমাদেরি মঙ্গলেরি তরে
আজি এ ধেয়ান মোর। অযোধ্যা নগরে
মহারাজ দশরথ পুত্র লাভ তরে
আরম্ভিলা যজ্ঞ এবে। সেই যজ্ঞ ফলে
পূর্ণ রূপে নারায়ণ জন্মিবেন তথা।
যে মধুর নামে মোরা বিভোর সকলে
সেই নামে অবতরি হরি ধরাধামে
তারিবেন পাতকীরে। ধরা ভেসে যাবে
মধুমাখা রাম নাম মধুর তরঙ্গে।
দেখ চেয়ে নভোপানে—এখনি এখানে
উদিবেন নারায়ণ ! রাম নাম গান
কর এবে, সবে মিলি পরাণ ভরিয়ে।”
আরম্ভিলা দেবগণ মুনিগণ সনে—
পুনরায় পদ্মযোনি বসিলেন ধ্যানে
অম্বরে উদিল জ্যোতি, কোটী সূর্য্য জিনি,
সে সূর্য্য মণ্ডল পানে কে চাহিতে পারে ?
কি যে তার মাঝে আছে কে পারে বলিতে ?
কতক্ষণ পরে, মরি ! হেরিলা সুরেশ
সহ দেব-মুনিবৃন্দ—সে সূর্য্য মণ্ডলে
প্রস্ফুটিত পদ্মোপরে তপ্ত স্বর্ণ দেহ,
করে শঙ্খ চক্র শোভে—মাথায় কিরীট
কনক কুণ্ডল কর্ণে—প্রকোষ্ঠে কেয়ূর,
হাসি মুখে আসি দেব উদিলা অম্বরে।
চাহিলেন পদ্মযোনি, করযুগ যুড়ি
বলিলেন—“নারায়ণ, ভূভার বাড়ান
ভার মোর ! বাড়ায়েছি আবার সে ভার !
রাবণের ভার ধরা সহিতে না পারে।
আবার হরিতে ভার, হরি হে ! তোমারে
ধরাধামে যেতে হ’বে। তুমি বই আর
দেবতার দুঃখ ভার কে পারে নাশিতে ?”
সে জ্যোতির মধ্য হ’তে দেবগণ প্রতি
কহিলা জ্যোতির জ্যোতি—“যাতনা নাশিতে
চিরকাল ব্যস্ত আমি, ধরা-ভার হরি’
দেবগণে শান্তি দিব অচিরে নিশ্চয়।
অযোধ্যায় দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গে ল’য়ে—
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ। সেই যজ্ঞফলে
চারি পুত্র হ’বে তাঁর, জ্যেষ্ঠ রামনামে
পূর্ণ রূপে জনমিব ভূভার হরিতে।
চলিলাম যজ্ঞস্থলে। সকলে মিলিয়ে
মাঙ্গলিক কার্য্য কর সুমঙ্গল তরে।”



"ব্রহ্মলোকে নারায়ণের আবির্ভাব।"

অম্বরে মিলাল জ্যোতি। জ্যোতির সহিত
চলি' গেলা জ্যোতিনাথ অভিষ্ট প্রদেশে।
দেবগণ পানে চাহি' মধুর বচনে
কহিলেন পদ্মযোনি—"যাও, দেবগণ,
যাও ত্বরা অমরায়। মঙ্গলের তরে
মঙ্গলার পূজা কর, হইবে মঙ্গল;
সবার মনের আশা পূরিবে নিশ্চয়।"
পদ্মযোনি-পাদপদ্মে করিয়া প্রণতি,
দেবগণ ব্রহ্মলোক করি' পরিহার
চলি গেলা নিজ দেশে। পিতামহ নিজে,
নিজ কাজে দিলা মন; মুনিগণ সবে
"জয় জয় রাম" নামে মাতিলা আবার।

ইতি শ্রীরাম চরিতে নারায়ণসন্দর্শনলাভ নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

কনকলতা।

(১৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর দিন প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে একটি নিভৃত কক্ষে রাজকুমারী কনকলতা একাকী উপবিষ্টা আছেন। কক্ষের বাতায়ন প্রভৃতি সমুদায় বন্ধ। রুদ্ধ বাতায়ন পথে যে ক্ষীণ আলো আসিতেছে, তাহাতেই গৃহটি কথঞ্চিৎ আলোকিত। বাহিরের আলো হইতে আসিলে, প্রথমতঃ গৃহ মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু গৃহ মধ্যে কিয়ৎক্ষণ থাকিলেই, গৃহস্থ সমুদায় পদার্থ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

গৃহটি সুসজ্জিত। গৃহ ভিত্তিতে অনেক গুলি চিত্র বিলম্বিত। চিত্রগুলিতে কারীকরের কারীগরী স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। তাহাতে আবার সে গুলি, পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত। পুষ্পমাল্য গুলি, বোধ হয়, রাজকুমারীর সখীগণের কীর্ত্তি।

গৃহের এক পার্শ্বে এক খানি খট্টা—মহার্হ শয্যায় আবৃত। শয্যার উপরে রাজকুমারী একাকী।

রাজকুমারী বালিকা—প্রকৃত পক্ষেই বালিকা—বয়স আজিও একাদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। রূপের কথা এখন আর কিছুই বলিব না—কেবল এই মাত্র বলিব রাজকুমারী সুন্দরী।

রাজকুমরী একাকী উপবিষ্টা। পার্শ্বে একখানি তালবৃন্ত পতিত। যেন গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ কষ্টের উপশম জন্য নিজেই তালবৃন্ত সঞ্চালন করিয়া হস্তে বেদনা অনুভব হওয়াতে পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছেন।

রাজকুমারী মনে মনে কত কি বলিতেছিলেন; তিনি যাহা বলিতেছিলেন, তাহা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অভিনিবেশ সহকারে শুনিলে বেশ শুনিতে পাওয়া যায়, দূর হইতে শুনা যায় না। তিনি যাহা বলিতেছিলেন, তাহার কতক অংশ পাঠকদিগকে শুনাইব। তিনি বলিতেছিলেন—

"ভাল, জয়েন্দ্র আজ সকালের সভায় আসেন নি কেন? তাঁর ত কোন অসুখ করে নি? দাদাকেও সকালে দেখ্‌তে পাই নি। বোধ হয় তাঁরা দুজনে কোথাও বেড়াতে গিয়ে থাকবেন। বিকালের সভায় তাঁরা বোধ হয় আস্‌বেন। আহা, মা দুর্গা করুন যেন তাঁর কোন অসুখ না হয়, অমন শরীর অসুখ হলে একেবারে শুখ্‌য়ে যাবে—না না—বালাই—অসুখ হবে কেন? তাঁরা যে বেড়াতে গেছেন——

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রপ্রভা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন "রাজকুমারি, কি ঘুমুচ্ছো?"

রাজকুমারী বলিলেন, "কেন সই, আমি বসে রয়েছি তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না?"

চন্দ্র। "এই বারে দেখ্‌তে পেয়েছি। তা তুমি একলাটি অন্ধকারে বসে কি করচো?"

কন। "কি আর করবো ভাই; যে গ্রীষ্ম, ঘরের বাহিরে ত বেরোবার যো নেই। কাজেই দোর জানালা বন্ধ করে বসে রয়েছি। তুমি ভাই এতক্ষণ ছিলে কোথায়?"

চন্দ্র। "আমি ভাই এতক্ষণ মা'র কাছে ছিলাম। আমি মনে কচ্ছিলাম, তুমি ঘুমুচ্ছো। ইঃ! তোমার গা দিয়ে যে কুল কুল ক'রে ঘাম বেরুচ্চে।"

এই কথা বলিয়া চন্দ্রপ্রভা নিকটস্থ গাত্রমাজ্জনী খানি লইয়া কনকলতার স্বেদবারি মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

পাঠক, এই সময়ে চন্দ্রপ্রভার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা আপনাকে বলিব। চন্দ্রপ্রভাও সুন্দরী। দুই জনের রূপই নয়ন প্রীতিকর, কিন্তু চন্দ্রপ্রভার রূপ স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায়, কিন্তু কনকলতার রূপের একটু জ্যোতি আছে—সে জ্যোতি নয়নকে তৃপ্ত করে—মনকেও তৃপ্ত করে—সে জ্যোতিটুকু কি, মন বুঝে—কিন্তু বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না—তাহার উপমা নাই। কনকলতা বালিকা, কিন্তু চন্দ্রপ্রভা বাল্য ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে পদার্পণ করিয়াছেন। কনকলতার দৃষ্টিতে সারল্য, চন্দ্রপ্রভার দৃষ্টিতে ঈষৎ কৌটিল্য আছে। কনকলতা গবাক্ষপথে একদৃষ্টিতে রাজ-সভা দেখে, কিন্তু চন্দ্রপ্রভা দেখিবার সময় গবাক্ষপার্শ্বে মুখ লুকাইয়া দেখে। যৌবন-সুলভ লজ্জা, কনকলতার নাই, চন্দ্রপ্রভার মনে তাহার অধিকার ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে।

চন্দ্রপ্রভা, কনকলতার দেহ মুছাইয়া দিয়া তালবৃন্ত গ্রহণ করিলেন, এবং বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "রাজকুমারি, আমি ভাই এতক্ষণ মা'র কাছে ছিলাম," আর একটু আগে যুবরাজ এসে মাকে বল্লেন তাঁরা নাকি কাল সকালে গঙ্গার ধারে বনেতে মৃগয়া কর্‌তে যাবেন। মহারাজের মত হ'য়েছে, কাজেই মা'রও মত হ'লো।"

কন। "দাদা যাবেন, আর কে যাবে? জয়েন্দ্র যাবেন না ত?"

চন্দ্র। "তাঁরি জন্যই ত মৃগয়া! যুবরাজের সঙ্গে তাঁর নতুন ভাব হয়েছে, তাইত যুবরাজ তাঁকে নিয়ে মৃগয়া করতে যাবেন। মৃগয়া নামে, নূতন বন্ধুর সঙ্গে আমোদ করাই আসল কথা।"

কন। "বনে না গেলে কি আর আমোদ হ'তো না। আমার ভাই মনে বড় ভয় হচ্চে।"

চন্দ্র। "ভয় কি? কত লোক জন সঙ্গে যাবে।"

কন। "তা হোক, তবু না গেলেই হ'তো ভাল।"

রাজকুমারীর কথা শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা মনে মনে ভাবিলেন "যুবরাজ ত আরও কতবার মৃগয়ায় গিয়াছেন, কই রাজকুমারী ত একবারও এমন ভয়ের কথা বলেন নি?—রাজকুমারী কি জয়েন্দ্রকে ভালবেসেছেন?—তিনি মৃগয়ায় যাবেন শুনেই কি রাজকুমারী এত উতলা। পরখ করে দেখ্‌তে হলো।"

মনে মনে এই রূপ ভাবিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন "আবার শুন্‌লেম জয়েন্দ্র নাকি একা, কেবল একখান তলোয়ার নিয়ে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বেন।"

কনকলতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "সে কি? তাকি কখন মানুষে পারে। না ভাই, তুমি যাও, তাঁ'কে বল গিয়ে তাঁ'র মৃগয়া কর্‌তে গিয়ে কাজ নেই।"

চন্দ্র। "বা রে! আমি কে? আমি তাঁকে বারণ কল্লে তিনি শুন্‌বেন কেন? মহারাজ যেতে বলেছেন তাঁ'র নিজের ইচ্ছে, যুবরাজের ইচ্ছে।"

কন। "আমি বারণ কল্লেও শুন্‌বেন না!"

চন্দ্রপ্রভা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "কেন তুমি তাঁর কে, যে তিনি তোমার বারণ শুন্‌বেন?

কন। "তবে কি হ'বে?"

চন্দ্র। (ঈষৎ হাসিয়া) "হবে আর কি? যেমন মদ্দানি ক'রে যাবেন, বাঘের হাতে প্রাণটা খোয়াবেন আর কি?"

কন। "না ভাই, অমন কথা বলোনা। আহা অমন শরীর অমন মিষ্টি মিষ্টি কথা—"এই কথা বলিতে বলিতে কনকলতা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

চন্দ্রপ্রভা, স্বীয় অঞ্চলে তাঁহার মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন "কেঁদনা ভাই! কাঁদ কেন? জয়েন্দ্র তোমার কে? যে তার জন্যে তুমি কাঁদ্‌চো?

কন। "তিনি আমার কেউ নন সত্যি! তবু মিছে মিছে তাঁর কত কষ্ট হবে বল দেখি? হয় ত কত বিপদ হ'তে পারে!"

চন্দ্র। "তোমার দাদারও ত বিপদ হ'তে পারে? সে কথা ত তুমি একবারও ভাব্‌লে না?"

কন। "বালাই! দাদার বিপদ হবে কেন? দাদার সঙ্গে কত লোকজন যাবে, তারা যে দাদাকে রক্ষে কর্‌বে?"

চন্দ্র। "তারা যদি তোমার দাদাকে রক্ষে কর্‌তে পারে, তা হ'লে আর তোমার দাদার বন্ধুকে রক্ষে কর্‌তে পার্‌বে না?"

কন। "তিনি যে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বেন।"

চন্দ্র। "সেটা মিছে কথা। তুমি জয়েন্দ্রকে কত ভাল বাস তাই দেখ্‌বার জন্য বলেছিলেম।"

কন। "আমিই জয়েন্দ্রকে ভালবাসি? তুমি কি ভাল-

বাস না? তাঁকে ভাই কে না ভাল বাসে? দেখ্‌লে না কাল সভা শুদ্ধ লোক তাঁর কত প্রশংসা করলে?"

চন্দ্র। "তবু তোমার ভালবাসা, আর আমাদের ভাল বাসায় একটু তফাৎ আছে। আমরা ভাল বলি, তুমি ভাল বাস।"

কন। "আমি ভাই বুঝতে পারলেম না।"

চন্দ্র। "তবে বুঝিয়ে দিই শোন।"

এই কথা বলিয়া চন্দ্রপ্রভা কনকলতার কানে কানে কি বলিলেন।

কনকলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দূর, তা কেন? ও তোর মনের কথা, আমিত ও কথা একবারও ভাবিনি।"

চন্দ্রপ্রভা। আর দিন কত যেতে দাও, তার পর চোখে আঙ্গুল দে দেখ্‌য়ে দেবো।"

এমন সময় বৈকালিক সভাজ্ঞাপক বাদ্য বাজিল।

কনকলতা বলিলেন, "চল সই বৈকালিক সভা দেখিগে।"

চন্দ্রপ্রভা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন চল, দেখিগে যদি জয়েন্দ্রকে একবার দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"

অনন্তর দুইজনে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নগরোপকণ্ঠে রাজকীয় কুসুমোদ্যান। অপরাহ্ণে ও প্রাতে নগরবাসীরা এখানে আসিয়া বায়ুসেবনসুখ অনুভব করেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। রৌদ্রের তেজ এখনো কমে নাই। পাখিরা এখনও পাতার ভিতর নীরবে চক্ষু বুঝিয়া বসিয়া আছে। গবাদি পশুরা এখনও তরুতল ত্যাগ করে নাই।

এমন সময়ে এই উদ্যান মধ্যস্থ একটি লতা মণ্ডপে প্রস্তরাসনে দুইটি যুবা বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন।

যুবক দুইটির একজন শ্রীদত্ত ও অপর জন চন্দ্রপ্রভ।

পাঠক! এই দুইটি যুবকের কথাই বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে। ইঁহারা দুই জনেই জয়েন্দ্রের বন্ধু।

চন্দ্রপ্রভ বলিলেন "কিন্তু ভাই, যে গ্রীষ্ম, এতে নগরের সুখ কিছুই হ'বে না। সমস্ত দিন কেবল তাঁবুর ভেতর না হয় গাছতলায় পড়ে থাকতে হ'বে।

শ্রীদত্ত বলিলেন "ভাই, কি করবে বল? রাজা রাজড়ার কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের যখন যা মত হ'বে তখন তাই করবেন, তা'তে কথা কয় কা'র সাধ্য?"

চন্দ্র। "তা বটে, কিন্তু মিছে কষ্ট পাওয়ায় ফল ত কিছু হবে না। আচ্ছা, ভাই, ভাদ্র মাসে এমন গ্রীষ্ম কখন দেখেছ?"

শ্রীদত্ত। "সে কথা ভেবে আর হ'বে কি? কিন্তু ভাই এই স্থানটি কেমন রমণীয়। এ গ্রীষ্মে ঘরে দ্বার জানালা বন্ধ করেও থাকা যায় না, কিন্তু দেখ এ স্থানটি কেমন শীতল।"

চন্দ্র। "হবে না কেন বল? আমরা প্রস্তরের আসনে কখন শুচ্চি কখন বস্‌ছি, এতে ত সমস্ত দিনের মধ্যে রৌদ্র লাগ্‌বার যো নাই, তাতে আবার এ মণ্ডপটি লতাপল্লবে এমনি আচ্ছন্ন, যে এতে বিন্দুমাত্রও রৌদ্রের তাপ প্রবেশ কর্‌বার যো নাই। কিন্তু ভাই, ঐ মাঠের মাঝখানে পুকুর পাড়ে যে বট গাছটী আছে, তার তলা ভাই এর চেয়েও ঠাণ্ডা। সে দিন দুপুরবেলা তপোবন থেকে আস্‌বার সময়, তার তলায় ঘাসের ওপর অনেকক্ষণ শুয়েছিলুম, শরীর যেন একেবারে জুড়িয়ে গেল।"

শ্রীদত্ত। "তা'ত হ'বারই কথা। অত রৌদ্র থেকে এসে, গাছের ছায়া ত শীতল বোধ হবেই, বিশেষ বটচ্ছায়া

'শীতকালে ভবেদুষ্ণমুষ্ণকালে চ শীতলং ॥"

সে কথা যা'ক, এখন ভাই তোমার বিয়ের কি বল? আমরা ইতর জন, দিন কয়েক মিষ্টান্ন লাভ হয়। জান ত ভাই—

"বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনা।"

চন্দ্র। "সে কাজটা এখন থাকলো। আমার ইচ্ছা নয়, জান্‌তে পেরে, পিতা এক প্রকার নিরস্তই হয়েছেন।"

শ্রীদত্ত। "তোমার অনিচ্ছা কেন?"

চন্দ্র। "অনেক কারণ আছে ভাই! এখন কেমন নিশ্চিন্ত আছি, কোন ভাবনা চিন্তা নাই! একটা গলগ্রহ জুটলে কি আর সে সুখ থাকবে? আমি ভাই এত অল্প বয়সে একটা চিন্তার বোঝা ঘাড়ে করতে প্রস্তুত নই।"

শ্রীদত্ত। "শুনে ভাই বড় সন্তুষ্ট হলেম, আমি আরও ভাব্‌ছিলেম বুঝি দলের একজন কমলো?"

চন্দ্র। "না ভাই, কেউ কম্‌বে না। আমি তোমায় নিশ্চয় বল্‌চি, যদি আমরা কখন সংসারী হই, সকলে এক সময়ে এক স্থানেই বাস করবো। বন্ধুবান্ধব ছেড়ে ধনের লোভে অন্যত্র গিয়ে থাকবো তাও কি সম্ভব বোধ কর?"

বন্ধুদ্বয়ের এই রূপ কথোপকথনে ক্রমে সময় অতীত হইতে লাগিল। সূর্য্য অস্ত গেলেন,—রাজ-উদ্যান ক্রমে নগরবাসী জনে পূর্ণ হ'তে লাগলো। বন্ধুদ্বয়ও উদ্যান ত্যাগ করে নগরাভিমুখে প্রস্থান করলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। রাজকুমারী কনকলতার কক্ষটি এখন দীপাবলীতে আলোকিত। গৃহটি সুগন্ধে পরিপূর্ণ। কনকলতা, আর চন্দ্রপ্রভা দুইজনে শয্যার উপর উপবেশন করিয়া কথোপকথনে নিযুক্ত।

এখন আর গৃহের জানালা বন্ধ নয়। গবাক্ষ পথে চন্দ্র, কনকলতা ও চন্দ্রপ্রভার রূপের তুলনা করিতেছেন; তাঁহার জ্যোৎস্নার প্রভুত্ব নাই। জ্যোৎস্না গৃহের বাহিরে, এ ছাদে ও ছাদে ছুটাছুটি করিতেছে। গৃহের মধ্যে, বুঝি চন্দ্রপ্রভা আর কনকলতাকে দেখিয়া, আসিতে লজ্জা বোধ করিতেছে।

চন্দ্রপ্রভার বাক্য শেষ হইলে, কনকলতা বলিলেন, "কিন্ত, যাই বল ভাই, জয়েন্দ্র নামটি বড় মিষ্টি।"

চন্দ্র। "তা'ত আমি আগেই বলেছি যে, এখন জয়েন্দ্রের সবি তোমার কাছে মিষ্টি বোধ হ'বে।"

কন। "ঠাট্টা কর কেন ভাই, আচ্ছা তুমি সত্যি করে বল দেখি, জয়েন্দ্র নামটি তোমার মিষ্টি বোধ হয় না?"

চন্দ্র। "আমি ঠাট্টা করচিনে, যথার্থই বলচি আমার কাছে ভাই জয়েন্দ্র নামও যেমন, ভীমসিংহ নামও তাই আর বিক্রমসিংহও তাই; জয়েন্দ্র নামে ত আমি কিছু বেশী মিষ্টত্ব দেখ্‌তে পাইনে। বরং কনকলতা নামটি আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।"

কন। "সে তুমি আমায় বেশী ভাল বাস বলে।"

চন্দ্র। "তা ভাই, আমিও ত তাই বল্‌ছি, যে, যে যারে ভালবাসে, সে তার সকল কাজই ভাল মনে করে।"

কন। "তা ভাই, জয়েন্দ্রকে কে না ভাল বাসে বল?"

চন্দ্রপ্রভা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তা সত্য, কিন্তু জয়েন্দ্রের নামটি পর্য্যন্ত মিষ্টি লাগ্‌বে, এত ভালবাসা তুমি বই আর কেউ বাসে না।"

কন। "আচ্ছা তা যেন হ'লো; কিন্তু জয়েন্দ্র ত দেখ্‌তে ভাল, তাত আর না বল্‌তে পারবে না?"

চন্দ্র। "তা কি আমি নয় বলচি। তা বলে ভাই তোমার জয়েন্দ্র পৃথিবী শুদ্ধ লোকের চেয়ে ত আর সুশ্রী নয়?"

কন। "আচ্ছা যারা সভায় ছিল তাদের চেয়ে ত?"

চন্দ্র। "তাই বা কেন বল্‌বো? সভায় যদি এমন কেউ থাকে, যাকে আমি ভালবাসি, তোমার জয়েন্দ্র ত আমার চক্ষে আমার তার চেয়ে সুশ্রী হবে না?"

কন। "আচ্ছা ভাই, সে কে? বল না?"

চন্দ্র। "আজকে ভাই তাঁকে সভায় দেখিনি, কাল্‌কে ভাই তিনি ছিলেন। আচ্ছা কালকে সবাই মৃগয়া থেকে ফিরে এলে, পরশু সকালে তোমায় দেখাব।"

কন। "কেমন ক'রে?"

চন্দ্র। "কেন তাঁদের কুস্তির আখড়ায়? তেতালার পশ্চিমের বারাণ্ডা থেকে, কুস্তির আখ্‌ড়া বেশ দেখা যায়। সকাল বেলা যুবরাজ টুবরাজ সবাই সেখানে কুস্তি করেন।"

কন। "আচ্ছা ভাই এঁরা সবাই কাল নিশ্চয়ই মৃগয়ায় যাবেন?"

চন্দ্র। "কেন রাজসভায় তোমার বাপ্‌ কি বল্‌ছিলেন, শোনো নি?"

কন। "কৈ কি বল্‌ছিলেন?"

চন্দ্রপ্রভা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "একেবারে মরেছ?" বলিয়াই জিহ্বা দংশন করিলেন।

কন। "গাল দাও কেন ভাই?"

চন্দ্র। "কৈ গাল ত দিই নি? বল্‌চি কি এত কথা হলো কিছুই শোনো নি, কেবল হাঁ ক'রে জয়েন্দ্রকেই দেখেছ? তাই বল্লেম "একেবারে মজেছ?"

কনকলতা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "আমি বুঝি কেবল জয়েন্দ্রকেই দেখ্‌ছিলেম?"

চন্দ্র। "জয়েন্দ্রকে দেখ, আর যারেই দেখ, কিন্তু ভাই তোমার বাপ অত কথা বল্লেন তার একটাও শুন্‌তে পেলে না এই বড় আশ্চর্য্য!"

কনকলতা একটু ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন "বল না ভাই বাবা কি বলেছেন?"

চন্দ্র। "তিনি তোমার দাদাকে বল্লেন তোমরা মধ্যাহ্ন কালে মহর্ষি চন্দ্রশেখরের আশ্রমে গিয়ে বিশ্রাম করো। মহর্ষিকে আমার প্রণাম জানিয়ো, এমনি এমনি আর কত কি? তার পর বল্লেন মৃগয়া কর্‌তে দূর বনে যেও না। অপরাহ্ন হ'বার পূর্ব্বে ফিরে এসো, এমনি এমনি কত কথা বল্‌লেন। আমি কি তোমার বাবার মত সাজ্‌য়ে গুজ্‌য়ে বল্‌তে জানি যে বল্‌বো?"

এ কথার উত্তরে কনকলতা কিছুই বলিলেন না, তিনি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে বলিলেন "ভাই, আমার বড় অসুখ কর্‌চে, তুমি মাকে বলগে আমি আজ আর কিছু খাব না।"

চন্দ্রপ্রভা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সঙ্গে সঙ্গে সে কথাটাও বল্‌বো?"

কনকলতা। "দূর!" বলিয়া শয়ন করিলেন।

চন্দ্রপ্রভা বলিলেন "তবে মাকে বলিগে?"

কন। কি?"

চন্দ্র। "তোমার অসুখের কথা।"

কন। "যাও!"

চন্দ্রপ্রভা চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাঠক, একবার কাননভূমিতে চলুন। আজ যুবরাজের মৃগয়া!

এই মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। যুবরাজ সদলবলে কাননভূমিতে পৌঁছিয়াছেন। সৈন্যগণ এদিক ওদিক মৃগ অন্বেষণ করিতেছে।

যুবরাজ, জয়েন্দ্র, ভীমসিংহ, শ্রীদত্ত, চন্দ্রপ্রভ, যশোবন্ত ও বলবন্ত, এক একটি সিন্ধুদেশীয় ঘোটকে আরোহণ করিয়া একটি বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষতলে দণ্ডায়মান।

যুবরাজ বলিলেন "দেখ ভাই, মৃগয়ার সময় আমরা যে কে কোথায় থাক্‌বো তা'র স্থিরতা নাই, কিন্তু মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে সকলে এই বটতলে উপস্থিত হ'বে। তা'র পর সকলে মিলে পিতার আদেশ মত মহর্ষি চন্দ্রশেখরের আশ্রমে যা'ব।"

এমন সময় একজন সৈনিক আসিয়া যুবরাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল "কুমার! পূর্ব্বদিকের ঐ বনে প্রচুর মৃগ আছে এরূপ বোধ হ'চ্ছে। কানন সীমাস্থিত বালুকার উপর হরিণ, বরাহ প্রভৃতি জন্তুর পদচিহ্ন যেরূপ ভাবে অঙ্কিত রয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোধ হ'চ্ছে তারা বনে প্রবেশ করেছে, কিন্তু এখনো বহির্গত হয় নি। এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

যুবরাজ বলিলেন "তবে যাও সকলে ঐ বনেই প্রবেশ কর।" সৈনিককে এই কথা বলিয়া বন্ধুদিগকে বলিলেন "চল ভাই আমরাও মৃগান্বেষণে যাই।" এই বলিবামাত্র সকলে সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক, একেবারে সকলের অনুসরণ করা সহজ নয়, চলুন আমরা যুবরাজেরই অনুসরণ করি।

মৃগান্বেষণচ্ছলে যুবরাজ এবং জয়েন্দ্র এক পথই অবলম্বন করিলেন। অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইজনে দেখিলেন দূরে একটি হরিণ তৃণ ভোজন করিতেছে।

হরিণটি দেখিয়া যুবরাজ জয়েন্দ্রকে বলিলেন "এস সখে, দেখা যা'ক কে আগে হরিণটিকে বিদ্ধ করিতে পারে।" এই বলিয়াই দুই জনে ধনুকে শরযোজনা করিলেন, কিন্তু হরিণ মনুষ্য সমাগম বুঝিতে পারিয়া প্রাণের ভয়ে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তাঁহারাও দুইজনে যুক্ত শরাসন হস্তে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে হরিণ কানন অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরভূমিতে উপনীত হইল, তখন দুইজনেই হরিণকে লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করিলেন। দুইজনের শরই হরিণকে বিদ্ধ করিল। হরিণ শরাহত হইয়া গঙ্গাজলে পতিত হইল।

এমন সময়ে যুবরাজ বলিলেন "দেখ জয়েন্দ্র, হরিণত নিহত হলো, কিন্তু এখন আমি তোমার প্রাণবধ করবো। তুমি অসি ধারণ কর, এই গঙ্গাকূলে আজ হয় তুমি নয় আমি নিহত হ'ব।"

জয়েন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "যুবরাজ! আপনি এ কি বলচেন? আমি আপনার এমন কি অপ্রীতিকর কার্য্য করেছি, যে, আপনি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করচেন? কুমার! আপনি যখন আমাকে একদিন একক্ষণের তরেও বন্ধু বলে আলিঙ্গন করেছেন, যখন আমি আপনাকে বন্ধু বলে আহ্বান ক'রেছি; তখন আপনার দেহে আমি কখনই অস্ত্রাঘাত করতে পারবো না।"

যুবরাজ বলিলেন "ভাল, তুমি অস্ত্রাঘাত না কর আমি অস্ত্রাঘাত করবো! তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—"

জয়েন্দ্র যুবরাজের কথা শেষ হইতে না হইতে বলিলেন "সে কি কথা, যুবরাজ, আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী? এমন কথা বলবেন না! আপনি রাজাধিরাজ মগধরাজের পুত্র, আমি একজন সামান্য ক্ষত্রিয়সন্তান মাত্র! আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কিসে?"

যুবরাজ বলিলেন "তুমি যতই বল না কেন, আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ বিনাশ করবো। তোমার প্রাণনাশ করবো ব'লেই, ছলে এই মৃগয়ার আয়োজন করেছি। এক্ষণে ইচ্ছা হয় আত্মরক্ষা কর, না হয় এই অসির মুখে আপনার প্রাণ অর্পণ কর।" এই বলিয়া জয়েন্দ্রকে আঘাত করিবার জন্য অসি নিষ্কোসিত করিলেন।

জয়েন্দ্র কাজে কাজেই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে। অসিযুদ্ধ চলিতে লাগিল। যুবরাজ জয়েন্দ্রের প্রাণনাশার্থ অসি সন্ধান করেন। জয়েন্দ্র কেবল আত্মরক্ষা করেন।

জয়েন্দ্রের পশ্চাতে খর বাহিনী গঙ্গা। ভাদ্রের ভরা গঙ্গা। জয়েন্দ্রের ইচ্ছা রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করেন। এই জন্য অশ্বকে ক্রমে পশ্চাৎ হঠাইয়া ফিরিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময়ে গঙ্গার প্রবল তরঙ্গে, তীরভূমির কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গঙ্গাজলে পতিত হইল। সেই সঙ্গে অশ্ব সমেত জয়েন্দ্র গঙ্গাজলে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজ তীরে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। হস্তে শরযুক্ত শরাসন। বোধ হয়, ইচ্ছা জয়েন্দ্র ভাসিয়া উঠিলে শরদ্বারা আহত করিবেন।

কিন্তু জয়েন্দ্র আর ভাসিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল অশ্বটি স্রোতের অনুকূলে সন্তরণ করিতে করিতে যাইতেছে।

যুবরাজ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, শেষে ফিরিয়া গেলেন।

তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কাঠুরিয়া ও যম।

১

"আরে রে জঠরানল!
আর যে আমি সইতে নারি জ্বালা তোর,
আলোয় দেখাস্ আঁধার ঘোর!
গরিব আমি, নাইকো আমার কেউ,
শূন্য আমার, ত্রিসংসার,
শূন্য আমার প্রাণ,
শূন্য আমার আশার বাসা,
শূন্য আমার জ্ঞান।
শূন্য সবি, তুই রে কেবল পূর্ণ হয়ে দেখাস্ বল।

২

"একে একে সবাই গেছে,
কেই বা থাকে দীনের কাছে?
দীনের কাছে কেবল আছে অমর জঠর-জ্বালা!
জঠর জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে,
ঈশ্বরকেও গেলেম ভুলে,
ক্ষুধার জ্বালা এগ্নি জ্বালা, হলেম ঝালা পালা!
ধিক্ রে জঠর! ধিক্ রে ক্ষুধা!
সয় না যে আর পরাণ-বেঁধা
দারুণ যাতনা!
আর যে আমি হাঁট্‌তে নারি,
ওহো ক্ষুধার তাড়না!"

৩

এই-না বোলে এক কাঠুরে
কাঠের বোঝা মাথায় কোরে,
ধীরে ধীরে লাঠির ভরে
যাচ্ছে মাঠের পথে;
বড় বুড়ো, তায় ক্ষুধাতুর;
তাতে আবার হাট বহু দূর,
কষ্টে চলে, ঘামের জলে
ভাস্‌চে শরীর তাতে।

৪

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলা,
মাথার উপর রবির গোলা;
রোদের চোটে মাটী ফাটে,
কা'র সাধ্য পথে হাঁটে?



তপ্ত হাওয়া লোটকে্ ধায়,
আগুন-ঝালা ঢেলে গায় ;
হঁাপায় পাখী গাছের ডালে,
মহিষ পড়ে ঝাঁপিয়ে জলে ;
কুকুরগুলো পুকুর খুঁজে
দিচ্চে পাঁকে পেট্‌টা গুঁজে ;
চাতক হাঁকে ফটিক জল,
কোচ্চে ঝাঁ ঝাঁ আকাশতল ;
ক্ষেতের মাটী ফুটী ফাটা,
গরিব বুড়োর কঠিন হাঁটা।
থুখ্‌ুরিয়ে কাঁপ্‌চে বুড়ো, হোতে নারে সোজা,
ধপাস্‌ কোরে ফেল্লে ভুঁয়ে ভারী কাঠের বোঝা।

৫

কষ্টে কেঁদে চোখের জলে
নিশেস ফেলে বুড়ো বলে,—
আর কষ্ট সইতে নারি,
পেট্‌টাই মোর শত্রু ভারি।
পেটের তরে আজো খাটি,
বোঝা মাথায় রোদে হাঁটি।
চাইনা এমন পোড়া পেট, চাইনা এমন প্রাণ,
ও যম ! ও যম ! ত্বরায় এসে আমায় কর ত্রাণ !

৬

কাতর বুড়োর কাৎরাণিতে যমের আসন নড়ে,
আচম্বিতে যম উপনীত; বৃক্ষ ভাঙ্গে ঝড়ে।

ভীষণ আকার, গভীর হুঁকার, চক্ষু দুটো ঘোরে,
কালির মতন গায়ের বরণ, যমদণ্ড করে।
মোটা ঠোঁটের উপর নীচে মস্ত দাড়ি গোঁফ,
কালো মাথায় কালো কালো কোঁক্‌ড়া চুলের থোপ।
যম দাঁড়িয়ে বুড়োর কাছে বজ্রনাদে বলে,—
"ডাক্‌লে কেন? ত্বরায় বল, ত্বরায় যাব চোলে।"

৭

যমকে দেখে চোম্‌কে বুড়ো বলে ব্যাকুল চিতে,
"ডাক্‌নু তোমায় কাঠের বোঝা মাথায় তুলে দিতে।
আর কিছু নয়, যম মহাশয়! হাটে আমি যাই,
একলা আমি তুল্‌তে নারি ডাক্‌নু তোমায় তাই।"
বুড়োর কথা শুনে যমের মুখে এলো হাসি,
সাঁ করে যম চোলে গেলো উড়িয়ে ধূলোর রাশি।

৮

কবি বলে——
এই-না বুড়ো এই এখনি মোত্তে চেয়েছিলো?
তাই-না বুড়ো 'ও যম' বোলে যমকে ডেকেছিলো?
তবে কেন উল্টো বোলে পাল্টে নিলে কথা?
ও, বুঝেছি—যমকে ডাকা কেবল মুখের কথা!
লোক মাত্রেই একেক রকম মুদ্রা দোষে দোষী,
তার মধ্যে কষ্ট পেলেই যমকে ডাকা বেশী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

পাণ্ডব-চরিত। *

(মহাভারতীয় দৃশ্যাবলী।)

প্রথম প্রকরণ।

প্রথম দৃশ্য।

রৈবতক পর্ব্বত।

পর্ব্বতোপরে শ্রীকৃষ্ণ আসীন।

শ্রীকৃষ্ণ।—ভূভার হরণ তরে অবতার মোর। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করিতে ব্যাপৃত আমি আছি চিরকাল। যেই জন ধর্ম্ম পথে র'বে—আমি তারি পাশে বাঁধা চির কাল তরে। পাণ্ডবেরা ধর্ম্মের আশ্রয়ে, হ'তেছে বর্দ্ধিত। বিদুরের পরামর্শে তা'রা চিরদিন, ধর্ম্মেরে আপন ভাবি' কাটাই'ছে কাল। এই হেতু, পাণ্ডবের সখা আমি; আমার আশ্রয়ে থাকি' পাণ্ডবেরা কালে, সসাগরা পৃথিবীর হ'বে অধীশ্বর। দুর্য্যোধন দুষ্ট মন্ত্রী সনে, পাণ্ডবের অহিত সাধিতে ব্যস্ত সদা। কিন্তু তার আশা—কভু না পুরিবে। ধর্ম্মের হইবে জয়—অধর্ম্মের ক্ষয়, হইবে নিশ্চয়। দুর্য্যোধন সদা ভাবে মনে,—কিসে সসাগরা ধরা ল'বে করতলে। কেমনে পাণ্ডবগণে করিয়া বিনাশ—একাকী ভারতবর্ষ করিবে শাসন—এ দুরাশা করিতে পূরণ—নিরন্তর পাপে মগ্ন মন। সেই পাপে কৌরবের কুল হ'বে ক্ষয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়—যাই এবে যথা গঙ্গাদেবী—বলি তাঁরে

---

* পাণ্ডবচরিত কথোপকথনচ্ছলে রচিত। শিল্পপুষ্পাঞ্জলি প্রকাশকগণের উদ্দেশ্য রামায়ণ ও মহাভারতের সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের কতকগুলি চিত্র প্রকাশিত করেন; কিন্তু শুধু চিত্র সাধারণের প্রীতিকর না হইতে পারে, এই জন্য পত্রে চিত্রের বিবরণ দিবার কল্পনা হয়। কিন্তু বিবরণ পরস্পর সংলগ্ন হইলে অধিক প্রীতিকর হইবে ভাবিয়া, দৃশ্যগুলির বিবরণ এই রূপ কথোপকথনচ্ছলে সাজাইয়া লেখা গেল। ইহা নাটক নয়, নাটকের লক্ষণ ইহাতে কিছুই নাই। কিন্তু এখনকার দিনে নাটক না হইলেও, কথোপকথনচ্ছলে কোন পৌরাণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলেই, অনেকে অভিনয় করেন। পাণ্ডব-চরিত কাহারও অভিনয় করিতে ইচ্ছা হইলে এক এক প্রকরণ এক এক রাত্রে অভিনয় করিতে পারেন। লেখক।

রক্ষিবারে ভীমে।—আজি পাপী দুর্য্যোধন করেছে মনন, বধিবারে ভীমসেনে বিষ-অন্ন দানে। বিষান্নে মূর্চ্ছিত যবে হ'বে ভীমসেন—দেবে দুরাচার তা'রে লতা পাশে বাঁধি—গঙ্গানীরে ভাসাইয়ে। জাহ্নবী, আদেশে মোর লবেন ভীমেরে, পাতালে পন্নগপুরে। বাসুকি তথায় দৌহিত্রের দৌহিত্রেরে রক্ষিবেন আসি—যাই এবে গঙ্গাকূলে হস্তিনার পারে—যথায় ক্রীড়ায় মত্ত কৌরব-পাণ্ডব। কহি এ আদেশ মোর গিয়ে জাহ্নবীরে—দেখিগে অম্বরে বসি' পাতকীর খেলা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির-মধ্য।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও ভীম।

দুর্য্যোধন।—দেখ ভাই, বৃকোদর, সহোদর সম, নিরখি তোমারে সদা। সাধ সদা মনে—পঞ্চাধিক শতভ্রাতা মিলিয়া হরিষে, খেলি সদা নানা খেলা—কাটাই জীবন আমোদে আমোদে ভাই—আর কিছু নাহি চায় মন—এই হেতু আজি গঙ্গাতীরে হের বস্ত্রাবাস—বিবিধ ভোজ্যের আয়োজন—আহারে কি পরিতৃপ্ত হয়েছ রে ভাই?

ভীম।—কেন না হইব তৃপ্ত! মনোসাধে আশা মিটাইয়ে দুই হাতে করেছি ভোজন—অতীব সুখাদ্য সব—গৃহে গিয়ে সূপকারগণে—উপযুক্ত দিব পুরস্কার!

দুর্য্যোধন।—ভাই দুঃশাসন, পরিতৃপ্ত হয়েছ কি করিয়ে আহার?

দুঃশাসন।—আর্য্য, অতি অল্পাহারী আমি। অতিরিক্ত হয়েছে আহার—আর না নড়িতে পারি—ইচ্ছা করে করিয়া শয়ন, নিদ্রা যাই মন সুখে।

দুর্য্যোধন।—ভাই রে! আদেশে আমার আজি, নিজ হস্তে পুনঃ, ক্ষীর-লড্ডু করিল প্রধান সূপকার।—বৃকোদর, আহারে নিপুণ তুমি ভাই; কর রে আহার ইহা আমার সাক্ষাতে। দুঃশাসন ইচ্ছা যদি হয় খেতে, কর রে আহার!

দুঃশাসন।—এখনি বলিনু দাদা, উদরে নাহিক হেন স্থান, তিল আধ ধরে যাহে। আমি আর নারিব ভক্ষিতে।

ভীম।—যদিও উদর পূরে করেছি ভোজন; গোটাদশ ক্ষীর-লড্ডু ধরিবে না কেন এ উদরে! কেবা কবে ডরে—লইবারে বোঝার উপরে শাক আঁটি? দাও মোরে; মনোসাধ পুরাব তোমার—(লড্ডু ভোজন)—

দুর্য্যোধন।—খাও ভাই, আশ মিটাইয়ে; আরো প্রয়োজন হয়, আনাইব পুনঃ।

ভীম।—আর না খাইব এবে—অতি ভোজনেতে মোর, হইতেছে অবসন্ন কায়—

দুর্য্যোধন।—মনোসাধ পূরেছে আমার—চল যাই গঙ্গা-তীরে—শীতল সমীরে, দেহ স্নিগ্ধ হ'লে—ঘুচিবে ও অবসন্ন ভাব।

ভীম।—বলেছ যথার্থ কথা—মৃদু ব্যায়ামেতে—অতি ভোজনের ক্লেশ ত্বরা দূর হবে—চল তবে—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গঙ্গার উত্তরকূল, অপর পারে কুরুবালকগণের বস্ত্রাবাস।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—দুরাচার দুর্য্যোধন বিষ-লড্ডু দানে, মূর্চ্ছিত করেছে ভীমসেনে। গঙ্গাকূলে, তরুমূলে মূর্চ্ছিত হইয়া, রয়েছে পতিত ঐ বীর বৃকোদর। এখনি আসিয়ে দুর্য্যোধন, বাঁধি লতাপাশে ভীমে, দিবে ভাসাইয়া, জাহ্নবীর জলে। যাহে ভীম পায় প্রাণ—উপায় তাহার করিব এখনি।—কোথা গঙ্গে, এস একবার, প্রয়োজন আছে মোর।

গঙ্গানীর হইতে গঙ্গার উত্থান।

গঙ্গা।—পিতা গো! কি মনন করি মোরে করিলে স্মরণ? তোমারি চরণে জন্মি' দীনা ভাগীরথী, তোমারি আদেশে ভ্রমি'ছে ভারতভূমে, পাপী অন্বেষিয়ে। তোমারি চরণ বলে পাপীরে নিস্তার করি। হে নিস্তারহেতু, তার তুমি, আমি মাত্র কারণ তাহার। কি কার্য্য সাধিব আজি? আদেশহ মোরে, পাপহারি!

শ্রীকৃষ্ণ।—শুন গঙ্গে, যে কার্য্যের তরে, স্মরণ করেছি তোমা। হের ঐ, তোমার দক্ষিণকূলে পাদপের মূলে, বিষান্নে মূর্চ্ছিত ভীমসেন। পাপ-বুদ্ধি দুর্য্যোধন এখনি আসিয়া, বাঁধি লতাপাশে ভীমে, তব জলে দিবে ডুবাইয়া। পাণ্ডবেরা আশ্রিত আমার চিরদিন, জানত, জাহ্নবি, তুমি। যবে দুর্য্যোধন, দিবে ভীমে ভাসাইয়া তোমার সলিলে, জননীর মত তুমি, কোলে ল'য়ে তা'রে, লইও পাতালপুরে;

বলো বাসুকিরে মোর নাম করি, বৃকোদর আত্মীয় তাহার; দৌহিত্রের দৌহিত্র সে, একারণে তারে, দুর্য্যোধন কবল হইতে রক্ষিবারে, বলবৃদ্ধি হেতু, অমৃতমিশ্রিত পরমান্ন যেন করান ভোজন। তা'হলে জীবন তা'র অটুট রহিবে। দুর্য্যোধন শত চেষ্টা করিলেও তা'রে নারিবে বধিতে। এ বচন গুলি মোর, বলিও তাঁহারে, গঙ্গে, বিশেষ করিয়া।

গঙ্গা।—যথা অভিরুচি তব সাধিব নিশ্চয়।

শ্রীকৃষ্ণ।—রহ তবে সাবধানে; ঐ দেখ আসিতেছে পাপী দুর্য্যোধন। যাই আমি হস্তিনায়, বিদুরে এসব তত্ত্ব বলি গিয়ে এবে। বলি গিয়া, বৃকোদর না হেরিয়ে, শোকেতে আকুল হ'বে যবে কুন্তীদেবী, পাণ্ডবগণের সনে, সে সময়ে সান্ত্বনা করিতে তা'সবারে। যাও গঙ্গে, রহ সাবধানে।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

[গঙ্গানীরে গঙ্গার অন্তর্দ্ধান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গঙ্গার দক্ষিণকূল।

কূলে বৃক্ষমূলে ভীমসেন মূর্চ্ছিতাবস্থায় পতিত।

ধীরে ধীরে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন।—এতক্ষণে, বিষের প্রভাবে, মরেছে নিশ্চয়! ও শয়ন, অন্তিম শয়ন! নাহিক সন্দেহ তাহে। সবে এবে আমোদে বিভোর, কোন দিকে নাহি দৃষ্টি কারো; এই বেলা, হস্ত পদ বাঁধিয়া উহার, লতার বন্ধনে, দিই ভাসাইয়া জলে; মৃতদেহ ডুবে যাবে, কেহ না জানিবে।—কিন্তু, জানি আগে নিশ্চয় করিয়া, মরেছে কি না মরেছে। যদি না মরিয়ে থাকে, বাঁধিলে বিপদ—

(ভীমের নিকটে গিয়া)

ভাই, বৃকোদর, বালুকার উপরেতে, রয়েছ শুইয়ে কেন ভাই? রম্যতম বস্ত্রাবাস—বিচিত্র শয়ন—ত্যজিয়ে, এখানে তব সাজে কি শয়ন; উঠ ভাই—চল যাই—

(নাসিকায় ও মস্তকে হস্ত দিয়া সবলে আহ্বান)

নাই—নাই—মরেছে নিশ্চয়! বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন! এই বেলা চুপে চুপে করিয়া বন্ধন—দিই জলে ডুবাইয়া—কেহ না জানিবে—

(ভীতিব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতে দেখিতে লতাপাশে ভীমকে বন্ধন)

কেহ নাই নিকটে এখন—দিই জলে ডুবাইয়া এরে এই বেলা—এ বন্ধন কঠিন বন্ধন—যদি জলে ডুবি'—বিষের প্রকোপ যায় চলি—এ বন্ধন ছিঁড়ে সন্তরিতে নারিবে নিশ্চয়—দিই জলে ডুবাইয়া——

(চারিদিক ত্রস্তভাবে দেখিয়া ভীমকে জলে নিক্ষেপ)

ঐ ঐ গেল তলাইয়া—আর না উঠিবে ভীম—তপন বদন ওর, আর না দেখিবে—আজি হতে, নাম মাত্র অবশেষ হইল ভীমের—ভয় মোর গেল এতদিনে—চিরশত্রু হইল নিপাত——চিরশত্রু—কৈ?—ভীম কভু শত্রুভাবে হেরেনি ত মোরে?—কিন্তু—তবু বুঝিতে না পারি কেন, হেরিলে উহারে, আতঙ্কে কাঁপিত প্রাণ—হ'তো জ্ঞান—যম মম ফিরে বেড়াইয়ে—সে ভয়ের হলো অবসান—কিন্তু—কেন, প্রফুল্ল না হলো প্রাণ—যাই এবে—দিবাকর ঐ চলিলেন অস্তাচলে——

[প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)



[ভীমের প্রতি বিষ প্রয়োগ]

(চারিদিক ত্রস্তভাবে দেখিয়া লতাপাশে বদ্ধ ভীমকে জলে নিক্ষেপ)



জন্মাষ্টমী।

জন্মাষ্টমী।

১

গভীর গভীর, অতীব গভীর বিভাবরী, আঁধার আঁধার চারিধার নিবিড় তমসে;
আকাশের কোলে স্তরে স্তরে স্তরে ছুটে মেঘ; দিগন্ত ঝলিয়া ঘন ঘন বিজলী ঝলসে।
ভাদ্র মাস, অষ্টমীর নিশি, কৃষ্ণপক্ষ তায়,
নীরব নীরব দশদিশি, জগৎ ঘুমায়,
কোলাহল দিবসের বেলা, নিশাকালে স্বপনের খেলা
অনন্ত প্রাণীর প্রাণ মাঝে জাগিল স্বপন,
মানুষ ঘু'মালে স্বপ্ন জাগে, জাগিলে মরণ।
যমুনা তটিনী উলটি পালটি ব'য়ে যায়; ভাদ্রের প্রবল স্রোত ধায়, ভীষণ গর্জ্জন,
যমুনার তটে মথুরা নগরী ঘুমাইছে, যমুনার এ হেন গর্জ্জনে নাহি জাগরণ।

২

কংসের কঠিন কারাগারে, নয়নের ধারে, বসুদেব দেবকী ভাসি'ছে হা হতাশে;
মুখে নাহি কথা, হৃদয়ের নিদারুণ ব্যাথা ঘন ঘন উথলিছে দীঘল নিশ্বাসে।
ব্রহ্মাণ্ডের পিতা নারায়ণ দেবকী উদরে
পুত্ররূপে জনমিয়া কাঁদে ভূমির উপরে;
বদনে অনন্ত জ্যোতি ছোটে, কারার আঁধারে আলো ফোটে,
কারাবাসী পিতা মাতা অবাক হইয়া চেয়ে রয়,
পুত্র পেয়ে আনন্দ অপার, পুন মনে জাগে কংস ভয়।
দেবকীরে বলে বসুদেব,—"দেবি! দেবি! বিষম বিভ্রাট অবিলম্বে হইবে ঘটন,
দরিদ্রের এ অমূল্য নিধি কংস কেড়ে নিয়ে, আছাড়িয়ে শিলাপটে করিবে নিধন!!"

৩

"বড়ই নির্ম্মম কংস, দুরাচার দস্যু ভ্রাতা তব, প্রাণে তা'র দয়া-বিন্দু নাই;
আমাদের চক্ষের উপরে বধিবে প্রাণের শিশু; হায় হায় কোথায় লুকাই!
রহ তুমি কিছুকাল হেথা, প্রাণ-ব্যথা চেপে,
গোকুলে নন্দের গৃহে যাই, খুব চুপে চুপে।"
এতো কহি, কোলে ল'য়ে ছেলে, চুপি চুপি বসুদেব চলে,
বক্ষ ভাসে নয়নের জলে, আগু পাছু চায়,
অর্গলিত কারার দুয়ার দেখে ভয় পায়।
কারাদ্বার খুলিল আপনি, দেখে পিতা পুত্রে ল'য়ে কোলে, ঘুমায় রক্ষকদল,
শ্রীহরি স্মরিয়া পথে চলে, কোলেই মুদিত আঁখি হরি; ডাকে মেঘ, ঝরে বৃষ্টি জল!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

যন্ত্রমাতৃকা।

উপক্রমণিকা।

যন্ত্রমাতৃকা চতুঃষষ্টিকলা শাস্ত্রের একটি। সুতরাং ইহা শিল্প শাস্ত্রের সীমার মধ্যে। "অল্প আয়াসে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ করা" এই শাস্ত্র যথাযথ শিক্ষা করিলেই আয়ত্ত হইয়া থাকে।

এই স্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজনীয় বোধ হইল, শিল্প বা বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু গ্রন্থ পাঠ করিলে হইতে পারে না। শিল্প বিষয়ক যত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, যদি কেহ সেই সমস্ত আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি শিল্প বিষয়ক সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দানে সমর্থ হইবেন সত্য, কিন্তু তিনি যথার্থ শিল্পী হইতে পারিবেন না। যথার্থ শিল্পী হইতে গেলে প্রত্যেক প্রকরণ নিজ হস্তে সম্পন্ন করিয়া (Practically) শিখিতে হইবে। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ রূপ।

বরং বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান কণ্ঠস্থ হইলে কদাচিৎ কাজে আসিতে পারে, কিন্তু শিল্প বিষয়ক কণ্ঠস্থ জ্ঞানে কোন বিশেষ ফল নাই। উহা এক প্রকার শিল্প বিষয়ক বাচালতা (জ্যাঠামি) অভ্যাস করা মাত্র।

তাই বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন, যে শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রত্যুতঃ যে কেহ শিল্প রূপ জীবিকার যে কোন শাখা শিক্ষা করিবেন, তাঁহার সেই বিষয়ক কতকগুলি স্থূল নিয়ম, প্রমাণ ও প্রক্রিয়া (Theoretically) শিক্ষা করা একান্ত উচিত।

যেমন যদি কোন ব্যক্তি চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার, ব্যবহারিক পরিপ্রেক্ষিত (Practical Perspective এর স্থূল নিয়ম, শিল্পীর প্রয়োজনীয় শারীরস্থানবিদ্যা (Artistic Anatomy) ছায়ালোক বিজ্ঞান (Laws of shade and light) প্রভৃতি বিষয়ের অন্ততঃ স্থূল স্থূল বিবরণও অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এই রূপ অন্যান্য বিষয়েও।

কিন্তু আমাদের দেশে যাঁহারা শিল্পরূপ জীবিকা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের অর্দ্ধেকেরও অধিক লোকে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, অথচ শিল্প শিক্ষা বিষয়ক কোন গ্রন্থই অদ্যাপি দেশীয় ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। শিল্পপুষ্পাঞ্জলির উদ্দেশ্য যখন, দেশে শিল্পের উন্নতি সাধন পক্ষে সাধ্যমত চেষ্টা করা, তখন ঐ রূপ বিষয় সকল যে ইহাতে প্রকাশের উপযোগী তাহা নিশ্চয়।

এই জন্য আজ আমরা "যন্ত্রমাতৃকা" শিল্প শাখার স্থূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যন্ত্রমাতৃকা প্রাচীন কালে কি ছিল জানি না, জানিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহাও অনুসন্ধান করা আমার সাধ্যাতীত। যদি থাকে শিল্পপুষ্পাঞ্জলিতে অন্য কোন লেখক সে কার্য্য করিবেন। যন্ত্রমাতৃকা শব্দের ব্যাখ্যা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যে উহা পাশ্চত্য (Mechanics) শব্দেরই পর্য্যায়। সুতরাং এই প্রবন্ধে পাশ্চত্য যন্ত্রমাতৃকা স্থূল রূপে আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

প্রথম অধ্যায়।

আকর্ষণের কেন্দ্র।

আকর্ষণ তত্ত্বই যন্ত্র বিজ্ঞানের মূল। পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে, কি সচেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সকল পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি। পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশই পরমাণু।

প্রত্যেক পরমাণুই পৃথিবীর মধ্য প্রদেশের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

যদিও প্রত্যেক পরমাণু পৃথিবীর মধ্য প্রদেশের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু পরমাণু সমষ্টিজাত কোন পদার্থ পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হইবার সময়, ঐ আকর্ষণ কার্য্য, প্রত্যেক পরমাণু হইতে পৃথক্ রূপে না হইয়া পরমাণু সমষ্টি-জাত ঐ পদার্থের স্থান বিশেষ হইতে হইয়া থাকে।

সেই পদার্থের স্থানটি স্থির করিতে পারিলে, সেই স্থান হইতে সূত্র দিয়া ঝুলাইলে, ঐ পদার্থ কোন দিকে না হেলিয়া স্থির ও সমান ভাবে থাকে।

অনেকে, বাজীকরদের নিকট ও প্রাচীন যাত্রার দলে কপালের উপর দুই তিন বা ততোধিক ঘটি উপর উপর রাখিয়া

চলিয়া বেড়ান, অঙ্গুলির মস্তকে থালা ঘুরান প্রভৃতি দেখিয়া থাকিবেন, তাহাও এই সূত্র অনুসারেই ঘটিয়া থাকে।

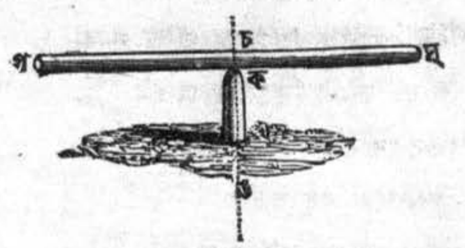
দড়ির উপর চলিয়া যাওয়া প্রভৃতিও এই সূত্র অবগত থাকিবার ফল।

উপরে যে স্থান বিশেষের কথা বলা হইল, ঐ স্থানকে আকর্ষণের কেন্দ্র বলে।

ইংরাজীতে ঐ কেন্দ্রকে (Centre of Gravity, Centre of Inertia) বা (Centre of Parallel Forces) বলে।

যদি কোন ঈষৎ বর্ত্তুলাগ্র খোঁটার উপর একগাছি যষ্টি আড়ভাবে ফেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে ঐ যষ্টি সরাইতে সরাইতে এমন একটি স্থান পাওয়া যাইবে, যে সেই স্থানটি ঐ খোঁটায় রাখিলে ঐ যষ্টি পড়িয়া না গিয়া সরলভাবে থাকিবে। যষ্টির ঐ স্থানটিই উহার কেন্দ্র। (১ম চিত্র দেখ)।

প্রথম চিত্র।

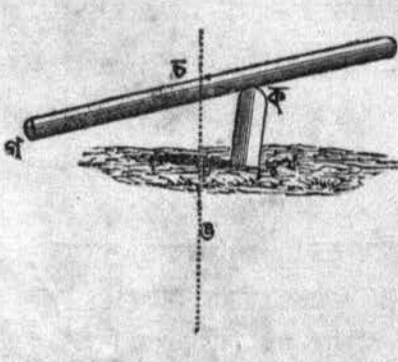


ঐ চিত্রে ক খ একটি বর্ত্তুলাগ্র কীলক (খোঁটা), গ ঘ এক গাছি যষ্টি। ঐ যষ্টির চ নামক স্থান কীলকের ক নামক স্থানে আনিয়া রাখাতে উহা স্থির হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং যষ্টির চ নামক স্থান, যষ্টির আকর্ষণ কেন্দ্র। ঐ স্থানে পৃথিবীর মধ্যস্থ ঙ নামক স্থান হইতে আকর্ষণ প্রযুক্ত হইতেছে, ঐ যষ্টি যেখানেই থাকুক না, পৃথিবীর মধ্য হইতে আকর্ষণ ঐ চ নামক স্থানেই প্রযুক্ত হইবে। যদি ঐ ক খ খোঁটার উপর গ ঘ যষ্টির চ ব্যতীত অন্য স্থান রাখা যায়, তাহা হইলে কখনই সমান থাকে না; কারণ তখন আর পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি কীলকের মধ্য দিয়া যষ্টির চ কেন্দ্রকে আকর্ষণ করে না, আকর্ষণ কীলকের বাহিরে পড়াতে যষ্টি ক্রমে ক্রমে একদিকে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে পড়িয়া যায়। (২য় চিত্র দেখ)।

কোন বস্তু তুলিবার প্রয়োজন হইলে, এই স্থানে বল প্রয়োগ করিতে পারিলে সহজে তোলা যাইতে পারে।

উপরস্থ চিত্রদ্বয়ের চ ঙ রেখার ঙর দিক আকর্ষণের দিক ও ঐ রেখা আকর্ষণসূত্র নামে অভিহিত।

দ্বিতীয় চিত্র।



অবশ্য ঐ আকর্ষণ-সূত্র (এবং সমস্ত আকর্ষণ-সূত্রই) কাল্পনিক সূত্র। তথাপি এই আকর্ষণ সূত্রই জগতের সকল বস্তুর অবস্থিতির প্রধান কারণ।

যতক্ষণ কোন পদার্থের আকর্ষণ সূত্র তাহার আধার ভূমির মধ্যে থাকে, ততক্ষণ সেই পদার্থ হেলিয়া থাকিলেও উল্টাইয়া পড়িবে না। কিন্তু ঐ সূত্র আধার ভূমির বাহিরে গেলেই নিশ্চয় সেই দ্রব্য উল্টাইয়া পড়িবে।

বস্তুর পাদদেশ অর্থাৎ যে সমস্ত অংশ ভূমির উপর সংলগ্ন আছে, তাহার মধ্যে যে অংশ পতিত হয় তাহাই ঐ বস্তুর আধার ভূমি।

একজন ব্যক্তি দুই পদ একত্র করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে সেই পদদ্বয় যতটুকু স্থান ব্যাপিয়া থাকে সেই টুকুই তাহার আধার ভূমি; আবার যদি ঐ ব্যক্তি পদদ্বয় খুব দূরে দূরে রাখে, তাহা হইলে সেই পদদ্বয়ের ব্যবধান স্থান তাহার আধার ভূমি।

এই সূত্র অবলম্বনে, বাজীকর, ব্যায়ামকারী ও সার্কাসওয়ালারা নানা কৌতুক দেখায়।

এই কারণে পাইসা ও বোলোনার হেলা মন্দির আজিও পড়িয়া যায় নাই। ঐ দুইটির প্রথমটি ১৯০ ফুট উচ্চ ও একদিকে প্রায় ১২ ফুট ঝুঁকিয়া আছে, এবং দ্বিতীয়টি প্রায় ১৩৪ ফুট উচ্চ ও ৯ ফুট ঝুঁকিয়া আছে।

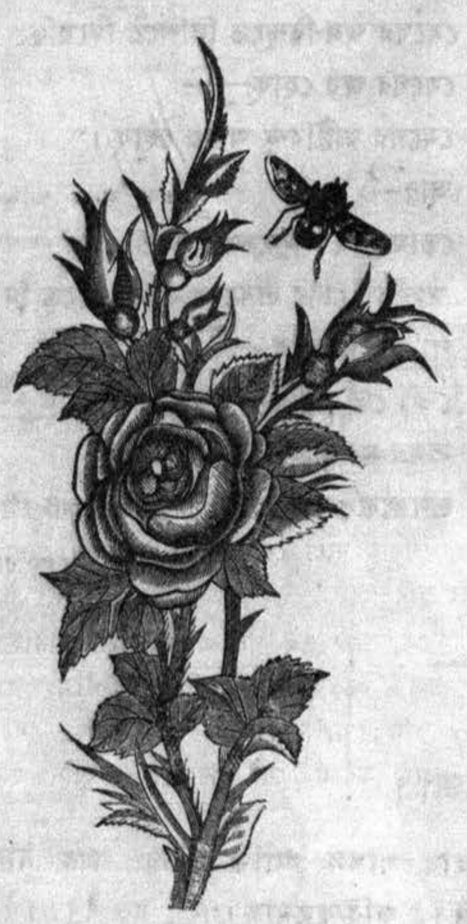
কেন্দ্র, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে। কোন কোন পদার্থের কেন্দ্র পদার্থের মধ্যে না হইয়া স্থানান্তরে হইতে পারে।

এই কেন্দ্রই অধিকাংশ যন্ত্রের জীবন, এই জন্যই এই কথা আগে বলা গেল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামান্য যন্ত্রের বিবরণ করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

বর্ষার গোলাপ।

(পদ্যপংক্তি গদ্য)



১

সাধের ফুল ! ভিজে গেছিস্ ?
তোর নধর অধরে ও কি টল্ টল্ কোচ্চে ?—
সুধা ?—মধু ?
না, ও যে মেঘের জলবিন্দু।
মেঘ কি নিষ্ঠুর, ছি ছি !
সে কা'রই আদর জানে না,
আদরের বদলে কষ্ট দেয়—পীড়ন করে ;
তুই তা'র সাক্ষী।
আহা, বসন্ত সময়ে তো'কে দেখেছি,
এখনও দেখ্ ছি,
কিন্তু সে-তুই আর এ-তুই যেন এক-তুই নয়।

২

ভোঁ ভোঁ ভোঁ !
এ কি ?—কিসের বাঁশী বাজে ?
ও—ভ্রমর যে !
এস, হে কালোমাণিক, এস,
এই গোলাপের সঙ্গে আলাপ কর।
ঐ যা, ভ্রমর ফিরে গেল যে ;
ফির্ বে বই কি,
গোলাপে মধু কই ?
কাজে কাজে রসিক ভ্রমর
ভোঁ ভোঁ কোরে ভোঁ-দৌড় দিলে।
গোলাপ ! মেঘ তোর অতি-বড় শত্রু।

৩

গোলাপ উত্তর দিলে—
"না না, তা'না,
মেঘ আমার অতি-বড় বন্ধু।
ভ্রমর পতঙ্গ বটে,
কিন্তু তোমাদের মত স্বার্থপর মানুষ,
সে উপকার কোত্তে চায় না;
অপকার কোত্তে খুব মজবুৎ।
প্রবঞ্চনা তা'র ব্যবসা,
ভনভনানি তা'র খোসামুদি—মোসাহেবি ;
আমি মরি বা উচ্ছন্ন যাই,

তা'তে ভ্রমরের একক্রান্তি কষ্টও হয় না,
সে কেবল আমার মধু লুট্‌তে আসে,
লুটে পুটে আমায় ফতুর কোরে পালায়;
ছি, এমন ভ্রমরের তুমি আবার প্রশংসা কর।
তা কোর্‌বেই তো——
মানুষ আর ভোম্‌রায় তফাৎ কি? এপিটওপিট!
মানুষ ম'রে ভ্রমর হয়, ভ্রমর ম'রে মানুষ হয়।
কিন্তু, মানুষ, মন দিয়ে শোনো—
মেঘ তোমাদের মত শঠ স্বার্থপর নয়,
মেঘ দয়ার অবতার—মেঘ দেবতা;
মেঘের যে জলবিন্দু
আমার শুষ্ক মুখে টল্ টল্ কোচ্চে,
যে বিন্দুর তুমি নিন্দা কোচ্চো,
সেই বিন্দু—সেই অমৃতবিন্দু মেঘের দয়া;
এই সুধারূপী জলবিন্দু আমার জীবন—
আমার রূপ—আমার গুণ—আমার সর্ব্বস্ব;
দয়াল মেঘের এই দয়া-বিন্দু বা জল-বিন্দু
না পেলে জগতে গোলাপ নাম উঠে যেতো।
এই বিন্দু-বলেই আমি বেঁচে আছি,
তা'ই তা'রই কৃতজ্ঞতা দেখা'বার জন্যে
আমার মধু-বিন্দু
মেঘের জল-বিন্দুতে মিশিয়ে দিয়েছি
মেঘের জয় হোক্——
মেঘের বৃষ্টিবিন্দু অক্ষয় হোক্।
আর—
তোমাদের মানুষের মত
স্বার্থপর চোর ভ্রমরের ডানা ছিঁড়ে যা'ক্—
পা ভেঙে যা'ক্—
ভেঁা ভেঁা ডাকুনি গেঁা গেঁা হোক্—
ভ্রমর মরুক্,
ভ্রমরকে যে ভাল বলে, সেও মরুক্।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কল্পনার খেলা।

কল্পনা এই শব্দটি যাহা বুঝায় তাহা বড় মধুর জিনিষ। কল্পনা যে কি? তাহা বুঝান বড় কঠিন। কিন্তু তাহার ফল যে কত মধুর তাহা সকলেই আস্বাদন করিতে পারেন। কল্পনা মানুষের সহজ গুণ। কিন্তু যে ব্যক্তি কল্পনার খেলায় ভুলিয়া, বাল্য কাল হইতেই তাহাকে চিরসঙ্গিনী করেন, তাঁহাকে তাহার প্রেমে এত উন্মত্ত হইতে হয় যে, লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে করে। তিনি কল্পনার নিকট যে খেলা শিখেন, যদি সময়ে তাহা স্থির চিত্তে সাধারণকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার পাগল খ্যাতি ঘুচিয়া কবি নাম প্রাপ্তি ঘটে। কবি-কল্পনার খেলা বড় মধুর।

কল্পনার প্রিয় সহচর কবি; কিন্তু কবি না হইলে যে কল্পনার সহচর হইতে নাই তাহা নহে; পক্ষান্তরে শিল্পী মাত্রেরই কল্পনার সহচর হইতে চেষ্টা করা উচিত। কল্পনার বলে দ্রব্যের মূল্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়।

শিল্পী কে? যে কোন কিছু সুচারু রূপে সুরুচি সহকারে নির্ম্মাণ করিতে পারে, সেই সুশিল্পী। সুশিল্পী নহিলে শিল্পীর আদর নাই। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, সূত্রধর, কর্ম্মকার, স্থপতি,

কুম্ভকার ও তদ্রূপ অন্য অন্য কর্ম্মকারেরা সকলেই শিল্পী।

শিল্পের গুণে মূল্যহীন বস্তুরও মূল্য হয়। মনে কর সামান্য মৃত্তিকা পল্লিগ্রামে বিনা মূল্যেই মিলে। একজন কুম্ভকার তাহা হইতে কলসী বা বাটি প্রস্তুত করিলেই তাহার মূল্য হইল, তখন আর তাহা বিনা মূল্যে পাইবার সম্ভাবনা নাই, অন্ততঃ একটি কলসীর জন্য একটি পয়সাও মূল্য দিতে হইবে। দ্রব্য ভাল হইলে মূল্যও অধিক দিতে হয়।

কিন্তু আবার কল্পনার খেলা দেখ। ঐ কলসী যদি কল্পনা বলে সজ্জিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ১০।১২ টাকার অপেক্ষা অধিক মূল্যেও বিক্রীত হইতে পারে *। বিলাতে ৫০০ টাকা মূল্যের মৃণ্ময় কলসও বিক্রীত হয় †। অবশ্য ঐসকল বস্তু গৃহসজ্জার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহা নিত্য ব্যবহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হইবার নহে। কিন্তু শিল্প ও কল্পনার বলে মূল্যহীন পদার্থেরও মূল্য হয়, তাহা এই উদাহরণে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

শিল্প ও কল্পনার বলে যখন মূল্য হীন পদার্থ এত বহু মূল্য হইতে পারে, তখন মূল্যবান স্বর্ণ প্রভৃতির মূল্য যে কত বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, যে শিল্পী কল্পনাকে যত অধিক পরিমাণে আপনার আয়ত্ব করিতে পারিয়াছে, তাহার সময়ের মূল্য অন্যের অপেক্ষা তত অনেক অধিক।

কোন শিল্পী যদি কল্পনাকে প্রিয়সঙ্গিনী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ভাল রূপে বুঝিতে হইবে। কি রূপে এই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হয়, তাহা আমরা বারান্তরে বলিব।

দেখা গেল কল্পনার খেলা কি? কল্পনার খেলায় মূল্যহীন পদার্থ কিরূপ বহুমূল্য হয়, তাহাও দেখা গেল। যে শিল্পের বলে এই ফল ফলে সেই "শিল্পের বল" কত? তাহা আগামী বারে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীঃ—

* বোধ হয় সকলেই কলিকাতার বিগত মহামেলায় গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের প্রদর্শিত দ্বিবিধ মৃণ্ময় সকল (Vase) ও একপ্রকার মৃণ্ময় Flask দেখিয়া থাকিবেন। তাহার মূল্য কত তাহাও বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। আর্ট-স্কুলের কথা বলিলাম, কারণ কেহ না মনে করেন, আমাদের দেশে বহুমূল্য কলস হয় না। জয়পুর অঞ্চলের কুঁজা, ফল প্রভৃতির কথাও বলা যাইতে পারে।

† "Take for example, clay as a natural material: * * * in the hands of another it becomes a tazza or a vase, worth five pounds or perhaps fifty."—*C, Dresser. Ph, D, F, L. S. &c. on Principles of Design.*



স্বর্গীয় মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কঠিনা প্রকৃতি শুষ্ক বীজ বিচ্ছিন্নভাবে জগতে প্রক্ষেপ করিলেন। সে বীজ পার্ব্বতীয় বন্ধুর ভূমিতে পড়িয়া অঙ্কুরেই অকালে শুকাইয়া নষ্ট হইল; উত্তপ্ত বালুকাকীর্ণ সুদুস্তর মরুভূমে পড়িয়া ধূলি আকারে মিশিয়া গেল; তরঙ্গমালা-শোভিত অকূল লবণময় সমুদ্র জলে জলীয়বাষ্পে বিলীন হইল; কেহ বা শাণিত প্রান্তভাগ কণ্টকে, কেহ বা প্রজ্জ্বলিত বাড়বানলে জীবন বিসর্জ্জন দিল। কি হইল! তবে কি একটি জীবনও জীবন্ত রহিল না? রহিল! যাহারা আপনার প্রাণ আপনি বাঁচাইতে পারিল, তাহারা রহিল; যাহারা পার্ব্বতীয় কঠিন প্রস্তরে, চূর্ণ বিচূর্ণিত শরীরে, অসীম আয়াসে, আশ্রয় অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিল—আপনার গন্তব্য পথ সজ্জনের নিকট দেখাইয়া লইল, তাহারা রহিল। মহাত্মা কৃষ্ণমোহন এইরূপে রহিয়া গিয়াছেন; আর যতদিন এই জগৎ রহিবে, তাঁহার নামও ততদিন রহিয়া যাইবে।

মহাত্মা কৃষ্ণমোহন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্মিয়াছিলেন। সে কুটীর অন্ধকারে পূর্ণ ছিল; সেখানে বিদ্যার জ্যোতিঃ প্রবেশ করে নাই—জ্ঞানের মনোমদ বিভা বিভাসিত হইতে পারে নাই। শিক্ষার প্রশস্ত পথ চিনিয়া লইবার সেখানে কোন উপায় ছিল না—পথ প্রদর্শকের জন্য কোন সজ্জন পথ প্রদর্শককেও সেখানে দেখা যাইত না। সে কুটীর-বাসী সকলেই অন্ধকারে অন্ধ; সুতরাং কে আর প্রদর্শকের কার্য্য করিবে? অন্ধ কি অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে পারে? কুটীরবাসীগণ কেবল অন্ধ নহেন—তাঁহাদের শীর্ণদেহে আবার কঠিন প্রস্তরের চাপ! সে ভারে তাঁহারা বড়ই ভারাক্রান্ত—উঠিতে নড়িতে পারিতেছেন না—সতত নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন। সে প্রস্তর কি?—দরিদ্রতা। কৃষ্ণমোহনের জীবন এই অন্ধকার গৃহে, এই রূপ দারিদ্র-প্রস্তর চাপনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

অর্থের অভাব; উৎসাহ-দাতার অভাব; বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন উচ্চবংশ পরম্পরার সহিত সম্বন্ধশূন্যতা; সংক্ষেপতঃ মানব-জীবন গঠনের সকল উপসর্গই কৃষ্ণমোহনের অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার উন্নতির গতি রোধ করিতে পারে নাই,—তিনি আপনিই আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবন-বীজ এ সকল উপসর্গকে ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিয়া সেই প্রস্তর চাপনের মধ্য হইতেই আপনার আঙ্কুরিক অবস্থার সম্প্রসারণ করিয়াছিল; সকল বিঘ্ন বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া, পথের কণ্টক দূরে ফেলিয়া, সে ক্ষুদ্র অঙ্কুর কালে ফলচ্ছায়াসমন্বিত বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল; আতপ-তাপিত ব্যক্তিকে ছায়াদানে, ক্ষুধিত জীবনকে ফলমূল দানে সে আপনার জনম-জীবন সার্থক করিয়াছিল।

কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক বিবরণ অতি শোচনীয়। তাঁহার পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায় রাঢ়িশ্রেণীস্থ দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। কুলীন ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ সে সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনেই জীবন-যাপন করিতেন। বিবাহ তাঁহাদের ব্যবসা ছিল; প্রধানতঃ তাঁহারা শৈশবেই বিবাহিত হইয়া শ্বশুরের গলগ্রহ হইতেন। জীবনকৃষ্ণের জীবনও বল্লালী সময় হইতে প্রচারিত এই সকল বিধিবদ্ধ নিয়মের হস্ত হইতে অব্যাহিত পায় নাই। জীবনকৃষ্ণের জন্মভূমি ২৪পরগণার অন্তঃপাতী, মহকুমা বারুইপুরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণবর্ত্তী নবগ্রাম। কিন্তু কুল-ক্রমাগত বিধিক্রমে জীবনকৃষ্ণের ভাগ্যে অধিক দিন জন্মভূমিতে বাস ঘটিয়া উঠে নাই; অতি শৈশবেই বিবাহিত হইয়া তাঁহাকে জন্মভূমি নবগ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

কলিকাতায় জীবনকৃষ্ণের শ্বশুরালয়। তাঁহার শ্বশুরের নাম রামজয় বিদ্যাভূষণ (চট্টোপাধ্যায়)। রামজয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তাঁহার পরিণীতা পত্নী। ঠনঠনিয়ার অন্তর্গত বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে রামজয় বিদ্যাভূষণের বাসস্থান ছিল। নবগ্রামবাসী জীবনকৃষ্ণকেও বাল্যকাল হইতেই এই বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটবাসী হইতে হয়। তিনি পিতৃপোষ্যের পরিবর্ত্তে বাল্যকাল হইতেই শ্বশুরের পোষ্য হইয়াছিলেন; আত্ম-স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে কৌমারেই প্রবাসিত্ব এবং পরান্ন-ভোজিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামজয় বিদ্যাভূষণ বিশেষ ধনশালী ছিলেন না। তিনি সাধারণ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বীয় যজমানী ব্যবসা হইতে একরূপ দুঃখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালে দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা ছিল না;

তখন সামান্য আয়েই সাধারণ গৃহস্থের সংসার একরূপে চলিয়া যাইত। বিশেষতঃ তাৎকালিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সামাজিক বিদায় ইত্যাদিতেও কিছু কিছু প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং সে সময়ে তাঁহাদের সংসার চালাইতে বর্ত্তমানের ন্যায় বিশেষ কষ্ট হইত না। রামজয় বিদ্যাভূষণ যোড়াসাঁকোর তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ধনী শান্তিরাম সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন—তাহাতেও তাঁহার কিঞ্চিৎ আয় ছিল। এইরূপ নানা উপায়ে বিজ্ঞ রামজয়ের বিস্তৃত সংসার কোনরূপে চলিয়া যাইত।

পৃথিবী নিয়ত স্বীয় কক্ষোপরি কেন পরিভ্রমণ করিতেছেন? ভ্রান্ত মানব! তাঁহার এরূপ ঘূর্ণনের অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিতে পারিয়াছ কি? উন্নতোন্মুখ শিক্ষিত যুবক! তুমি হয় তো বলিয়া বসিবে "এ কি আবার নূতন প্রশ্ন? বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়, তাহা তোমায় এ প্রশ্ন তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিবে।" কিন্তু আমি বলি, তাহা নহে। এ ঘূর্ণন জীব জগতের উপর আপনার সম্পূর্ণ প্রতিপত্তি চালাইতেছে। এ ঘূর্ণনে ধনী দরিদ্র হইতেছে; এ ঘূর্ণন দরিদ্রকে ধনবান করিতেছে। এ ঘূর্ণনের মূল সত্য,—জীব জগতের পরিবর্ত্তন; এ ঘূর্ণনের মূল সূত্র,—সংসারে বিভ্রাট আনয়ন। এই ঘূর্ণন জীবনকৃষ্ণের জীবনে বিভ্রাট আনয়ন করিল। তিনি স্বয়ং পরাশ্রয়ী ও পরান্নভোজী; কিন্তু বিচিত্রময়ী পৃথিবীর এই বিচিত্র ঘূর্ণনে আবার তাঁহাতেও জীব আশ্রয় লইতে লাগিল; শ্বশুরালয়ে কিছু দিন বাস করিতে করিতে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহারও সন্তান সন্ততি জন্মিল। ক্রমে রামজয়ের গৃহে, শ্রীমতীর গর্ব্ভে জীবনকৃষ্ণের তিনটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। তাঁহার পুত্র তিনটির মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; মধ্যম আমাদের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; এবং কনিষ্ঠের নাম কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কন্যা দুইটির মধ্যে একটির অতি শৈশবে মৃত্যু হয় এবং অপরটি শিবনারায়ণ দাসের গলিনিবাসী হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরিণীতা হন। অধুনা তাঁহার গর্ব্ভজাত পুত্র শ্রীযুক্ত মন্নলাল চট্টোপাধ্যায় বিচার বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

এইবার রামজয় বড় বিপদে পড়িলেন। দিনের পরিবর্ত্তনে দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; দৌহিত্র পৌত্রাদিতে সংসার পরিবারপূর্ণ হইয়া আসিল; কিন্তু তাঁহার আর আয় বাড়িল না—সংসার চালান কষ্টকর হইয়া উঠিল। অগত্যা তিনি পরিবারসংখ্যার ন্যূনতা কল্পে চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার জামাতা প্রভৃতি পোষ্যবর্গকে কৌশলে স্থানান্তরিত করিতে লাগিলেন।

এই কৌশলে জীবনকৃষ্ণকেও শ্বশুরালয় ত্যাগ করিতে হইল। এত দিন তিনি শ্বশুরের স্কন্ধে সংসার-ভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন হইতে তাঁহার মস্তকে সাংসারিক গুরুভার পতিত হইল। রামজয় তাঁহাকে ঠনঠনিয়াপল্লীস্থ গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটে একটু সামান্য ভূমিদান করিলেন এবং তাহাতে তাঁহাদের বাসোপযোগী ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। অগত্যা জীবনকৃষ্ণকে রামজয়-ভবন ত্যাগ করিয়া ঐ নূতন বাটীতে বাস করিতে হইল। পরদুঃখকাতর সহৃদয় পাঠক পাঠিকে! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "নূতন বাটীতে আসিয়া জীবনকৃষ্ণের পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ কিরূপে চলিতে লাগিল?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রধানতঃ জীবনকৃষ্ণের সাংসারিক আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হয়; তাঁহার কুলোচিত ভিক্ষাবৃত্তি, শ্বশুর প্রদত্ত সাহায্য এবং শারীরিক পরিশ্রম। ফলতঃ জীবনকৃষ্ণের সংসার এই তিন উপায়ে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা পতিপত্নী অর্দ্ধাহারে, কখনও বা অনাহারে থাকিয়া অতি কষ্টে সন্তান কয়েকটিকে পালন করিতে লাগিলেন। এই সন্তান কয়েকটিই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ভরসা—অন্ধের একমাত্র অবলম্ব্য যষ্টি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে ভারত হইতে মুসলমানগণের প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইল; বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকাল জ্বলিয়াই মহারাষ্ট্র-জ্যোতিঃ নিভিয়া গেল; আর ইন্ধনাবৃত ধূমপূর্ণ তুষাগ্নির ন্যায় ব্রিটিশ-বীর্য্য দিগন্ত প্রসারিত হইল। ক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর কৈশোর যাইল, কৌমার কাল আসিল; ভারতে ব্রিটিশ-প্রতাপও পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিতে লাগিল। এই সময়ে বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে, রামজয়ের গৃহে মহাত্মা কৃষ্ণমোহন জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের (১২২১ সালের) বৈশাখ মাসে তাঁহার জন্ম হয়। এই ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা মহাত্মা লর্ড মিণ্টো ভারত ত্যাগ করেন; এই সময় আমাদের মহারাজা তৃতীয় জার্জ্জ, নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সহিত উপদ্বীপিক যুদ্ধে (Peninsular War-এ) লিপ্ত ছিলেন; এই সময়ে এই উপদ্বীপিক যুদ্ধ লইয়া সমগ্র ইউরোপে তুমুল হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল; এই খৃষ্টাব্দেই কালের বিচিত্র গতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মহাত্মা নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বলিয়াছিলেন দুই দিন পূর্ব্বে যে ইউরোপ আমার সহকারী বন্ধু ছিল, আজ কালের কুটিল গতিতে সেই

ইউরোপ আমার বিপক্ষে শক্রত্ব গ্রহণ করিয়াছে।" কালের এই অশান্তিপূর্ণ পরিচ্ছেদে—ইতিহাসের এই বিচিত্রময় অধ্যায়ে ভারত মাতা একটি রত্ন লাভ করিয়া ক্ষণকালের জন্য শান্তিসুখে সুখী হইয়াছিলেন। সে রত্ন—এই কৃষ্ণমোহন।

কৃষ্ণমোহনের বাল্যজীবন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—সে জীবনের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। তবে আমরা অনুসন্ধানে যতদূর প্রাপ্ত হইয়াছি, পাঠকগণকে তাহাই জানাইয়া পরিতৃপ্ত হইব। এই সময়ে ডেভিড হেয়ার নামক একজন সহৃদয় ইংরাজ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তাঁহার জীবন ভারতবাসীর উন্নতি কামনায় সতত নিয়োজিত ছিল। তিনি ভারত-সন্তানগণকে উন্নত করিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে আপনাকে সতত ব্যাপ্ত রাখিয়াছিলেন। ভারতে শিক্ষাবিস্তারের সাহায্যকল্পে প্রণোদিত হইয়া তিনি কলিকাতায় অনেকগুলি পাঠশালা ও বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সকল পাঠশালা এবং বিদ্যালয়ে দীন দরিদ্রের সন্তানগণকে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের নিয়ম ছিল। তাঁহার সংস্থাপিত পাঠশালার মধ্যে ঠনঠনিয়াস্থ কালিতলার পাঠশালাটি অন্যতম। দরিদ্র-সন্তান কৃষ্ণমোহন ছয়বর্ষ বয়সে যথাবিধি হাতে খড়ি দিয়া হেয়ার সাহেবের স্থাপিত এই পাঠশালায় প্রথম প্রবেশ করেন। তাঁহার জননী শ্রীমতী সমধিক বুদ্ধিমতী ছিলেন; তাঁহারই যত্নে কোনরূপে কৃষ্ণমোহনের পাঠশালার পাঠ চলিতে লাগিল।

পতিতপ্রায় বৃক্ষ অবলম্বন পাইয়াছে! আর তাহার উন্নতির গতি কে রোধ করিবে? দিন দিন কৃষ্ণমোহনের হৃদয় বিদ্যার জ্যোতিতে পূর্ণ হইতে লাগিল; "বিদ্যাহি পরমং ধনং" দিন দিন এই অমৃত-নিঃসারিণী নীতি তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আসিল; তাঁহার হৃদ্বেগ দিন দিন এই নীতির অনুসরণে প্রবলবেগে প্রধাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে, তিন চারি বর্ষের মধ্যে তাঁহার পাঠশালার পাঠ সমাপন হইল; পাঠশালার পরীক্ষায় তিনি প্রধানতম ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে (১২৩০ সালে) কৃষ্ণমোহন দশম বর্ষে পদার্পণ করেন। এই সময় তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়; তিনি পাঠশালা ত্যাগ করিয়া হেয়ার সাহেবের স্থাপিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। আর এই বর্ষে কৃষ্ণমোহনের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা এই যে, তাঁহার বিদ্যানুশীলনের যত্ন এবং একাগ্রতায় মুগ্ধ হইয়া "কলিকাতা স্কুল সোসাইটি" তাঁহার পাঠব্যয় আপন স্কন্ধে বহন করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষ্ণমোহন ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশের এবং কলিকাতা স্কুল সোসাইটি হইতে সাহায্য প্রাপ্তির এই অব্দ ভারত ইতিহাসে আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড আমহার্ষ্ট মহোদয়ের ভারতাগমন অব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অব্দ হইতে কৃষ্ণমোহনের যশজ্যোতিঃ ক্ষীণাকারে প্রকাশ পাইতে থাকে; এই অব্দ হইতে তিনি শিক্ষিতমণ্ডলীর প্রিয়পাত্র মধ্যে গণ্য হইতে থাকেন; তাঁহার বিদ্যানুরাগীতা ও সচ্চরিত্রতা এই সময় হইতে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে।

এক বর্ষকাল ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের (১২৩১ সালের) ফেব্রুয়ারি মাসে, একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে কৃষ্ণমোহন "হিন্দু কালেজে" প্রবিষ্ট হইলেন। এখানেও তাঁহার বেতন লাগিত না। তিনি আপনার একান্ত যত্ন এবং অধ্যবসায়ে, সাধারণ ছাত্রের অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে উন্নত বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, হিন্দু-কালেজের অবৈতনিক ছাত্র হইয়াছিলেন। শিক্ষার একান্ত চেষ্টা এবং অনুরাগ থাকিলে, এইরূপেই অবলম্বন যুটিয়া যায়।

যাহা হউক, এ সময়ে জীবনকৃষ্ণের সাংসারিক অবস্থা কিরূপ? কিরূপেই বা তাঁহার সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণ নির্ব্বাহিত হইতেছে? এ সময়েও জীবনকৃষ্ণের সাংসারিক অবস্থা পূর্ব্ববৎ শোচনীয়। বলিতে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে যে, এ সময়েও এক মুষ্টি অন্নের জন্য কৃষ্ণমোহনের জননীকে নীচলোকের ন্যায় চরকায় সূতা কাটিতে হইত—যজ্ঞোপবিত বিক্রয় করিতে হইত। আর বলিব কি! পোড়া পেটের দায়ে সামান্য অসভ্যজনোচিত পরিশ্রমে, প্রচলিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবনকৃষ্ণ সতত অর্থের চেষ্টায় ফিরিতেন। তাঁহাদের জীবন কেবল যেন জগতে কাঁদিতে আসিয়াছিল, তাই তাঁহারা সতত পুত্রাদির আহারের ভাবনা ভাবিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবন কাটাইতেন। ক্রন্দনই দরিদ্রের অসময়ের সম্বল। কৃষ্ণমোহনের দরিদ্র পিতা মাতাকেও সতত এই ক্রন্দন সম্বলে থাকিতে হইয়াছিল।

এত কষ্টে পড়িয়াও কিন্তু একদিনের জন্যও কৃষ্ণমোহনের মতি বিচলিত হয় নাই। বিদ্যার প্রতি তাঁহার সেই দৃঢ় অনুরাগ, সেই একান্ত অধ্যবসায় এত কষ্টে পড়িয়াও অটুট ছিল। তাঁহার এই বিদ্যানুরাগের, বিপুল অধ্যবসায়ের যে সকল দৃষ্টান্ত জগতে রহিয়া গিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। ভ্রান্ত-জীবন! যদি একবার এই সকল স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত হৃদয়ে স্থান দেও, তবে তোমার সকল ভ্রম দূরে যাইবে; তোমার

পক্ষে সকল দ্রব্যই অনায়াস-লব্ধ বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। কৃষ্ণমোহনের পিতা মাতা সতত অন্নের চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন; সুতরাং স্কুলের সময়ে অন্ন পাওয়া কৃষ্ণমোহনের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইত। কিন্তু প্রথমতঃ কৃষ্ণমোহন সে কষ্ট গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি অৰ্দ্ধেক দিন অনাহারেই বিদ্যালয়ে চলিয়া যাইতেন। ক্রমে তাঁহার এ অনাহার-কষ্ট প্রবল হইল—তাহা শারীরিক ও মানসিক অবস্থার হানিকর হইয়া উঠিল। কৃষ্ণমোহন আর এ কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেন না; দেখিলেন, এরূপ ভাবে চলিলে শীঘ্রই তাঁহার দেহ জরাগ্রস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সুতরাং তিনি এই সময় হইতে জীবন-রক্ষা এবং বিদ্যাশিক্ষা এই উভয়ের উপযোগী এক প্রশস্ত পথ অবলম্বন করিলেন। স্কুল হইতে আসিয়া বৈকালে এবং রাত্রি প্রায় দুই প্রহর, আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি একচিত্তে আপনার পাঠাভ্যাসে রত থাকিতেন। এ সময়ের মধ্যে কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা বা আলাপ পরিচয় পর্য্যন্তও করিতেন না। এমন কি! এ সম্বন্ধে কোন দুষ্ট লোক যদি তাঁহাকে কোনরূপ বিদ্রূপ করিত, তাহা হইলে তিনি অন্তর খুলিয়া উত্তর দিতেন "দিন পাইলে লোকের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিব। এখন বিদ্যাশিক্ষাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া তুচ্ছ আমোদ আমার কাজ কি? বিজ্ঞ লোকে এরূপ আমোদও বিদ্রূপ করিবে যে!"

দশ ঘটিকার পর হইতে কৃষ্ণমোহন বিদ্যালয়ে থাকিতেন; বৈকাল ও রাত্রি তাঁহার পাঠাভ্যাসে অতিবাহিত হইত। কিন্তু প্রাতঃকালে কৃষ্ণমোহনকে সংসারের একটি কঠোর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। সে কার্য্য কি? পোড়া লেখনীকে এ কথাও সাধারণে প্রচার করিতে হইবে? এ কথা যে বড় মর্ম্মভেদী! এ কথা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু না বলিলে যে কর্ত্তব্য রক্ষা হইবে না! বলিব বটে; কিন্তু লোকের কি একথা স্মরণ থাকিবে? লোকে যদি একথা স্মরণ রাখিতে পারে, তবে এ কথায় জগতের বিশেষ উপকার দর্শিবে—এ কথায় লোকে মহত্ত্ব ও দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। কৃষ্ণমোহন শয্যা ত্যাগ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন, তৎপরে রন্ধন গৃহাদি পরিষ্কার করণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। ইহার পর স্নান করিয়াই তাঁহাকে রন্ধনশালায় রন্ধন কার্য্যে ব্রতী হইতে হইত। তাঁহার পিতা মাতা সতত অন্নের ভাবনাতেই ব্যস্ত; প্রাতঃকালিক রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে তাঁহাদের সে অন্ন-সংস্থানে ব্যাঘাত পড়িত। সুতরাং কৃষ্ণমোহন আর এ কার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য লইতেন না। আপনিই যাহা পারিতেন, তাহাই যথেষ্ট বোধ করিতেন।

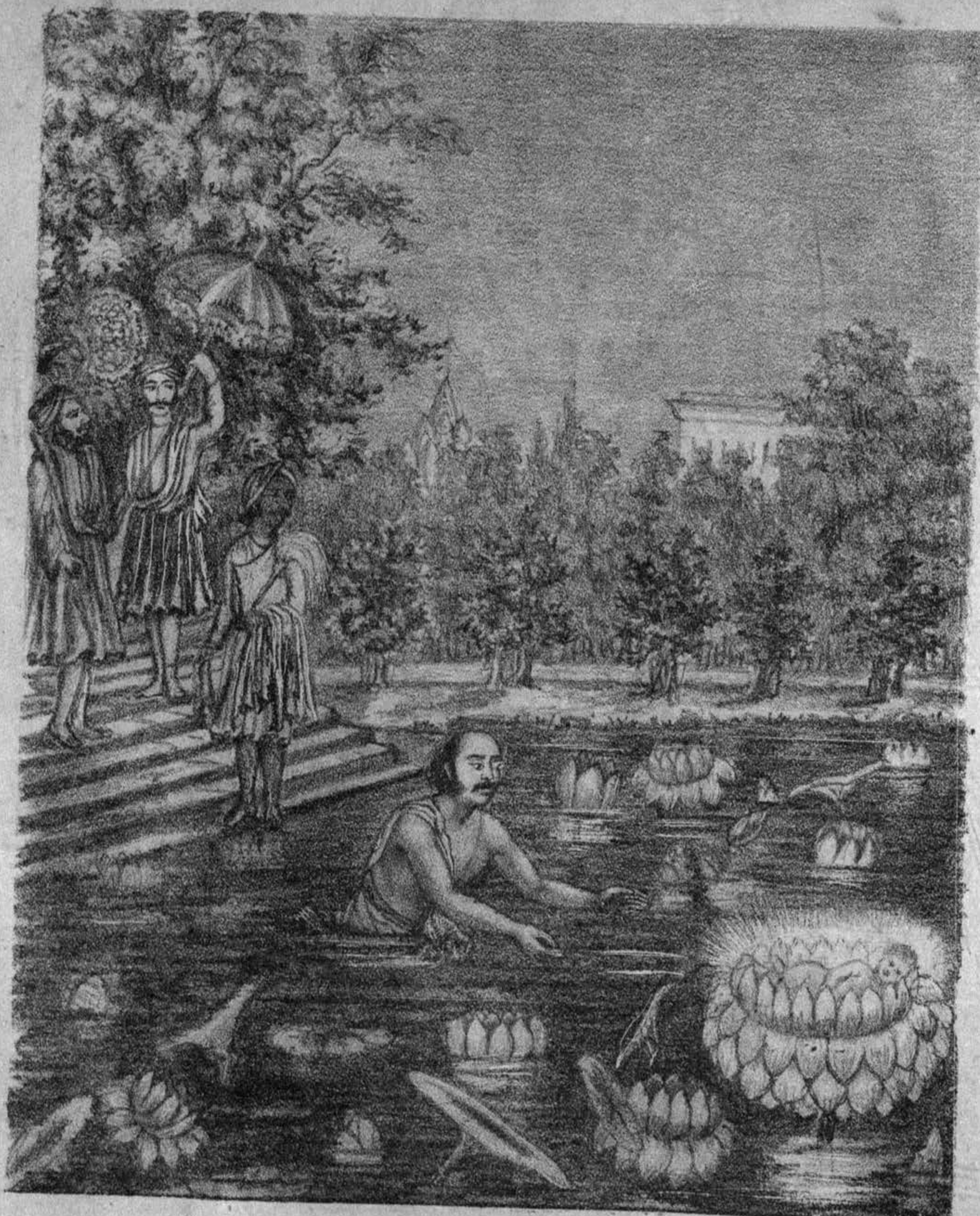
এ রন্ধন কার্য্য ব্যতীতও কৃষ্ণমোহনের প্রাতঃকালে আর একটি কার্য্য ছিল—সেটি তাঁহার মাতুলালয়ে বিগ্রহ পূজা। রন্ধন-কার্য্যের পূর্ব্বে, স্নান করিয়াই তিনি রামজয় বিদ্যাভূষণের বাটিতে নারায়ণ পূজা করিতে যাইতেন। ইহাতেও তাঁহার কিঞ্চিৎ লাভ ছিল; নৈবেদ্য পূজোপকরণ তণ্ডুলাদি প্রাপ্ত হওয়ায়, ইহাতে প্রায়ই তাঁহার প্রাতঃকালিক অন্নের সংস্থান হইয়া যাইত।

কৃষ্ণমোহন কেবলই যে, প্রাতঃকালে এই রূপ গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহাও নহে। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এ সময়েও তিনি আপনার পাঠাভ্যাস ত্যাগ করিতেন না। রন্ধন সময়েও তিনি আপনার পাঠ্য পুস্তক সকল নিকটে লইতেন—রন্ধন কার্য্য করিতে করিতেও, এক একবার অবসর ক্রমে আপনার পুস্তক পাঠ করিতেন। বিদ্যাব প্রতি এরূপ অনুরাগ অতি অল্পলোকেরই দেখা গিয়া থাকে। যাঁহাদের দেখা যায়, তাঁহারাই এ জগতে মহৎ নামের বাচ্য।

প্রথম ব্রহ্ম-বিগ্রহের (First Burmise War-এর) অবসান হইল; ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ভারতশাসক মহাত্মা আমহার্ষ্ট ভারত ত্যাগ করিলেন; পতিত ভারত মহাত্মা বেণ্টিকের শুভাগমন সম্ভাষণ করিয়া লইল। এই অব্দে কৃষ্ণমোহনের জীবনে একাধারে হর্ষ বিষাদের উদয় হইয়াছিল; একপক্ষে এই অব্দে যেমন তাঁহার শোক দুঃখের অবধি ছিল না, অন্য পক্ষে এই অব্দে আবার তাঁহার হৃদয় আনন্দোৎসাহে উৎফুল্ল হইয়াছিল। এই কাল খৃষ্টাব্দে দরিদ্রাবস্থাতেই, দরিদ্রতার কঠোর পীড়নে, তাঁহার দরিদ্র পিতার জীবন বায়ুর অবসান হইয়াছিল;—উন্নতোমুখ যুবকপুত্রের সম্মুখে "আর কষ্ট সহ্য হয় না" বলিয়া এই অব্দে জীবনকৃষ্ণ জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহনের এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে? এ শোক তাঁহার কি ভয়ঙ্কর মর্ম্মস্পর্শী! আর এ অব্দে তাঁহার আনন্দের কারণ;—তিনি হিন্দুকালেজের পরীক্ষায় সর্ব্বোন্নত ছাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন; বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রবৃত্তি এ অব্দে তাঁহারই ভাগ্যে ঘটিয়াছিল; এই অব্দ হইতে তাঁহার যশোভাতি প্রশস্ত আকারে সাধারণে প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।



রাধাষ্টমী।

রাধাষ্টমী।

১

শরতের সপ্তমী-রজনী প্রভাত হইল ধীরে ধীরে;
সপ্তমীর সপ্ত-কল-শশী নাহি প্রাতে আকাশ-শরীরে।
অষ্টমীর অধিকার, মঙ্গল প্রভাত, উষার ধূসর আভা পূরবে বিভাত;
সুদূর আকাশে নব রবি, নীলিমায় লোহিতের ছবি,
ভাঙা মেঘ ভেসে যায় নীল-লাল-নীরে।
আগে আগে উষা দেবী যায়, ফিরে চায় ডাকিয়া রবিরে;
পাছে পাছে চলে দিবাকর, মাণিক-মুকুটখানি শিরে।

২

নিশির শিশির-মাখা পাখী, শাখি-শাখে থাকি' পাখা ঝাড়ে;
গুঁড়া গুঁড়া শিশিরের কণা ঝুরু ঝুরু ছিটাইয়া পড়ে।
ফোটা ফুলে টলমলে শিশিরের ফোঁটা, শিশিরের ভারে ফুল অবনত বোঁটা;
সুধায় মিশেছে হিম-জল, আকুল তৃষিত অলিদল
আশায় হতাশ হ'য়ে ফুল-পাশে ওড়ে।
মনোহরা ব্রজপুরী মাঝে বড় বড় প্রাসাদের চূড়
প্রভাত-ভানুর নব কর নভ হ'তে গড়াইয়া পড়ে।

৩

ব্রজমাঝে সাজে চারু সাজে বৃষভানু রাজার উদ্যান;
মনোহর সরোবর কিবা, জল-বিভা স্ফটিক সমান।
প্রফুল্ল কমল দল—শোভার আধার——সরসী উরসে ভাসে, অচল সাঁতার;
ছোট বড় পদ্ম-পাতা-সারি ছেয়ে দেছে সরোবর-বারি,
মরকত-চক্র যেন জলে ভাসমান।
সেই সরসীর শীত জলে করিবারে প্রাভাতিক স্নান
উপনীত হইলেন আসি' বৃষভানু রাজা পুণ্যবান্।

৪

সোপান বাহিয়া মহারাজ নামিলেন সরোবর-জলে,
শরীরার্দ্ধ উপরে জাগিল, শরীরার্দ্ধ সরোবর-তলে।

ডুব দিলা মহারাজ 'হরি হরি' বলি,' ডুবি' জল-তলে হেরে জ্বলন্ত বিজলী;
মধুর মঙ্গল বাদ্য বাজে, হুলুধ্বনি রমণী-সমাজে,
জলদেবীগণ কত নাচে তালে তালে।
উজ্জ্বল জলের মাঝে রাজা হেরিলেন নয়ন-কমলে
জ্যোতির্ম্ময় শতদল-কোলে জ্যোতির্ম্ময়ী শিশুবালা দোলে।

৫

বিস্ময়ে চমকি' বৃষভানু, জলতল ছাড়ি' অচিরায়
মগ্ন মুখ তুলিয়া উপরে, কি ভাবিয়া চারি ধারে চায়।
জ্যোতির্ম্ময় শতদলে জলের ভিতরি হেরেছিলা যে বালারে, সেই জলোপরি
বিশাল প্রফুল্ল শতদলে ঘুমাইয়া ধীরে টলমলে,
প্রফুল্ল কমলে ফুল্ল কমল লুটায়।
স্নেহ মাখা বদন কমলে জ্যোতিচ্ছটা ঝকমকি' ধায়,
শূন্যে মেঘ আরোহণে, সুর ঋষি ফুল বরিষায়।

৬

প্রাণভরা কন্যা-স্নেহ-ধারা জাগি' উঠে বৃষভানু-প্রাণে,
"এই কন্যা হরিপ্রিয়া রাধা" দৈববাণী শোনে রাজা কাণে।
"মা আমার! মা আমার! আয় কোলে আয়!" এই বলি' কন্যা তোলে বৃষভানু রায়;
অযোনিজা আদ্যাশক্তি রমা, শ্রীহরির প্রেমের মহিমা
শিখাইতে ভক্তগণে আইলা ভুবনে।
আনন্দ-বিভোর বৃষভানু, পূর্ণ স্নেহে চেয়ে মুখপানে
কোলে ল'য়ে প্রাণের কুমারী, চলে ত্বরা রাণী-সন্নিধানে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

গন্ধযুক্তি—গন্ধতৈল।

(প্রাপ্ত পত্র।)

সম্পাদক মহাশয়,

আপনার প্রথম সংখ্যক শিল্পপুষ্পাঞ্জলিতে 'সাবান' নামক প্রবন্ধে 'গৃহ ব্যবহার্য্য অল্প পরিমাণ সাবান প্রস্তুত প্রক্রিয়া' প্রকাশিত হইতেছে, উহার শেষ অংশ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইলেই, ঐ প্রক্রিয়ায় কিরূপ সাবান প্রস্তুত হয়, পরীক্ষা করিব মনে করিয়াছি। বোধ হয় আপনারা ঐ প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কারণ এরূপ বিষয় পরীক্ষা না করিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত নয় *।

আপনার পত্রে শিল্পের যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার পত্রে প্রকাশিত হইতে পারে না এমন বিষয় ত খুঁজিয়া পাইলাম না। যাহা হউক আপনার শিল্প-সীমার মধ্যগত কোন বিষয়ের একটি অংশ আমার বিশেষ পরীক্ষিত আছে, তাহাই অদ্য লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম, আপনার পত্রের এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

'গন্ধযুক্তি' যদি গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করণ প্রক্রিয়াকে বলে, তাহা হইলে গন্ধ তৈল প্রস্তুত করণ প্রক্রিয়াও উহার অন্তর্ভুক্ত।

আমি বাল্যকাল হইতে গন্ধ তৈল মাখিতে বড় ভাল বাসি। যখন আমি বস্তুবিচার পড়ি, তখন ফুলল তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক তিল ও গোলাপ ফুল নষ্ট করিয়াছিলাম। তৈল পাইতাম বটে, কিন্তু যেমন খরচ হইত তেমন তৈল পাইতাম না। কিছু দিন গত হইল, শিল্পশিক্ষা নামক পুস্তকে অস্মদ্দেশীয় ফুলল তৈল নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, এক্ষণে নিজের ব্যবহারের জন্য অতি উৎকৃষ্ট গোলাপী ফুলল তৈল প্রস্তুত করিতেছি। সকলেই চেষ্টা করিলে ঐ রূপ করিতে পারেন।

প্রথমতঃ আমি ঐ পুস্তকে কাষ্ঠের ফ্রেমের কথা পড়িয়া উহা কিরূপ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া দুইখান পরিষ্কার তক্তা দ্বারা চাপ দিতাম, কিন্তু তাহাতে অনেক তৈল নষ্ট হওয়ায়, এখন যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি তাহাই বর্ণন করিব।

আমি কেবল গোলাপ ফুলেরই তৈল প্রস্তুত করি। এজন্য আমি একটি গোলাপ ফুলের বাগান করিয়াছি, গোলাপ গুলির ব্যাস প্রায় ৬।৭ অঙ্গুলি হয় ও অতি সুগন্ধ। গোলাপের সময়ে প্রতিদিন অপরাহ্ণে প্রস্ফুটিত গোলাপ গুলি তুলিয়া লই। দুইটি টিনের বাক্সের খোলের মত করিয়াছি। তাহার প্রত্যেকটির তলার পার্শ্বদেশে এক একটি সরু নল আছে।

গোলাপ তুলিয়া তাহার পাতাগুলি খুলিয়া ও ভাল করিয়া বাছিয়া একটি চাঙ্গারিতে করিয়া লই। পরে, ঐ ফুলের পাতা বা পাপ্ড়ি সেই বাক্সর তলে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ করিয়া সাজাইয়া তাহার উপর তিল তৈল ঢালিয়া দিই। পাতাগুলি তৈলে উত্তম রূপে সিক্ত হইলে আবার পাতা দিই; দিয়া সে গুলিতেও ঐ রূপে তৈল দিই, এই রূপে সব পাতা গুলি বিছান হইলে, তাহার উপর একখানি টিনের পাত চাপ দিয়া রাখি। অবশ্য নলটায় ছিপি দেওয়া থাকে। ঐ পাতাগুলি সে রাত্রি ও তৎপর দিন ঐ রূপ থাকে।

তৎপর দিন অপরাহ্ণকালে আবার ফুল তুলিয়া অপর বাক্সটিতে ঐ রূপে সাজাইয়া এবং পূর্ব্বদিনের বাক্সের টিনের পাতের উপর ঐ পাতের পরিমাণ একখানি কাষ্ঠের চৌকা বুক রাখিয়া উহা একটি কপি প্রেশের (Copy press) ভিতর দিয়া নলের ছিপি খুলিয়া একটি কাচের বাটি পাতিয়া প্রেশ কসিতে আরম্ভ করি। যথা সম্ভব কসা হইলে তৈলটা একটা পরিষ্কৃত বোতলে রাখিয়া প্রেশটা ঈষৎ হেলাইয়া বাটিটা পুনরায় নলের নীচে পাতিয়া রাখি। ইহাতে তৎপর-দিন আরও খানিকটা তৈল পাওয়া যায়, তখন প্রেশটা আন্দাজ সিকি প্যাঁচ কসিয়া দিই (আর কসা যায় না) এবং তৈলের কতকটা সে দিনের ব্যবহারার্থ লইয়া বাকি বোতলে ঢালিয়া রাখি ও বাটী পুনরায় পাতিয়া রাখি, অপরাহ্ণে পূর্ব্বদিনের কসা বাক্স বাহির করিয়া অপর বাক্স কসি ও পূর্ব্ব দিনের বাক্স সাফ করিয়া আবার পাতা সাজাই। এই প্রক্রিয়ায় গত বৎসর আমি অনেক তৈল প্রস্তুত করিয়াছিলাম, আজিও ব্যবহার করিতেছি, নষ্ট হয় নাই, দিব্য গন্ধ, একদিন স্নান করিবার কালে মাখিলে পরদিন স্নানের সময় পর্য্যন্ত গন্ধ প্রায় সমান থাকে। আমি যে শয্যায় শয়ন করি

---

* প্রবন্ধ লেখক সাবানের বিষয় পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন কিনা বলিতে পারিলাম না।—(সম্পাদক)

তাহাতেও গোলাপের গন্ধ পাই। আজও তৈল নষ্ট হয় নাই, পরে হইবে কিনা জানি না। অনেকে আমাকে এইরূপ তৈল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ের পরামর্শ দিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে বিক্রয় করিয়া দেখিব কি রূপ সুবিধা হয়।

আমি তৈল বাহির করিবার জন্য যে সকল সরঞ্জম ব্যবহার করি, তাহা সকলেই বুঝিয়াছেন, তবু যদি আমি আঁকিতে জানিতাম তাহা হইলে আঁকিয়া দিতাম। মহাশয়, যদি আঁকিয়া দেখান প্রয়োজন বোঝেন, আমি সে সকল সরঞ্জম আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারি। আকিয়া দিবেন।†

গন্ধ তৈলের মধ্যে ফুলেল তৈলই অধিক ব্যবহৃত হয়। অপর কয়েক প্রকার তৈলের কথা ঐ শিল্পশিক্ষায় আছে, কিন্তু আমি তাহা পরীক্ষা করি নাই, সুতরাং বলিতে পারি না। উহাতে কিরূপ তৈল হইতে পরে, কাজেই সে কথা কিছু লিখিলাম না। ম্যাকেসার তৈল প্রস্তুত প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে। পরীক্ষিত হইলে, ফল জানাইতে পারি।

নিবেদক
শ্রীরামলাল দত্ত।

† যখন চাপ দেওয়াই উদ্দেশ্য, তখন উল্লিখিত সরঞ্জম গুলির প্রতিরূপ দিবার প্রয়োজন দেখি না।——(সম্পাদক)

ভক্তিপরীক্ষা। *

১

কৈলাস গিরিবর, রাজত কলেবর,
দূর-দূরন্তর আকাশ-ভেদী;
পূত পবিত থল, হিম-জল ঝলমল,
যোগিবর শূলধর শঙ্কর-বেদী।
আঁখি চলে যতদূর, গিরি-দেহ ততদূর,
ঘনগণ খেলে গিরি-কোলে;
ঊর্দ্ধে প্রভাত-রবি, রক্তবরণ ছবি,
নিম্নে জলদ-দল দোলে।
ভোধর তরুকুল, অগণিত ফল ফুল,
নধর অধরে লতা হাসে;
মধু-পরিমল-আশী, গুঞ্জন-সুরভাষী
অলিদল উড়ে ফুল পাশে।

২

নির্ঝর ঝরঝরি', ধায় ভূধর'পরি,
লুটিপুটি তটিনী গড়ায়;
ঘাত-জাত ফেনরাশি, ভাসি'ছে হাসি' হাসি',
বুদ্বুদ জনমি' মিলায়।
নটন-নিপুণ বায়, তরুপাশে ভিখ চায়,
দাতা তরু ঢালে ফুল রাশি;
পবন সে ফুল-ডালি, নির্ঝরে দেয় ঢালি,'
চলে জলে ফুল দল ভাসি'।
কীচক-বিঁধ মাঝে, বায়ব বেণু বাজে, †
শাখি-শাখে পাখী করে গান;
সে ভুঁহু শব্দ সনে, শঙ্কর শোনে কাণে,
আর এক সুধামাখা তান;—

* এই কবিতাটির ছন্দ বিদ্যাপতির অনুকরণে লঘু-গুরু ধরণে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের রচিত পদাবলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা পড়িতে অসুবিধা হইবে না। কিন্তু যাঁহারা নব পাঠক, তাঁহারা একটু সুর করিয়া লঘু-গুরু ধরণে পড়িবেন। ছন্দের সকল স্থলে আক্ষরিক লঘু-গুরু-ধরণ বজায় করা হয় নাই, তাল, লয় ও যতির উপর নির্ভর করিয়া পড়িলেই ঠিক হইবে। প্রথম বারে না হয়, দ্বিতীয় বারে ঠিক হইবে।

† কীচক (বেউড় বাঁশ), বিঁধ (ছিদ্র) মধ্যে বায়ু সম্বন্ধীয় বা বায়ুজনিত বাঁশী বাজে।

"প্রভু হে!—প্রভু হে!"
এই সেই সুধামাখা তান।

(৩)

ধ্যান-মগন হর, শার্দ্দূল-ছাল'পর,
সারা-নিশি মুদিত নয়ান;
অচল উপরি যেন, দ্বিতীয় অচল হেন,
শঙ্কর অচল মহান্।
এলাইত জটজূট শিলাতলে লটপট,
জটে জটে জড়িত ভুজঙ্গ;
লম্বিত হাড়মালা, লুণ্ঠিত বাঘছালা,
সম্মুখে ডমরু করঙ্গ।
ধবল অচল তনু, অযুত নিযুত ভানু,
ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ;
জটমূলে কল কল, উছলি'ছে ছল ছল,
গঙ্গা-সলিল-বিভঙ্গ।

(৪)

মুদিত-নয়ন হর হৃদি-শতদল মাঝে
মূল-শকতি প্রকৃতিরে
ভাব-বিভোরে ভাবে, বাহ্য চেতন নাহি,
ত্রিলোচন ভাসে প্রেম-নীরে।
"প্রভু হে!—প্রভু হে!"
পুন সেই মধুমাখা তান
শোনে কাণে শিব ধ্যানবান্।
অন্তর মাঝে পুন "প্রভু হে!—প্রভু হে!"
বাহ্যান্তরে এক রব;
ধ্যান-ভগন হ'য়ে, মেলে হর ত্রিলোচন,
মুখে বলে "জয় জয়" রব।

(৫)

সম্মুখে জ্যোতির্ময়ী মূল-প্রকৃতি সতী
ভগবতী পার্ব্বতী দেবী
অচল উজাল' করে, দাঁড়াইয়া যোড়-করে,
গিরি'পরি জ্যোতির ছবি।
"প্রভু হে!—প্রভু হে!" ডাকিল শঙ্করী,
শঙ্কর বলে, "কেন, তারে?"
প্রাণ-আসন ছাড়ি' বাহিরিলে তাড়াতাড়ি,
বল, সতি!—বল দেবি! মোরে?
যোগময়ি! তব যোগে, অন্তর মাঝে জেগে,
বাহিরে ছিনু ঘুম-ঘোরে;
মূল-প্রকৃতি তুমি, মূল-শকতি তুমি,
বাঁধা আমি তব প্রেম-ডোরে।
বাহিরে তোমারে আমি, পত্নী আমার হেরি,
অন্তরে হেরি এক আর;—
বিষ্ণু-শরীর হোতে ভাসি' জ্যোতির স্রোতে,
হও সৃজ-ধাতু-মূলাধার।

(৬)

"কত সে ভুবন নব গড় তুমি পলে পলে,
কত জীব, গণা নাহি যায়;
স্থাবর জঙ্গম, জড়াজড় চরাচর
শূন্য আকাশ-কোলে ধায়।
ব্রহ্মা কত শত, ইন্দ্র কত শত,
কত শত শিব-আমি জন্মি;
অদ্ভুত কৌশল, যন্ত্র-পুতলি সম
উঠি বসি, সবে সমধর্ম্মী।
কারণ-বারি-তলে ভাসি সকলে মিলে,
নাহি মিলে কূল কিনারা;
আঁধারে আঁধারে ভাসি শুধু চৌধারে,
সে আঁধারে তুমি ধ্রুব-তারা।
আশ্রয়ি' তব পদ, করম-ভূমিতে উঠি',
তোমারি মহিমা করি গান;
বসি' মহাযোগাসনে, আমি-শিব একমনে,
তব পদ হৃদে করি ধ্যান।
জ্যোতির্ময়ী সে মূরতি হৃদয়ে ভাবিতেছিনু,
সে মূরতি বড় ভালবাসি;

কেন, দেবি, হৃদি ছাড়ি' বাহিরিলে তাড়াতাড়ি,
লীলাময়ি! কহ তা' প্রকাশি' ?"

(৭)

শঙ্কর-বাণী শুনি' পুন যুড়ি' যুগপাণি,
শঙ্করী কহে ধীর ভাষে ;—
"প্রভু হে!—প্রভু হে! যা'ব জনক-গৃহে,
মাগি বিদায় তব পাশে।
ষষ্ঠী রজনী গত, সপ্তমী-পরভাত,
সমুদিত লোহিত সূর্য্য ;
বাসনা জাগে মনে, নিরখিব লোচনে
কনক-জননী-পদ পূজ্য।
আদেশ বিনা তব, হে ভব! হে ধব!
দাসী তব যাইবারে নারে ;
জনক জননী ছেঁহ তিন দিন ভুঞ্জিব,
দশমীতে হেরিব তোমারে।"

(৮)

ব্যোম-দিগম্বর, রাজত বপুধর,
তাপসবর হর হাসে ;
গম্ভীর আস্য, গম্ভীর হাস্য,
লোচনে লাস্য বিকাশে।
গম্ভীর রাবে ডাকিল শঙ্কর,—
"ধনপতি!—ধনপতি!"
কুবের করপুটে, এই পড়ে—এই উঠে—
আসিল ঝটগতি।
ধূর্জ্জটী কহে তবে, "গৌরী আজি হে যা'বে
হিমবাসে জনক-নিবাসে ;
যোগিনী হ'বে রাণী, এই মত করি' তুমি
সজ্জিত কর ভূষাবাসে।"

(৯)

পশুপতি-অনুমতি শিরে ধরি' ধনপতি
ধাইল আপন বাসে ;
ভাণ্ডার চুনি' চুনি' দীপ্ত রতন মণি
আনিল শঙ্করী পাশে।
অঙ্গ-সুশোভন আনিল ভূষণ,
হেম-ফুল-কৌশিক-বাস ;
চারু রতন-চুর, রুণু ঝুনু নূপুর,
কেয়ুর নয়ন-বিলাস।
মাণিক-মণ্ডিত কুণ্ডল আনিল,
হীরক-মণ্ডিত বালা ;
মরকত-বিখচিত সীঁথি সুশোভন,
গজমতি-শতনরী মালা।
দিগন্ত-ভাসিত, অনন্ত-ফুরিত,
উজ্জ্বল মুকুট সুছাঁদ ;
মুকুট উপরি কিবা ঝলমল চল বিভা,
চকমক শত শত চাঁদ।

(১০)

সাজ-ভবন মাঝ কুবের রাখে সাজ,
রাখিল দর্পণ চারু ;
জগত-জননী তথি পশিয়া ত্বরিত গতি,
ভূষিল অঙ্গ সুচারু।
যথি যেই ভূষণ, কৈল সুশোভন,
নাহি মিলে নূপুর ভূষা ;
সাজ-ভবন ছাড়ি' বাহিরিল তাড়াতাড়ি,
পূর্ব নভ ছাড়ি' যেন উষা।
সাজ-ভবন-দ্বারে নন্দী কেশরী ধ'রে,
দাঁড়াইয়া গম্ভীর-ভাবে ;
কুবের নূপুর ল'য়ে নন্দীর পাশে গিয়ে
মনে মনে কিবা যেন ভাবে।
পার্ব্বতী তথি আসি' কুবেরে কহে হাসি' ;—
"রে কুবের! নূপুর কই ?"
কুবের নূপুর করে কহিল ভকতি ভরে,—
"এই যে নূপুর, দয়াময়ি!"

সিংহ-উপরি তুমি বৈস উঠিয়া, মাতা।
বড় সাধ জাগিয়াছে মোর ;
সভকতি নিজ করে সাজাইব ধীরে ধীরে
নূপুরে শ্রীচরণ তোর।"
শঙ্করী হাসি' ধীরি, আরোহে হরি'পরি,
আহা, কিবা সুন্দর শোভা পরকাশ!
সিংহবাহিনী তারা, ত্রিভুবন-মূলাধারা,
জ্যোতির জ্যোতি-সারা. সূর্য্য-প্রভাস।
কুবের সেইখন রাতুল শ্রীচরণ
আপন মস্তকে রাখি'
পরাইল নূপুর, জ্যোতি ছুটে বহুদূর,
নন্দী নিরখে দূরে থাকি'।

(১১)

কুবের মৃদুভাষী নন্দীরে কহে হাসি' ;—
"হের, ভাই! পদযুগ-শোভা ;
বল মোরে, নন্দী হে! দেখেছ কখন কি হে—
হেন শোভা আঁখি-মন-লোভা?
নূপুর দেবী-পায়, উজ্জ্বল ঝল তায়,
আমি বই কে হেন সাজায়?
নন্দী হে! দেখ দেখ, চরণ-সাজানো শেখ,
মোর মত সাজাইবে মায়।"
নন্দী হাসিয়া কয়, "কুবের মহাশয়!
অম্নি কতক বটে শোভা ;
যেরূপ ভাব তুমি, সেরূপ না হেরি আমি,
এ শোভা কি আঁখি-মন-লোভা?"

(১২)

দুঃখে সরোষে তবে, কুবের কহে ভেবে,—
"নন্দী হে! এ কি কহ আজ?
মম সম তুমি কি হে, হেন চারু বর-দেহে,
সাজা'তে পার চারু সাজ?"
নন্দী হাসিয়া কয়,—"তা' নয়—তা' নয়;
অন্য ভূষণ নাহি জানি ;
চরণ-ভূষণ আমি, বোধ হয়, ভাল জানি,
তেঁই এই নূপুর না মানি।"
কুবের কহে তবে,—"এ হ'তেও শোভা হ'বে,
হেন পদ-ভূষা তুমি জান?
ভাল ভাল, তাই দেখি, সাজাইয়া কর সুখী,
কথায় না ভুলি, ভূষা আন।"

(১৩)

নন্দী ধাইল বনে, ঢুঁড়ি' ঢুড়ি' সযতনে,
আনিল ভূষণ সুভাতি ;
ফুল্ল রকত জবা, ভকত-নয়ন-লোভা,
শ্রীফল-দল তিন-পাতী।
দূর্ব্বাদল তুলি' রকত চন্দন ঢালি'
ম্রক্ষিত করিল সুধীরে ;
শ্রীফল-দল'পরি দূর্ব্বা জবা ধরি'
নব ভূষা গড়িল অচিরে।
দেবীর পদ'পরে নন্দী ভকতি ভরে
রাখিল ভূষণ মহৎ ;
কোটিগুণ শোভা আসি' চরণে উঠিল ভাসি,
মোহিত হইল জগৎ।

(১৪)

স্বর্গে অমরগণ ফুল করে বরিষণ,
সমীরণ বংশী বাজায় ;
অপ্সরমণ্ডলী নাচে কুতূহলী,
কিন্নর তাল দেয় তায়।
নারদ আদি মুনি, বদনে হরিধ্বনি,
শঙ্কর শঙ্করী বাজিল বীণে ;
নটন-ঘটন কত, কৈলাস পর্ব্বত
উৎসব-মোহিত সপ্তমী দিনে।
যন্ত্র-শবদ সনে গায় বিহগগণে
কাকলি-কলরব ছোটে ;
ভ্রমর-ভ্রমরী-দল ভুলি' ফুল পরিমল,
শঙ্করী-পদ-তলে লোটে।

(১৫)

দুর্গ-বিনাশিনী, দুর্গতি-হারিণী,
ত্রিলোক-তারিণী তারা;
কেশরি-পিঠ'পরি নূতন রূপ ধরি'
হইল অতুল শোভাধারা।
নন্দি-ভূষণ কিবা চরণে বিলায় বিভা,
কুবের অবাক হ'য়ে চায়;
যন্ত্র-পুতলি সম নাহি চলে লোচন,
শরমে মরম ভেঙে যায়।
শ্রীফল-দল জবা চরণে বিলায় শোভা,
নূপুর শোভাহীন তনু;
লাল চরণ তলে লাল কিরণ খেলে,
লাল ঘনে যেন লাল ভানু।

(১৬)

কৈলাস গিরি'পরি "জয় জয় শঙ্করি!"
পুন এই শবদ-তরঙ্গ;
দূর যোগাসনে শঙ্কর কাণে শোনে,
নব যোগ পুন হ'ল ভঙ্গ।
ধায় শিব ছুটি' ছুটি' জটজূট লুটিপুটি,
আলুথালু শার্দ্দূল-ছালা;
ধুস্তূর ফুল খসে, ভাল-শশী ঝিঝলসে,
হড়মড় গল-হাড়-মালা।
করধৃত শূল খুলে আটকে বাঘ ছালে,
শূল প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাহি;
শঙ্করী পাশে হর ধাইল সত্বর,
মুখে "জয় শঙ্করি!" গাহি।

(১৭)

গৌরী সমীপে গিয়ে, হেরে হর আঁখি চেয়ে,
ত্রিলোচন অচল উল্লাসে;
"জয় জয় শঙ্করি! জয় শিব সহচরি!"
বলে শিব গদ গদ ভাষে।
প্রেম বিভল হর, ডগমগ প্রেম ভর,
মুখে থুয়ে ভীম বিষাণ,—
গাইল ঘোর রবে, জাগিল জীব সবে,
উদ্দেশে করিল প্রণাম।
শৃঙ্গ হাঁকিল জোরে দূর দূরন্তরে
ধাইল নভ-ভেদী নাদ;
"জয় জয় শঙ্করি! জয় শিব সহচরী।
নির্জ্জীব জীব-বিষাদ।

(১৮)

ধূর্জ্জটী বলে পুন,—"কে রে সেই সুনিপুণ,
কে রে সেই ভকতপ্রধান?
পার্ব্বতী পদ'পরে হেন ভূষা কে দিল রে,
আয়, তা'রে করি কোল দান।"
এই বলি' ধূর্জ্জটী মেলি' মহাবাহু দু'টি,
কোল দিতে ছুটি' ছুটি' ধায়;
নন্দী ভকতি ভরে ভূমি লুণ্ঠিত শিরে
শঙ্কর চরণে লুটায়।
"নন্দীরে! নন্দীরে! আয় কোলে আয় কোলে,
সাবাসি তোর ভূষা শিক্ষা;
কুবের চেয়ে তোরে বাড়াইনু আমি রে—
করি' তোর ভক্তি পরীক্ষা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।



ভক্তিপরীক্ষা

শিল্পের বল।

দ্বিতীয় সংখ্যক শিল্পপুষ্পাঞ্জলিতে "কল্পনার খেলা" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম "শিল্পের বল কত আগামী বারে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।" আজ সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য মাত্রই শিল্পের ফল। অসভ্য অবস্থায় মানুষের এই শিল্পে বড় অধিক প্রয়োজন হইত না। তখন তাহারা পশু শিকারের জন্য ধনুক ও তীর, এবং রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বিশ্রামের সময়ে আত্ম রক্ষার জন্য ক্ষণস্থায়ী পর্ণকুটীর মাত্র নির্ম্মাণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। মৃগয়ালব্ধ পশুর অর্দ্ধদগ্ধ মাংস ভোজন করিয়া ও নিঝরের জল অঞ্জলি পুরিয়া পান করিয়াই তাহারা তৃপ্ত হইত।

কিন্তু মানুষের স্বভাব এই, অভাব হইলেই তাহা দূর করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে; এবং চেষ্টা করিলেই ফললাভ হইয়া থাকে। যখন মানুষ দেখিল যে, তাহার পর্ণকুটীর দৃঢ় নয়, প্রবল বৃষ্টি হইতে সকল সময় রক্ষা করিতে পারে না—ঝড় ত দূরের কথা। তখন তাহারা দৃঢ়তর গৃহের জন্য ব্যাকুল হইল। সেই ব্যাকুলতার ফলে—পর্ণকুটীর হইতে ক্রমে মৃণ্ময় গৃহ ও তৎপরে অট্টালিকার উৎপত্তি।

আজ যদি পৃথিবীতে শিল্পের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে, সভ্যতা নামও পৃথিবী হইতে লোপ পাইত। সাঁওতাল পল্লীতে আর প্যারিসনগরে কিছুতেই প্রভেদ থাকিত না, অথবা প্যারিসনগরের ন্যায় নগরের অস্তিত্বই থাকিত না।

শিল্পের সাহায্যে মূল্যহীন পদার্থ কিরূপ বহুমূল্য হয়, তাহা "কল্পনার খেলা" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এক্ষণে একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে, ইহা হইতে কিরূপে জাতীয় দৈন্যতা দূরিত হয়।

মনে কর, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি এই রূপ অল্প মূল্য ও মূল্যহীন পদার্থে, শিল্পবলে কত মূল্যবান দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, বাণিজ্যের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে, স্বদেশের অর্থ বৃদ্ধি করিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যজাতিরা এখন আর বহুমূল্য স্বর্ণাদি ধাতুর গৃহসজ্জা ব্যবহার করিতে ভাল বাসেন না। এখন অল্পমূল্য লৌহ, কাষ্ঠ, প্রস্তর, তাম্র প্রভৃতি গৃহসজ্জা তাঁহারা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন। পাশ্চাত্য শিল্পিগণের মত, যে, বহুমূল্য ধাতুর উপর কল্পনার খেলা দেখাইতে নাই।* উহা নষ্ট হইবার যত আশঙ্কা, অল্প মূল্য ধাতু প্রস্তরাদির উপর শিল্পের খেলা দেখাইলে নষ্ট হইবার তত ভয় নাই। বাস্তবিকও সে কথা বড় অযথার্থ নয়। তুমি বহুমূল্য স্বর্ণের একটি সুন্দর কারুমণ্ডিত কৌটা এবং কাষ্ঠ বা প্রস্তর নির্ম্মিত তদপেক্ষা বহুমূল্যের কৌটা প্রস্তুত করাইয়া রাখ, চৌরে তোমার স্বর্ণের কৌটাটিই চুরি করিবে, কেন না সে জানে যে, স্বর্ণের কৌটাটি গলাইয়া বিক্রয় করিলে সে অর্থ পাইবে, কিন্তু প্রস্তর বা কাঠের দ্রব্য ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করিতে গেলে তাহার এক কপর্দকও প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, পক্ষান্তরে ঐ দ্রব্য অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বিক্রয় করিতে গেলে বা রাখিয়া দিলে ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

---

* "Beautiful though gold and silver are, and worthy, even though they were the commonest of things, to be fashioned into the most exquisite devices, their money value makes them a perilous material for works of art. How many of the choicest relics of antiquity are lost to us, because they tempted the thief to steal them, and then to hide his theft by melting them! How many unique designs in gold and silver have the vicissitudes of war reduced in fierce haste into money-changers' nuggets! Where are Benvento Cellini's Vases, Lorenzo Ghiberti's Cups or the silver lamps of Ghirlandajo? Gone almost as completely as Aaron's golden pot of Manna, of which, for another reason that that which kept St. Paul silent, 'we cannot now speak particularly.' Nor is it only because this is a world 'where, thieves break through and steal' that the fine gold becomes dim and the silver perishes. This, too, is a world where 'love is strong as death;' and what has not love—love of family; love of brother, love of child, love of lover—prompted man and woman to do with the costliest things, when they could be exchanged as more bullion for the lives of those who were beloved?"—Professor G. Wilson. of Edinburgh.

জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, জানিতে পারিবে, বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত কত কারু দ্রব্য কালের অতল গর্ত্তে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অন্য অল্প মূল্যের দ্রব্যের উপর কারিগরী আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আমরা শিল্পের বল দেখাইতে গিয়া অনেক বাক্য ব্যয় করিলাম, কিন্তু এক কথায় এই বলিলেই যথেষ্ট, যে, শিল্পের বল দেখিতে চাও, পাশ্চাত্য সমৃদ্ধ জনপদ সকলের দিকে চাহিয়া দেখ—অত দূরের কথাই বা বলি কেন ?—চীন জাপানের দিকে চাহিয়া দেখ—শিল্পের বলে কি হইতে পারে, প্রতি নিমেষপাতে জানিতে পারিবে।

শ্রীঃ—

পাণ্ডব-চরিত।

(৪২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

পঞ্চম দৃশ্য।

নাগপুরীর দ্বারদেশ।

লতাবদ্ধ মূর্চ্ছিত ভীমসেন পতিত।

পার্শ্বে গঙ্গাদেবী দণ্ডায়মান।

গঙ্গা।—কৃষ্ণের আদেশে, আনিলাম ভীমে এই নাগরাজ পুরে। জলসেকে, বিষের প্রকোপ প্রায় হইয়াছে দূর, তবু তীব্র কালকূট, আচ্ছন্ন করিয়া, রেখেছে এখনো এরে;—কিন্তু নাগগণ, আক্রমণ করিলে ইহারে, জঙ্গম বিষের বলে, স্থাবর বিষের তেজ নষ্ট হ'য়ে যাবে একে বারে। ভীমসেনে এখানে রাখিয়া, যাই আমি বাসুকির পাশে; কহি গিয়া তাঁরে কৃষ্ণের আদেশ যেই মত।

[গঙ্গার অন্তর্দ্ধান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নাগরাজ সভা।

সিংহাসনে বাসুকি সভাসদগণে বেষ্টিত।

বাসুকি।—হের নাগগণ, দিকচয় সুপ্রসন্ন অনুমান করি, সৌভাগ্যের সমাগম হইবেক আজি, আমাদের ভাগ্য ফলে।

গঙ্গার আবির্ভাব।

—এস গঙ্গে, পতিত পাবনি, পবিত্র হইল আজি তব পদার্পণে, নাগপুরী। কি মানসে আগমন হেথা বল মোরে; চরিতার্থ হ'ব আজি, আদেশ তোমার করিয়া পালন।

গঙ্গা।—আমার আদেশ নয়, কৃষ্ণের আদেশে আসিয়াছি হেথা আমি। কার্য্য তাঁর কিছু, তোমারে সাধিতে হ'বে।

বাসুকি।—কি আদেশ করিলা শ্রীপতি, বল ত্বরা মোরে, দেবি, অবিলম্বে করিয়া পালন, কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করি।

[বেগে কতিপয় নাগসৈনিকের প্রবেশ।

১ সৈনিক।—সব গেল মহারাজ!

২ সৈনিক।—কোথা হতে নর একজন, এসে এই পুরীমাঝে, নাগগণে বধিছে জীবনে।

বাসুকি।—জান কেহ কেবা সেই নর, কোথা হ'তে এ'ল হেথা ?

গঙ্গা।—জানি আমি, হে নাগেন্দ্র, কেবা সেই নর, কোথা হ'তে এ'ল হেথা; শুন, বলি। কুন্তিভোজে জানত নাগেশ ?

বাসুকি।—দোহিত্র, আমার কুন্তিভোজ।

গঙ্গা।—তাঁহার নন্দিনী কুন্তী নামে, পাণ্ডব জননী। যে মানব আজি তব পুরে করিছে উৎপাত, দ্বিতীয় পাণ্ডব সেই, ভীম নাম ধরে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধন, বিষান্ন প্রদানে ভীমে করিয়া মূর্চ্ছিত, ভাসাইয়ে দিয়েছিল আমারি সলিলে। কৃষ্ণের আদেশে তারে আনিয়াছি আমি, তোমারি এ পুরে। আদেশিলা কৃষ্ণ মোরে বলিতে তোমারে অমৃত মিশ্রিত পরমান্নে বল বৃদ্ধি করিতে ভীমের—

বাসুকি।—যাও হে পন্নগগণ, যাও ত্বরা করি, আন গিয়ে সে মানবে, সুমিষ্ট বচনে তুষি', এই সভাতলে—নারায়ণ পাঠাইলা তারে—

[কতিপয় প্রধান সভাসদের প্রস্থান।

(গঙ্গার প্রতি)—দেবি, প্রণতি আমার জানাইও বাসুদেবে। বলিও বাসুকি উৎকর্ণ হইয়া আছে, তাঁহার আদেশ, শুনিবার আশে।

[গঙ্গার অন্তর্দ্ধান।

—ভূভার হরণ আয়োজন, করিয়াছেন নারায়ণ, ভীম করে কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল—তাই হেতা অমৃতান্ন ভোজনের তরে পাঠাইলা তারে। শরীরে বিপুল বল না হইলে, নাশিবে কিরূপে শত ধার্ত্তরাষ্ট্র প্রাণ, অসংখ্য সেনার সহ।—যাও মন্ত্রী-বর, তুমি যাও ত্বরা করি, আদেশহ সূপকারগণে, অমৃতে মিশায়ে পরমান্ন করিতে প্রস্তুত। শুনেছি আহারে পটু বীর বৃকোদর। ব'লো তা সবারে আহারে তাহার, অন্নে যেন না হয় অভাব।

মন্ত্রী।—যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[শিরোনমন করিয়া প্রস্থান।

নাগগণের সহিত ভীমসেনের প্রবেশ।

বাসুকি।—(ভীমের প্রতি)—কহ হে মানব, কেবা তুমি? কেন নাগগণে পীড়ন করিলে অকারণে?

ভীম।—নাগনাথ! অকারণে আমি, পীড়ন না করি কভু কারে। নিদ্রিত ছিলাম আমি গঙ্গাকূলে। নাগগণ মোরে করিয়া বন্ধন আনি হেথা, বিনা দোষে করিল পীড়ন। তাই তা সবারে আক্রমণ করিয়াছি। হে রাজন! ন্যায় মত করুন বিচার আগে, তবে দিব আত্ম পরিচয়।

বাসুকি।—হে মানব! কুন্তিভোজ দৌহিত্র আমার, তাহার দৌহিত্র তুমি, চিনিহে তোমারে, নাগগণ হেথা আনে নাই তোমা। ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধন, করিবারে তব প্রাণনাশ, বিষমাখা ক্ষীরলড্ডু খাওয়াইয়েছিল তোমা, হয় কি স্মরণ? সেই লড্ডু করিয়া আহার, মৃতাকার হয়েছিলে তুমি। দুর্য্যোধন লতাপাশে বাঁধিয়া তোমারে, ডুবাইয়ে দিয়েছিল গঙ্গার সলিলে। গঙ্গা নিজে কৃষ্ণের আদেশে, কৃষ্ণভক্ত বলে, তোমা আনিলা এখানে। বিষান্নে পাইলে প্রাণ প্রহ্লাদের মত। কৃষ্ণে যদি ভক্তি তব থাকে চিরকাল, সর্ব্ব-স্থানে হ'বে চিরজয়ী। প্রায় পরমান্ন হইল প্রস্তুত; পূজি ইষ্টদেবে ভোজন কররে বৎস, আশ মিটাইয়া। ভোজন করিয়া সুখে নিদ্রা যাও আজি সুশয্যায়। নিদ্রা ভঙ্গ হ'লে পাঠাইয়া দিব তোমা হস্তিনানগরে।

ভীম।—হরি, দয়াময়, রক্ষক আমার তুমি?—জানিতে পারিনে এত কাল?—তবে কেন আর, ভয়ে ভয়ে কাটাইব কাল?—শত্রুভাবে হেরিনি কাহারে কভু, তবু দুর্য্যোধন, ইচ্ছা করে নাশিবারে প্রাণ মোর? ভাল—এর প্রতিফল দিব তারে আমি, হরি, তোমারি প্রসাদে।

বাসুকি।—চল, বৎস, এবে মোর সনে। হরির প্রসাদে, তোরি হাতে, দুর্য্যোধন হইবে নিধন।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কক্ষ।

যুধিষ্ঠির, বিদুর ও কুন্তী।

কুন্তী।—হা! দেবর, একি হলো? সপ্তাহ হইল গত, আজো না ফিরিল কেন? কোথা গেল ভীম মোর? কি হবে? কি হবে? প্রাণের ভিতর কি যে করে, বুঝা'তে না পারি।—হায়! আর কেহ নাহি ডাকে মোরে, ক্ষুধার সময় খেতে দেমা বলি ভীমে খাদ্য নাহি দিলে, শান্তি নাহি হয় মোর মন। রোদন সম্বল মোর হ'লো এতদিনে। (রোদন)।

বিদুর।—না কর রোদন দেবি! ভীম তব আছে গো জীবিত। বলি নাই এত দিন—বলিব তোমারে আজি অতি গূঢ় কথা—ভগবান নিজে, সদাই করেন রক্ষা তব পুত্রগণে। কি সম্পদ কি বিপদে, ভগবান রক্ষক যাহার, কি ভয় তাহার, দেবি, এ ভব মণ্ডলে? আশ্বস্ত কর গো হিয়া, আজি কালি আসিবে তনয় তব।—আরও বলি শুন, যুধিষ্ঠির সাবধানে, বিশ্বাস না ক'রো দুর্য্যোধনে, তোমাদের অহিত সাধনে, সদা তার মন। না হেরিছ ভীমে যে কারণ, শুন, তার বলিব কারণ—বিষান্নে মূর্চ্ছিত করি ভীমে—দেছে দুর্য্যোধন ভাসাইয়ে জাহ্নবী সলিলে—কৃষ্ণের আদেশে, ভগবতী ভাগীরথী নিজে—লইয়া গেছেন তারে পন্নগের পুরে। বাসুকির আলয়েতে এবে সুখে নিদ্রা যায় ভীম। নিজে হরি দয়া করি বলিলা এ কথা মোরে, কোন চিন্তা না করিও আর—ব'লো না এ কথা মুখ ফুটে—সাবধানে থাক সদা ক'টি ভায়ে মিলে—কালি পাবে ভীমসেনে—ধর্ম্মপথে থাক সদা—যথা ধর্ম্ম তথা জয় জানিও নিশ্চয়—সহস্র বিপদ হ'লে ভগবান রক্ষক তোদের। কোন চিন্তা নাই—যাই আমি—হরি পূজনের হইল সময়।

কুন্তী।—দেবর! কি আর বলিব আমি, জানত সকলি, কি সুখে বাঁচিয়ে আছি; পুত্র ক'টি রক্ষা কর তুমি।

বিদুর।—দেবি, হেন কথা না বলো, হরি বিনে কে রক্ষক এ ভব মণ্ডলে? হরির চরণে, কর সমর্পণ এক মনে, পুত্র ক'টি—তিনিই রক্ষক তা সবার, কি সম্পদে কি বিপদে। যাই আমি—আর না করিব দেরি।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির।—মাগো! বিফল ক্রন্দন করি' নাহি ফল। খুল্লতাত বলিলেন যাহা তিল আধ সন্দেহ ক'রো না তাহে। নিশ্চয় ফিরিবে ভীম কালি।—শ্রীহরির কৃপা বলে সকল বিপদ মো সবার হবে দূর। যাও, তুমি,—দেখ গিয়ে সহদেব নকুলেরে—শিশু দোঁহে—তুমি না দেখিলে আর কে দেখিবে বল? আমিও, জননি, অর্জ্জুনেরে বলিগে এ কথা।

[প্রস্থান।

কুন্তী।—কোথা যাই?—প্রাণের ভিতর হুহু করে সদা!—সত্য বটে হরি না রক্ষিলে পরে কে রক্ষিতে পারে? কিন্তু তবু না হেরিয়া ভীমে আকুল পরাণ মোর।—আহা এতক্ষণে কতবার আসি—"বড় ক্ষুধা খেতে দেমা" বলে দাঁড়া'ত আমার পাশে।—হরি! দয়াময়! রক্ষা ক'রো ভীমে মোর!—রক্ষ মোর পুত্রগণে সদা।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

রাজোদ্যান।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।—এইত পোহাল বিভাবরী—ডাকিতেছে পাখিগণ।—উদিছেন রবি ঐ উদয় অচলে।—অষ্টদিন পাণ্ডবেরা ভীম-হারা হ'য়ে, রয়েছে হস্তিনাপুরে। সত্য বটে হরির কৃপায় পাব পুন ভীমসেনে। তবু কেন আকুল পরাণ কিছুই বুঝিতে নারি——ওহো! বুঝিয়াছি! বিয়োগ সংযোগ—দুঃখ সুখ ঘটায় জগতে—বিয়োগের ফল দুঃখ, সংযোগেতে সুখ বিধির এ বিধি আছে চিরকাল—তবে কেন না কাঁদিবে প্রাণ?—(দূরে দেখিয়া)—ওই আসে আনন্দ-বর্দ্ধন ভীম—দ্বিতীয় তপন সম—আয়, আয়, আয়, ভাই, কোথায় ছিলি রে এত দিন?

বেগে ভীমের প্রবেশ।

কি রূপে কাটালি কাল? বল রে সকল মোরে? আকুল পরাণ তো বিহনে। দৈব মোরে বড় অনুকূল—তাই পুনঃ পেনু তোমা ধনে।—(আলিঙ্গন)—চল যাই জননীর পাশে, কাতরা জননী তো বিহনে।

ভীম।—আর্য্য! বিলম্ব করহ ক্ষণকাল, দেহ মোর শিরে পদধূলি—দেহ অনুমতি পাপী দুর্য্যোধনে করিব বিনাশ—

যুধিষ্ঠির।—হেন কথা নাহি বল ভাই! শত্রুপুরী এ যে, কেহ নাহি সহায় মোদের হেথা—

ভীম।—দাদা! না করিও ভয়! যে সহায় আছে আমাদের, তার কাছে লক্ষ অক্ষৌহিণী কোথা লাগে—যাঁর পদচ্ছায়াস্পর্শে—কালকূট পানে মৃত ভীম, পেলে প্রাণ—তার চেয়ে আবার সহায় কেবা? দাদা! যতদিন হরি, হৃদয় ভিতরি, বিরাজিবে—ততদিন ভীম নাহি ডরে শমনেরে—ছার দুর্য্যোধমে ডরিবে কি হেতু?—দেহ অনুমতি—

যুধিষ্ঠির।—শান্ত হও এবে ভাই! খুল্লতাত বিদুরের পরামর্শ বিনা কোন কার্য্য না পারি করিতে। চল এবে গৃহে যাই—জননী কাঁদিছে সদা তোমারে না হেরে—তা'র-পর যেবা হয় হবে।

ভীম।—আর্য্য! জ্যেষ্ঠ তুমি, পিতৃতুল্য, তোমার আদেশ বিনা—কভু নাহি করি কোন কাজ—কিন্তু তোমারি চরণ-স্পর্শ করি, করিনু প্রতিজ্ঞা আজি নবোদিত তপনেরে সাক্ষী করি—এক দিন নিশ্চয় বধিব দুর্য্যোধনে——

যুধিষ্ঠির।—গৃহে যাই—চল ভাই——

[ভীমকে লইয়া প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)



ক্রুদ্ধভীমকে সান্ত্বনা

শরৎ ও শরৎ-প্রকৃতি।

[স্থান—অরণ্য। সময়—পূর্ণিমার সন্ধ্যা।]

১

ধোয়া চাঁদ আকাশের গায়
পৃথিবীর বন পানে চায়।
বরিষার মেঘের আড়ালে
বহুদিন ছিল ঢাকা;
জলভরা মেঘ গেছে চ'লে,
নীলাকাশ আজ ফাঁকা।
তাই চাঁদ চোক মেলে চায়,
হেসে হেসে ভেসে ভেসে যায়।

২

নিদারুণ বিষাদের পরে
আনন্দের মূরতি-ফূরতি;
নিদারুণ বরিষার পরে
চাঁদ-মুখে ঝকঝকে জ্যোতি।
ভরা চাঁদ ষোল-কলা-ফোটা,
ছিটায় দ্বিগুণ ছটা-ঘটা।
নিবিড় অরণ্য মাঝে চাঁদ
ওই পাতে হীরকের ফাঁদ।

৩

চাঁদের হীরক-জ্যোতি ছুটে
দু'টি মুখে ধপ্ কোরে ফোটে।
কোন্ দু'টি মুখে?
শরৎ ঋতুর আর শরৎ-প্রিয়ার।
কায়া-চাঁদ—ছায়া-চাঁদ;—রূপের আধার।
মনোহর রূপধর যুবা,
হরিত বসন শোভে গায়;
ফুলের মুকুটে চাঁদ-বিভা,
দোলে চুল মুকুটের ছায়।
দাঁড়াইয়া তমালের তলে,
ডান হাতে ধরি' তরু-শাখা,
পায়ের উপরে দিয়ে পা,
বাম দিকে দেহ খানি বাঁকা।

৪

শরতের অবিদূরে কিবা
শরৎ-প্রকৃতি ঢালে বিভা।
সুগন্ধ ফুলের বেদি'পরি
বোসে অই জীবন্ত মাধুরী।
ফুলময়ী সীঁথি হাসে শিরে,
ফুলের কুন্তল দোলে ধীরে;
ফুল-কলি নোলোকের ঘটা,
ফুলপাটা আধা আধা ফোটা;
ফুল-বালা, ফুলের কেয়ূর,
ফুল-মালা, ফুলের নূপুর;
বাছা বাছা ফুলের সাজনি,
ফুলময়ী শরৎ-সজনি।
ফুল-বেদি-কুল-তলে বসি'
মহামালা গাঁথে ফুল-শশী।
অবিদূরে সম্মুখ বিভাগে
শরৎ দাঁড়া'য়ে অনুরাগে।
প্রেমে ভরা নয়ন-যুগল
প্রিয়া-মুখে র'য়েছে অচল।
কা'রো মুখে নাহি কোন কথা,
হেথা তরুবর, হোতা লতা।
আবার—
হেলিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে
প্রিয়ার বদনে চায়,

ওদিকে—
নীল-নভ-কোলে হাসিয়ে হাসিয়ে
চাঁদ গড়ালুটি খায়।

৫

উভয়ে নীরব, মুখে নাই কথা,
তরুতলে তরু, বেদি'পরি লতা,
ধীরে ধীরে নড়ে তরু-লতা-পাতা,
ধীরে ধীরে ওড়ে ফুলের বাস ;
ধীরে ধীরে চাঁদ উঁকি মেরে দেখে,
ধীরে সুধা ঢালে সুধাভরা মুখে,
এক-চখো চাঁদ চায় চারি চোখে,
পাঁচ চোখে খেলে জ্যোতির হাস।

৬

মধুর বদনে মধুর হাসি'
কহি'ছে শরৎ মধুরভাষী ;—
"প্রিয়তমে !—প্রিয়তমে !
দু'মাসের তরে এসেছি দু'জনে
দু'মাস ফুরা'লে যাইতে হ'বে ;
আসিবে হেমন্ত নিজ প্রিয়াসনে,
সে কথা তো মনে রেখেছ ভেবে ?"

৭

"প্রিয় ! রেখেছি ভেবে।"
কহিল শরৎ-প্রকৃতি রাণী,
বন-বীণা সম বাজিল বাণী,
ঘুমঘোরা পাখী সে রব শুনি'
উঠিল জাগি'।
মধুর কাকলি পাখীর গলে
বন-সমীরণে ভাসিয়ে চলে,
ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে মিশিয়ে গেল
আকাশে লাগি'।

৮

"প্রিয় ! রেখেছি ভেবে।"
বন-প্রতিধ্বনি এ মধুর ধ্বনি
সাধ কোরে ধোরে আপন মুখে,
জড়িত বচনে ভাঙা ঘুম-ঘোরে
লুটিয়ে পড়িল হাওয়ার বুকে।
"প্রিয় ! রেখেছি ভেবে।"
এ মধুর ভাষা জাগাইয়ে আশা
শরতের প্রাণে মিলা'ল প্রাণ ;
প্রাণের ভিতরে গানের লহরি,
গানের ধমনী ছাড়িল তান।

৯

হাসিয়ে শরৎ আবার কহিল,—
"ভাল, প্রিয়ে ! ভেবে' রেখেছ যদি।
তবে কেন বৃথা সাধের সময়
হেলায় হারাও সাধ না সাধি' ?
আমার আমলে পূর্ণিমা যামিনী
সব ঋতু চেয়ে মাধুরী ভরা ;
আমার আমলে পূর্ণিমার চাঁদ
ভাবুকের মন-নয়ন-ধরা ;
আমার আমলে তরু-লতা-কুল
মরকতময় রূপের ডালি,
আমার আমলে ফুল ফুলকলি
শোভার গরবে পড়ি'ছে ঢলি'।
হের হের, প্রিয়ে ! সুধা-ধোয়া শশী
নধর অধরে ধরিয়ে সুধা
আমাদের পানে ওই চেয়ে আছে,
কভু মেঘে ঢেকে চাহিছে আধা।
ভাঙা ভাঙা মেঘ চাঁদের কিরণে
নীলাকাশতলে উড়িয়ে যায় ;
চকোর চকোরী চাঁদ-প্রেম গানে
উড়ে উড়ে চলে মেঘের ছায়।



আমার আমন্দে ভরা সরোবর
কতই প্রসবে কমলদল ;
কমলে কমলে হেলাহেলি খেলা,
বদন-সুধায় শিশির-জল।

১০

"প্রিয়ে ! হের হের ওই—
তোমারি রূপের কণিকা লইয়ে
জড় জগতের রূপের ঘটা ;
আকাশ—ভূতল—সলিলের তলে
প্রেমের লহরী—জ্যোতির ছটা।
ওই সরোবরে মুদিত নয়নে
কমলিনী করে তোমার ধ্যান ;
ফুটফুটে চোখে চেয়ে কুমুদিনী
তোমারে দিতেছে নিজের প্রাণ।
মেঘ সরাইয়ে পূর্ণিমার চাঁদ
তব রূপ-ছটা মাখি'ছে মুখে ;
ভাঙা ভাঙা মেঘ ধীর-বেগ হ'য়ে
তব রূপ নিতে আসিছে ঝুঁকে।
দূর দূরন্তরে সুনীল অম্বরে
উঁকি ঝুঁকি মারে অযুত তারা,
তব আঁখি-তারা-শোভা নিবে ব'লে
ভেবে ভেবে নিভে আপনহারা।
ঘোমটা খুলিয়ে, মুখটি তুলিয়ে
বনফুলগুলি ফুটিয়ে চায়,
তা'সবার কাণে তব রূপ-কথা
শুনাইতে বায়ু মৃদুল ধায়।
প্রিয়ে !
তোমার পরশে জগত বেঁচেছে,
তব মহাপ্রেমে সকলি নব ;
তুমি কেন তবে, প্রেমিকা প্রকৃতি !
হেন ভাবে ?—এ কি লীলা হে তব ?
দু'মাসের তরে এসেছি দু'জনে,
দু'মাসের পরে ফিরিতে হ'বে ;
জেনে শুনে হেন মনভোলা হ'য়ে
তবুও কি বৃথা বসিয়ে র'বে ?

১১

উঠ, শরতের হৃদয়বাসিনি !
উঠ, প্রাবৃটের ভীতি-বিনাশিনি !
সাধের রাজত্ব—সাধের সময়—

সাধের সশশী পূর্ণিমা যামিনী
বৃথায় যায় ;
এস উভে মিলি' নব খেলা খেলি,
গেল যে সময়, হেমন্ত আসিবে,
মনের বাসনা মনেই রহিবে ;
জেনে শুনে, প্রিয়ে ! সময় হারা'তে
মন কি চায় ?"

১২

শরতের কথা শুনিয়ে কাণে
শরৎ-প্রকৃতি সুধার তানে
মধুর হাসনি হাসিয়ে বলে ;—
"দু'মাসের তরে এসেছি, পতি !
দু'মাস সময় অল্প অতি,
দেখিতে দেখিতে যা'বে হে চলে।
তাই আমি, নাথ ! যতন ক'রে
ফুলকুল তুলি আপন করে
মন-মত করি গাঁথি এ মালা ;
তব অধিকারে তোমার কালে
যতরূপ ফুল ফোটে হে ডালে,
এই হারে তত ফুলের খেলা।
সাধের সময় এখনি যা'বে,
সাধ যে আমার সাধ না পাবে,
হেমন্ত আসিয়ে সাধিবে বাদ ;
তাই আমি তব পরাতে গলে
মহামালা গাথি ফুলের দলে,
গলে দুলাইয়ে পুরাব সাধ।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতার ইতিহাস।

(২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

মহারাষ্ট্রদেশ—তাহার প্রাচীন ইতিহাস—শিবজী—চৌথ ও সর্দেশ মুখী—শিবজীর মৃত্যু—গঙ্গার পূর্ব্ব পারে জনপদ বৃদ্ধি—শোভাসিংহের বিদ্রোহ—ফোর্ট উইলিয়ম—সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয়—প্রাচীন দুর্গের অবস্থিতির স্থান—নূতন কোম্পানি—নূতন পুরাতনে মিলন—মুরশিদকুলি খাঁ—ডাক্তার হামিল্টন—নূতন সনন্দ—প্রথম গির্জা—খ্রীঃ ১৭১৭ অব্দ—ডাক্তার হামিল্টনের মৃত্যু—কলিকাতার তাৎকালিক অবস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে লিখিত হইয়াছে বর্গীদিগের উৎপাতে লোকে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে আসিয়া বাস করিত, এক্ষণে এই বর্গী কাহারা, কি জন্য তাহারা এ দেশে এরূপ উৎপাত করিত, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। কেন না, কলিকাতার ইতিহাসে তাহাদের বিষয় অনেক বার উল্লিখিত হইবে।

বর্গী-(মারহাটা)-দিগের নিবাসভূমি মহারাষ্ট্র দেশ। ইহার উত্তর সীমা সাতপুর পর্ব্বতমালা, পশ্চিম সীমা ভারত সাগর, পূর্ব্বদিকে বেণগঙ্গা, বেণগঙ্গা যথায় বরদা নদীর সহিত মিলিতা হইতেছেন, সেই স্থান হইতে সীমা রেখা বরাবর পশ্চিম মুখে মাহুরনগরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত আসিয়া ভীমানদীর সঙ্গমস্থলের কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম মুখে শিবদাস গড়ের নিবট সাগর কূলে আসিয়া মিলিত ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ সকল সময়ে এই সীমা মান্য করিয়াও চলিতেন না।

মহারাষ্ট্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস অতীতের অনন্ত গর্ভে নিহিত, জানিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। শিবজীর সময় হইতেই এই জাতি অভ্যুত্থিত হয়। এই জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শিবজী, খ্রীঃ ১৬২৭ অব্দে সিউনির দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে দাদাজী কণ্ঠদেবের শিক্ষালাভ করিয়া যুবা বয়সে দিল্লীশ্বরকে পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। ইঁহার

প্রতাপেই মহারাষ্ট্রীয়দের প্রতাপ বর্দ্ধিত হয়। দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত ইঁহাকে দমন করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে তাঁহাকে বিজয়পুর রাজ্যের কতক অংশের চৌথ (চতুর্থাংশ) ও সর্দেশমুখী (শতকরা দশ হিসাবে) দিয়া ও তাঁহার পুত্র শাম্বজীকে ৫০০০ সেনার অধিনায়ক করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সর্দেশমুখী ও চৌথই ভারতরাজ্যের কাল। ইহাই উপলক্ষ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা সময়ে সময়ে ভারতের নানাদেশ আক্রমণ করিত। বঙ্গদেশেও আসিত, ইহা ছাড়া বঙ্গে উৎপাত করিবার আর একটি কারণ ঘটিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

শিবজী, খ্রীঃ ১৬৮০ অব্দে ৫ই এপ্রিল রাজগড়ে বাতরোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইহারই সহিত অভ্যুত্থিত বংশের পতন আরম্ভ হয়।

ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম না থাকাতে মহারাষ্ট্রীয়গণ এদিকে বড় উৎপাত করিত না। এই জন্য লোকে ক্রমে এদিকে আশ্রয় লইতে লাগিল। কাজে কাজেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের চক্ষুও ক্রমে সে দিকে পড়িতে লাগিল।

খ্রীঃ ১৬৯৬ অব্দে শোভাসিংহ নামে বর্দ্ধমানের একজন জমিদার বর্দ্ধমান রাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। সেই গোলযোগের সময় বঙ্গ-প্রবাসী ইউরোপীয়গণ নবাবের নিকট আত্মরক্ষার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তদনুসারে খ্রীঃ ১৬৯৮ অব্দে ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় ঐ সময়েই তাঁহারা সম্রাট আজিম ওসানের নিকট সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করিয়া লন।

খ্রীঃ ১৬৯৮ অব্দে যে দুর্গ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা বর্ত্তমান দুর্গ হইতে স্বতন্ত্র। উহা বর্ত্তমান ফেয়ার্লি প্লেসে কষ্টম হাউস প্রভৃতির স্থানে অবস্থিত ছিল।

খ্রীঃ ১৭০০ অব্দের প্রারম্ভে আর এক দল ইংরাজ বণিক ভারতে আগমন করেন। ১৭০৬ অব্দে উহঁারা পুরাতন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইলে, ফোর্ট উইলিয়মে ১৩০ জন ইউরোপীয় সৈনিক সন্নিবিষ্ট হয়।

খ্রীঃ ১৮১৩ অব্দে মুরশিদকুলি খাঁ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিম হন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি দেওয়ান ছিলেন। নাজিম পদ পাইয়া তিনি অন্য লোকের নিকট যেরূপ মাস্থল আদায় করিতেন, ইংরাজদিগের নিকটও তদ্রূপ দাওয়া করিলেন। এই জন্য ইংরাজেরা দিল্লীতে সম্রাটের নিকট হামিণ্টন নামক একজন ডাক্তারকে দূত রূপে প্রেরণ করেন। এই সময় সম্রাট পীড়িত ছিলেন। ডাক্তার হামিণ্টনের চিকিৎসায় তাঁহার আরোগ্য লাভ হইলে, তিনি ডাক্তার সাহেবকে পারিতোষিক প্রার্থনা করিতে বলেন। হামিণ্টন সাহেব আপনার লাভের অপেক্ষা স্বজাতীয়গণের লাভ অধিক প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে সুবিধাজনক একখানি সনন্দ সংগ্রহ করিলেন। সে সনন্দের বলে ইংরাজেরা যে সকল উপকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই—

"১। ইংরেজ কোম্পানি বিনা মাস্থলে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন।

২। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৮ টি মৌজা ক্রয় করিতে পারিবেন।

৩। মুরশিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন তাঁহাদের জন্য টাকা মুদ্রিত হইবে।

৪। যাহারা ইংরেজদিগের কাছে ঋণী, নবাবের কর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন।" *

এই সনন্দ লাভে ইংরাজদের বল অনেক বৃদ্ধি হয়।

খ্রীঃ ১৭১৬ অব্দে কলিকাতায় প্রথম গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ঐ গির্জ্জা রাইটার্স বিল্‌ডিংসের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। ঐ গির্জ্জার চূড়া

* বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ৫৮ পৃঃ।

১৭৩৭ অব্দের ঝড় ও ভূকম্পে পতিত হয়। তৎপরে সিরাজের আক্রমণে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

উপরে যে সনন্দের কথা বলা হইয়াছে, উহা খ্রীঃ ১৭১৭ অব্দে লব্ধ হয়। সুতরাং ঐ অব্দ বঙ্গে ইংরাজাধিকারের একটি স্মরণীয় অব্দ বলিতে হইবে।

এই অব্দের শেষেই ডাক্তার হ্যামিণ্টনের মৃত্যু হয়।*

এই সময়ে বর্ত্তমান চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণেই অরণ্য ছিল। এই অরণ্য ও খিদিরপুরের মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। শেঠবংশীয়দিগের আনীত লোকদ্বারাই ঐ গ্রামদ্বয় অধ্যুষিত হয়। এক্ষণে যেখানে চৌরঙ্গীর পরম রমণীয় সৌধমালা বিরাজ করিতেছে, তৎকালে সেই খানে জীর্ণকুটীরপূর্ণ একখানি সামান্য গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান বেলিয়াঘাটার দুই মাইল পশ্চিম পর্য্যন্ত অরণ্য ছিল। রাত্রে লোকে ব্যাঘ্রাদির ভয়ে সশঙ্ক থাকিত। এত অসুবিধা সত্বে বাণিজ্যের বৃদ্ধি শীঘ্র শীঘ্রই হইয়াছিল। ইউরোপীয়গণ এ স্থানে অতি স্বচ্ছন্দেই থাকিতেন। হ্যামিণ্টন সাহেব কলিকাতাবাসী ইংরাজগণের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন।

"বঙ্গে ইউরোপীয় নর নারীগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করেন। সকলেই প্রাতঃকালে বিষয় কর্ম্ম করিয়া মধ্যাহ্নে আহারান্তে বিশ্রাম করেন, এবং অপরাহ্নে কেহ বা মাঠে ও বাগানে গাড়ী বা পাল্কীতে করিয়া, কেহ বা চারি দাঁড়ের বজরায় করিয়া নদীতে ভ্রমণ করেন। কখন কখন নদীতে মাছধরা বা পাখীমারা কখন বা উভয়বিধ আমোদই হয়। রাত্রি হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা বন্ধুভাবে পরস্পরের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকেন।"

সুতরাং এই সময়ে কলিকাতার উন্নতির অবস্থা বলিতে হইবে।

* St John's church (সেণ্টজনসচার্চ্চ) বা পাথুরিয়া গির্জ্জার সন্নিহিত ভূমিতে ইহাঁর স্মরণ স্তম্ভে এই রূপ লিপি আছে—

"Under this stone lies interred the body of
WILLIAM HAMILTON SURGEON,
Who departed this life, 4th December, 1717.
"His memory ought to be dear to his nation, for the credit he gained the English, in curing Ferruksier, present King of Indostan, of a malignant distemper, by which he made his own name famous at the court of that great monarch, and without doubt, will perpetuate his memory as well in Great Britain as other nations of Europe."

এই লিপি পারসী ভাষাতেও আছে। J. B. KNIGHT's. *Calcutta* &. 120

চিত্র-বিদ্যা।

উপক্রমণিকা।

চিত্র-বিদ্যা, শিল্পশাস্ত্রের একটি প্রধান শাখা। অতি অসভ্য অবস্থা হইতেই মানুষ ইহার আদর করিয়া আসিতেছে। চিত্র যে সুন্দর—সৌন্দর্য্যের বিকাশক—চিত্রের যে, শোভা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আছে—তাহা মানুষ চিরকালই বুঝে, নহিলে, অসভ্য অবস্থায় দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহার দেহ চিত্রিত করিত না।

এই বিদ্যার চর্চ্চা, প্রায় সকল দেশে, সকল জাতীয় লোকেরাই করিয়া থাকে। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আদৃত হইয়া আসিতেছিল—এমন কি এই বিদ্যার বিশেষ উন্নতিও হইয়াছিল—মধ্যে কিরূপে ইহার অবনতি হইল, নিম্নে বিবৃত হইবে।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে (রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি

বেদের স্থানে স্থানেও) চিত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ সকল চিত্র যে কিরূপ তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমরা যদি ঐ সকল স্থানের কথা ধরিয়া আমাদের দেশের চিত্রবিদ্যার বিষয়ে স্পর্দ্ধা করি, তাহা হইলে অনেক মহাত্মা জগন্নাথ-ক্ষেত্রের 'জগন্নাথের পট' তাহার নমুনা বলিয়া উপহাস করিতে পারেন (আমার একজন নব্যসভ্যতা ও উন্নতিবাদী বন্ধু এক দিন এইরূপ বিবাদ করিয়াছিলেন)।

অতএব অতি প্রাচীন কালের কথা একেবারেই ছাড়িয়া দিলাম। পরবর্ত্তী কালের কথা উল্লেখ করিলেই আমা-দের প্রাচীন ভারতে চিত্রের অবস্থা অনেক জানিতে পারা যাইবে।

সংস্কৃত রত্নাবলী, উত্তররামচরিত, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থে চিত্রে যেরূপ উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, ঐ সকল গ্রন্থ রচয়িতাদের সময়ে সম্ভ্রান্তবংশীয় পুরুষ ও নারীগণ আমোদের জন্য চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন—সামান্য রূপ শিক্ষা নয়—রীতিমত প্রতিকৃতি পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিতে পারিতেন। যদি বল উহা কবি-কল্পনার অতিরঞ্জন—অত উন্নতি হইলে একেবারে সে চর্চ্চার লোপ হইল কিরূপে? তাহা পরে বলিতেছি। কিন্তু নাটকের চিত্র বর্ণনা যদিই কবিকল্পনার অতিরঞ্জন বল, তথাপি, ভদ্রবংশীয় নরনারী-গণের মধ্যে চিত্রশিক্ষার চলন না থাকিলে কখনই গ্রন্থকারগণ রাজা ও রাজবংশীয়দিগের দ্বারা চিত্রকার্য্যের উল্লেখ করিতেন না। আর, সমাজের যে অবস্থায় ভদ্রবংশীয় নরনারীগণ চিত্রবিদ্যা (সামান্য রূপও) শিক্ষা করিতেন, সে সময়ে চিত্রব্যবসায়ীরা যে উত্তমরূপে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

ঐ সকল গ্রন্থকার যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময় হইতে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই বিদ্যালোচনায় কোন ব্যাঘাত পড়ে নাই; পর পর কালের গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলমান রাজত্বে চিত্রবিদ্যার বিশেষ অধঃপতন ঘটিয়াছে। "সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা মুসলমান-দিগের যেরূপ অনুমোদনীয়, চিত্রবিদ্যার অনুশীলন সেরূপ হওয়া দূরে থাকুক, চিত্র রচনা করিলে ঈশ্বরের সহিত সৃজন বিষয়ে সমকক্ষতা করা হয়, এই বোধে, মুসলমানেরা চিত্রকার্য্যকে মনুষ্যের বিষম স্পর্দ্ধাসূচক, সুতরাং পাপ-জনক বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাতে চিত্রকার্য্য সম্বন্ধে হিন্দুজাতি মুসলমান রাজবংশীয়-দিগের নিকট হইতে যে, কতদূর উৎসাহ লাভে কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।"*

তাহার উপর আবার, খোদিত প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির ন্যায় চিত্রকার্য্য সুচিরস্থায়ী নয়। এই সকল কারণে এক্ষণে পূর্ব্ব উন্নত অবস্থার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু ভারতে আবার সকল বিষয়ে যুগাবর্ত্তন ঘটিতে চলিয়াছে। পূর্ব্ব গৌরবকে লক্ষ্য করিয়া আবার পূর্ব্বকীর্ত্তি উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। ভারত আবার সকল বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত হয়, ইহা সকলেরই ইচ্ছা। সুতরাং এ সময়ে শিল্পের উন্নতি চেষ্টাও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

আলিম্পন কার্য্য (Drawing) প্রায় অধিকাংশ শিল্পেরই মূল, এই জন্য চিত্রবিদ্যা প্রবন্ধের প্রথমাংশে ঐ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়া আমরা চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে অন্য সমস্ত বিষয় আলোচনা করিব।

ড্রয়িং-এর অনুবাদ স্থলে, আমরা কোথাও কোথাও 'আলিম্পন' কোথাও 'অঙ্কন' শব্দ ব্যবহার করিব। কোথাও বা 'ড্রয়িং' এই ইংরাজী শব্দও থাকিতে পারে।

জাতীয় উন্নতি যাঁহার অভিলষিত, তাঁহারই উচিত, যাহাতে দেশের সকল বিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা। স্ত্রী, পুরুষ উভয়েরই এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন আছে।

আলিম্পন কার্য্য (Drawing) শিক্ষা যে সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয় কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য এ প্রবন্ধে চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই; তাহা, শিল্প পুষ্পাঞ্জলির "চিত্র-বিদ্যার উপযোগিতা" ও তদ্রূপ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। তথাপি দুই একটি কথা বলি—

এই বিদ্যা শিক্ষা করিলে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি-(Perspective faculties)-র বৃদ্ধি হয়।

যাহারা অঙ্কিত করিতে জানে, তাহারা মনের ভাব সহজে বুঝাইতে পারে। বাস্তবিক কোন কিছু বর্ণনার শ্রেষ্ঠ অথচ সহজ উপায় উহা অঙ্কিত করা। আবার দেখ এই বর্ণনা সকল লোকেই বুঝিতে পারে। একজন লেখক † বলিয়াছেন, "Drawing * * * is a simple kind of *shorthand* which enquires no translation.

ভ্রমণকারী যদি অঙ্কনে সুপটু না হন, তাহা হইলে তিনি কখনই আপনার দৃষ্ট বস্তু অন্যকে সুন্দর রূপে বুঝাইতে

* আর্য্য জাতির শিল্প চাতুরি, পৃঃ ৬৯—৭০।

† Charles Ryan.

পারিবেন না। কোন স্থানের একখানি চিত্রপট দেখিলে, সেই স্থানটি যেমন বুঝা যাইবে, একখানি পকাশৎ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকের বর্ণনা দৃষ্টে তেমন বুঝা যাইবে না। অবশ্য চিত্র অনুরূপ হওয়া চাই)। সময়ে ভ্রমণকারী প্রায় সকলকেই হতেই হয়। সুতরাং ইহার কত প্রয়োজন তাহা বুঝাইবার জন্য আর অধিক আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না।

এ প্রবন্ধে চিত্রবিদ্যা এবং চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি শিল্পবিদ্যার মূলসূত্র আলিম্পনকার্য্য (Drawing and shading) কি রূপে আয়ত্ব করিতে হয়, তাহারই স্থূল তত্ত্ব বিবৃত করা যাইবে।

অনেকের এই রূপ বিশ্বাস যে আলিম্পন কার্য্য শিক্ষার প্রয়োজন—হয় আমোদ লাভ—না হয় অর্থলাভ। সত্য বটে চিত্র করিতে জানিলে, অবসর কাল আমোদে কাটান যায় এবং অর্থলাভও ঘটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে এই বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যই কেবল তাই, তাহা মনে করা উচিত নহে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের লোকের এই সংস্কার থাকিবে, ততদিন শিল্প হইতে দেশের যে উপকারের সম্ভাবনা, তাহা লাভ হওয়া দুর্ঘট।

একজন লেখক* বলিয়াছেন, "So far from looking upon a knowledge of the art of Drawing as necessary merely to the Artist or Designer, we hold that it should form an essential part of general education—that its proper place is in the daily school, that its principles and practice should be inculcated in the daily lesson; in short, that equally with reading or writing, so should Drawing be deemed one of the branches of every day-tuition."

নানা লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়া চিত্রবিদ্যা (অন্ততঃ Drawing) যে অবশ্য শিক্ষণীয় তাহা প্রমাণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিরূপে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে, এই প্রবন্ধের পরে পরে তাহারই পথ প্রদর্শিত হইবে। আমাদের দেশে (শিল্পবিদ্যালয়ে) শিক্ষার সময়ে অনেকেই (আর কতদিন এ শ্রেণীতে থাকিব বলিয়া) বড় উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু তাঁহারা যদি বিশেষ রূপে বুঝিতে পারেন যে, প্রথমে সহজ সহজ বিষয় লইয়া অত বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি? তাহা হইলে বোধ হয় আর তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হন না।

প্রথম শিক্ষা সময়ে সহজ সহজ বিষয়ে বিলম্ব করিবার ফল এই যে, সামান্য বিষয়ের সামান্য ত্রুটিও সহজে নয়নগোচর হয়। প্রাথমিক লাঙ্গন কার্য্য (Elementary linear drawing) সম্বন্ধেই বলি; মনে কর যে চিত্রে কেবল তিনটি রেখা আছে, তাহার যদি একটি একটুও বাঁকিয়া যায় তাহা ছাত্র নিজেই সহজে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যদি একটি চিত্রে ২৫টি কি ৩০টি রেখা থাকে, তাহার কোন একটি যদি গোলমাল হইয়া যায়, তাহা ধরা অনেক সময় শিক্ষকের পক্ষেই অসাধ্য হয়—ছাত্র ত দূরের কথা এবং ঐ রূপেই ছাত্রের সুশিক্ষা পক্ষে ব্যাঘাত পড়ে। এই জন্য সহজ সহজ বিষয় প্রথমে ভাল করিয়া শিক্ষা করা উচিত; তাহা হইলে শেষে গুরু বিষয়ে আর কষ্টভোগ করিতে হয় না। সিঁড়িতে এক এক ধাপ করিয়া উঠিলে ২০০ ধাপ উঠিতে ও তত কষ্ট বোধ হয় না, কিন্তু দুই দুই ধাপ করিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিলে ২৫।৩০ ধাপ উঠিলেই পা ধরিয়া যায়।

আলিম্পন (Drawing) শিক্ষা করিতে গেলে প্রথমে রেখাঙ্কন সুন্দররূপে অভ্যাস করিবে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে নিম্ন লিখিত প্রকরণ গুলি পরে পরে অভ্যাস করিতে হইবে।

১। সরল অসরল রেখা দ্বারা গঠিত বিবিধ প্রকার আকারের রৈখিক চিত্র আলেখ্য দর্শনে অভ্যাস করিবে।

রেখাদ্বারা অঙ্কনকে সংস্কৃতে লাঙ্গন কার্য্য বলে।

২। সামান্য সামান্য ছায়ালোক যুক্ত চিত্র আলেখ্য দর্শনে অভ্যাস করিবে।

৩। জ্যামিতিক আকারযুক্ত চিত্র আলেখ্য দৃষ্টে এবং সামান্য সামান্য দ্রব্য দৃষ্টে লাঙ্গন কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে।

এই সময়ে একখানি ছোট খাতা করিয়া কচুপাতা, ইট প্রভৃতি সামান্য সামান্য দ্রব্য আকিবার চেষ্টা করা উচিত। পাতা কখন তুলিয়া আঁকিবে না, গাছের কাছে গিয়া আঁকিবে। তোলা পাতা শীঘ্র আতড়িয়া পড়ে।

৪। সামান্য সামান্য দ্রব্য দেখিয়া ছায়ালোক সম্বলিত করিয়া আলিম্পন অভ্যাস করিবে।

৫। উত্তর উত্তর ভারি দ্রব্য দেখিয়া রৈখিক চিত্র ও তাহার ছায়ালোক প্রদর্শন অভ্যাস করিবে।

সঙ্গে সঙ্গে আলেখ্য দেখিয়া ও তদ্রূপ দ্রব্য অঙ্কন অভ্যাস করা যাইতে পারে, কিন্তু আলেখ্য দর্শনে চিত্র করা অপেক্ষা বস্তু দর্শনে চিত্র করাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

৬। গৃহ ভিত্তির অলঙ্কার (যেমন থামের মাতলা, ঠাকুর দালানের ফুল ইত্যাদি—উড়িষ্যার মন্দির প্রভৃতির অলঙ্কার সকল এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইলেও উহা সকলের পক্ষে সুপ্রাপ্য নহে সুতরাং সুবিধা জনকও নয়) লতা, পাতা, ফল, ফুল, পল্লব প্রভৃতি আলেখ্য এবং গঠন (Cast.) দৃষ্টে অভ্যাস করিবে।

* Robert Scott Burn, F. S. E. &c.

৭। মানুষের এবং অন্যান্য জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ক্রমে সম্পূর্ণ দেহ, আলেখ্য ও গঠন (Cast) দৃষ্টে প্রথমে রৈখিক অঙ্কন পরে ছায়ালোক প্রদর্শন।

৮। ফল, ফুল, লতা, পল্লবাদি, স্বাভাবিক দ্রব্য দৃষ্টে।

৯। জন্তুর দেহ জীবিত প্রাণী দৃষ্টে।

১০। মানুষের মুখ জীবিত প্রাণী দৃষ্টে।

১১। ব্যবহারিক জ্যামিতি।

১২। পরিপ্রেক্ষিত প্রভৃতি।

বর্ণ মিলাইবার চেষ্টা অষ্টম প্রকরণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই করিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে দ্বিতীয় প্রকরণ হইতেই সেপিয়া (Sepia) দ্বারা বর্ণ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

অনেকে একেবারে লাফাইয়া, আগা ধরিতে চান, তাহার দোষ কত, একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতঃপর উল্লিখিত প্রকরণ সমূহ আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহের সহিত বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব। বাঙ্গালা ভাষায় এই উদ্যম প্রথম বলা যাইতে পারে, অতএব শিল্পিগণ যে সকল ভ্রম প্রমাদ পাইবেন, জানাইলে, সংশোধন করিয়া যাহাতে দেশীয়গণের মধ্যে ভুল মত প্রচারিত না হয় সে বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন করিব।

প্রথম অধ্যায়।

ELEMENTARY DRAWING AND SHADING.

অঙ্কনাধ্যায়।

প্রথম প্রকরণ।

DEFINITIONS.

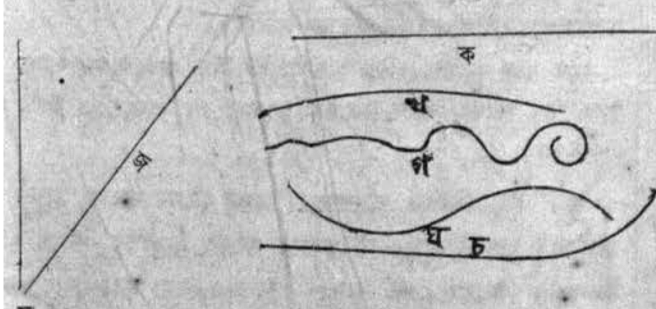
সংজ্ঞা।

১। এক স্থান হইতে অন্য স্থান পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে পেনসিল টানিয়া গেলে যে দাগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আলিম্পন কার্য্যে রেখা বলে।

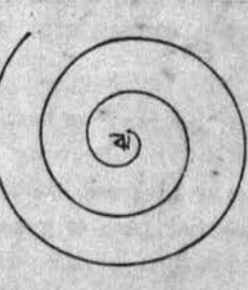
রেখার ইংরাজী নাম লাইন (Line)।

রেখা (Line) চারি প্রকার—সরল রেখা (Straight Line; ক, ছ, জ এবং ঞ দেখ); বক্র রেখা (Curved Line; খ দেখ); আন্দোলিত রেখা (Waving line; গ, ঘ দেখ) এবং কুণ্ডলিত রেখা (Scroll or Spiral line; ঝ দেখ)।

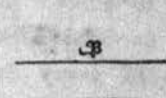
সরল রেখা আবার তিন প্রকার—লম্বরেখা (Perpendicular or vertical line, জ দেখ; সমতল রেখা (Horizontal line; ক দেখ) এবং কোণমুখী রেখা (Oblique line; জ দেখ)।



আর এক প্রকার রেখা হইতে পারে—যদি কোন রেখার কতকাংশ সরল ও অবশিষ্টাংশ বক্র হয়, তবে ঐ রেখা মিশ্র (Mixed) পদবাচ্য হইবে (চ দেখ)।

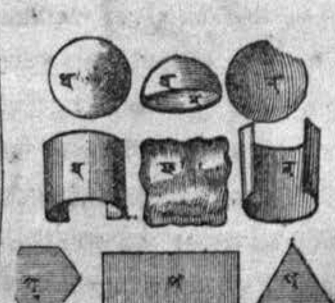


২। দুইটি বা তদধিক সরল রেখা যদি বরাবর সমান অন্তরে থাকে, তবে তাহারা সমান্তর রেখা (ঞ দেখ)।



সমান্তর রেখার ইংরাজী নাম প্যারালেল লাইন্‌স (Parallel lines)।

৩। একটি বা বহু রেখা দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে ক্ষেত্র বলে। চিত্র বিদ্যায় ঐ বেষ্টন রেখার নাম সীমাচিত্র।



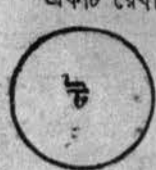
ক্ষেত্রের ইংরাজী নাম ফিগার (Figure)। কিন্তু চিত্রবিদ্যায় ফিগার বলিলে নরমূর্ত্তি (Human figure) বুঝায়।

সীমা-চিত্রের ইংরাজী নাম আউটলাইন (Outline)।

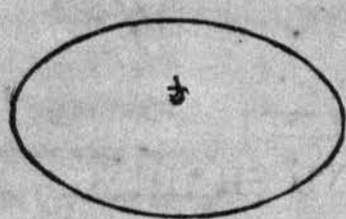
ক্ষেত্র অশেষ প্রকার। সকল প্রকার ক্ষেত্রের নামকরণ হয়

নাই। তথাপি ইহা চারি জাতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, (১) ন্যুব্জ (Convex ধ দেখ), (২) গভীর (Concave ন দেখ) (৩) সমতল (Plane প দেখ), (৪) অসমতল অর্থাৎ যাহার কোন স্থান উচ্চ কোন স্থান নীচু (ফ দেখ)।

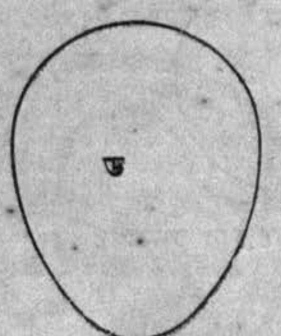
একটি রেখার দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র—



(১) বৃত্ত (Circle ট দেখ,) ইহার সীমা মধ্যস্থল হইতে সমদূর-বর্ত্তী।



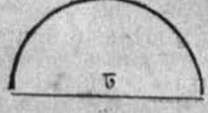
(২) বৃত্তাভাস বা বৃত্তগন্ধি ক্ষেত্র (Elliptical figure ঠ দেখ,) ইহার মধ্যস্থলের দুই দিকে দুইটি করিয়া স্থান পরস্পর সমান।



(৩) ডিম্বাকার ক্ষেত্র (Oval or Egg shaped figure, ড দেখ,) ইহার মধ্য রেখার যে কোন স্থানে বিন্দু লইয়া উভয় পার্শ্বে একপ্রকার কোণ করিয়া রেখা টানিলে ঐ দূরত্বদ্বয় সমান হইবে।

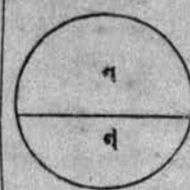
এতদ্ব্যতীত এক রেখা দ্বারা অন্য অনেক প্রকার ক্ষেত্র হইতে পারে তাহাদের নাম নাই।

দুইটি রেখা দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র—



(১) অর্দ্ধবৃত্ত (Semi circle, ঢ দেখ)। বৃত্ত পরিধি (Circumference)-র অর্দ্ধাংশ ও ব্যাস (Diameter) দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র।

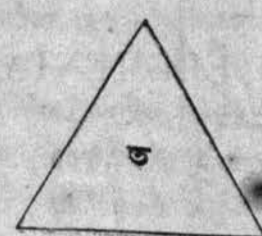
যে রেখার দ্বারা বৃত্ত সীমাবদ্ধ তাহার নাম পরিধি। ঠিক মধ্যস্থল দিয়া উভয় দিকে পরিধি স্পর্শ করিয়া কোন সরল রেখা অঙ্কিত করিলে তাহাকে ব্যাস বলে। পরিধির ইংরাজী নাম সারকম্‌ফারেন্স ও ব্যাসের ইংরাজী নাম ডায়ামিটর।



(২) বৃত্তাংশ (Segment of a circle ণ দেখ,) যে কোন স্থান দিয়া সরল রেখা টানিলে ঐ রেখা দ্বারা ও কর্ত্তিত পরিধির অংশ দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রকে বৃত্তাংশ বলে।

বৃত্তগন্ধির কোন অংশ ও এক সরল রেখা, দুইটি বক্র, একটি বক্র একটি আন্দোলিত রেখা প্রভৃতির দ্বারাও ক্ষেত্র হইতে পারে।

তিনটি রেখার দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র বা ত্রিভুজ (Triangle)—

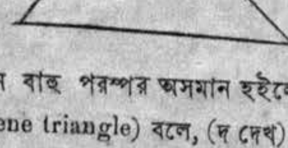


(১) তিনটি সমান সরল রেখার দ্বারা অঙ্কিত ক্ষেত্রকে সমবাহু ত্রিভুজ (Equilateral Triangle) বলে, (ত দেখ)।

সরল রেখা দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রের রেখাগুলিকে ভুজ বা বাহু (Side) বলে।

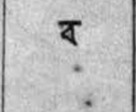


(২) দুইটি সমান ও অপরটি অন্যবিধ সরল রেখা দ্বারা বেষ্টিত ত্রিভুজকে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ (Isosceles triangle) বলে, (থ দেখ)।



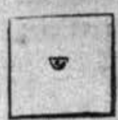
(৩) তিন বাহু পরস্পর অসমান হইলে উহাকে অসমবাহু ত্রিভুজ (Scalene triangle) বলে, (দ দেখ)।

শেষ দ্বিবিধ ত্রিভুজ সমকোণী হইতে পারে।

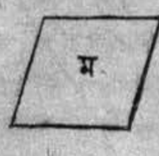


যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ Rightangle ব দেখ) তাহার নাম সমকোণী ত্রিভুজ Rightangled triangle)।

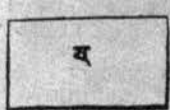
বৃত্তাংশ ও দুই সরল রেখা, এবং সরল ও অসরল রেখা দ্বারা বহু প্রকার ত্রিরেখান্বিত ক্ষেত্র হইতে পারে।



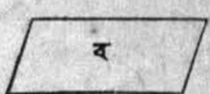
(১) বর্গ ক্ষেত্র (Square) ইহার চারি বাহু সমান ও চারি কোণ সমকোণ (ভ দেখ)।



২। সমচতুর্ভুজ বা রম্বস (Rhombus) ইহার চারিকোণ সমকোণ নহে, কিন্তু বিপরীত কোণদ্বয় সমান হইবে (ম দেখ)।

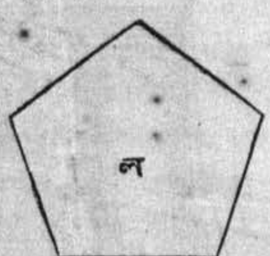


(৩) সমকোণী চতুর্ভুজ-(Parallelogram)-এর চারিটি কোণ সমকোণ ও বিপরীত বাহুদ্বয় সমান হইবে (য দেখ)।



(৪) রম্বয়ড ক্ষেত্রে-(Rhomboid)-র বিপরীত বাহুদ্বয় ও কোণদ্বয় পরস্পর সমান। কিন্তু ইহা সমকোণী নহে (ব দেখ)।

এতদ্ব্যতীত চারি সরল ও অসরল রেখায় আরও নানা প্রকার ক্ষেত্র হইতে পারে।



পাঁচ প্রভৃতি অধিক রেখার দ্বারা অঙ্কিত ক্ষেত্রকে পঞ্চভুজ (Pentagon, ল দেখ) প্রভৃতি বলে।

গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকে এ সকল নাম জানেন; সংজ্ঞা প্রকরণ তাঁহাদের জন্য নয়। যাঁহারা ঐ সকল জানেন না অথচ অঙ্কন কার্য্য শিখিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সুবিধার জন্যই বিশেষ বিশেষ কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া গেল।

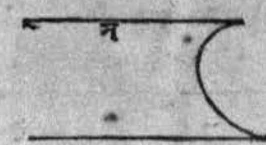
আরও কতকগুলি মিশ্ররেখা ও ক্ষেত্র আছে, ঐ সকলের শিল্পে বহু প্রচলন বলিয়া নাম ও আকার দেওয়া গেল যথা—

লাইন অব বিউটি (Line of beauty, ষ দেখ)।

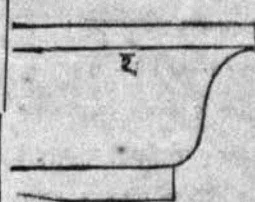
অগি (Ogee শ দেখ) ইহা চিত্রের কেবল বক্র অংশ টুকুকেই বলে।



একিনস্ (Echinus, ষ দেখ) স্থাপত্যে ইহার বহু প্রচলন।



স্কোসিয়া (Scotia, স দেখ) ইহার বক্র অংশ টুকু, ব্যবহারিক জ্যামিতি অবলম্বনে দুইটি পরিধি খণ্ড দ্বারা অঙ্কিত করা যায়।

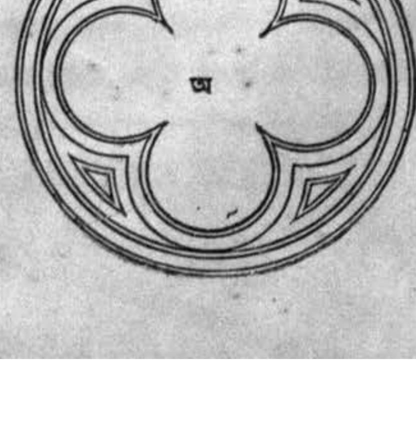


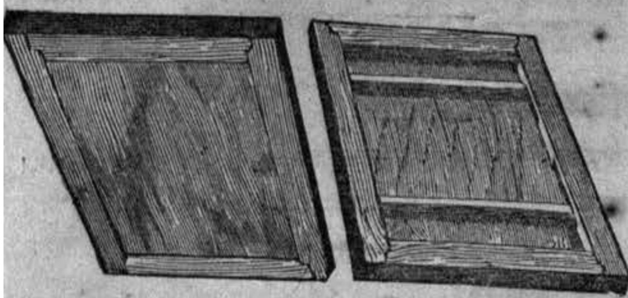
সাইমা রেকটা (Cyma recta, হ দেখ) লাইন অব বিউটির প্রয়োগ। স্থাপত্য তক্ষণ-কার্য্য প্রভৃতিতে ইহার বহু প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃতে ইহার নাম পদ্মবন্ধ।

কেবল বৃত্ত ও বৃত্তাংশ দ্বারা সংগঠিত বহু প্রকার আকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে—



ত্রিফয়েল (Trefoil, ক্ষ দেখ) কোয়াটরফয়েল (Quatrefoil, অ দেখ)।





তলা।　　　　উপর।

প্রথম চিত্র।

যে সকল আকারের নাম জানা প্রয়োজন, তাহা উপরে দেওয়া গেল। এক্ষণে যে সকল দ্রব্য সচরাচর আলিম্পনে প্রয়োজন হইবে তাহাদের নাম ও স্বরূপ দেওয়া হইতেছে।

(১) ড্রয়িংবোর্ড-(Drawing board)—একখানি প্রশস্ত তক্তা উত্তমরূপে পালিস করিয়া বাতা দিয়া উত্তম রূপে আঁটিয়া লইবে যেন রৌদ্রের উত্তাপ পাইলেও বাঁকিয়া না যায়। ইহাতে ড্রয়িং করিবার কাগজ আঁটিয়া তাহার উপরে ড্রয়িং করিতে হয়। প্রথম চিত্রে একখানি উৎকৃষ্ট ফ্রেম করা ড্রয়িং বোর্ডের উভয় পৃষ্ঠের প্রতিরূপ দেওয়া গেল।

(২) বিভিন্ন প্রকারের পেনসিল যথা—H. HB. B. BB. BBB.; এই কয়েক প্রকার পেনসিলের মধ্যে অবয়ব অঙ্কনে (Sketching) HB. ব্যবহৃত হয়। তৎপরে H. দিয়া ঐ ড্রয়িং পরিষ্কার করিয়া আঁকিতে হয়। B. BB. BBB. উত্তরোত্তর অধিক কৃষ্ণবর্ণ উৎপাদন করে, ঐ সকল পেনসিল ছায়ালোক প্রদর্শন-(Shading)-জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩) পেনসিলের ভ্রমপূর্ণ দাগ উঠাইবার জন্য রবরের (India Rubber) প্রয়োজন। রবর যত নরম হয় ততই ভাল। শক্ত রবরে কাগজের রেণু গুড়া হইয়া উঠিয়া কাগজ পাতলা হইয়া যায়।

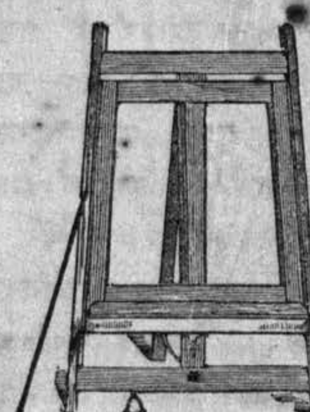
(৪) ড্রয়িং করিবার কাগজ মোটা, শক্ত ও মসৃণ হওয়া উচিত। ভাল ফুলিস্ক্যাপ কাগজেও পেনসিল ড্রয়িং হইতে পারে, কিন্তু ছায়ালোক প্রদর্শন জন্য ঈষৎ মসৃণ কাগজ ব্যবহার করা ভাল।

উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

(১) কন্টি-ক্রেয়ণ (Conte á Paris)—নং ১ ২ ও ৩ এই তিন প্রকার ক্রেয়ণ সেডিং কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। B. BB ও BBB. পেনসিলের ন্যায় এই তিন প্রকার উত্তরোত্তর কৃষ্ণবর্ণ। (আজ কাল এক প্রকার ক্রেয়ণ উঠিয়াছে উহা এক দুই অনুসারে উত্তরোত্তর অল্প কৃষ্ণ)। ক্রেয়ণে ছায়ালোকের গভীরতা স্পষ্ট অনুভূত হয়।

২। পোর্ট-ক্রেয়ণ (Porte Crayon)—ইহাকে ক্রেয়ণ হোলডার-(Crayon holder)-ও বলে। অঙ্কনকারীদের পেনসিল দীর্ঘ হওয়া উচিত। ক্ষুদ্র ক্রেয়ণ বা পেনসিল ইহার দ্বারা ধরিলে দীর্ঘ হয়। ক্রেয়ণের দাগ তুলিতে পামরুটি ব্যবহৃত হয়।

পেনসিলের পরিবর্ত্তে কয়লার দ্বারা অবয়ব অঙ্কিত করিলে অনেক সুবিধা হয়। কয়লার দাগ ঝাড়িলেই প্রায় উঠিয়া যায়।



দ্বিতীয় চিত্র।

দ্রব্য দেখিয়া অঙ্কিত করিবার সময় ইজেল (Easel) ছড়ি (Mahl-Stick) এবং ক্ষুদ্র ওলন (Plummet), প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় চিত্রে ঐ সকল দ্রব্যের প্রতিরূপ দেওয়া গেল। অতঃপর আলিম্পন কার্য্য কিরূপে আরম্ভ করিতে হইবে তাহাই বিবৃত করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

কলিকাতার ইতিহাস।

(৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

চতুর্থ অধ্যায়।

খ্রীঃ ১৭৩৭ অব্দের ঝড় ও ভূমিকম্প—বর্গীর হাঙ্গামা—মহারাষ্ট্রীয় খাত—সিরাজ-উদ্দৌলা—কলিকাতার গবর্ণরগণ—রোজার ড্রেক—কৃষ্ণদাস—সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ—অন্ধকূপ হত্যা।

জগতে কাহারও অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। খ্রীঃ ১৭৩৭ অব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে ভাগীরথীতে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পও হয়। এই ভূমিকম্পেই প্রাচীন সেণ্টজন্‌স্ চর্চ্চের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। কলিকাতায় প্রায় দুই শত গৃহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শুনা যায় নৌকা ডিঙ্গা জাহাজ প্রভৃতিতে প্রায় ২০০০০ জলযান স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায়। গঙ্গায় ইংরাজদের নয়খানি জাহাজের মধ্যে আটখানি নষ্ট হইয়াছিল। নাবিকেরা প্রায় অনেকেই মরিয়াছিল। এই ঝড়ে ও ভূমিকম্পে প্রায় ৩০০,০০০ প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছিল। *

খ্রীঃ ১৭৪০ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। তাঁহারই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। খ্রীঃ ১৭২০ অব্দে দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে যে চৌথ পাইবার কথা নির্দ্ধারিত হয় সেই চৌথের জন্য তাহারা সর্ব্বত্রই দাবী করিত। এখন তাহারা সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই বঙ্গ আক্রমণ করে। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন নবাব আলিবর্দ্দি কোন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন, ইহাও তাহাদের জাতক্রোধ হইবার এক কারণ। যাহাই হউক তাহাদের উৎপাতে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই ইতিহাসে "বর্গীর হাঙ্গামা" নামে প্রসিদ্ধ। এই উপলক্ষেই মহারাষ্ট্রীয় খাত নিখাত হয়।

আলিবর্দ্দির পর সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হন। "কলিকাতা সংস্থাপক চার্ণকের সময়াবধি সিরাজউদ্দৌলার সময় পর্য্যন্ত ফ্রিক, ক্রটেনডেন্, ব্রেডিল, ফরষ্টর, আলেকজাণ্ডার ডেসন্, উইলিয়ম কাউইচ ও রোজর ড্রেক ক্রমান্বয়ে ইংরাজদের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই ড্রেকের সময় এক কাণ্ড ঘটে, যাহাতে ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন। সিরাজউদ্দৌলা ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের ধন হরণে চেষ্টা করে। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস, ধনরাশি লইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক ইংরাজের শরণাপন্ন হন। ড্রেক তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে ইংরাজদিগের নিকট কৃষ্ণদাসকে চাহিয়া পাঠান এবং বলেন কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে না দিলে, তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিবেন। ড্রেক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফল এই হইল—খ্রীঃ ১৭৫৬ অব্দের ১৭ই জুন ৫০০০০ সৈন্য লইয়া সিরাজ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। হলওয়েলের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে ইংরাজ পক্ষে আন্দাজ ১৭০ জন মাত্র যুদ্ধ করিয়াছিল; তাহার মধ্যে ২৫ জন মৃত এবং প্রায় ৭০ জন আহত হইয়াছিল।

* এই রূপ বর্ণনা ঐ সময়ে প্রকাশিত বিলাতী Gentleman's Magazine নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ড্রেক সাহেব স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে লইয়া জলপথে পলাইয়াছিলেন। যখন সিরাজ দুর্গ অধিকার করেন, তখন ১৪৬ জন মাত্র বন্দী তাঁহার করতলগত হয়। সিরাজ বন্দীদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আপনার সেনানায়কের হস্তে তাঁহাদের রক্ষাভার অর্পণপূর্ব্বক, বিশ্রাম জন্য শিবিরে প্রস্থান করেন। সেনানায়ক নির্ব্বোধের ন্যায়, সেই বন্দীদিগকে 'অন্ধকূপ' নামক একটি ক্ষুদ্র কারাগারে সে রাত্রির মত আবদ্ধ করিয়া রাখিল। প্রাতঃকালে সেই গৃহ হইতে মৃতপ্রায় ২৩ জনকে মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

কিন্তু এই ১২৩ জনের রক্তেই, ইংরাজের ভারতে প্রোথিত সৌভাগ্যতরু কালে ফলবান হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

হলওয়েল সাহেব—পুরাতন সেণ্টজনের গির্জ্জা—আলীনগর—মান্দ্রাজে কলিকাতা আক্রমণ সংবাদ—ক্লাইব ও ওয়াটসন—কলিকাতা হইতে পলায়নের পর ড্রেক প্রভৃতির অবস্থা—ক্লাইবের বজবজিয়া অধিকার—কলিকাতা পুনরধিকার—হুগলী অধিকার—অন্ধকূপ-স্মরণ-চিহ্ন—সিরাজউদ্দৌলার ইংরাজদের সহিত সন্ধি—ফরাসী ইংরাজে—চন্দননগর আক্রমণ—সিরাজউদ্দৌলার ক্রোধ—পলাসীর যুদ্ধ—মিরজাফর—মিণ্ট ও প্রথম মুদ্রা—খৃঃ ১৭৫৬ অব্দ।

অন্ধকূপ হইতে যে ২৩ জন পুনরায় সূর্য্যের মুখ দেখিয়াছিলেন, হলওয়েল সাহেব তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহারই বর্ণিত বিবরণ দ্বারা অন্ধকূপ ঘটনা জানিতে পারা যায়।

হলওয়েল সাহেবের বর্ণনা-(Mr. Howell's Narrative), তে জানা যায় তাঁহারা তৎপরদিন নবাব সেনাপতি মীরমদন কর্ত্তৃক অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়া পরে নবাব কর্ত্তৃক মুক্ত হন।

সিরাজউদ্দৌলা সহস্র দোষে দোষী হইলেও অন্ধকূপ-হত্যা বা ইংরাজ কয়েদীদের উপর অত্যাচার জন্য দোষী নহেন।

সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণে দুর্গের বহিস্থিত যে সকল গৃহ নষ্ট হয়, কলিকাতার প্রথম গির্জ্জা (St. John's Church) তাহার মধ্যে একটি।

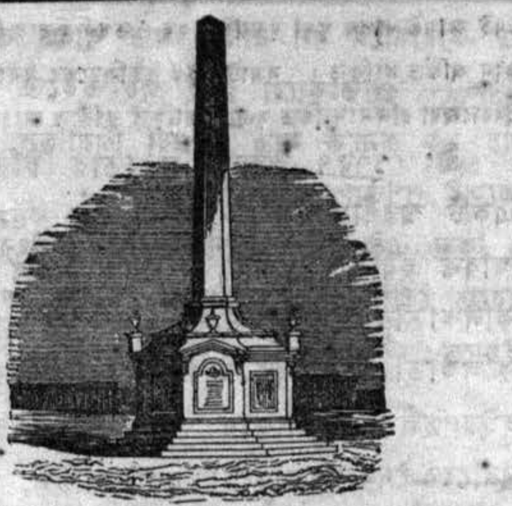
সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিয়া, ইহার নাম আলীনগর রাখেন, এবং কয়েকদিন মাত্র এখানে অবস্থিতি করিয়া, আপনার সেনাপতি মাণিকচাঁদকে কয়েকজন মাত্র সৈন্যের সহিত রাখিয়া প্রস্থান করেন।

কলিকাতা আক্রমণের সংবাদ সাত সপ্তাহ পরে মান্দ্রাজে পৌঁছিয়াছিল। সম্বাদ পৌঁছিলে কর্ণেল ক্লাইব ও আড্‌মিরাল ওয়াটসন ৫ খানি রণতরী ও ৫ খানি বাণিজ্যতরীতে ৯০০ ইউরোপীয় এবং ১৫০০ সিপাহী সৈন্য লইয়া ১০ই অক্টোবর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ড্রেক প্রভৃতি এতদিন ফলতায় জাহাজে বাস করিতেছিলেন। ১৫ই ডিসেম্বর ক্লাইব এবং ওয়াটসন্ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন ও ক্রমে ক্রমে বজবজিয়া, কলিকাতা ও হুগলী অধিকার করিলেন।

কলিকাতায় অতি অল্প মাত্র সৈন্য ছিল সুতরাং অধিকার করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। খৃীঃ ১৭৭৫ অব্দে ২রা জানুয়ারি কলিকাতা পুনরায় অধিকৃত হয়।

অন্ধকূপ হত্যার স্মরণার্থ হলওয়েল সাহেব নিজ ব্যয়ে ৫ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ (obelisk) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভ লালদিঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল।



খ্রী: ১৮৪০ অব্দে মার্কুইস অব হেষ্টিংস্এর আদেশে ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

নবাব, কলিকাতা প্রভৃতি অধিকারের কথা শুনিয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা সম্রাট-দত্ত ক্ষমতা ব্যতীত, কলিকাতায় একটি দৃঢ়তর দুর্গ নির্ম্মাণ ও টাকশাল স্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত নবাব স্বীকার করেন, কলিকাতার আক্রমণে কলিকাতার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবেন।

এই সময়ে বিলাতে ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ বাধিয়াছিল, সেই জন্য ক্লাইব চন্দননগরে ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ঐ যুদ্ধ নবাবের অনভিমত হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহারই ফল পলাসীর যুদ্ধ।

কিন্তু পলাসীর যুদ্ধের ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর কারণ ছিল।

"মীর জাফর আলি খাঁ নামক একব্যক্তি আলিবর্দ্দি খাঁর দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নবাবের সৈন্যের অধ্যক্ষতা ইহাঁর উপর সমর্পিত ছিল। এক্ষণে (সিরাজউদ্দৌলার) এই সৈন্যাধ্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীরজাফর গোপনে নবাবের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। এই সময়ে জগৎশেঠ মহাতাব রায় মুর্শিদাবাদের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। কারবারে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। নবাব, মহাতাব রায়কে বণিকদিগের নিকট হইতে তিনকোটি টাকা তুলিয়া দিতে বলেন, মহাতাব রায় ইহাতে এই উত্তর করেন যে, এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে। নবাব এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎশেঠ মহাতাব রায়ের অপমান করিলেন। মহাতাপ রায় এ অপমান অমনি অমনি ভুলিতে পারিলেন না। প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকন্তু ইংরাজদিগের প্ররোচনায় গোপনে তাহাদের সহিত মিশিলেন।" *

বাস্তবিক জগৎশেঠের ন্যায় ধনকুবের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত না হইলে, ক্লাইব নবাবের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিতেন কি না সন্দেহ।

কৃষ্ণচন্দ্র চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায় মীরজাফর, জগৎশেঠ, মহাতাব রায়, নবাবের মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ রায়দুর্ল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাণী ভবানী, খোজাবাযেজিদ, বণিক উমাচাঁদ প্রভৃতি নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং রাণী ভবানী ব্যতীত সকলেই ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বন করেন।

ক্লাইব প্রধান প্রধান দেশীয়দিগকে সহায় পাইয়া, নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কলিকাতার প্রায় ৩৫ ক্রোশ উত্তরে পলাশীর বিস্তীর্ণ আম্রকাননে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্লাইব ১৮৮০ জন ইউরোপীয় এবং ২৮৮০ জন সিপাহী সঙ্গে নবাবের ৩৫০০০ পদাতি ও ১৫০০০ অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। এ যুদ্ধে তাঁহার প্রধান ভরসা মীরজাফর। বাস্তবিক মীরজাফর যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নবাবকে সৈন্য ফিরাইতে না বলিলে ক্লাইবের পক্ষে পলাশীক্ষেত্রে জয়লাভ করা কঠিন হইত। ইতিতত্ত্ববিদ হণ্টর সাহেব লিখিয়া-

* বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত ভারতের ইতিহাস ইংরাজ রাজত্ব ৩১—৩২ পৃষ্ঠা।

ছেন নবাব যখন প্রাতে ৬টার সময় ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন, তখন ক্লাইব, আপনার সৈন্য-দিগকে আম্রকাননে লুকাইয়া রক্ষা করেন। তারপর যুদ্ধের অবহার হইলে যখন নবাব-সৈন্য আহারের উদ্যোগে ব্যস্ত, তখন তাহাদের শিবির আক্রমণ করিয়া অধিকাংশ সৈন্য নষ্ট করেন। * বাস্তবিক এই রূপ কার্য্যই ইংরাজদের ভারতাধিকার কার্য্যে কলঙ্ক রেখা। খ্রীঃ ১৭৫৭ অব্দের ২৩এ জুন এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধে নবাবের দুইজন বাঙ্গালী সেনাপতি মাত্র প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। মীরমদন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। আর সেনাপতি মোহনলালের নাম পলাসী বৃত্তান্তে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

পরাজিত হইয়া সিরাজউদ্দৌলা ফকির বেশে পলায়ন করেন। কিন্তু ধৃত হইয়া মীরজাফরের পুত্র মীরনের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হয়।

সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাব করিলে, ইংরাজেরা সিরাজউদ্দৌলার সন্ধির মর্ম্মানুসারে টাকশাল (Mint) স্থাপিত করেন। খ্রীঃ ১৭৫৭ অব্দের ১৭ই আগষ্ট প্রথম মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হয়। তখন মুদ্রায় দিল্লীশ্বরের নাম অঙ্কিত থাকিত। সম্রাট চতুর্থ উইলিয়মের সময় হইতেই ইংরাজেরা রাজনামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন।

* Vide W. W. HUNTER's Brief History of the Indian People, P. 166.

খ্রীঃ ১৭৫৭ অব্দ কলিকাতার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অব্দ। এই অব্দেই বর্ত্তমান দুর্গ আরব্ধ হয়—এই অব্দ হইতেই সকল বিষয়ে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে আরম্ভ হয়—পুরাতন কলিকাতা সিরাজের উপদ্রবে একপ্রকার নষ্টই হইয়াছিল। বড়বাজার অঞ্চলের সমস্ত গৃহই নবাবের সৈন্যগণ পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল, নগরের প্রধান প্রধান গৃহ বিশেষতঃ গির্জ্জাটির ধ্বংশাবশেষে দুর্গ মধ্যে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতার অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই দূরে অরণ্যে পলায়ন করিয়াছিল। নগর পুনঃ-অধিকৃত হইলে প্রায় ৫০,০০০ লোক ফিরিয়া আসিয়াছিল। অনেকে আর ফিরে নাই।

এই সময়ে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা সুন্দর বনের মধ্যে জঙ্গল কাটিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। দক্ষিণাঞ্চলের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এ বিষয়ের বিবরণ পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্লাইবের জীবনী—মীরজাফর কর্ত্তৃক ক্ষতিপূরণ—২৪ পরগণা—ক্লাইবের বাঙ্গালা ত্যাগ—বান্সিটার্ট—মীর কাসিম—ইংরাজ কাসিমে—লর্ড ক্লাইবের পুনরাগমন—বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ—লালগির্জ্জা—ক্লাইবের ভারত ত্যাগ—হারি বেরেলষ্ট—জন কর্টিয়ার—ছিয়াত্তরে মন্বন্তর—মন্বন্তরে কারণ—কোম্পানির প্রকাশ্য রূপে বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ।

যাঁহার সহিত সম্পর্ক না ঘটিলে, কলিকাতার ভাগ্যে কখন সুখের দশা ঘটিত কি না সন্দেহ, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এস্থলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

খ্রীঃ ১৭২৫ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি শ্রফসায়র প্রদেশে ক্লাইবের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রিচার্ড ক্লাইব উকীলের ব্যবসায় দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন। ক্লাইব বাল্যকালে বড় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। দেশের লোকে তাঁহার জ্বালায় সর্ব্বদা অস্থির ছিল। তাঁহার পিতাও কাজে কাজেই তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। এই জন্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিয়া দিয়া, তাঁহার পিতা, তাঁহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। ১৮ বৎসর বয়সে, খ্রীঃ ১৭৪৩ অব্দে তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। মান্দ্রাজে


সার উইলিয়ম জোন্স
লর্ড ক্লাইব

আসিয়া তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না। মনোকষ্টে তিনি দুইবার আত্মহত্যার উদ্যম করেন, কিন্তু দৈববশে দুইবারই তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। অবশেষে তিনি সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন, এবং কর্ণাট যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া প্রসিদ্ধ হন। অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

মীরজাফর নবাব হইয়াই ইংরাজদের হস্তে কলিকাতার ক্ষতিপূরণের টাকা পাঠাইয়া দেন। খ্রীঃ ১৭৫৭ অব্দের ৬ই জুলাই মুরসিদাবাদ হইতে প্রায় ৭৬ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ৭০০ সিন্দুকে বোঝাই হইয়া ১০০খানি নৌকায় কলিকাতায় পোঁছে। ইহার পূর্ব্বে, ভারতে ইংরাজেরা একত্রে এত টাকা কখন প্রাপ্ত হন নাই। তৎপরে দেড়মাসের মধ্যেই আবার ৪০ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা আসিয়াছিল।*

খ্রীঃ ১৭৫৮ অব্দে ক্লাইব বঙ্গদেশীয় কুঠীসমূহের গবর্ণর হইলেন। এই সময়ে কোম্পানি, মীর-জাফরের নিকট হইতে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের স্বত্ব লাভ করেন। উহাই বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা।

যদিও ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় একজন করিয়া গবর্ণর থাকিতেন, কিন্তু তৎকালে কোম্পানির ভূসম্পত্তি কিছুই ছিল না। এই জন্য লর্ড ক্লাইবকেই বঙ্গের প্রথম গবর্ণর বলা যাইতে পারে।

পলাসী বিজেতা ক্লাইব লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই রূপে ইংরাজ রাজ্য বৃদ্ধি করিতে করিতে লর্ড ক্লাইব খ্রীঃ ১৭৬০ অব্দে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। লর্ড উপাধি তিনি ইংলণ্ডে গমনান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ক্লাইবের কলিকাতা ত্যাগের পর বান্সিটার্ট সাহেব গবর্ণর হন। ইনি মীরজাফরকে অকর্ম্মণ্য দেখিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে নবাব করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই অর্থ লইয়া ইংরাজ কাসিমে অনর্থ ঘটে। সেই অনর্থ নিবারণার্থ লর্ড ক্লাইব খ্রীঃ ১৭৬৫ অব্দের মে মাসে পুনরায় বঙ্গের গবর্ণর হইয়া আগমন করেন।

এইবার তিনি সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করিলেন। খ্রীঃ ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট এই দেওয়ানির সনন্দ ক্লাইবের হস্তগত হয়।

খ্রীঃ ১৭৬৭ অব্দে পীড়িত হইয়া ক্লাইবকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়। তিনি কোম্পানির কার্য্য সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন।

এই সালে রেবরেণ্ড কির্ণন্দর (Revd. Mr. Kiernander) লালগির্জা (The old or mission Church) নির্ম্মাণ করেন। তখন ক্লাইব কলিকাতায় ছিলেন।

ক্লাইব যখন কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন তখন ইংরাজের কুঠী ভগ্ন প্রায়। আর যখন শেষবার ভারত ত্যাগ করেন তখন বাঙ্গালায় কোম্পানির আধিপত্য বদ্ধমূল।

ক্লাইব কলিকাতা ত্যাগ করিলে হারি বেরেলষ্ট গবর্ণর হইয়া খ্রীঃ ১৭৬৯ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন; তৎপরে জন কার্টিয়ার গবর্ণর হন। এই সময় দেশের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। এই সময়ে একটি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর উৎপীড়নে সমগ্র বঙ্গ ছারখার হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৭৭০ * অব্দে এবং বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই মহামারী সংঘটিত হয়। এজন্য ইহা ছিয়াত্তরে মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। হিকে সাহেব লিখিয়াছেন কলিকাতার ১৫ই জুলাই হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৭৬,০০০ লোক প্রাণত্যাগ করে। ইহার উপর আবার অগ্নিকাণ্ডও ঘটিয়াছিল।

বঙ্গের সর্ব্বত্রেই এই দুর্দ্দশা। পূর্ব্ব দুই বৎসর শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে নাই। তাহার

* J. B. Knight's Calcutta. p. 14-15.

* Martin's Medical Topography of Calcutta.

উপর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে কি দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে, সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। রাস্তা ঘাটে মৃতদেহের ছড়াছড়ি। প্রথমে টাকায় চারি সের চাউল বিক্রয় হইয়াছিল, অবশেষে তাহাও পাওয়া যাইত না। এই সময় ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল যে, ইংরাজেরা সব চাউল ও অন্যান্য শস্য ক্রয় করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই চাউল এত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, কোম্পানি এ বিষয়ে বন্দোবস্ত করা উচিত বোধ করিলেন।

এই পর্য্যন্ত কোম্পানি প্রকাশ্যভাবে আপন হস্তে দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন এবং যাহাতে সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হয়, তাহার জন্য ওয়ারণ হেষ্টিংসকে শাসন-কর্ত্তা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস—হেষ্টিংসের সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনা—হেষ্টিংসের বিচার—খ্রীঃ ১৭৭৩ অব্দের বন্দোবস্ত—নূতন কৌন্সিল—নন্দকুমারের ফাঁসি—চাঁদপাল ঘাট—টলীর নালা—কালিঘাট—বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ—খিদিরপুর ডক—হিকের গেজেট—কলিকাতা মাদ্রাসা—সার উইলিয়ম জোন্স—এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল—পাথুরিয়া গির্জা—হেষ্টিংসের ভারত ত্যাগ—সারজন ম্যাকফারসন—কলিকাতার অবস্থা।

খ্রীঃ ১৭৭২ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রকাশ্য ভাবে আপন হস্তে রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া ওয়ারণ হেষ্টিংসকে এ দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করেন।

খ্রীঃ ১৭৩২ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্ম হয়। ইনি ওয়েষ্টমিনিষ্টর বিদ্যালয়ে ইলাইজা ইম্পে ও কবিবর উইলিয়ম কাউপারের সহিত একত্রে পড়িয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতায় কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। পলাসীর যুদ্ধের পর তিনি নবাবের দরবারে কোম্পানির এজেণ্ট হন। ১৭৬১ অব্দে তাঁহাকে কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বর করা হয়। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি বিলাতে গিয়া আবার সাত বৎসর পরে আগমন করেন, তখন তিনি মান্দ্রাজ কৌন্সিলের মেম্বর। ১৭৭২ অব্দে তিনি বাঙ্গালার গবর্ণর হন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালা ও বেহার ১৮টি জিলায় বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক জিলায় এক একজন কালেক্টর নিযুক্ত করেন।

তাঁহার সময় কলিকাতার রেবেনিউ বোর্ড স্থাপিত হয়।

তাঁহার সময়েই রোহিলা যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

তিনিই মহারাজ নন্দকুমার রায়কে সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

তাঁহারই কর্ত্তৃক বারাণসীরাজ চৈতসিংহের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়।

প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহীসুর যুদ্ধও তাঁহার সময় সংঘটিত হইয়াছিল।

তাঁহারই সময় বাঙ্গালার প্রথম সংবাদ পত্র হিকের গেজেট প্রচারিত হয়।

তাঁহার দ্বারা অনেক অপকর্ম্ম সাধিত হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৭৮৫ অব্দে তিনি ভারত ত্যাগ করেন।

নন্দকুমারের ফাঁসি, রোহিলাযুদ্ধ, চেতসিংহের নির্ব্বাসন, অযোধ্যার বেগমগণের অর্থাপহরণ প্রভৃতি অপরাধে হেষ্টিংস, বর্ক, সেরিডান ও ফক্স প্রভৃতি কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া ৭ বৎসর কাল অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার শাসন সময়ে খ্রীঃ ১৭৭৩ অব্দে বিলাতের মহাসভা কোম্পানির বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করেন। তাহাতে কয়েকটি নূতন নিয়ম, পালনার্থ কোম্পানির ডিরেক্টরদিগের হস্তে অর্পিত হয়।



ওয়ারেণ হেষ্টিংস

সে নিয়ম কয়টি এই—

(১) বৎসরে বৎসরে কোম্পানিকে ৪,০০,০০০ পৌণ্ড দিতে হইবে।

(২) কলিকাতার গবর্ণর, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ইংরাজাধিকারের গবর্ণর জেনেরেল হইবেন।

(৩) চারিজন সভ্যে তাঁহার একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে। উহাদের প্রত্যেকের গবর্ণর জেনেরেলের তুল্য ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) গবর্ণর জেনেরল স্বীয় সভার সাহায্যে নূতন আইন প্রচারিত করিতে পারিবেন।

(৫) কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবে, তথায় একজন চিফজষ্টিস ও ৩ জন জজ নিযুক্ত হইবেন।

(৬) কোম্পানির ভারতসংক্রান্ত কার্য্য নিয়মিতরূপে ইংলণ্ডে মহামন্ত্রীর নিকট জ্ঞাপিত করিতে হইবে।

এই নিয়ম অনুসারে খ্রীঃ ১৭৭৪ অব্দের অক্টোবর হইতে হেষ্টিংস প্রথম গবর্ণর জেনারল হন। বারওয়েল, কর্ণেল মনসন্, ফ্রান্সিস এবং জেনেরল ক্লেবরিং তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্য হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে বারওয়েল কেবল হেষ্টিংসের পক্ষ ছিলেন, অপর তিন জনের আন্তরিক ইচ্ছা হেষ্টিংসকে পদে পদে অপদস্থ করা। প্রথম প্রথম তাঁহাদের অভিসন্ধি প্রায়ই সিদ্ধ হইত।

মনসন্ প্রভৃতি সভ্যত্রয়ের একজন সহযোগী ছিলেন। তিনি দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার রায়। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। মুরসিদাবাদের অন্তঃপাতী ভদ্রপুর গ্রামে খ্রীঃ ১৭০৫ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৭৫৬ অব্দে তিনি হুগলীর ফৌজদার হন। ক্লাইব ইহাঁকে বড় ভাল বাসিতেন। ১৭৬৩ অব্দে ইনি নবাব মীরজাফরের দেওয়ান হন। মনসন্ প্রভৃতির পক্ষ হইয়া হেষ্টিংসের দোষ সমুদায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, হেষ্টিংস মোহনপ্রসাদ নামক একজন ব্যবসায়ীকে উপলক্ষ করিয়া জাল করা অপরাধে তাঁহাকে সুপ্রীমকোর্টে উপস্থিত করেন। তাঁহারই যত্নে প্রধান বিচারপতি স্যর ইলাইজা ইম্পে ইহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। জাল করিয়া ক্লাইব পলাসী জয় করিলেন; ফল—লর্ড উপাধি। জাল করিয়া (?) নন্দকুমার রায় কাহার কি মহান্ অপকার করিয়াছিলেন জানি না, ফল—ফাঁসী। ১৭৭৫ অব্দে ৭০ বৎসর বয়সে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণবায়ুর অবসান হয়।

চাঁদপালঘাট (যেখানে ভারতের গবর্ণর জেনারেলগণ প্রায়ই কলিকাতায় পদার্পণ করেন) এ সময়ে বর্ত্তমান ছিল।

খিদিরপুরের উত্তরস্থিত টলির নালা (Tolly's Nullah) বা টালিগঞ্জের খাল খ্রীঃ ১৭৭৫অব্দে কর্ণেল টলি (Colonel Tolly) কর্ত্তৃক খনিত হয়। পূর্ব্বে ইহাকে গোবিন্দপুরের খাড়ী বলিত পূর্ব্বে এখানে গঙ্গার শাখা প্রবাহিত ছিল।

হণ্টর সাহেব তাঁহার ষ্ট্যাটিষ্টীক্যাল রিপোর্টে লিখিয়াছেন কালিঘাটের মন্দির প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাইট সাহেব বলেন—

"The temple of *Kalighat* Probably stood for centuries, when the Ganges itself, some miles wide, laved its walls, when human blood streamed on its altars, and when thugs, before proceeding on their expedition, made their devoirs to Kali."

কিন্তু আলিপুরে (১৮৮৫। ২৩শে জুন মঙ্গলবার) সম্প্রতি এক মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে তাহাতে মোকদ্দমার বাদী বরিশার সাবর্ণ চৌধুরীগণ বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান মন্দির ইং ১৮০৯।১০ সালে (বাঙ্গালা ১২১৬ সালে) নির্ম্মিত।

বর্ত্তমান মন্দির আদি পীঠের উপর নির্ম্মিত নহে (২৫ পৃষ্ঠা দেখ)।

খ্রীঃ ১৭৭৮ অব্দে হালহেড্ সাহেব, চার্লস উইলকিন্সের খোদিত বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রচারিত করেন।

খ্রীঃ ১৭৮০ অব্দে কর্ণেল হেনরি ওয়াটসন খিদিরপুরের ডক্ প্রস্তুত করিয়া জাহাজের কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে দশলক্ষ টাকা ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

এই সালের ২৯এ জানুয়ারি হইতে প্রথম সংবাদপত্র 'হিকের গেজেট' মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়।

খ্রীঃ ১৭৮১ অব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং ১৮২০ সালে বর্ত্তমান বাটী প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। খ্রীঃ ১৮২৯ অব্দে ইহাতে প্রথম ইংরাজী প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপূর্ব্বে কেবল আরবী ও পারসীই শিক্ষা দেওয়া হইত। তৎপরে ইহার ক্রমে উন্নতি হইতেছে। ✓ খ্রীঃ ১৭৮৩ অব্দে সার উইলিয়ম জোন্‌স সুপ্রীমকোর্টের জজ হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন।

ইনি খ্রীঃ ১৭৪৬ অব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর, লণ্ডননগরে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইহাঁর তিন বৎসর বয়স, তখন ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ইহাঁর জননী অসামান্য গুণসম্পন্না ছিলেন। ইহাঁর বাল্যশিক্ষার ভার জননীর হস্তে ছিল। ইনি জননীকে যখন কোন প্রশ্ন করিতেন, তখনি তিনি বলিতেন "পড়িলেই জানিতে পারিবে।" সেই মাতৃ উপদেশেই ইহাঁর পাঠ-তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয় এবং সেই জন্যই আজ তিনি জগতে পূজ্য। সাতবৎসর বয়সে তিনি হারোনগরের বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তৎপরে ১৭৬৪ অব্দে অক্ষফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ইনি অতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন। অল্প বয়সেই ব্যবহার শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। অক্ষফোর্ডে অধ্যয়ন কালে, ইনি আলিপোবাসী একজন লোককে আরবী শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে গ্রীক ও লাটিন শিক্ষা করিয়াছিলেন। ছুটির সময় অশ্বারোহণ, তরবারিচালন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ইটালিয়, স্পানীয়, পর্ত্তুগীজ ও ফরাসীস ভাষা শিক্ষা করিতেন। খ্রীঃ ১৭৬৫ অব্দে ইনি লর্ড আলথর্পের শিক্ষকতা কার্য্য স্বীকার করেন। খ্রীঃ ১৭৬৭ অব্দে তিনি স্বীয় ছাত্র লর্ড আলথর্পের সহিত, জর্ম্মনীদেশের স্পানগারে অবস্থিতি করেন, সেই সময় তাঁহার জর্ম্মনভাষা শিক্ষা হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি পারসী হইতে নাদির সাহেব জীবনী ফরাসীভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৭০ অব্দে তিনি টেম্পল বারে প্রবেশ করেন। ১৭৭৪ অব্দে তিনি ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। খ্রীঃ ১৭৮৩ অব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টের বিচারক হইয়া আসেন। এখানে আসিয়াই লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির আদর্শে "এসিয়াটীক সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামক সভার উদ্যোগ করেন। খ্রীঃ ১৭৮৪ অব্দেই ঐ সভা স্থাপিত হয়। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ঐ সভার সভাপতি ছিলেন এবং উহার অনেক উন্নতিও করিয়াছিলেন। এ দেশে আসিয়া ইনি সংস্কৃত উত্তম রূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৭৮৭ অব্দের ছুটিতে তিনি কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করেন। খ্রীঃ ১৭৮৯ অব্দে ইনি মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। খ্রীঃ ১৭৯৪ অব্দের প্রথমে তাঁহার অনুবাদিত মনুসংহিতা প্রকাশিত হয়। খ্রীঃ ১৭৯৪ অব্দে এপ্রিল মাসে যকৃৎরোগে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার ৪৮ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ—শুধু ভারতবর্ষ কেন?—সমস্ত জগত বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভারতে ও ইংলণ্ডে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।

মহাত্মা জোন্‌সের স্থাপিত এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহ নির্ম্মাণ জন্য পার্কষ্ট্রিটের উত্তর পশ্চিম কোণে গবর্ণমেণ্ট একখণ্ড ভূমি প্রদান করেন, তাহার উপর যে গৃহ নির্ম্মিত হয় তাহা অদ্যাপি আছে। এই স্থলে উক্ত সোসাইটির কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া গেল।

এই সভা ১৭৮৪ অব্দের ১৫ই জানুয়ারিতে সর উইলিয়ম জোন্স মহোদয় কর্ত্তৃক প্রথম স্থাপিত। তৎকালের গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইহার একজন উদ্যোগী ছিলেন। ইহার স্থাপন কর্ত্তা, ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। "এসিয়ার মধ্যে মানুষ কৃত বা স্বভাবত যাহা কিছু আছে তাহারই তত্ত্বানুসন্ধান ইহার উদ্দেশ্য।"

৫৭ নং পার্কষ্ট্রীটে মাসের প্রথম বুধবার রাত্রি ৯টার সময় এই সভার নিয়মিত অধিবেশন হয়। ইহাতে বিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আন্দোলন হয়। সর্ব্ব প্রথমে এই সভা হইতে "এসিয়াটিক রিসার্চেস্‌" বাহির হয় উহা খ্রীঃ ১৭৯৯ হইতে ১৮৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত বাহির হয়। খ্রীঃ ১৮২৯ অব্দ হইতে কাপ্তেন জেমস্, ডি, হারবার্ট, গ্লিনিংস ইন্ সায়েন্স নামক মাসিক পত্র এই সভা হইতে বাহির করিতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসর পরে জেম্‌স প্রিন্‌সেপ সাহেব ঐ পত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া ১৮৩২ অব্দ হইতে উহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া, জরনাল আব দি এসিয়াটিক সোসাইটির অব বেঙ্গল এই নাম রাখেন। তিনি ১৮৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত

উহার সম্পাদক ছিলেন। এই সভা হইতে বিব্লিয়থিকা ইণ্ডিকা নাম দিয়া ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ প্রকটিত হইতেছে। প্রথমে এই সভার একটি চিত্রশালিকা ছিল, উহা খ্রীঃ ১৮৬৫ অব্দে হইতে গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। এক্ষণে সভার সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসনমূর্ত্তি ও পুস্তকালয়মাত্র সভার হস্তে আছে। পুস্তকালয়ে অন্যূন ১৫০০০ গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে প্রায় ৫০০০ সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও হিন্দুস্থানী হস্তলিপি পুঁথী। এতদ্ব্যতীত, নেপালী ও ব্রহ্মদেশী অনেক পুঁথীও আছে। সভার সভ্যগণ প্রতি দিন ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত (ছুটিবাদ) সভাস্থ দ্রষ্টব্য সকল দেখিতে পারেন। অন্য লোকের দেখিতে ইচ্ছা হইলে, সম্পাদকের নিকট অনুমতি লইতে হয়।

খ্রীঃ ১৭৮৪ অব্দের ৫ই এপ্রিল বর্ত্তমান সেণ্ট-জনের গির্জার ভিত্তি প্রস্তরে প্রোথিত হয়। ইহা পাথুরিয়া গির্জা নামেই প্রসিদ্ধ। লর্ড মিণ্টোর সময় ইহার আয়তন বর্দ্ধিত হয়। এখন ইহাতে অন্যূন ৭০০ লোক বসিতে পারে।

এই স্থানেই জব চার্ণক, উইলিয়ম হামিল্টন প্রভৃতির গোর আছে।

খ্রীঃ ১৭৮৫ অব্দে হেষ্টিংস স্বদেশে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহাকে স্বকৃত পাপের ফল ভুগিতে হইয়াছিল।

তাঁহার স্বদেশগমনের পর সারজন ম্যাক-ফারসন প্রায় ২০ মাস এ দেশের গবর্ণরী করেন। খ্রীঃ ১৭৮৬ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনা-রেল হইয়া আগমন করেন। এই সালেই শিব-পুরের বোটানিকাল গার্ডেন স্থাপিত হয়।

হেষ্টিংসের সময় যদিও কলিকাতার উন্নতি হইতেছিল বটে, কিন্তু দেশের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। ম্যাকিণ্টস্ (Mackintosh) সাহেব বলেন, "It is a truth that from the Western extremity of California to the Eastern coast of Japan, there is not a spot where Judgment, taste, decency and conveniency are so grossly insulted, as in that scattered and confused chaos of houses, huts, sheds, streets, lanes, alleys, windings, gutters sinks and tanks which Tumbled into an and is tenquished mass of filth and corruption equally offensive to human sense and healthe, compose the capital of the English Company's Government of India" (ক্রমশঃ)

রামচরিত।

(৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

দ্বিতীয় সর্গ।

পোহাইল বিভাবরী ;—অযোধ্যা নগরে
ঘরে ঘরে প্রজাগণ আনন্দে মগন।
মহারাজ দশরথ অশ্বমেধ-যাগ
সমাপন করি', আজি পুত্রলাভ তরে
আরম্ভিলা মহা হর্ষে, পুত্রেষ্টি নামেতে
মহাযাগ। মহাঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ আজি
যজ্ঞ হেতু পুনরায় হইলেন ব্রত।
তাই উঠে ঘরে ঘরে আনন্দ নিঃস্বন।
বহিয়া সরযূ নদী কুলু কুলু নাদে
প্রিয়সখী জাহ্নবীরে আলিঙ্গন তরে
যেতেছেন খরগতি তর তর করি'
মহা-পুণ্যবতী সতী। তাঁ'রি' তীরদেশে—
পবিত্র উত্তরকূলে—সুপবিত্রতম
যজ্ঞক্ষেত্র, সুশোভিত মহাঋষিগণে
ঋষ্যশৃঙ্গ, বামদেব, বশিষ্ঠ, জাবালি
মার্কণ্ডেয়, কাত্যায়ন, সুযজ্ঞ, কাশ্যপ,
মহাতেজা বিশ্বামিত্র, গৌতম প্রভৃতি
বিরাজেন চারিধারে অনল সমান ;
মধ্যে শোভে যজ্ঞকুণ্ড, যাজ্ঞীয় অনলে।
জনক প্রভৃতি করি, রাজ-ঋষিগণ

শোভিছেন তার পাশে ক্ষত্রব্রহ্ম-তেজে
দীপ্তিমান ; মরি কিবা কোমলে কঠিনে
সুমিলিত। তার পাশে নানাদেশ হ'তে
রাজাগণ আসি' সবে যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে
আছেন বসিয়া, মরি, হরষিত মনে।
রাজা দশরথ নিজে রাজবেশ ত্যজি'
যতিবেশে, আজি, মরি, পুত্রলাভ তরে
করেন কঠোর কত। পুত্রহীন জন
পুত্রলাভ তরে হায় কতই কাতর,
কি জানিবে সেই, যার সন্তানের রোলে
কর্ণ সদা ঝালাপালা। কুশাসনে বসি,
আছেন হরিষে আজি রাজা দশরথ
নাহি রাজবেশ অঙ্গে, উপবাস-ক্লেশে
দেহ শুষ্ক—কিন্তু মুখে আনন্দ উথলে।
শুভলগ্ন দেখি-তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি
দিলা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি। যজ্ঞানল হ'তে
অদ্ভুত পুরুষ এক হৈলা আবির্ভূত—
কিবা সুগঠিত দেহ—জলদ বরণ—
বিম্বজিনি' ওষ্ঠাধর, কর পদতল—
রক্তাম্বর পরিধান—কুঞ্চিত কুন্তল—
অংসো'পরি মরি কিবা রয়েছে লম্বিত—
রতন মুকুট শিরে,—বক্ষে বিলম্বিত
রত্নহার—কর্ণে দোলে রতন কুণ্ডল—
প্রকোষ্ঠে বলয় শোভে রতনে খচিত
তেজে যেন দিনমণি—দেহ, শৈলসম
বলে ত্রিজগতে কেহ নাহিক তুলনা।
সে মহাপুরুষ, মরি, যজ্ঞানল হ'তে
পায়সপূরিত পাত্র দুই করে ধরি'
হইলেন আবির্ভূত।—দেখিয়া তাঁহারে
বিস্ময়পূরিত নেত্রে চাহিল সকলে।
কহিলেন সে পুরুষ জলদ গম্ভীরে—
"মহারাজ। প্রজাপতি আশীর্ব্বাদ করি'
প্রাজাপত্য এ পায়স পাঠাইলা আজি
তব তরে ; পুত্রলাভ হইবে তোমার
এই পায়সের ফলে। লহ মহামতি
ভক্তিভরা চিতে, আজি, এ মহাপায়স।
অনুরূপ ভার্য্যাগণে ভোজনের তরে
দেহ ইহা বিভাজিয়ে, অন্যথা না হয়।"
কহিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ "লহ, মহারাজ,
ভক্তিভরে কর পাতি' ও দিব্য পায়স।
ও পায়স ফলে তুমি হ'বে পুত্রবান।
বংশকর চারি পুত্র জন্মিবে ইহাতে।"
মুনিগণও সে বচনে দিলা অনুমতি।
ভক্তিভরে দশরথ প্রণতি করিয়া
পাতিলেন করযুগ—সে দিব্য পুরুষ,
পায়স পূরিত সেই সুবর্ণের থালা
রজতাবরণে ঢাকা—দিলেন তাহারে।
দশরথ সে পায়স লাভে, আহামরি
হলেন হর্ষিত, যথা দারিদ্র-পীড়িত
অকস্মাৎ ধনলাভে হয় পুলকিত।
ডুবিলা অনলে পুন সে দিব্য পুরুষ।
বলিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ "যাও, মহারাজ,
অন্তঃপুরে এ পায়স লয়ে ভক্তিভরে।
প্রথমতঃ এ পায়স দুইভাগ করি'
অগ্রভাগ দেহ, রাজা, কৌশল্যা দেবীরে
অপরার্দ্ধ দেহ পরে রাণী কৈকেয়ীরে
বল সে দোঁহারে, পরে, নিজ নিজ ভাগ,
তাঁরা যেন দুই ভাগ করি' ভক্তিভরে,
অগ্রভাগ শুচি হয়ে করিয়া ভোজন
অপরার্দ্ধ সুমিত্রারে দেন প্রীতিভরে।
যাও, রাজা, এই মত করহ বিধান,
পুত্রেষ্টি তোমার, রাজা, হইল সফল।
মুনির আদেশে রাজা আনন্দ অন্তরে
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া আদেশানুরূপ



দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ

করিলা সকলি। কালে সে পায়স ফলে
লভিলেন চারিপুত্র ভূতলে অতুল।
যাঁহার চরিত গান করিবার তরে
এ পাগল মন চায় পাগলের মত।

জনমিলা সেই রাম দশরথ ঘরে
গাহিলেন দেবগণ স্বর্গে "জয় রাম"।
"জয় রাম জয় রাম" রবে ভরিল ভুবন।

ইতি শ্রীরাম চরিতে শ্রীরামজনম নামক দ্বিতীয় সর্গ।

কনকলতা।

(৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

নবম পরিচ্ছেদ।

জয়েন্দ্রকে ভাদ্রের ভরা নদীর অতল জলে রাখিয়া, চল পাঠক! একবার সেই বটবৃক্ষতলে যাই। চল দেখিগে, মৃগয়া প্রতিনিবৃত্ত বন্ধু কয়টিতে কি করিতেছেন। চল দেখিগে, জয়েন্দ্রের জন্য তাঁহাদের মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে কি না।

সেই বটতল বৃক্ষের লম্বিত স্তম্ভনিচয়ে অশ্বগুলি বদ্ধ। নিহত পশুনিচয় একধারে স্তূপীকৃত। ভীমসিংহ, শ্রীদত্ত, চন্দ্রপ্রভ, যশোবন্ত ও বলবন্ত একস্থানে একখানি বিস্তৃত আস্তরণে—কেহ উপবিষ্ট, কেহ অর্দ্ধশায়িত। সৈন্যগণ, দূরে দূরে—কোথাও দুইজন কোথাও তিনজন—কেহ বা একক—বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছে—এখনো যুবরাজের দেখা নাই—আর জয়েন্দ্র, সকলে তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত বটে, কিন্তু আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া আর কি করিব—বিধাতার মনে যাহা ছিল, হইল! বিধাতার ইচ্ছার জয় চিরদিনই হয়—যে তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে সেই সুখী।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভীমসিংহ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এরা দুজনে গেল কোথা, দুই প্রহরের পূর্ব্বে সকলের একত্রিত হ'বার কথা! দুই প্রহর ত অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে!"

শ্রীদত্ত বলিলেন, "যাই হউক আমাদের একবার অনুসন্ধান করে দেখা উচিত।"

সকলেরই সেই মত, কেবল চন্দ্রপ্রভ বলিলেন, "অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু অরণ্যে কোন্ দিকে অনুসন্ধান করবে? যদি বল সকলে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাব, কিন্তু আমরা গেলে তাঁরা যদি আসেন, তা'হলে কি তাঁরাও উৎকণ্ঠিত হবেন না? তার চেয়ে আর এক কাজ করা যা'ক, জনকয়েক সৈন্যকে অনুসন্ধান করতে পাঠান যা'ক, তারা অনুসন্ধান ক'রে সকলে একেবারে রাজধানীতেই যা'বে।"

এই রূপ পরামর্শ হইতেছে এমন সময় যুবরাজ অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে সেইখানে উপনীত হইলেন, তিনি উপস্থিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়েন্দ্র কোথায়?"

"জয়েন্দ্র কোথায়!" জান না নরাধম! "জয়েন্দ্র কোথায়?"—এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে কি পাপ রসনা একবার স্তম্ভিত হইল না?—"জয়েন্দ্র কোথায়!" পাপবুদ্ধি! মিত্রঘাতী! বিশ্বাস ঘাতক! নরাধম! আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, "জয়েন্দ্র কোথায়!" এ জগতে এ'কথার উত্তর আর কে দিবে? যার ইচ্ছায় এই জগত ঘুরিতেছে—সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভিন্ন আর কেহই জানে না "জয়েন্দ্র কোথায়?"

যুবরাজের প্রশ্নের উত্তরে ভীমসিংহ বলিলেন, "কৈ জয়েন্দ্র ত এখনো আসে নাই।"

যুবরাজ যেন মহা ভাবিত হইয়াই বলিলেন, "তাই ত?"

অনেকক্ষণের পর যুবরাজ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিলেন, "বীরেন্দ্র! সৈন্যগণকে বল এই কাননভূমি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করুক। আমি নিজেই অনুসন্ধান করতে যেতাম, কিন্তু আমার বড় অসুখ বোধ হ'চ্ছে, আমি এখনি রাজপুরী যাব।"

কাননভূমি নয়রে নরাধম! গঙ্গার অতল তল অনুসন্ধান করতে বল।

ভীমসিংহ বলিলেন, "যুবরাজ! আমরাও জয়েন্দ্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হব।"

যুবরাজ বলিলেন, "তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর; কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না।"

এই বলিয়াই যুবরাজ ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন।

ভীমসিংহ অনেকক্ষণ রাজপুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, মনে মনে বলিলেন,

"এ কি! যুবরাজের মুখশ্রী এত মলিন হ'লো কেন?" তারপর চন্দ্রপ্রভের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই চন্দ্রপ্রভ! তুমি এই-খানেই থাক, কয়েকজন সৈন্যও তোমার কাছে থাকুক, আমরা জয়েন্দ্রের অন্বেষণে যাই, ইতি মধ্যে যদি জয়েন্দ্র আসে, তা হ'লে একজনকে ঐ বৃক্ষের উচ্চ শাখায় উঠে তুরীধ্বনি করতে ব'লো, তুরীধ্বনি যার কর্ণে যাবে, সেই তুরীধ্বনি করে এই বটতলে ফিরে আসবে। নচেৎ আমরা আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানে একত্রিত হ'য়ে যা কর্ত্তব্য হয় করবো।"

এই রূপ পরামর্শের পর, ভীমসিংহ প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। চন্দ্রপ্রভ কয়েকজন সৈনিকের সহিত সেই বৃক্ষতলেই থাকিলেন।

পাঠক! আমরা আর জয়েন্দ্রের জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়া কি করিব, তার চেয়ে, একবার কনকলতার অনুসন্ধান করা যা'ক।

দশম পরিচ্ছেদ।

কনকলতা আপনার শয্যায় নিদ্রিতা। নিকটে চন্দ্রপ্রভা বসিয়া বীজন করিতেছেন।

চন্দ্রপ্রভা বীজন করিতে করিতে বলিলেন, "সখিরে! এ বালিকা বয়সে কেন এ অকুল সাগরে ঝাঁপ দিলে? এতে যে কত যাতনা তা'ত তুমি জান না।"

এ কয়টি কথা যাহার উদ্দেশে বলা হইল, সে শুনিল না। চন্দ্রপ্রভা আবার বলিলেন, "আহা! কোমল শরীরখানি একদিনের ভাবনায় একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

এমন সময়ে রাজকুমারী নিদ্রিতাবস্থাতেই বলিয়া উঠি-লেন, "দাদা! কি কর? কি কর?" পরক্ষণেই "মাগো! কি হলো!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

চন্দ্রপ্রভা "কাঁদ কেন সখি?" বলিয়া গাত্রস্পর্শ করিবা-মাত্রই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলেও তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রপ্রভা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ কেন সখি?"

কনকলতা কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিতে লাগিলেন, "সখি, কেন এমন দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লাম! হায় কেন এমন হ'লো! না জানি আমার ভাগ্যে কি ঘট্‌বে।——"

চপ্রপ্রভা তাঁহার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "ভয় কি? কি দুঃস্বপ্ন দেখেছ, আমার কাছে বল। দুঃস্বপ্ন দেখে, সখীজনের কাছে বল্‌লে, তার দোষ কেটে যায়।"

কনকলতা বলিতে লাগিলেন, "কি বল্‌বো, সখি, সে কথা মনে করতেও গা কেঁপে ওঠে। দেখ্‌লাম গঙ্গার ধারে জয়েন্দ্রকে বধ করবার জন্য দাদা যেন অসি তুলেচেন, আমি যেমন "কি কর কি কর" বলে দাদার হাত ধরতে যা'ব, চেয়ে দেখি সেই অসি বাবার বুকে বেঁধা, আর কেউ কোথাও নেই—চার দিকে ভয়ানক বন—আমি অমনি ভয় পেয়ে কেঁদে উঠ্‌লেম—হায় কেন এমন হ'লো?——"

চন্দ্রপ্রভাও স্বপ্নের কথা শুনিয়া অন্তরে কাঁপিলেন, কিন্তু সে ভাব চাপিয়া সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, "তুমি ভাই জয়েন্দ্রকে বড় ভালবাস, তাঁর কথা সর্ব্বদা ভাব, তাই অমন স্বপ্ন দেখেছ।"

কিন্তু এ উপদেশে কিছুই হইল না। কনকলতা বলিলেন, "সত্য বটে, আমি তাঁকে ভালবাসি, কিন্তু দাদা যে তাঁকে মারবার জন্য চেষ্টা করবেন, এ কথা ত আমার মনে কখন উদয় হয়নি—আর 'দাদার অসি বাবার বুকে বিদ্ধ' এ স্বপ্নই বা দেখ্‌লেম কেন? সই, আমার প্রাণের ভিতর কেমন করুচে, হায় কি হবে?" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।"

চন্দ্রপ্রভা দেখিলেন, সান্ত্বনা করা সহজ নয়, সুতরাং বলিলেন, "চল ভাই, যাই দেখিগে, এতক্ষণে বোধ হয় তাঁরা আস্‌চেন।"

এই বাক্যেই কনকলতা যন্ত্রচালিতা পুত্তলিকার ন্যায় চন্দ্রপ্রভার অনুগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য, অস্তাচলের শিখরদেশ অবলম্বন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। পদ্মিনী মৃদুপবনে চালিতা হইয়া যেন তাঁহাকে 'যেওনা যেওনা' বলিয়া গমন করিতে নিষেধ করিতেছেন। চন্দ্র এখনও ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড—বৎ। ধনীর কাছে দরিদ্রের দীপ্তি কোথায় দেখিয়াছ?

যুবরাজ, রাজপুরীতে আসিয়াছেন। এমন মধুর সময়েও তিনি আপনার কক্ষে। প্রকৃতির শোভা আর তাঁহার চক্ষে ভাল লাগে না। যেন জগতকে মুখ দেখাইতে, আর তাঁহার ইচ্ছা নাই, তাই গৃহের গবাক্ষগুলি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

যুবরাজ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মনে

অনন্ত চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। মুখ মণ্ডলের ভাবে, হর্ষ—বিষাদ—ভয় প্রভৃতি ভাবের লক্ষণ স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে, যে চিন্তায় মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখমণ্ডলের সহস্র প্রকার বিকৃতি ঘটে, সে চিন্তা কি?—তাহা আমরা জানি না—সুতরাং পাঠককেও জানাইতে পারিলাম না।

কালের গতি কি চমৎকার! নিয়তির নিয়ম কি অদ্ভুত! যাহা কখন ভ্রমেও ভাবি নাই, তাহাই ঘটিতেছে—যাহা ঘটিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি, মুহূর্ত্তের ঝঞ্ঝায় তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ঘটনার ফলের দিকে লক্ষ্য কর, মুখ্য না হউক গৌণ ফল নিশ্চয়ই মঙ্গলময় হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই—মঙ্গলময়ী জগজ্জননীর রাজ্যে, যাহা ঘটিতেছে সকলি মঙ্গলের জন্য। মনুষ্যের অন্ধ-চক্ষু না দেখুক—মনুষ্যের সীমাবদ্ধ জ্ঞান বুঝিতে না পারুক, কিন্তু এ জগতে যাহা ঘটে, সকলি মঙ্গলের জন্য। তুমি যদি যত্ন করিয়া মঙ্গলকে অমঙ্গলে পরিণত কর, তাহা হইলে, তাহার জন্য দোষী কে?

যুবরাজ এতক্ষণ চিন্তার পর অর্দ্ধোচ্চস্বরে বলিলেন, "সেই ভাল, সহজে না হয়, বল প্রয়োগ আবশ্যক।" এই বলিয়াই শয্যার উপর উপবেশন করিলেন।

এমন সময় সন্ধ্যাসূচক শঙ্খধ্বনি হইল। তৎপরেই সান্ধ্যবাজনা বাজিয়া উঠিল; এক জন ভৃত্য আসিয়া, যুবরাজের গৃহে কয়েকটি দীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল।

যুবরাজও ক্ষণেক বসিয়া থাকিয়া, কি জানি কোথায় উঠিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক, এ সময়ে একবার জয়েন্দ্রের বন্ধুগণের সন্ধান লইতে ইচ্ছা করে কি?—জয়েন্দ্রের অনুসন্ধানে যে তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই- কিন্তু এই সন্ধ্যার সময়েই তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিবার কথা; এ সময়ে, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইতে ইচ্ছা হইলেও, অরণ্যে গমন করা সহজ নয়—আমার বাঙ্গালী-প্রাণে এত সাহস নাই—আপনারা পারেন সন্ধান করুন—আমার সহায়তার আবশ্যক হইলে, আজ নিরস্ত হইতে হইবে। এমন সময়ে আমি লোকালয়ের বাহিরে যাইতে পারি না।

যুবরাজ কোথায় গেলেন, তাহার সন্ধান লইতে ইচ্ছা হয়, আসুন অন্বেষণ করি।

এই দেখুন রাজান্তঃপুর সন্নিহিত উপবন—চারিদিকই হরিৎবর্ণ—বর্ষাবসানে বৃক্ষাদির এই রূপ নব শোভা হইয়া থাকে—দেখুন অর্দ্ধচন্দ্রের ক্ষীণ রশ্মিতে যেন চারিদিক হাসিতেছে।

কিন্তু কৈ! যুবরাজ ত এখানে নাই—এমন সময় এমন সুন্দর স্থান ছাড়িয়া তিনি কোথায় গেলেন?

চল দেখি, পাঠক, দেখি যদি তিনি অন্তঃপুরে জননীর কাছে থাকেন; এমন সময় জননীর পাদ-বন্দনা করিতে যাওয়া অসম্ভব নয়।

ঐ দেখুন, রাজমহিষী, বিচিত্র গালিচার উপর উপবিষ্টা। গৃহে সুগন্ধি তৈলের অসংখ্য দীপ, পার্শ্বে কনকলতা ও চন্দ্রপ্রভা, কিন্তু কৈ? এখানেও ত যুবরাজ নাই।

পাঠক, শুনুন, রাজমহিষী কি বলিতেছেন, পরে যুবরাজের অনুসন্ধান করা যাইবে।

রাজমহিষী বলিলেন, "চন্দ্রপ্রভা, যাও ত মা, আমার কনক, কি ছবি এঁকেছে আনগে ত, আমি দেখ্‌বো।"

চন্দ্রপ্রভা উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজমহিষী কনকলতাকে, কত কি বলিতে লাগিলেন—স্নেহ-মাখা মাতৃ উপদেশ—শুনিতে বড়ই মধুর।

অনেকক্ষণ পরে, কনকলতা বলিলেন, "সই এখনো আস্‌চে না কেন, বোধ হয় ছবি খুঁজে পায়নি, আমি যাই।"

রাজমহিষী। "সেই খুঁজে আনবে এখন, দেরি হ'চ্ছে তাতে ক্ষতি কি?"

কিন্তু, পাঠক, আমরা আর এখানে থাকিয়া কি করিব? মায়ে ঝিয়ে কথা, সকলের ভাল লাগে না। চলুন, চন্দ্রপ্রভা কি করচেন দেখে, আমরা যুবরাজের অনুসন্ধানে যাই।

কিন্তু, এ কি, এই যে যুবরাজ! ইনি এ অন্ধকারে—অবতরণ স্থানে কি করচেন?

যুবরাজ অর্দ্ধোচ্চস্বরে বলিতেছেন, "না, সহজে হ'লো না দেখ্‌ছি, কিন্তু বল প্রয়োগ—তার বড় প্রতিবন্ধক—পিতা,—কিন্তু প্রতিবন্ধক কি দূর করা যায় না?—হাঁ, যায় বৈ কি?—তা' হ'লে বোধ হয় আর বলের প্রয়োজন হ'বে না—সেই ভাল কণ্টক দূর করতে হ'বে—এই যে জয়েন্দ্রকে হত্যা কর্‌লাম কে জানতে পার্‌লে—এও তেমনি করে নির্জ্জনে—সেই ভাল—"

এই বলিয়া যুবরাজ নিজ কক্ষাভিমুখে চলিলেন। সর্ব্বদর্শী—চক্ষুর কথা একবার ভাবিলেন না। লোভে অন্ধ হইয়া পাপের প্রলোভনে ভুলিলেন।

জয়েন্দ্রের হত্যার কথা, সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর ব্যতীত আর একজন জানিল। ঐ দেখুন চন্দ্রপ্রভা এতক্ষণ ঐ কবাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, যখন দেখিলেন যুবরাজ চলিয়া গেলেন, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, "হা জগদীশ্বর! এ কি? রাজকুমারীর স্বপ্নের প্রথমাংশ ত সফল হ'য়েছে! শেষাংশও কি পূর্ণ হ'বে নাকি? কিন্ত এ সকল কথা কারুকে বলা হ'বে না। যাই, অনেক বিলম্ব হ'য়েছে, আর দেরি কর্‌বো না।" এই বলিয়া তিনিও চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রযুক্ত-বিজ্ঞান।

(SCIENCE AS APPLIED IN ARTS.)

২—গিল্টিকরা।

গিল্টিকরা বা দ্রব্য বিশেষকে সুবর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্যবৎ প্রতীয়মান করা দুই প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সাধারণ সংযোগ (Mechanical means) এবং রাসায়নিক সংযোগ-(Chemical means)-ই এই দ্বিবিধ উপায়।

১। যে কোন দ্রব্যের উপর, যে কোন উপায়ে স্বর্ণপাত (সোনালি) বা স্বর্ণরেণু লাগাইয়া দেওয়ার নামই সাধারণ সংযোগ।

২। যখন কোন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন ধাতুকে সুবর্ণরঞ্জিত করা যায়, তখন সেই সুবর্ণ সংযোগ প্রক্রিয়াকেই রাসায়নিক সংযোগ বলে।

সাধারণ সংযোগ বহুপ্রকার উপায়ে নিষ্পন্ন হইতে পারে, নিম্নে সেই সমুদায়ের ক্রমে বিবরণ করা যাইতেছে।

অইল গিল্‌ডিং (Oil gilding)—সাধারণ সংযোগ প্রকার মধ্যে এই প্রকারই প্রধান। এই স্থলে ইহার ফরাসী দেশীয় প্রসিদ্ধ প্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ সফেদ রঙ (White lead) শুষ্ককারক মসিনার তৈলে অল্প পরিমাণ তারপিন তৈলের সহিত মর্দ্দিত করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা জমি করিতে হইবে। তৎপরে ক্যালসাইন্‌ড্ সেরুজ (Calcined ceruse, সফেদের একপ্রকার) উত্তম রূপে কাঁচা মসিনার তৈলে মর্দ্দিত করিয়া তার্পিন- (Essence of turpentine)-এ গুলিয়া পূর্ব্ব প্রস্তুত জমি শুকাইলে, তাহাতে তিন চারি বার লাগাইবে। প্রথম প্রদত্ত বর্ণ না শুখাইলে দ্বিতীয় বার লাগাইবে না।

অইলকলার ব্রস (তেলের রঙের তুলি) কোন পাত্রে ধুইলে, তাহার তলায় যে ঘন পদার্থ পতিত হয়, সেই আটাযুক্ত পদার্থ (রঙটা কৃষ্ণবৎ বর্ণ না হয়) পরিষ্কার করিয়া ঐ দ্বিবিধ প্রকারে প্রস্তুত জমির উপর লাগাইয়া দিয়া তাহা অল্প কাঁচা থাকিতে তাহার উপর সোনালি বসাইয়া দিতে হইবে। সোনালি সমান করিয়া তুলার গোলক দ্বারা চাপিয়া চাপিয়া বসাইয়া দিবে, যেখানে হাত না যায় সেখানে সরু শলাকার অগ্রভাগে তুলা দিয়া তাহা দ্বারা চাপিয়া দিতে হইবে।

এই রূপ গিল্টি করা দ্রব্যে বার্ণিস লাগান যাইতে পারে, কিন্ত যদি ঐ দ্রব্য অনাবৃত স্থানে রাখিবার জন্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে বার্ণিস লাগাইবে না; কারণ তাহা হইলে ঐ বর্ণ শীঘ্রই নষ্ট হইবে। আবৃত স্থানে (গৃহাদি মধ্যে) যে সকল দ্রব্য থাকিবে তাহা বার্ণিস করাই ভাল। বার্ণিস করিতে হইলে প্রথমতঃ একবার উহাতে স্পিরিট বার্ণিস মাখাইবে, তৎপরে সেফিংডিস্-(Chafing dish একপ্রকার আগুনের কটাহ)-এর দ্বারা উহা অল্প উত্তপ্ত করিবে। কটাহ শীঘ্র শীঘ্র সরাইয়া লইবে, কোন এক স্থানে স্থির করিয়া রাখিবে না, তাহা হইলে দাগ ধরিবার সম্ভাবনা।

সর্ব্বশেষে অইল বার্ণিস লাগাইলেই কার্য্য শেষ হইল।

পারিস প্রচলিত আরও একপ্রকার প্রকরণ উল্লিখিত হইতেছে——

প্রথমতঃ যে দ্রব্যে গিল্টি করিতে হইবে তাহার উপর নিম্ন লিখিত রূপ জমি করা হয়—

সফেদ রঙ (White lead) তদর্দ্ধেক ওজনে ইয়েলো ওকর (Yellow ochre,) এবং অল্প পরিমাণ লিথারেজ (Letherage oxide of lead) প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইয়া

মসিনার তৈলে মর্দ্দিত করিয়া তার্পিন (Essence of turpentine) দ্বারা পাতলা করিতে হয়। ইহাই কথিত দ্রব্যে মাখাইয়া প্রথম জমি করিতে হয়।

প্রথম জমি শুষ্ক হইলে তাহার উপর আরও ১০।১২ বার ঘন করিয়া রঙ দিতে হইবে। ঐ ঘন রঙ ক্যালসাইণ্ড হোয়াইট লেড্ (Calcined white lead) বা মাজিকট (Massicot) কাঁচা মসিনা তৈল ও টারপিনে মিশাইয়া প্রস্তুত করিলেও চলে। এই রঙ রৌদ্রের তাপে শুকাইতে পারা যায়।

দ্বিবিধ জমি প্রস্তুত হইলে, উহা প্রথমতঃ ঝামা প্রস্তর (Pumice Stone) ও জল, তৎপরে ঝামা প্রস্তরের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ ও পশমী কাপড় দ্বারা উত্তম রূপে পালিস করিবে যেন কাচের ন্যায় মসৃণ হয়।

তৎপরে ক্যামেল হেয়ার তুলি দিয়া, চারি পাঁচ বার (প্রয়োজন হইলে আরও দেওয়া যায়) পরিষ্কার ও পাতলা লাক্ষা বার্ণিস (Lac varnish) মাখাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ উত্তাপ দেওয়া প্রয়োজন।

এই বার্ণিস শুষ্ক হইলে উহা উত্তমরূপে পালিস করিলে দর্পণের মত উজ্জ্বল হইবে। তৎপরে কোন উষ্ণ স্থানে লইয়া যাইবে, সে স্থানে যেন ধুলির সংস্রব না না থাকে। সেই খানে ইহাতে স্বর্ণ বর্ণ (Gold color) খুব পাতলা করিয়া লাগাইবে এবং অর্দ্ধ শুষ্কাবস্থায় তাহাতে স্বর্ণপাত (সোনালি) বা স্বর্ণরেণু লাগাইবে।

প্রথম প্রক্রিয়ায় যে অইলকলারের রংয়ের কথা বলিয়াছি তাহা সুপ্রাপ্য না হইলে, নিম্ন প্রকারে প্রস্তুত করা যায়। ইয়েলো ওকার কোটান মসিনার তৈলে মর্দ্দিত করিয়া তাহাতে আবশ্যক মত তার্পিন দিয়া লইলেই চলে। এই উভয় প্রকারের নামই গোল্ড কলার বা অইল গোল্ড সাইজ্।

সংলগ্ন স্বর্ণ উত্তম রূপে শুষ্ক হইলে তাহাতে স্পিরিট বার্ণিস দিবে। উহা শুকাইলে, তাহাতে দুই তিন বার কোপাল বার্ণিস বা অইল বার্ণিস লাগাইবে।

সর্ব্বশেষে পশমী কাপড়ে ট্রিপলি-(এক প্রকার বেলিয়া পাথর)-র গুঁড়া মাখাইয়া, তদ্দ্বারা ঐ গিল্টি করা স্থান পালিস করতঃ, (হস্তে অল্প অলিভ অইল মাখাইয়া) হস্ত দ্বারা আস্তে আস্তে মাজিয়া যাইবে। তাহা হইলেই গিল্টি উজ্জ্বল হইবে।

এই রূপে কাষ্ঠ, প্লাষ্টার প্রভৃতি নির্ম্মিত দ্রব্য উত্তম গিল্টি হয়।

সচরাচর হোয়াইট লেড্ মসিনার তেলে মর্দ্দিত করিয়া তদ্দ্বারা জমি করিয়া তাহার উপর অইল গোল্ড সাইজ্ মাখাইয়া সোনালি বসাইয়া কোন মসৃণ বস্ত্র দ্বারা মাজিয়া বেশ সোনালি রঙ প্রস্তুত হয়।

উপরে নানাবিধ বার্ণিসের কথা বলা হইয়াছে, সময়ান্তরে বিবিধ প্রকার বার্ণিস প্রস্তুত প্রক্রিয়া বিবৃত হইবে।

পুস্তকের মলাটের চামড়ার উপর বা কাপড়ের উপর সোনা লাগাইতে হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গম ম্যাষ্টিকের সূক্ষ্ম চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর স্বর্ণপাত রাখিয়া ধাতুনির্ম্মিত ছাপ (যাহা ঐ স্থানে বসাইতে হইবে) অগ্নিতে উত্তম রূপে গরম করিয়া উহার উপর চাপিলেই উহাতে উত্তম ছাপ উঠিবে।

পাতার ধারে সোনা লাগাইতে হইলে ধার উত্তম রূপে পরিষ্কৃত হইলে ঐ পুস্তক উত্তম রূপে কসিয়া স্পিরিটে দ্রবীভূত আইসিংগ্লাস তাহাতে মাখাইবে ও অল্প কাঁচা থাকিতে থাকিতে তাহার উপর পাত বসাইয়া উত্তম রূপে শুষ্ক হইলে পুস্তক খুলিয়া লইবে।

ফরাসী দেশীয় কারীগরেরা, আইসিংগ্লাসের পরিবর্ত্তে আর্ম্মেনিয়ান বোল (Armenian bole) ৪ ভাগ, মিছরীর গুঁড়া একভাগ এবং প্রয়োজন মত ডিম্বের শ্বেতাংশ মিশ্রিত দ্রব ব্যবহার করেন। ইহা ব্যবহার করিতে হইলে পাতলা গঁদ অগ্রে লাগাইয়া তাহার উপর এই দ্রব পাতলা করিয়া লাগাইতে হয়। জমি উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে একখান ভিজা ন্যাকড়ার দ্বারা ঐ স্থান মুছিয়াই তাহার উপর সোনার পাত দিয়া পশমগুচ্ছ দ্বারা চাপিয়া দিতে হয় ও একটু পরেই বেশ করিয়া মাজিয়া দিতে হয়।

পুস্তক বান্ধাইকারেরা (দপ্তরীরা) এই সকল প্রয়োজনে যে সমুদায় যন্ত্র ব্যবহার করে, তাহা এ স্থলে বর্ণিতব্য নহে। প্রস্তাবান্তরে বর্ণিত হইতে পারে।

সাইনবোর্ডে স্বর্ণাক্ষর লিখিতে হইলে প্রথমতঃ অক্ষরগুলি পীতবর্ণে লিখিয়া তাহার উপর অইল গোল্ড সাইজ্ লাগাইয়া সোনার পাত বসাইলেই চলিতে পারে। কাঠের অক্ষর উচ্চ করিয়া তাহার উপর সোনা লাগাইতে হইলে প্রথম প্রক্রিয়ার ন্যায় গিল্টি করিলে অতি উত্তম হয়।

ইহাতে বার্ণিস দেওয়া উচিত নহে, কারণ বার্ণিস রৌদ্রে নষ্ট হইয়া যায়।

আর কএক প্রকার গিল্টি করিবার প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে।

১। কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত দ্রব্য সিরিষ মাখাইয়া শুষ্ক করিবে, তদনন্তর খটিকাচূর্ণ প্যানিস্ হোয়াইট বা প্লাষ্টার অব প্যারিস চূর্ণ করিয়া সিরিষ অথবা আইসিং গ্লাস দ্বারা মণ্ডবৎ করতঃ

তাহাতে মাখাইবে। এই রূপ তিন চারিবার মাখানর পর জমি হইলে, উহা সিরিষ কাগজ দিয়া মসৃণ করতঃ অইল গোল্ড সাইজ্ দিয়া তদুপরি স্বর্ণপাত বসাইবে। উহা আ্যগেট (Agate) বা অন্য কোন মসৃণ পদার্থ দ্বারা পালিস করিলে সুন্দর গিল্টি হইবে।

২। ওয়ারম উড্ (Worm wood) ও গার্লিক জলে সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিবে, পরে তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে লবণ ও বিনিগার মিশাইবে, এই মিশ্র দ্রবে সিরিষ গলাইয়া, উষ্ণাবস্থাতেই যে কাষ্ঠ দ্রব্য গিল্টি করিতে হইবে তাহার গায় মাখাইবে। প্রস্তর বা প্লাষ্টার দ্রব্যে গিল্টি করিতে হইলে লবণ দিবেনা। তৎপরে সাইজের দ্বারা স্পানিস্ হোয়াইট ৮।১০ বার উত্তমরূপে মাখাইবে। তৎপরেও কোন স্থানে ছিদ্রাদি দৃষ্ট হইল, তাহার মধ্যে সিরিষ মিশ্রিত সাদা রঙ দিবে। তৎপরে জমি খুব ঠাণ্ডা জল ও ঝামা পাথর দিয়া পালিস করিবে এবং যদি কোন স্থান উচু নীচু বোধ হয়, আবশ্যক হইলে আবার শ্বেতবর্ণ লাগাইবে। তৎপরে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তাহার দ্বারা সমস্ত অংশ উত্তম রূপে পরিষ্কৃত কিরিবে, তৎপরে উত্তম রূপে মসৃণ করিয়া সাইজ্ মিশ্রিত ইয়েলো ওকর লাগাইবে। তৎপরে—

আর্ম্মেনিয়ান বোল	১ পৌণ্ড
ব্লুডষ্টোন	২ ঔন্স
গ্যালেনা	প্রয়োজন মত

পৃথক পৃথক জলে মাড়িয়া অল্প পরিমাণ অলিভ অইলের সহিত মিশাইবে। ইহা মেষের চামড়ার সিরিষের সহিত মিশ্রিত করিয়া কোমল ভাবে উপর উপর লাগাইবে। ঐ স্থান উত্তম রূপে শুষ্ক হইলে, বরফ খণ্ড দ্বারা ঐ স্থান ভিজাইয়া তাহার উপর স্বর্ণপাত বসাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে ব্লডষ্টোন দ্বারা বার্ণিস করিতে হইবে। যদি কোন স্থানে স্বর্ণ না লাগিয়া থাকে তুলি দ্বারা সেই স্থান ভিজাইয়া আবার পাত দিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত দ্রব কোমল ভাবে অল্প পরিমাণে মাখাইবে দ্রব—

এনোট	২ ঔন্স
গ্যাম্বোজ	১ ঔন্স
বর্ম্মিলিয়ন	১ ঔন্স
ড্রেগনস্ ব্লড	অৰ্দ্ধ ঔন্স
সল্ট অব টার্টার	২ ঔন্স
জাফ্রান	১৮ গ্রেণ
জল	২ পাইণ্ট

মৃদু উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া রেশমী কাপড়ে ছাঁকিতে হইবে।

জাপানীরা গিল্টি করিতে হইলে দ্রব্যটি উত্তমরূপে মসৃণ করিয়া তাহার উপর অয়েলগোল্ড সাইজ্ টার্পিণের সহিত মাখাইয়া তাহাতে স্বর্ণ চূর্ণ চাপাইয়া ওয়াসলেদার দ্বারা পালিস করতঃ স্পিরিট মাখাইয়া ঈষৎ উত্তপ্ত করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, গিল্টি দুই প্রকার। তন্মধ্যে সাধারণ প্রকারের প্রণালী বিবৃত হইল। এক্ষণে রাসায়নিক সংযোগ বর্ণিত হইতেছে—

এই উপায়ে গিল্টি করিতে হইলে, পিত্তলই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তাম্র, নরম এবং ঘন বর্ণযুক্ত বলিয়া উহাতে গিল্টি তত ভাল হয় না। সচরাচর যে পিত্তল ব্যবহৃত হয়, তাহার সহিত সাত গুণ তাম্র মিশাইয়া লইলে গিল্টি করিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ধাতু হয়। প্রথমতঃ ঐ ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যে আমলগাম অব গোল্ড (Amalgam of Gold) চারিদিকে সমান ভাবে মাখাইয়া উত্তাপ দ্বারা ঐ আমালগামস্থিত পারা উড়াইয়া দিলে অতি উৎকৃষ্ট গিল্টি হয়।

এই প্রক্রিয়া দ্বারা গিল্টি করণ, আমালগাম প্রস্তুত করণ প্রভৃতি উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট যত্ন সহকারে রক্ষা না করিলে, ঐ সকল বিষয়ে পারদর্শী হওয়া যায় না, এজন্য উহার প্রক্রিয়া বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইল না।

আমালগাম হইতে পারদ উড়াইবার সময় পারদ শিল্পির শরীরে প্রবেশ করে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটে, তন্নিবারণ জন্য ফরাসী পণ্ডিত মুসে, ডি, আর্সেট (M. D' Arcet) এক প্রকার ফরেনেস্ (Furnace) প্রস্তুত করিয়াছেন।

গ্রীসদেশে আর একবিধ রাসায়নিক গিল্টি প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। করোসিব সব্লিমেট ও নিসাদল সমান অংশে, নাইট্রিক আসিড্ দ্বারা বিগলিত করিয়া তাহাতে স্বর্ণযোগ করিলে, যে দ্রব প্রস্তুত হয়, উহা রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যে মাখাইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইলে উহা উত্তপ্ত করিলেই সুন্দর সুবর্ণ বর্ণ হইয়া থাকে।

কাচ ও চীনা বাসনে, চূর্ণস্বর্ণ (Gold dust) গঁদ ও সোহাগা দ্বারা গুলিয়া তুলি দ্বারা লাগাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে, স্বর্ণ, পাত্রে লগ্ন হয়, তার পর পালিস্ করিলেই গিল্টি হয়।

খ্রীঃ ১৮৩৬ অব্দের জুন মাসে এলকিংটন (Mr. Elkington) সাহেব, নিম্ন প্রক্রিয়া প্যাটেন্ট (Patent) করিয়া লইয়াছেন—

প্রথমতঃ—

বিশুদ্ধ নাইট্রিক আসিড্ (Sp. gr. 1·45) ২১ ঔন্স

বিশুদ্ধ মিউরেটিক আসিড্ (Sp. gr. 1·15) ১৭ ঔন্স
পরিশ্রুত জল ... ... ১৪ ঔন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৫২ ঔন্স নাইট্রোমিউরেকি আসিড্ হইবে। তাহাতে ৫ ঔন্স, উত্তম স্বর্ণ গলাইয়া লইতে হয়।

স্বর্ণ, টুরওয়েট দ্বারা পরিমিত হইলে।

পূর্ব্বোক্ত মিশ্রে স্বর্ণ দিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইতে হয়, যতক্ষণ তাহা হইতে, হরিদ্রা ও লাল বাষ্প উঠা বন্ধ না হয় ততক্ষণ উত্তাপ দিতে হয়। তৎপরে, তলার সারাংশ বাদে সমস্ত একটি প্রস্তর বা মৃণ্ময় পাত্রে গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে ৪ গ্যালন জল এবং ২০ পৌণ্ড বিশুদ্ধ বাইকারবনেট অব পটাস (Bicarbonate of Potash) মিশ্রিত করিয়া ২ ঘণ্টা কাল ফুটাইতে হয়।

তৎপরে ঐ ফুটন্ত দ্রব অগ্নির উপর রাখিয়াই, তাহাতে গিল্টি করিবার দ্রব্য উত্তমরূপে পরিস্কৃত করিয়া একটি তারে বাঁধিয়া ডুবাইয়া দিতে হয় এবং উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিয়া তুলিয়া লইতে হয় ও পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিলেই চলে।

উপযুক্ত সময় কত? অভ্যাস দ্বারাই জানিতে পারা যায়।

ইহাতে রঙ করা যায়।

আর একপ্রকার গিল্টি করিবার প্রক্রিয়া আছে তাহা সাধারণতঃ কোল্ড গিল্ডিং নামে প্রখ্যাত।

প্রথমতঃ—

বিশুদ্ধ স্বর্ণ	৬০ গ্রেণ
উৎকৃষ্ট তাম্র (Brosh copper) ...	১২ গ্রেণ
বিশুদ্ধ নাইট্রিক আসিড্	অর্দ্ধ ঔন্স
বিশুদ্ধ মিউরেটিক আসিড্	দেড় ঔন্স

একত্রে মিশ্রিত করিয়া, পরিষ্কার কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র খণ্ডের উপর দিবে, যেন সমস্তই তাহাতে শুষিয়া লয়, তৎপরে উহা শুষ্ক হইলে তাহাতে অগ্নি দিয়া পোড়াইয়া ভস্ম করিবে। এই ভস্মে স্বর্ণ চূর্ণ থাকে।

যখন কোন দ্রব্য গিল্টি করিতে হইবে। তখন উহা পরিষ্কার করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, লবণাক্ত জলে কর্ক ভিজাইয়া তদ্দ্বারা ঐ চূর্ণ লইয়া সেই দ্রব্যে ঘসিতে থাকিবে। এই রূপেই ঐ দ্রব্য গিল্টি হইবে। বড় জিনিস লইলে, গিল্টির পর হেমেটাইট (Hematite) দ্বারা সাবান জলের সহিত পালিস করিতে হয়; সামান্য জিনিস ইস্পাত দিয়া মাজিয়া লইলেই চলে।

উপরে রঙ করিবার কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে উহার প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে।

ফট্‌কিরি	১ ঔন্স
কোরাইড আব সোডিয়ম	১ ঔন্স
সোরা	২ ঔন্স
পরিশ্রুত জল	অর্দ্ধ পাইট

একত্রে ফোটাইয়া লইবে ইহাতে স্বর্ণালঙ্কার রঙ করা যায়।

আমাদের দেশে ফটকিরি ও লবণ অল্প জলে গুলিয়া অলঙ্কারে মাখাইয়া উত্তপ্ত করে এবং মাজিয়া লইয়া, ফটকিরি, পাকা তেঁতুলের শাঁস, গন্ধক, নিশাদল ও জলের সহিত একত্রে অগ্নিতে ফোটাইলেই অতি উৎকৃষ্ট রঙ হয়।

নিম্ন লিখিত মিশ্র, পুরাতন গিল্টিতে মাখাইলে উজ্জ্বল হয়।

আনোটা	১ ঔন্স
সল্ট অব তাতার	১ ঔন্স
খুনখারাপী	অর্দ্ধ ঔন্স
পরিশ্রুত জল	তিন পোয়া

ফুটাইয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ২০ গ্রেণ জাফ্রান্ মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মলিন গিল্টি পুনরুজ্জ্বল করণ জন্য উষ্ণ চূর্ণ ১ ঔন্স এক পাইন্ট উষ্ণ জলে এবং পারল আস্ ২ ঔন্স, ১॥ পাইন্ট উষ্ণ জলে গুলিয়া একত্রিত করতঃ উপরস্থ পরিষ্কার অংশ লইবে। ইহা স্পঞ্জ দ্বারা মাখাইলেই মলিন গিল্টি পুনরুজ্জ্বল হইবে।

উপরি লিখিত প্রক্রিয়া সমস্ত আমার পরীক্ষিত নহে নানা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

শ্রীসাঃ—



হেমন্ত।

১

সুন্দর শরৎ ঋতু প্রিয়া সনে ছাড়িয়া ধরণী,
শারদ ঐশ্বর্য্যরাজি শোভা শূন্য হইল অমনি।
প্রভু, প্রভু পত্নী নাই ; কাজে কাজে বিশাল সংসার
"কোথা রাজা! কোথা রাণি!" এই বলি' করে হাহাকার।
গভীর বিষাদ ভরে সরোবরে কমলিনীকুল
রাজশোকে প্রাণে মরে কেঁদে কেঁদে হইয়ে আকুল।
অলি এসে ফিরে গেল নাহি পেয়ে কমলের সুধা,
কাতর ভ্রমরবর, জলে উঠে পিপাসার ক্ষুধা।
শরতের কেলিকুঞ্জ তরু-লতা-ভূষিত কানন
দেখিতে কেমন ছিল, দেখিলেই ভুলে যেতো মন।
এখন তেমন নয়, নাহি আর রূপের বিকাশ,
প্রাণ মাত্র আছে শুধু, তাও বুঝি হয় বা বিনাশ।
তরু আছে, লতা আছে, কিন্তু নাই সে ফুলের ছটা,
মন-মরা ফুলগুলি হ'য়েছে গো ছাড়ো-ছাড়ো বোঁটা।
সেই তো আকাশ আছে, কিন্তু নাই নীলিমার ছাঁদ?
সেই তো আকাশে চাঁদ, কিন্তু কই 'শরতের চাঁদ'?
সেই তো চাঁদিনী আছে, কিন্তু কই চাঁদিনীর প্রাণ?
সেই তো চকোর আছে, কিন্তু কই বাঁশরীর গান?
সেই তো তারকা আছে, কিন্তু কই ফুটন্ত চাহনি?
সেই তো সমীর আছে, কিন্তু কই সাধের নাচনি?
সেই তো প্রকৃতি আছে, কিন্তু কই প্রকৃতির খেলা?
সেই তো পৃথিবী আছে, কিন্তু কই উৎসবের মেলা?

২

কেন হে আচম্বিতে? কেন হেন কঠিন ঘটনা?
কেন হাসি মিশে গেল, কেন ঘোর বিষাদ তাড়না?
তৃণটি পর্য্যন্ত কেন সারানিশি কেঁদে কেঁদে সারা?
মুখ ব'য়ে ফোঁটা ফোঁটা কেন পড়ে নয়নের ধারা?
বন মাঝে মনোদুখে কি এক গভীর নিরাশায়
গলা জড়াজড়ি ক'রে তরু লতা কেন কেঁদে চায়?
পূরো ফোটা—আধ ফোটা ফুলকুল আকুল কাঁদিয়ে,
টস্ টস্ আঁখি-বারি কেন পড়ে ভূমে গড়াইয়ে?
যে চাঁদের সুধা হাসি বসুধারে হাসাইয়েছিল,
সে চাঁদ মলিন কেন? হাসিহারা কেন বা হইল?
যে সন্ধ্যার পশ্চিমাঙ্গ রঙ মাখা নীরদে সাজিত,
সে সন্ধ্যা ধূসরা কেন? সে নীরদে কেন বা বঞ্চিত?
দিবায় রবির করে, নিশায় চাঁদের চাঁদিমায়
যে মেঘ করিত খেলা, সেই মেঘ এখন কোথায়?
খেলার বিশাল ক্ষেত্র মহাকাশ ফাঁক হ'য়ে আছে,
খেলুড়ে মেঘেরা নাই, কে সে সবে তাড়া'য়ে দিয়াছে?
দূর দূরন্তরব্যাপী যে আকাশ নীল রঙ মাখা,
সে আকাশ কেন এবে ধূসর বরণ ধূমে ঢাকা?
নবীন যৌবনা নদী খরস্রোতে কেন নাহি রয়?
কই সে লহরী-লীলা? এই নদী যেন সেই নয়।
জীবন্ত প্রকৃতি এবে মুমূর্ষুর মতন অসাড়,
উঠিয়ে দাঁড়াতে চায়, কেন পড়ে লুটাইয়ে ঘাড়?



মহারাজ রণবীর সিংহ

৩

এতক্ষণে বুঝিয়াছি,—হইয়াছে ঋতু-বিপর্য্যয়,)
শরতের শূন্য রাজ্যে কঠিন হেমন্ত ঋতূদয়।
রাজার প্রকৃতি মত রাজ্যে ঘটে শাসন-নিয়ম,
শরতের শান্ত প্রাণ, হেমন্তের দাপট বিক্রম।
হের হের, ওই ধায় হেমন্ত উধাও হ'য়ে নভে,
বিশাল আকাশ-পট কি এক ছায়ায় যায় ডুবে।
কি ছায়া ওছায়া ? উহা হেমন্তের মূল পরাক্রম,
নাসারন্ধ্র হ'তে হয় হুহু ক'রে কোয়াসা নির্গম।
অনন্ত আগ্নেয় গিরি এক সঙ্গে মিলে একেবারে
ভয়ঙ্কর ধূমরাশি হুহু ক'রে যেন রে উদ্গারে।
ভীষণ হেমন্ত ঋতু দূরব্যাপী প্রবল নিশ্বাসে
উড়ায় কোয়াসা রাশি স্তরে স্তরে অনন্ত আকাশে।
গভীর গহ্বর মুখে ঘন ঘন দিতেছে ফুৎকার,
অনন্ত শিশির-বিন্দু ঝর ঝরি ঝরে ঝারাকার।
নীলাকাশ ঢেকে গেল নিবিড় ধূমল কোয়াসায়,
ঊষার জাগানো ভানু ছায়াকারে ক্ষীণ দেখা যায়।
ধরাতল হেমন্তের অন্তহীন নিশির শিশিরে
আগেই গিয়েছে ভিজে ; প্রমাণ আহার তৃণশিরে।
ধূমে হিমে পরাক্রমে আকাশে হেমন্ত বেগে ধায়,
ডানি হাতে রাজদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড বাঁ হাতে ঘুরায়।

৪

হের হের, পুন ওই হেমন্তের কুজ্ঝটিকা স্রোত
আকাশ ভূতল জল করিয়া ফেলিল ওত-প্রোত।
দৃষ্টিপথে বাধা পড়ে, দূরবস্তু নাহি দেখা যায়,
একাকার একার্ণব কুজ্ঝটির জমাট ধোঁয়ায়।
কি এক আঁধার-ছায়া ছাইয়া ফেলিল চারি ধার,
কি এক সমুদ্রে ডুবে ধরা যেন দিতেছে সাঁতার।
অনন্ত অনন্ত জীব ডুবে গেল অভেদ্য আঁধারে,
কেহ কা'রে নাহি হেরে, হেমন্তের কি ঘোর ধাঁধারে!
চকিতে চমক পুন, কুজ্ঝটিকা ঈষৎ তরল,
চেয়ে দেখি নিম্নভাগে, ভিজে গেছে সমস্ত ভূতল।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কাশ্মীরাধিপতি মহারাজাধিরাজ রণবীর সিংহ।

"ধর্ম্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবমতি গতির্ভাবনীয়া সদৈব
জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং বরচর নয়নৈর্ম্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ম্।
প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ যোজনী যৌ চ কালে
আত্মা যত্নেন রক্ষ্যো রণশিরসি পুনঃ সোঽপি নাপেক্ষণীয়ঃ।"
"দানং দরিদ্রে বিভবেঽপি শান্তির্যূনাং তপো জ্ঞানবতাঞ্চমৌনম্।
ইহানিবৃত্তিশ্চ সুখোচিতানাং দয়া চ ভূতে ত্রিদিবং নয়ন্তি॥"

মৃত মহারাজ যে উল্লিখিত নিয়মানুসারেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন—দ্বিতীয় শ্লোকোল্লিখিত সত্যই যে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, তাহা তাঁহার জীবনে পদে পদে প্রকাশিত আছে। আজিকার দিনে তিনি যে একজন আদর্শ-হিন্দুরাজা ছিলেন, তাহা অসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে। এরূপ রাজার মৃত্যুতে যে ভারত কাতর হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

যদিও আমাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন্ সম্বন্ধ ছিল না—তথাপি তিনি হিন্দু রাজা—সুতরাং আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ আছে। তাই আজ আমরা তাঁহার গুণোল্লেখ করিয়া কাঁদিব।

খ্রীঃ ১৮৩২ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জন্মিবার ১৩ বৎসর পূর্ব্বে, খ্রীঃ ১৮১৯ অব্দে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ, মুসলমান-কবল হইতে, সুবর্ণভূমি কাশ্মীর রাজ্য উদ্ধার করিয়া, স্বীয় প্রিয় সেনাপতি গোলাব সিংহের হস্তে অর্পণ করেন। মহারাজ গোলাব সিংহই মৃত মহারাজের পিতা।

খৃীঃ ১৮৫৭ অব্দে মহারাজ গোলাব সিংহের মৃত্যু হইলে, ইনি ২৫ বৎসর বয়সে, কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে আসীন হন। রাজা হইয়া ইনি অতি যত্নে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।

এই সময়েই, ভারতে ইংরাজাধিকারে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই উপদ্রব সময়ে, ইনি সৈন্য-দ্বারা ইংরাজরাজের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের অবসানে, মহারাণী ভারত রাজ্য নিজ করে গ্রহণ করিলে, ইনি এই সহায়তার জন্য খৃীঃ ১৮৬১ অব্দে নাইট কম্যাণ্ডার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া (K. C. S. I.) উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বরাবর সমান অনুরক্ত ছিলেন।

খৃীঃ ১৮৭৫ অব্দে যখন যুবরাজ (Prince of Wales) ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন ইনি তাঁহার অভিনন্দন জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আগমন করিবার সময় ইনি পথিস্থ সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রত্যেক স্থানে যথাবিহিত দানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া কালীঘাটে গমন করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি বঙ্গীয় পণ্ডিতগণকে, যুব-রাজের সমক্ষে বেদোচ্চারণ করিতে দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, এবং ম্লেচ্ছ সমক্ষে বেদোচ্চারণকারী ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ বলিয়া, এখানকার ব্রাহ্মণগণকে আদর, সম্মান বা দান করেন নাই।

ইনি যুবরাজকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যুবরাজ যখন কাশ্মীর দর্শনে গমন করেন, সেই সময়ে ইনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের ব্রিটিশভক্তির চিহ্ন স্বরূপ ঐ অট্টালিকা আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

খৃীঃ ১৮৭৭ অব্দ, ভারতের পক্ষে যেমন সুখের দিন, তেমনিই অসুখের দিন। এই অব্দে ইংলণ্ডে মহারাজ্ঞী ভারত রাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কাজেই ইহা সুখের দিন—কিন্তু যে ভীষণ দুর্ভিক্ষে ভারত ছারখার হইয়াছিল, তাহারই জন্য ইহা আবার অসুখের দিন। এই দুর্ভিক্ষের করাল বদন হইতে কাশ্মীর রক্ষা পায় নাই। রাজকর্ম্মচারীগণের অসাবধানতায় প্রথমতঃ রাজ্যে বড়ই অমঙ্গল ঘটিবার উদ্যোগ হইয়াছিল, কিন্তু ইনি ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের কথায় নিজে প্রজাবর্গের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া, সময়ে তাহাদিগকে সাহায্য দান পূর্ব্বক, বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই অব্দের প্রথমেই দিল্লির দরবারে ইনি কৌন্সেলার অব দি এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি লাভ করেন, এবং ব্রিটিস সৈন্যের অবৈতনিক সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন।

ইনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৯৩,৪০০ টাকা দান করেন। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে অনেক দান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি লেডি ডফরিণের স্ত্রী চিকিৎসা বিদ্যালয় ফণ্ডে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার দান শৌণ্ডতা দেখা গিয়াছে।

রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। শালের ব্যবসায়ের অবনতি হওয়াতে, তাঁহার রাজ্যের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছিল, সেই অভাব নিরাকরণ জন্য তিনি রেশমের ব্যবসায়, ও নানাবিধ শিল্পের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজ্যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির বিস্তার পক্ষে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল।

এই অশেষ গুণশালী রাজার মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে বলিয়াই যেন কাশ্মীর ভূমি, বর্ত্তমান ১৮৮৫ সালের মে মাস হইতে অনবরত কম্পিত হইতে ছিল। ১২ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীরের পক্ষে কি কাল দিন। রাজ্যেশ্বর হারাইয়া সকলেই দুঃখে মগ্ন। ৫৩ বৎসর বয়সে, ১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ন ৪॥ টার সময় কাশ্মীররাজ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মহারাজের ৩ পুত্র বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার প্রতাপ সিংহের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর। রাজ্যেশ্বর হইয়া তিনিই পিতার নাম রক্ষা করিবেন।

মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

জীবনকৃষ্ণের মৃত্যুর পরই তাঁহার পতিত সংসার সমস্য স্রোতে ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা ; কিন্তু তাহা যাইল না—পরমপিতা পরমেশ্বর তাহার অবলম্বন হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃষ্ণমোহনের অগ্রজ ভুবনমোহনের একটি কর্ম্ম যুটিল। দারিদ্র্য-পীড়নে ভুবনমোহন সম্যকরূপ বিদ্যালোচনা করিতে পারেন নাই ; অবলম্বন অভাবে বাল্যেই তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগে সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। পিতার পরলোকে এ সময় হইতে তাঁহাকে সাংসারিক কার্য্যে আরও দৃঢ়রূপে নিযুক্ত হইতে হইল। তিনি কলিকাতার তাৎকালিক বিচারালয়ে * মকর্দ্দমার আরজী লিখিয়া অতি ক্লেশে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারে এই সময় বঙ্গগৃহে বিষম ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইলে কৃষ্ণমোহনও সে আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁহার এ আন্দোলনে যোগদানের মূল—ডিরোজিও সাহেব। ডিরোজিও ফিরিঙ্গি-সন্তান। এ সময়ে তিনি হিন্দুকলেজের চতুর্থ শিক্ষক। ডিরোজিও, ফিরিঙ্গি-সন্তান হইলেও, হিন্দু-সন্তানগণকে সমধিক শ্রদ্ধা ও মান্য করিতেন। তাঁহার সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মান্য অচিরে কৃষ্ণমোহনপ্রমুখ যুবকবৃন্দকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, অল্প দিবসের মধ্যে নব্য হিন্দু-যুবকগণ ডিরোজিওর সহকারী সঙ্গী হইতে লাগিলেন।

ডিরোজিওর সহবাস হিন্দু-সমাজে যে কি ঘোর বিপ্লব আনয়ন করিল, তাহা বলিবার নহে। একে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে, ইতিহাস বিজ্ঞানের নবালোকে নবোত্থিত যুবক-মণ্ডলীর মন প্রাচীন হিন্দু-সামাজিকতার উপর হীনশ্রদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে আবার এই মহা প্রলয়ঙ্কর ডিরোজিওর সংস্রব! এ সংস্রব অগস্ত অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল ; বালুকারোধী নদীর গতি প্রসারিত করিয়া দিল। যুবকগণ প্রশস্ত মনে, নির্ভীক চিত্তে সামাজিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন ; কৌলিন্য-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন, শুক্রবিক্রয় নিবারণ, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের প্রতিবন্ধকতা আচরণ এ সময়ে তাঁহাদিগের আলোচ্য কার্য্য হইয়া আসিল।

এই যুবকগণের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতিই প্রধান। ডিরোজিওর সংস্রবে, এই সকল নব্য যুবকদলের উদ্যোগে হিন্দুসমাজ বিধ্বস্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইল। যুবকগণ সভা সমিতি করিয়া, সংবাদপত্রে লিখিয়া, প্রকাশ্যভাবে সামাজিক কুসংস্কার সমূহের মূলোৎপাটনে দৃঢ়-ব্রত হইলেন। এই যুবকগণের উদ্যোগে মানিকতলায় * (১৮২৮ কি ২৯ খৃষ্টাব্দে) "একাডেমিক এসোসিয়েসন" নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইল। এ সভা স্থাপনেরও প্রধান উদ্দেশ্য, সামাজিক কুপ্রথা সমূহের উচ্ছেদসাধন। এ সভায় অনেক মান্য গণ্য ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সম্মীলন হইত। এ সভায় ডেভিডহেয়ার, রায়ান এবং বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারী বেনসন প্রভৃতিরও বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

জীবনকৃষ্ণের মৃত্যুর এক বৎসর পরে কৃষ্ণমোহনের হিন্দু-কলেজের পাঠ শেষ হইল। তিনি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের (১২৩৭ সালের) নবেম্বর মাসে হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার প্রিয়বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এ সংযোগও তাঁহাদের স্বাধীন মত প্রচারের বিশেষ সহায় হইল। এই সময় ভারতের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল। একদিকে যেমন হিন্দু-যুবকগণ সামাজিক কুসংস্কার সমূহের উচ্ছেদ-সাধনে দৃঢ়ব্রত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই রাজ-দরবারেও হিন্দুদিগের কুসংস্কার দূরীকরণে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই খৃষ্টাব্দে মহাত্মা বেণ্টিঙ্কের উদ্যোগে ভীষণ সতীদাহ-নিবারণ-প্রথা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল,—ঠগী-উৎসাদন প্রভৃতির আন্দোলন চলিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে এইরূপ সামাজিক আন্দোলনে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল ; ক্রমে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ আসিল। এই খৃষ্টাব্দ

* এই বিচারালয়কে "কোর্ট অব্ রিকোয়েষ্ট" (Court of Request.) বলিত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা "ছোট আদালত" নামে অভিহিত।

* বর্ত্তমান সময়ে ঐ বাটিটি ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অধিকৃত। ইতিপূর্ব্বে কোর্ট অব্ ওয়াডের অধীনস্থ জমীদার-সন্তানগণ ইহাতে বাস করিতেন।

কৃষ্ণমোহনের জীবনে যে কঠিন শেল নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে। এই খৃষ্টাব্দে ঘটনাচক্র তাঁহাকে গৃহত্যাগী করিয়াছিল; তাঁহার অন্নের সংস্থান কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে প্রবাসিত্ব এবং পরান্নভোজিত্ব গ্রহণ করাইয়াছিল। এই খৃষ্টাব্দের ২৩এ আগষ্ট কৃষ্ণমোহনের জীবনের একটি শোচনীয় দিন। এইদিন কৃষ্ণমোহন হেয়ারস্কুলে পড়াইতে গিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণমোহনের নিকট গতায়াত করায়, পরিচিত থাকায়, তাঁহাদিগকে বাটীর ভৃত্য বাহির গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল। তাঁহারা গৃহে বসিয়া নানারূপ আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন।

এই সময় কৃষ্ণমোহনের বাটীর উত্তর-পার্শ্ব-সংলগ্ন বাটীতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; তিনি প্রচলিত কালোচিত হিন্দু রীতি নীতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। নব্যদলের নূতন মত তাঁহার নিকট ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইত, তিনি সর্ব্বদা যুবকদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিবার জন্য সামাজিক দল বাঁধিতে চেষ্টিত হইতেন। এইদিন যুবকগণ সেই বৃদ্ধের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের চপল স্বভাবোচিত অত্যাচারে বঙ্গগৃহ কলুষিত হইয়া উঠিল। যুবকগণ অস্পর্শীয় গোমাংস ও গোহাড় সমূহ উক্ত ব্রাহ্মণের বাটীতে নিক্ষেপ করিয়া "ঐ গোহাড়! ঐ গোমাংস!" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সে চীৎকার শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইলেন.—কম্পান্বিত দেহে, ম্লানবদনে হিন্দু-সমাজের সহায় লইলেন। সে সহায়ে বিষম বিভ্রাট ঘটিল। শত শত হিন্দু একত্রে মিলিয়া যুবকগণকে আক্রমণ করিলেন—পল্লী ঘোর রোলে ধ্বনিত হইল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণমোহন বাটী আসিলেন; বাটী আসিয়া দেখিলেন, বাটী লোকে পরিপূর্ণ—সেখানে কেবল 'মার' 'মার' শব্দ।

কৃষ্ণমোহনের গৃহাগমনের পরই বিবাদ মিটিল। ক্ষণকাল মল্লযুদ্ধের পর নব্য যুবকগণ পলাইলেন; আর হিন্দুগণ ভুবনমোহনের কর্ম্মস্থান হইতে আগমন প্রতীক্ষায় পথ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। "হয় কৃষ্ণমোহনকে সমাজচ্যুত ও গৃহত্যাগী করিব, না হয় উপদ্রব করিয়া সমগ্র পরিবার বিধ্বস্ত করিব" এই রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহারা পথে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এমন সময় ভুবনমোহন গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন দেখিয়া, হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট কৃষ্ণমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলেন; আনুপূর্ব্বিক দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে বলিলেন, "আপনি যদি মঙ্গল কামনা করেন, তবে কৃষ্ণমোহনকে এই দণ্ডেই বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন, নতুবা আপনাদের আর রক্ষা নাই।" ভুবনমোহন আর কি করিবেন? সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে কথা কহেন, তাঁহার সাধ্য কি? সুতরাং অগত্যা সমাজপতিগণের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন; বাটী আসিয়াই কৃষ্ণমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! হয় তুমি বাটী হইতে বহিষ্কৃত হও, নতুবা আমাকে বহিষ্কৃত হইতে হইবে। হিন্দু-সমাজ তোমার প্রতি বিশেষ রুষ্ট; তুমি বাটী হইতে না বাহির হইলে তাহারা এ সংসারে বিষম বিভ্রাট ঘটাইবে।" কৃষ্ণমোহন আর কথা কহিলেন না; জ্যেষ্ঠের আদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া ম্লান মুখে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

নিঃসম্বলে গৃহত্যাগী হইয়া কৃষ্ণমোহন একদিন আশ্রয় পাইলেন না,—সে দিন তাঁহার অনাহারে পথে পথে কাটিয়া গেল। পরদিন কোন সহৃদয় ইংরাজ তাঁহাকে আপন বাটীতে স্থান দিলেন; কৃষ্ণমোহন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া মনকষ্টে আপনার কাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু স্বজাতিচ্যুতি-কষ্ট তাঁহার বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইল। এইরূপে গৃহত্যাগী হইয়া শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে কৃষ্ণমোহন পীড়িত হইলেন। সে পীড়ায় তাঁহার বাঁচিবার কোনই আশা ছিল না; কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে ও তাঁহার বন্ধুগণের যত্নে তিনি সে পীড়ার হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেন। এই সময় ডফ প্রভৃতি খৃষ্ট-যাজকগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল; নিরাশ্রয় দেখিয়া তাঁহারা কৃষ্ণমোহনকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণমোহনকে গৃহত্যাগী করিয়াও হিন্দুসমাজ কিন্তু স্থির রহিলেন না; তাঁহাকে ব্যথার উপর ব্যথা প্রদান তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। গৃহত্যাগের একমাস যাইতে না যাইতে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮এ সেপ্টেম্বরে) একদল হিন্দু একদিন তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কৃষ্ণমোহন অতি কষ্টে এ আক্রমণের হস্ত হইতেও নিস্কৃতি পাইলেন,—এ আক্রমণেও হিন্দু-সমাজ তাঁহার বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে পারিলেন না।

ক্রমে আরও দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল, তথাপি তাঁহার প্রতি হিন্দুসমাজের উৎপীড়ন কমিল না। এবার হিন্দু-সমাজ কৃষ্ণমোহনের কর্ম্মচ্যুতির জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা হেয়ার সাহেবকে গিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণমোহনকে শীঘ্র আপনার বিদ্যালয় হইতে দূর করিয়া দিউন,—না দিলে আমরা আর সন্তানগণকে ও বিদ্যালয়ে

যাইতে দিব না।" হেয়ার সাহেব এ কথায় কিছু শঙ্কিত হইলেন; অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃষ্ণমোহনকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। অসহায় কৃষ্ণমোহনের একমাত্র অন্নের সংস্থানও এই রূপে নষ্ট হইল,—কৃষ্ণমোহন এতদিনে ভিখারীপ্রায় হইলেন।

এ সময় ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রবল বেগ। যে বেগ কয় বৎসর পূর্ব্বে কেবলমাত্র শ্রীরামপুরে দৃষ্ট হইয়াছিল, আজ কালের বিচিত্র ঘূর্ণনে তাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিতপ্রায়! কৌলিন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া অনেক হিন্দু ক্ষোভে ও মনোদুঃখে প্রকাশ্যভাবে সে বেগে ভাসমান হইলেন। কলিকাতায় এ সময় ডফ সাহেব একজন প্রধান ধর্ম্মযাজক। তিনি অনেক দিন হইতে কৃষ্ণমোহনকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে ছিলেন। এ সময় আবার কৃষ্ণমোহনের পরম বন্ধু, ডিরোজিওর অন্যতম সহকারী মহেশচন্দ্র ঘোষ ডফ-পৌরহিত্যে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কৃষ্ণমোহন একে নিরাশ্রয়, তাহাতে আবার মনোদুঃখে জর্জ্জরিত; একে তিনি হিন্দু-সামাজিকতার বিরুদ্ধবাদী, তাহাতে আবার তাঁহার এই দুরবস্থা! সমাজ হইতে পরিত্যক্ত, আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্বন্ধশূন্য কৃষ্ণমোহন আর বারিহীন মরুতে কত দিন থাকিবেন? এ অবস্থায় ডফের চিত্তমুগ্ধকারী ধর্ম্মকথা তাঁহার মন আকর্ষণ করিল। অগত্যা ডফ পৌরহিত্যে তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ডফ-ভবনে * বহুসংখ্যক ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সম্মুখে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহার এই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের দিন—১৮৩২ খৃষ্টাব্দের (১২৪০ সালের) ১৭ই অক্টোবর (?) ‡। এই দিন ভারতের একটি জ্বলন্ত নক্ষত্র ভারতাকাশ হইতে স্খলিত হইয়াছে; এই দিন ভারতমাতার একটি প্রকৃত পুত্র অসহায়ে, নিরাশ্রয়ে সনাতন আর্য্যধর্ম্মচ্যুত হইয়া ম্লেচ্ছধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। ইহা কি অল্প ক্ষোভের বিষয়?

খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণমোহন আশ্রয় পাইলেন। এই খৃষ্টাব্দে 'লণ্ডন মিসনারী সোসাইটীর' উদ্যমে মৃজাপুর পল্লীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সহৃদয় খৃষ্টান-সমাজ কৃষ্ণমোহনকে সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অসহায় কৃষ্ণমোহনের ইহাতে কিঞ্চিৎ আয় হইতে লাগিল—তিনি অদূরে উন্নতির ক্ষীণ জ্যোতি দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৫।১৬ বৎসর বয়সে হাবড়া-নিবাসী রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিন্দুবাসিনী নাম্নী কন্যার সহিত কৃষ্ণমোহনের পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। খৃষ্টান হওয়ার পর বিন্দুবাসিনীকে বাসায় আনয়নের চেষ্টা পাওয়ায় রাধামোহন কন্যাকে কৃষ্ণমোহনের নিকট পাঠাইতে অস্বীকৃত হইলেন; কৃষ্ণমোহনকে পুনরায় বিবাহ করিতে পরামর্শ দিলেন। কৃষ্ণমোহন কিন্তু তাহা পারিলেন না। যে বহু-বিবাহ প্রভৃতির প্রতি বিদ্বেষভাব তাঁহাকে জাতিচ্যুত ও আত্মীয় স্বজন হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, তাঁহার প্রাণ থাকিতে তিনি স্বয়ং তাহার পোষকতায় কেমন করিয়া নীচতার দৃষ্টান্ত হইবেন? বিন্দুবাসিনীও স্বামী ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বুদ্ধিমতী বিন্দুবাসিনী পিতার অজ্ঞাতে, গোপনে গোপনে স্বামীকে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। পত্নীর মনোভাব জানিতে পারিয়া কৃষ্ণমোহন অগত্যা বিচারালয়ের আশ্রয় লইলেন। হাবড়ার আদালতে, বিচারে তাঁহার জয় হইল; তিনি বিন্দুবাসিনীকে আপন আশ্রমে লইয়া আসিলেন।

কৃষ্ণমোহনের এখন অদৃষ্টের গতি ফিরিয়াছে। এখন সৌভাগ্য-স্রোত তাঁহার অনুকূলবাহী। মৃজাপুরের বিদ্যালয়ে পঞ্চ বর্ষকাল অধ্যক্ষতা করিতে করিতে, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে তাঁহার পদের উন্নতি হইতে লাগিল। খৃষ্টান-সমাজে তাঁহার মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়া আসিল। এমন কি,—১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে (১২৪৫ সালে) তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকের পদে উন্নীত হইলেন। ধর্ম্ম-যাজকের পদে বরিত হইলে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, বেথুন স্কুলের দক্ষিণে একটি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মন্দির প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণমোহন সেই ধর্ম্মালয়ের আচার্য্য হইলেন; ধর্ম্ম-মন্দির সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। এই ধর্ম্ম-মন্দির অধুনাপি "কৃষ্ণ বন্দ্যোর গির্জ্জা" বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

এত বিপ্লবেও কিন্তু কৃষ্ণমোহনের বিদ্যানুরাগ বিলুপ্ত হইল না; এখনও তিনি অদম্য উৎসাহে বিদ্যার সেবায় ব্যাপৃত রহিলেন। বাঙ্গালী, সাধারণতঃ কর্ম্মকাজ যুটিলেই লেখাপড়া ত্যাগ করেন, কিন্তু কৃষ্ণমোহনের জীবনে সে ঘটনা ঘটিতে পাইল না; তাঁহার শৈশবোচিত বিদ্যানুরাগ অটুট রহিল। সংবাদপত্রে লেখা কৃষ্ণমোহনের আশৈশবিক জল্পনা। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সংবাদপত্রে লিখিত আরম্ভ করেন। ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ "পার্থেনো" নামে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র

* মৃজাপুর ষ্ট্রীটের এই বাড়ী বর্ত্তমানে ঘোষাল পরিবারের অধিকৃত।

‡ নববার্ষিকীতে লিখিত আছে, ডিসেম্বর মাস।

প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তেজবীর্য্যপূর্ণ স্বাধীন ভাবসমূহের সমাবেশ দেখিয়া হোরেশ উইলসন তাহা বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পর কৃষ্ণমোহন 'হেস্পারস্' (Hesperus) প্রভৃতি আরও দুই একখানি ইংরাজী পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে, হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতার সময়ে "এনকোয়েরার" (Enquiror) নামে অপর একখানি ইংরাজী পত্র স্বয়ং সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হন। এ পত্রও হিন্দু কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধবাদী অনেক তেজস্বী প্রবন্ধে পূর্ণ থাকিত।

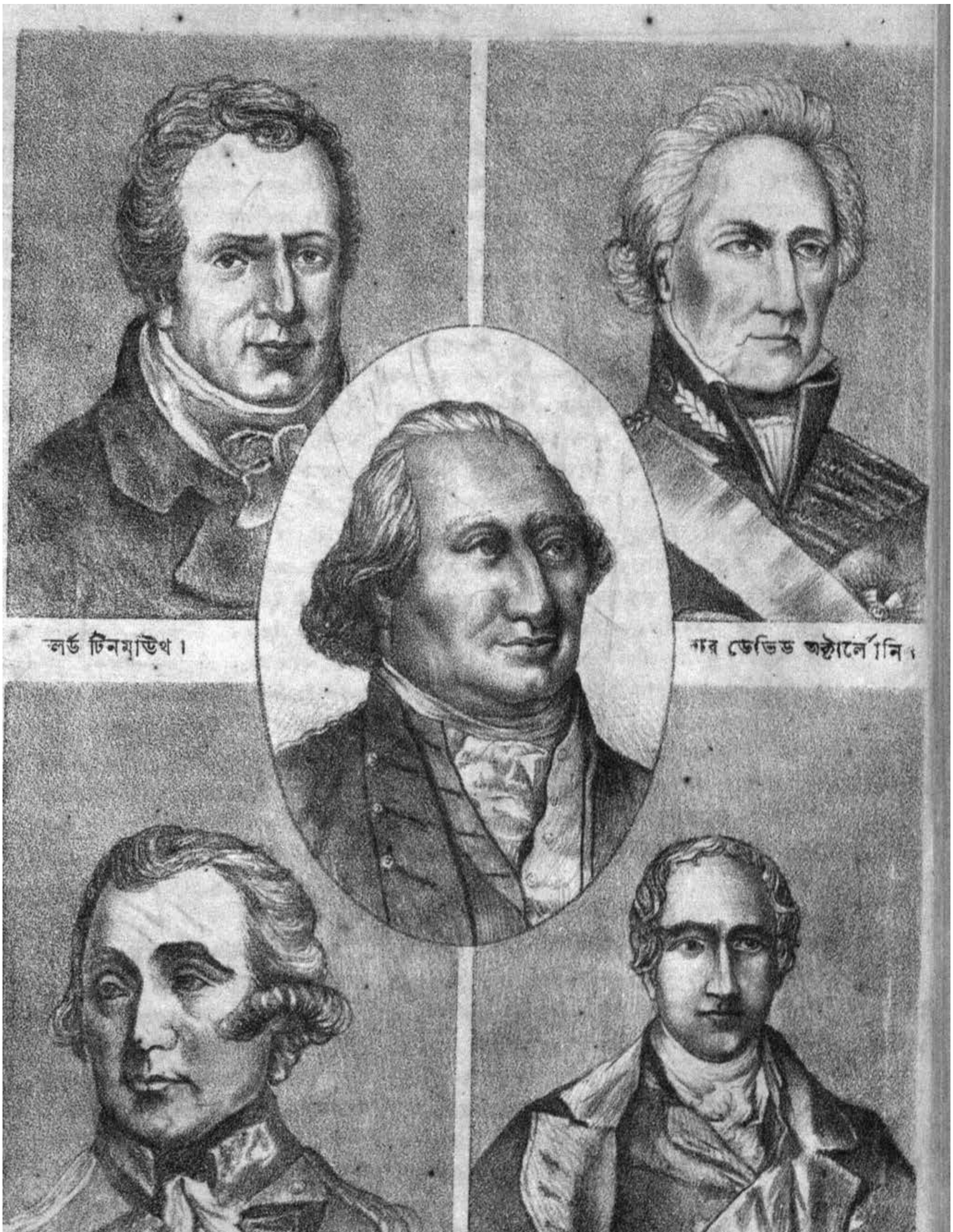
স্বদেশ ও স্বজাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও কৃষ্ণমোহন একদিনের জন্য জন্মভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি বিরাগভাব প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৫ বর্ষকাল ধর্ম্মযাজকের পদে অধিরূঢ় ছিলেন।' মহাত্মা বেণ্টিঙ্কের পর এই ১৫ বৎসরের মধ্যে অক্‌ল্যাণ্ড, এলেন্‌বরা, হার্ডিঞ্জ এবং ডালহৌসী ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনেরাল হইয়া আগমন করেন। এ সময় বঙ্গভাষার অতি দুরবস্থা, বঙ্গভাষা এ সময় সহায়হীনা। অক্‌ল্যাণ্ড-শাসন হইতে কৃষ্ণমোহনের দৃষ্টি সেই পতিত বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব-সাধনে প্রধাবিত হইল; বঙ্গভাষায় পুস্তক এবং পত্রিকা প্রচার করিয়া তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উপকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্পাদিত 'সুধাংশু' সংবাদপত্র এই সময় প্রচারিত হইয়াছিল। এ পত্র দ্বারাও বঙ্গভাষার কথঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার পর (১৮৪১ কি ৪২ খৃষ্টাব্দে) তিনি অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা দানের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন—এ প্রবন্ধটিও জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

অক্‌ল্যাণ্ড এবং এলেনবরার পর হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কুটীল রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি ভারতের সমূহ অনিষ্ট করিলেও, বঙ্গভাষার উন্নতি কামনায় তাঁহার সাহায্য, বঙ্গবাসীর চিরদিন স্মরণ থাকিবে। উৎসাহই উন্নতির মূল—মহত্ত্বের সোপান। মহাত্মা হার্ডিঞ্জ বঙ্গভাষার উন্নতি কামনায় নিযুক্ত কৃষ্ণমোহনকে সেই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে (১২৫২ সালে) "প্রথম শিখ-বিগ্রহ" অবসান হয়। ইহার পর বৎসরই (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে) কৃষ্ণমোহন গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে "সর্ব্বার্থসংগ্রহ" (Encyclopædia Bengaliansis) প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহা বঙ্গভাষার একটি প্রধান ভূষণ। মহাত্মা হার্ডিঞ্জের সাহায্যে কৃষ্ণমোহন বঙ্গভাষাকে এই ভূষণ পরিধান করাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এ সময় কৃষ্ণমোহন অনেক ইংরাজী পত্রেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "কলিকাতা রিভিউ" নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র এই সময় প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। কৃষ্ণমোহন এই পত্রের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তিনি এই পত্রের দ্বিতীয় ভাগে "বাঙ্গালার কুলীন-ব্রাহ্মণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধটির সারবত্ত্বায় অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি! 'কলিকাতা রিভিউর' তাৎকালিক সম্পাদক এই প্রবন্ধটি পড়িয়া মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন, "স্বদেশীয় ভাষায় লিখিয়াও, কেহ ইহাপেক্ষা সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারেন কিনা সন্দেহ।" ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালী-যুবকের এরূপ সম্মান কি অল্প গৌরবের কথা?

ক্রমে কৃষ্ণমোহনের বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাব দিন দিন সাধারণে প্রচারিত হইয়া আসিল। দিন দিন তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। খৃষ্ট-পৌরহিত্যে ব্রতী থাকিবার কালীন কৃষ্ণমোহনের অনেক উচ্চপদ যুটিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রধান অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করিলেন; শিক্ষাসমিতি 'শিবপুর বিসপস্ কালেজের' অধ্যাপকতা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিশেষরূপে বিদ্যাচর্চ্চাই কৃষ্ণমোহনের জীবনের বিশেষ লক্ষ্য। তিনি দেখিলেন, 'বিসপস্ কালেজের' অধ্যাপকতা গ্রহণ করিলে তাঁহার সে লক্ষ্য সম্যক সাধিত হইতে পারে। সুতরাং অন্য সকল কর্ম্মের মায়া ত্যাগ করিয়া, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে (১২৫৯ সালে) তিনি "বিসপস্ কালেজে" অধ্যাপকতা গ্রহণ করিলেন। এই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, ডালহৌসীর শাসনে, দ্বিতীয় ব্রহ্মবিগ্রহের (Second Burmise War এর) অবসান হয়।

সামাজিক পীড়নে গৃহত্যাগী হইয়াও, কৃষ্ণমোহন এক দিনের জন্যও আপনার সেই স্নেহময়ী জননীকে, প্রাণপ্রিয় ভাই ভগিণীগণকে ভুলেন নাই। যে জননী, আপনি অনাহারে, অৰ্দ্ধাহারে থাকিয়া সঙ্কটসময়ে সন্তানকে রক্ষা করিয়াছিলেন—সন্তানের উন্নতির গতি প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সন্তান কেমন করিয়া জননীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবে? বিধর্ম্মী হইলেও, হিন্দু-সমাজের কুটিল দৃষ্টি সতত তাঁহার প্রতি পতিত থাকিলেও, কৃষ্ণমোহন আপনাকে জননীর সেবায় ব্যাপৃত রাখিলেন।

ক্রমশঃ।



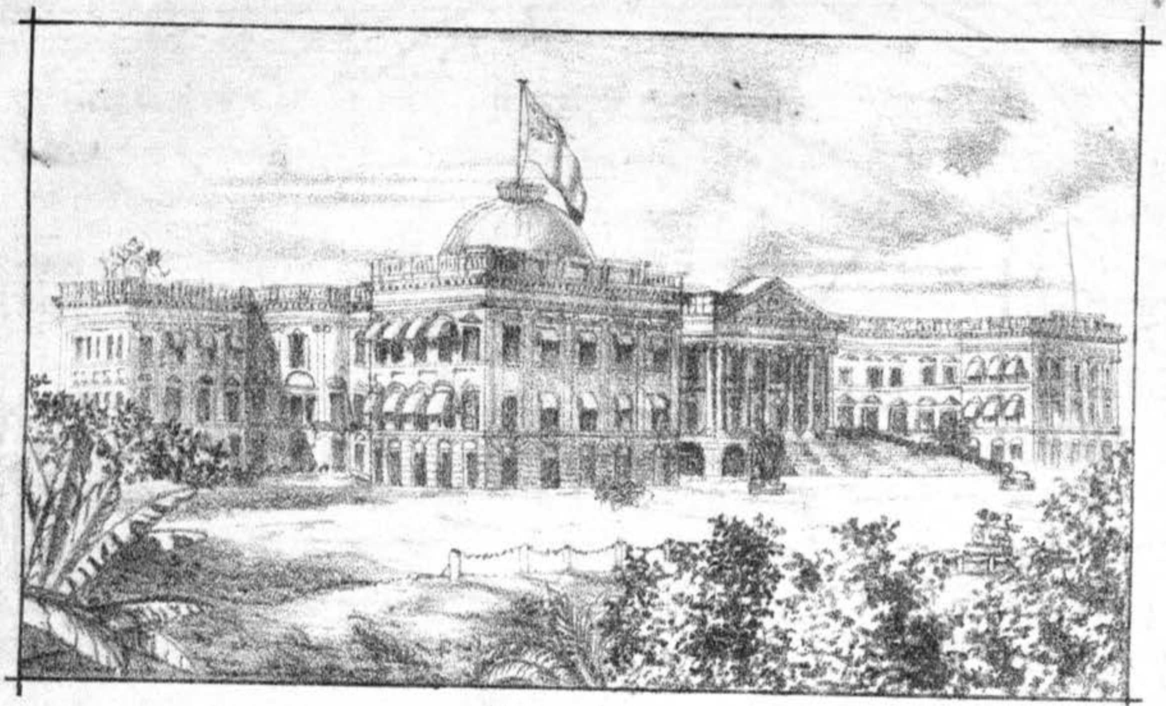
লর্ড টিনমাউথ।

সার ডেভিড অক্টারলোনি।

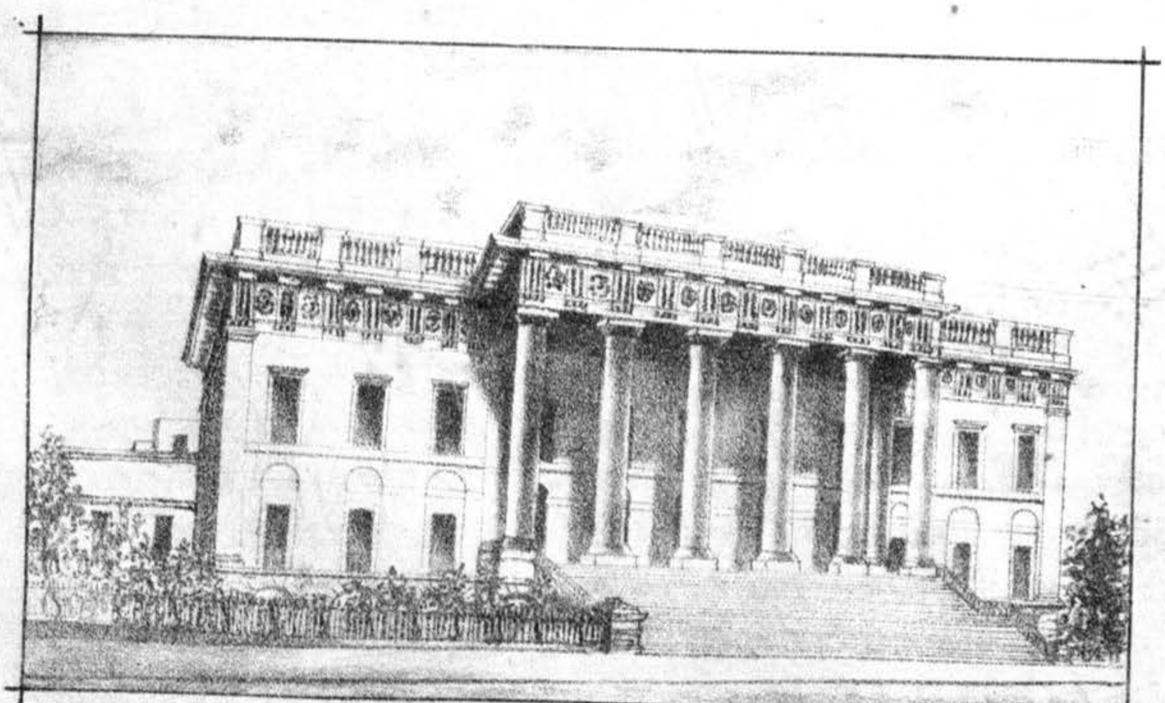
মার্কুইস অব হেষ্টিংস।

লর্ড কর্ণওয়ালিস।

মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লি।



গবর্ণমেণ্ট হাউস।



টাউনহল।

কলিকাতার ইতিহাস।

(৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

অষ্টম অধ্যায়।

মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিস—রয়াল বোটানিকাল গার্ডন—তিরেত্তা বাজার—কলিকাতায় সদর নিজামত—প্রোবিন্সিয়েল কোর্ট—সর জন সোর—ধর্ম্মতলার বাজার—সর এলুর্ড ক্লার্ক—লর্ড মর্ণিংটন বা মার্কুইস অব ওয়েলেসলি—গবর্ণমেণ্ট হাউস—এসিয়াটিক রিসার্চেস্—ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ—বাঙ্গলা গ্রন্থ—রামায়ণ ও মহাভারত—টাউন হল—কর্ণওয়ালিসের দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন ও মৃত্যু।

খ্রীঃ ১৭৮৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ম্যাকফারসন সাহেব মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিসের হস্তে শাসনভার বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। কর্ণওয়ালিস্ দুইবার ভারতের গবর্ণর জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হন। প্রথমবার তিনি খ্রীঃ ১৭৮৬—১৭৯৩ অব্দ পর্য্যন্ত এই পদে ছিলেন।

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং

(২) মহীসূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ ইহাঁর সময়ের প্রধান ঘটনা।

খ্রীঃ ১৭৮৬ অব্দে জেনেরল কিড্ (Kyd) সাহেবের পরামর্শে শিবপুরের রয়াল বোটানিকাল উদ্যান প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার কিছু উত্তরেই বিসপ্‌স্ কালেজ।

খ্রীঃ ১৭৮৮ অব্দে তিরেত্তা (টেরিটির) বাজার প্রথম স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে বর্দ্ধমানরাজের সম্পত্তি।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় সদর নিজামত পুনরায় কলিকাতায় আনীত হয় (১৭৯০)।

লর্ড কর্ণওয়ালিস বিচার সম্বন্ধীয় অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট স্থাপিত হয়।

কর্ণওয়ালিস ভারত ত্যাগ করিলে সর জন সোর বা লর্ড টিনমৌথ গবর্ণর জেনেরল হইয়া পাঁচ বৎসর এ দেশ শাসন করেন। ইনিই সর উইলিয়ম জোন্‌সের জীবনীর রচয়িতা। খ্রীঃ ১৭৯৩—১৭৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত ভারত শাসন করেন।

ইহাঁর শাসন সময়ে খ্রীঃ ১৭৯৪ অব্দে ধর্ম্মতলার বাজার স্থাপিত হয়। ইহাকে লোকে সেক্ষপীরের বাজার বলিত।

সর জন সোর ভারত ত্যাগ করিলে সর এলুর্ড ক্লার্ক কয়েক দিন গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন, তৎপরে লর্ড মর্ণিংটন বা মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্‌লি, বিলাত হইতে পৌঁছেন। ইনি খ্রীঃ ১৭৯৮—১৮০৫ পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইহার সময়ে কোম্পানির অনেক রাজ্য বৃদ্ধি হয়।

ইনি হিন্দুদিগের গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথা রহিত করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ ইহাঁরই সময়ে স্থাপিত হয়।

ইহাঁকে ইংরাজেরা কোম্পানির আকবর বলিতেন।

ইহাঁরই সময়ে, খ্রীঃ ১৭৯৯ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারিতে গবর্ণমেণ্ট হাউসের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়া ১৮০৪ অব্দ পর্য্যন্ত ইহার নির্ম্মাণে অতিবাহিত হয়। ইহার নির্ম্মাণে অন্যূন ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। ইহার ছাদের নিম্ন ভাগ, গবর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এচ্ এচ্ লক সাহেবের ডিজাইন অনুসারে সজ্জিত। এই খানে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, তৃতীয় জর্জ ও তাহার রাজ্ঞী, ক্লাইব, হেষ্টিংস, টিনমৌথ, কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেস্‌লি, মিণ্টো, মার্কুইস অব হেষ্টিংস, অকলণ্ড, মেটকাফ্, এলেন্‌বরা, ডালহৌসী, মেও, জন আদম, আর্থর ওয়েলেস্‌লি, কুট, লেডি বেণ্টিঙ্ক, নবাব

সাদত আলী খাঁ, পারস্যরাজ, ভরতপুরেশ্বর যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতির প্রতিকৃতি আছে।

ইহাঁরই সময় এসিয়াটিক রিসার্চেস্ (Asiatic Researches) বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। এই কালেজ উপলক্ষে, রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' এবং 'লিপিমালা', রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী', কেরী সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হয়। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৮০১ অব্দে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছাপাইয়া, কাশীদাসের মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করেন। সুতরাং ইহাঁর সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়, বলা যাইতে পারে।

খ্রীঃ ১৮০৪ অব্দে বর্ত্তমান টাউনহল প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহার বড় ঘরটি দীর্ঘে ১৬২ ফুট ও প্রস্থে ৬৫ ফুট।

এখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ও মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিসের প্রস্তর মূর্ত্তি এবং মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামীর মূর্ত্তি, এবং লর্ড গফ, সর চার্লস মেটকাফ, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি আছে।

খ্রীঃ ১৮০৫ অব্দে ইনি ভারত ত্যাগ করেন। তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিস পুনর্ব্বার গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিয়া, এই অব্দেই, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গাজীপুর নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন।

নবম অধ্যায়।

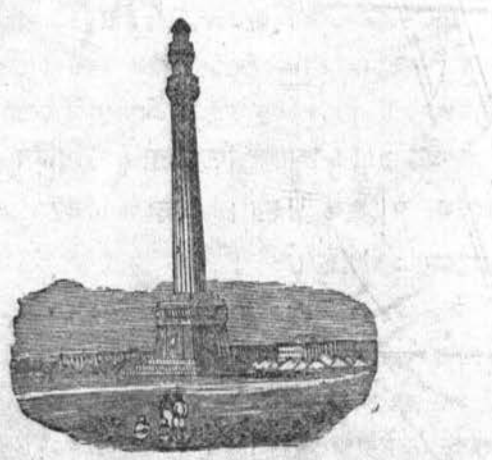
সর জর্জ বার্লো—আর্ল আব মিন্টো—চার্লস মেটকাফের দৌত্য—মার্কুইস আব হেষ্টিংস—সর ডেবিড অক্টরলোনী—মনুমেণ্ট—সেণ্ট আন্ড্রুস্ চর্চ—হিন্দুস্কুল—ডেবিড্ হেয়ার—কষ্টম হৌস—বিসপস্ কলেজ—সমাচার দর্পণ—এগ্রিকলটুরেল ও হর্টিকলটুরেল সোসাইটি—ডাক্তার উইলিয়ম কেরি—জন আডাম—লর্ড আমহার্ষ্ট—বর্ত্তমান টাকশাল—সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি—আমহার্ষ্টের ভারতত্যাগ—কলিকাতার অবস্থা।

কর্ণওয়ালিসের মৃত্যুতে, সর জর্জ বার্লো ভারতের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। ইনি দুই বৎসর মাত্র এই কার্য্য করিয়াছিলেন। অবশেষে খ্রীঃ ১৮০৭ অব্দে আর্ল আব মিন্টো গবর্ণর জেনেরল হইয়া ১৮১৩ অব্দ পর্য্যন্ত ভারত রাজ্য শাসন করেন।

মিন্টোর শাসন সময়ে চার্লস মেটকাফ, গবর্ণর জেনেরল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক বৃটিশ সাম্রাজ্যের বল বৃদ্ধি করেন।

তৎপরে লর্ড ময়রা, ভারতের গবর্ণর হন। ইনি মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস নামেই বিশেষ পরিচিত। ইনি খ্রীঃ ১৮১৪ হইতে ১৮২৩ অব্দ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে নয় বৎসর কাল ভারতবর্ষ শাসন করেন। ইহাঁর সময়ে নেপাল যুদ্ধ, পিণ্ডারী সমর ও শেষ মারহাট্টা সমর সংঘটিত হয়।

নেপাল যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ সর ডেবিড অক্টরলোনী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই বীরবরের স্মরণার্থ অদ্যাপি



কলিকাতায় গড়ের মাঠে অক্টরলোনী মনুমেণ্ট স্বীয় উন্নত মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা ১৬৫ ফুট উচ্চ। এই সময়েই সেণ্ট আন্‌ড্রুর চর্চ (St, Andrew's Church or Scotch Kirk.) নির্ম্মিত হয়। খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দের ৩০শে নবেম্বর ইহার ভিত্তি প্রস্তর প্রথম প্রোথিত হয়। ইহা লাট সাহেবের গির্জ্জা নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ইহার পর বৎসরই ডেবিড হেয়ার হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন। ডেবিড হেয়ার স্কটলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি



সেনেট হাউস।　হেয়ার স্কুল।　প্রেসিডেন্সি কলেজ।　সংস্কৃত কলেজ।

খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে এ দেশে আগমন করিয়া, ঘড়িওয়ালার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন এ দেশে বিদ্যার চর্চ্চা বড় অধিক ছিল না। তিনি দেখিলেন ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার না হইলে দেশের উন্নতির আশা অতি অল্প, এ জন্যই হিন্দুস্কুল নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি এ দেশের উপকার জন্য ও বিদ্যাবিস্তারের জন্য কায়মনে প্রায় ৪২ বৎসর কাল কাটাইয়া এই দেশেই মানবলীলা সম্বরণ করেন, ১৮৪২ অব্দের ১লা জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। এই মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণ বন্দ্যো প্রভৃতির উন্নতির প্রধান সহায়। তাঁহার সমাধি ও প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি পটোলডাঙ্গায় বিরাজিত রহিয়াছে।

খ্রীঃ ১৮২০ অব্দে কষ্টমহৌস নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বৎসরই বিসপ্ মিড্‌লটন, বিসপ্‌স কালেজের ভিত্তি স্থাপিত করেন। কেরী সাহেব এই বৎসরেই এগ্রিকলটুরেল ও হর্টিকলটুরেল সমিতি স্থাপন করেন। এই সময়েই সমাচার দর্পণ নামক বাঙ্গালা প্রথম সম্বাদ পত্র প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

এগ্রিকলটুরেল ও হর্টিকলটুরেল সমিতি (The Agricultural and Horticultural Society.) বিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক Dr. Carey কর্ত্তৃক খ্রীঃ ১৮২০ অব্দে স্থাপিত হয়। এক্ষণে ইহার সভ্য সংখ্যা ৫০০ পাঁচ শতেরও অধিক। ইহা এক্ষণে মেট্‌কাফ্ হলে স্থাপিত আছে।

যে কেরী সাহেবের চেষ্টায় এই সমিতি স্থাপিত হয়, সেই মহাত্মা অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তাঁহার, লোকের নিকট পরিচয় দিবার উপযুক্ত বংশ মর্য্যাদা কিছুই ছিল না। তিনি অতি সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া প্রথমে জুতা সেলাই করিতে শিক্ষা করেন, এই সামান্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি নিজ অধ্যবসায়গুণে ইংরাজী ও লাটিন শিক্ষা করেন। খ্রীঃ ১৭৯২ অব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে দারিদ্র দুঃখে তাঁহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তিনি মালদহে নীলকুঠির অধ্যক্ষ হন। তথায় তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সে প্রদেশের অনেক উপকার করেন। এখানে আসিয়া তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি "নিউটেষ্টামেণ্ট" বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া স্বহস্তে উহা মুদ্রিত করেন। খ্রীঃ ১৭৯৯ অব্দে তিনি মালদহ হইতে কলিকাতায় আসিয়া নীলকুঠি ক্রয় করেন। পরে মার্স্‌মান প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরামপুরে গমন পূর্ব্বক, ধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান হন। ১৮০১ অব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক হন। এই সময়েই তাঁহার ব্যাকরণ ও কথাবলী প্রচারিত হয়। এক বৎসর পরে তিনি ঐ কলেজের সংস্কৃত শিক্ষক হন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রচারিত করেন। মিণ্টোর শাসন সময়ে ইনি রামায়ণ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন ও সমাচার দর্পণ নামে একখানি সম্বাদ পত্র মার্স্‌মান প্রভৃতির সাহায্যে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। খ্রীঃ ১৮১৮ অব্দের ২৩শে মে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। খ্রীঃ ১৮২০ অব্দে তাঁহার এগ্রি ও হর্টিকলটুরেল সোসাইটি স্থাপিত হয়। তৎপরে তিনি আইন বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন ও একখানি অভিধান সংকলন করেন। খ্রীঃ ১৮০৪ অব্দে ৯ই জুন ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীরামপুরের গির্জায় আজিও তাঁহার সমাধি আছে। তাঁহার স্থাপিত এগ্রি ও হর্টিকলটুরেল সোসাইটিতে অদ্যাপি তাঁহার পবিত্রমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে।

মার্কুইস অব হেষ্টিংস্ স্বদেশে গমন করিলে, জন আডাম কিছুদিন গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন, তৎপরে খ্রীঃ ১৮২৩ অব্দের অগষ্ট মাসে লর্ড আমহর্ষ্ট ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তার ভার গ্রহণ করেন।

ইনি খ্রীঃ ১৮২৩—১৮২৮ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। ইঁহার শাসন সময়ে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ ও ভরতপুর অধিকৃত হয়। ইঁহারই শাসন সময়ে বর্ত্তমান টাকশাল নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। এই টাকশাল পৃথিবীর মধ্যে সকল টাকশাল অপেক্ষা বৃহৎ। খ্রীঃ ১৮২৪ অব্দে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয়।

খ্রীঃ ১৮২৭ অব্দে হিন্দু কালেজের জন্য গৃহ নির্ম্মিত হয়। ক্রমে ক্রমে, বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলেজ ষ্ট্রীটের বিদ্যামন্দিরগুলি স্থাপিত হইয়া ক্রমে ঐ অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। বাস্তবিক সেনেট হাউস্, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কালেজ, সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দুস্কুলের নয়নরঞ্জক দৃশ্য দেখিলে কাহার না তৃপ্তি লাভ হয়।

বেঙ্গল ক্লবও এই বৎসর স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সময়ে কলিকাতার উন্নতির দশা। এই সময়েই এ দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ আবির্ভূত

হইয়া বঙ্গ উজ্জ্বল করেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া দেশের মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সে সকল কথা অন্য স্থানে আলোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

পাণ্ডব চরিত।

(৬৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

নবম দৃশ্য।

প্রান্তরে বটতল।

দ্রোণাচার্য্য।

দ্রোণাচার্য্য।—অশ্বথামা পুত্র মোর। করিয়াছি মনে নির্জনে তাহারে শিখাইব নানা অস্ত্র। এই হেতু বালকগণেরে পাঠায়েছি গঙ্গাতীরে আনিবারে বারি। সবারে দিয়াছি সুক্ষ্মমুখ কুম্ভ। কেবল তনয়ে মোর, দিয়াছি এমন কুম্ভ, যাহা অনায়াসে বারিপূর্ণ হ'বে। কাজেই ফিরিবে অশ্বথামা সবাকার আগে। এই রূপে প্রতিদিন তা'রে শিখাইব নানা দিব্য অস্ত্র, অপরের অলক্ষিতে—

দূরে বারিপূর্ণ কুম্ভস্কন্ধে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

এ কি? অর্জ্জুন আসি'ছে বারি ল'য়ে, সবাকার আগে? অশ্বথামা এখনো না এলো?—কহ পার্থ, এত শীঘ্র কুম্ভে বারি পূরিলে কেমনে?

অর্জ্জুন।—(কুম্ভ রাখিয়া)—গুরুদেব, বরুণাস্ত্র শিক্ষা তবে করিলাম কেন? যদি না পারিব বারি সৃজিতে কুম্ভেতে অনায়াসে?

দ্রোণাচার্য্য।—ধন্য বৎস, ধন্য বুদ্ধি তব! কোন্ অস্ত্র কোন্ সময়েতে প্রয়োগ করিতে হয়, বুঝিয়াছ তুমি। সফল তোমার শিক্ষা। বৎস রে! অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এই ধরাধামে তুমি হইবে নিশ্চয়! মোর শিষ্যগণ মাঝে তোমা হ'তে কেহ, শ্রেষ্ঠ কভু নাহি হবে।—নিশ্চয়—নিশ্চয়। এই লহ ব্রহ্মজাল মন্ত্রসনে দিব তোরে, ব'স পূর্ব্ব মুখে—

অর্জ্জুনের পূর্ব্বাস্যে উপবেশন।

দ্রোণাচার্য্যের যোগ দ্বারা তেজোময় ব্রহ্মজাল আবির্ভাব করিয়া অর্জ্জুনকে দান ও তাহার প্রয়োগ সংহার মন্ত্র দান।

যাও, বৎস!, অভ্যাস করগে অস্ত্র, ক্রীড়াভূমে গিয়ে— ত্যজ বাণ—ত্যজিয়া তখনি করহ সংহার—আগ্নেয়াস্ত্র ব্রহ্মজালে করিয়া সংহার, বরুণাস্ত্রে করিবে নির্ব্বাণ—

অর্জ্জুন।—দেহ গুরু, শ্রীচরণ ধূলি—ও চরণ ধূলি বলে এখনি অভ্যস্ত হ'বে বাণ।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

দ্রোণাচার্য্য।—এ কি? অশ্বথামা এখনো না এলো, আসিতেছে যুধিষ্ঠির—ঐ—ঐ আসি'ছে সকলে?—

অগ্রে যুধিষ্ঠির ও পরে ক্রমে ক্রমে সকল বালকের প্রবেশ।

দ্রোণাচার্য্য।—কহ যুধিষ্ঠির, কোথা অশ্বথামা মোর? কোথায় বা ভীম? কোথা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন? চারি জনে নাহি হেরি কেন?

যুধিষ্ঠির।—গুরো! কি বলিব আমি?—পুত্র তব, দুর্য্যোধন দুঃশাসন সনে বৃক্ষমূলে বসি' কি যে পরামর্শ করে বুঝিতে না পারি। ডাকিলাম এত, তবু নাহি এলো তিন জনে। না পারি বলিতে, ভীম এলো না কি হেতু? অর্জ্জুনেও না হেরিনু, গুরো, গঙ্গাতীরে।

দ্রোণাচার্য্য।—তোমাদের আগে, অর্জ্জুন এসেছে জল লয়ে—এই দেখ কুম্ভ তার।—বল সবে—বরুণাস্ত্র শিক্ষা তোমাদের হয়েছে কি?—

সকলে।—না—

দ্রোণাচার্য্য।—যাও তবে সবে—অভ্যাস করগে বারুণাস্ত্র—

একলব্যের * প্রবেশ।

—(একলব্যের প্রতি)—কে তুমি?—কি হেতু কৈলে হেতা আগমন।

একলব্য।—(সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া)-গুরো! নিষাদের কুলে জন্ম মোর, নামের মহিমা তব করিয়া শ্রবণ, আইলাম শ্রীচরণ দরশন আশে—ইচ্ছা মনে, শর শিক্ষা করি তব পাশে।

* নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র।

দ্রোণাচার্য্য।—কি বল, নিষাদ, তুমি শিষ্য হবে মোর?—রাজপুত্রগণ তব সনে করিবেক অস্ত্রখেলা?—অতীব দুরাশা তব—অসম্ভব! অসম্ভব অতি—

একলব্য।—অস্পৃশ্য নিষাদ বটে আমি, গুরুদেব, কিন্তু দুরাশা না করি কভু। রাজপুত্রগণ সনে অস্ত্রখেলা করিবার না করি বাসনা—এ প্রান্তরে, এক পাশে একাকী শিখিব, দয়া করি শিক্ষা দিও মোরে।

দ্রোণাচার্য্য।—কভু না হইবে তাহা। যাও ত্বরা ছাড়িয়া এ ভূমি—বাণ আমি না শিখাই নিষাদে কখন।

একলব্য।—গুরুদেব! গৃহে থাকি গুরু বলে বরে'ছি তোমারে মনে মনে। তুমিই আমার গুরু, অন্য গুরু নাহি মোর এই ত্রিভুবনে। কিন্তু, তুমি যদি ত্যজিলে আমারে, অস্পৃশ্য নিষাদ বলি'; কি কাজ জীবনে আর মম। যাই আমি নিবিড় কাননে, ও চরণ হৃদে ধরি'। যা আছে বিধির মনে ঘটিবে তাহাই।

[প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

অরণ্য।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—নিষাদের পতি ভক্ত মোর। তার পুত্র একলব্য আত্মনাশ আশে আসিতেছে এ কাননে—রক্ষিতে হইবে তারে। দর্পহারী নাম মোর—নাশিব দ্রোণের দর্প! অন্তর্হিত হ'য়ে রই। দেখা দিব একলব্যে ব্রাহ্মণের বেশে। অধ্যবসায়ের ফল দেখিবে জগৎ।

[প্রস্থান।

বিষণ্ণ একলব্যের প্রবেশ।

একলব্য।—কি কাজ জীবনে আর মোর—সবে যদি ঘৃণা করে অস্পৃশ্য বলিয়া, তবে, কি সুখ বাঁচিয়া?—হরি, পিতৃ-ইষ্ট-দেব তুমি, তোমার চরণ হৃদে ধরি' ডুবাব জীবন-তরি কালের সাগরে। হে ভব-সাগর-কর্ণধার, ইচ্ছা যদি হয়, উদ্ধারি' সে মগ্ন তরি, ল'য়ো, হরি, ভবসিন্ধু পারে। বাসনা আমার কিছু নাই—নিরাশার প্রবল বাতাসে, ভেসে ভেসে কালের সাগরে—ডুবে যায় তরি আজি, হরি—রক্ষিবার না দেখি উপায়—উপায় দেখিতে নাহি চাই, ইচ্ছাময়, ইচ্ছা তব হউক পূরণ।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ।—বৎস রে, কে তুমি এ নিবিড় কাননে? পথভ্রান্ত আমি, সুপথ দেখাও মোরে।

একলব্য।—দ্বিজবর, কি বলিলে? সুপথ দেখাব আমি কোথা যাবে তুমি?

ব্রাহ্মণ।—বৎস রে, ত্রিভুবনে কোথা স্থান মোর বলিতে না পারি?—যে মোরে আপন ভাবে তা'রি কাছে থাকি। দিলে খেদাইয়ে ভেসে ভেসে বেড়াই অকূলে।

একলব্য।—দ্বিজবর, আমারও জীবন তরি ভাসে ঐ স্থল কালের অকূল জলে।

ব্রাহ্মণ।—হেন বাক্য না বলিও, বাছা! নবীন বয়স তব। কি হেন নিরাশা আসি, সহসা তোমারে করিয়াছে ব্যতিব্যস্ত? বল মোরে; বৃদ্ধ আমি, অনেক সয়ে'ছি, জানি রে উপায় বহু, ব'লে দিব, যাহে পুন আশা পূর্ণ হবে ও হৃদয়।—

একলব্য।—দ্বিজবর, যে দুরন্ত ঝটিকার ভীষণ তাড়নে, ভাসিতেছি অকূল সাগরে, উপায় তাহার, সাধ্য কি তোমার? সম্ভব ত নয় কভু?—তবু, ব্রাহ্মণের আজ্ঞা আমি কভু না হেলিব। শুন, দ্বিজবর, নিষাদের কুলে জন্ম মোর। রাজার তনয় আমি। মহারাজ হিরণ্যধনুরে পিতা বলি এ অধম ধন্য বলি মানিত নিজেরে। ছিনু সুখে পিতার আলয়ে।—কিন্তু, দ্বিজবর, একদিন জনকের মুখে, দ্রোণের ধনুর বল করিয়া শ্রবণ, মনে মনে গুরু বলি বরিনু তাঁহারে। হায়! কি কুক্ষণে অস্ত্রশিক্ষা-আশে, গেনু গুরু পাশে, বলিতে না পারি। ঠেলিলা চরণে গুরু মোরে, নাহি দিলা অস্ত্রশিক্ষা অস্পৃশ্য নিষাদ বলি। দ্বিজবর, কি কাজ জীবনে আর মোর? দারুণ যন্ত্রণাময় অস্পৃশ্য এ দেহ না ধরিব করিয়াছি মনে, হরির চরণে দিব ছার দেহ ঢেলে—

ব্রাহ্মণ।—হরিদাস! নাম তোর নাহি জানি আমি—হরিদাস বলিলাম তাই। শুনিয়াছি শাস্ত্রের বচন—হরিভক্তিহীন দ্বিজ চণ্ডাল সমান—হরিভক্তিমান যে চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ হতেও শ্রেষ্ঠ সেই—কে তোরে অস্পৃশ্য বলে—আয় হরিভক্ত-শিশু আয় কোলে আয়—কোলে ল'য়ে তোরে জীবন জুড়াব আজি— (একলব্যকে আলিঙ্গন)

শিশুরে! সদুপায় বলি তোরে শুন। হরির কৃপায়, হবি তুই শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর। মৃন্ময় দ্রোণের মূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ, স্থাপন করহ এই স্থানে—গুরুভাবে পূজ তাঁরে প্রতিদিন—সর্ব্বসিদ্ধিকর মন্ত্র দিব তোর কাণে—সেই মন্ত্র জপ প্রাতে—সূর্য্যোদয় আগে—শুচি হয়ে—প্রাতে পাবে তূণ পূর্ণ বাণ

এ মন্ত্র প্রভাবে, বৎস, শিয়রে তোমার—ধ্যান করি দ্রোণের চরণ—বাণ শিক্ষা কর নিজে নিজে। এ মন্ত্র প্রসাদে তোর হইবে মঙ্গল—জিজ্ঞাসিলে কেহ, দ্রোণাচার্য্য-শিষ্য বলি দিও পরিচয়—'সাধিলেই সিদ্ধি লাভ' এই মহাবাক্য মনে যেন থাকে—এস মোর সাথে—গঙ্গাজলে স্নান করি দোঁহে; দিব মন্ত্র তোর কাণে—দেখাইয়ে দিব তোরে মূর্ত্তির গঠন।

[উভয়ের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

অরণ্য।

সম্মুখে দ্রোণমূর্ত্তি একলব্য ধ্যানে মগ্ন।

দূরে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—অধ্যবসায়ের ফল দেখাবার তরে, একলব্য নিষাদনন্দন অবতীর্ণ অবনীতে। একে একে বর্ষ কেটে গেল। আমার আশ্রয়ে থাকি' একলব্য এবে, শিখিতেছে অস্ত্র নিজে, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হয়েছে নিষাদ। নিষাদের গুরু ভক্তি প্রকাশ করিতে, পাতিয়াছি ছলা আজি। শিষ্যগণ সনে দ্রোণ এসেছেন এ বনের মাঝে, শিষ্যগণে শিক্ষা দিতে চল-লক্ষ্য-ভেদ। চূর্ণিব দর্পীর দর্প আজি। রহি এবে অলক্ষিত ভাবে।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে কুক্কুরের চীৎকার)

একলব্য।—বিজন আশ্রম মোর, চিরশান্তি নিকেতন, শান্তিভঙ্গ করিবারে কে আসিল হেথা? কাহার কুক্কুর আসি করি'ছে চীৎকার? গুরুর চরণ চিন্তা করিতে ব্যাপৃত ছিনু আমি; ধ্যানে বিঘ্ন কে করিল মোর?—(দ্রোণমূর্ত্তির পদে প্রণত হইয়া)—গুরুদেব, চরণ তোমার ভরসা আমার, ও চরণ বলে স্বরবদ্ধ হবে কুক্কুরের, এই ঈষিকায়—

(নিকটে কুক্কুর শব্দ)

গুরুদেব, ত্যজিনু ঈষিকা, তব নামের দোহাই (ধনুকে যোজনা করিয়া ঈষিকা ত্যাগ ও কুক্কুরের চীৎকার বন্ধ)—

(নেপথ্যে) কি আশ্চর্য্য! গুরুদেব, অকস্মাৎ নিস্তব্ধ কুক্কুর—ঈষিকা আঘাতে বদ্ধ-মুখ। কে ত্যজিল এ ঈষিকা?

(নেপথ্যে দ্রোণ) চল সবে দেখি গিয়া অগ্রসর হ'য়ে।

দ্রোণ ও অর্জ্জুনাদির প্রবেশ।

একলব্য।—(অগ্রসর হইয়া প্রণত)—নমি, গুরু, চরণে তোমার। তোমারি চরণ ধ্যান করি', শিখিতেছি নানা অস্ত্র এ বিজন বনে। তোমারি চরণ রেণু বলে, একলব্য আজি দেব, আগ্নেয়, বারুণ, অস্ত্রে সুশিক্ষিত; শব্দভেদী শর শিক্ষা হয়েছে আমার—ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাস্ত্র আয়ত্ব হয়েছে—

দ্রোণ।—একলব্য, তুমিই কি ঈষিকায় বদ্ধ-স্বর করিয়াছ এই কুক্কুরেরে?

একলব্য।—গুরুদেব, ছিলাম বিজনে মগ্ন তব পদ ধ্যানে; বারম্বার কুক্কুরের রবে ধ্যানে বিঘ্ন হলো মোর,—নাহি জানিতাম আমি তব অনুচর কেহ ও কুক্কুর লয়ে আসিয়াছে এ কাননে—অজ্ঞানে করেছি অপরাধ, ক্ষমা কর নিজ গুণে।

দ্রোণ।—নাহি কিছু অপরাধ! তুষ্ট হইয়াছি আমি হেরি তব শর শিক্ষা। মোর শিষ্যগণ মাঝে, শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর তুমি হয়েছ রে—

অর্জ্জুন।—গুরুদেব! ভুলিলে কি পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা?

দ্রোণ।—ভুলি নাই, আছে মনে জাগি'।—বৎস, একলব্য, ব্রহ্মজাল অস্ত্র শিক্ষা হয়েছে কি তব?

একলব্য।—গুরুদেব! শিখেছি সকল অস্ত্র। তোমার চরণে সদা মতি বাঁধা যা'র—শিক্ষা নিজে তা'র আজ্ঞাকারী—অস্ত্রগণ চিরদিন তাঁ'র স্মৃতিপথে বিরাজিত—নাহিক সংশয়—

দ্রোণ।—বৎস, বড় তুষ্ট হৈনু তব গুরু ভক্তি হেরি'। শিক্ষা শেষ হ'য়েছে তোমার—দক্ষিণা করহ দান, করি আশীর্ব্বাদ।

একলব্য।—গুরুদেব, কি দক্ষিণা দিব আর, যা কিছু আমার আছে, সকলি ত নিবেদন করেছি শ্রীপদে। কি দিব তোমারে, গুরো? নিষাদের প্রাণে যদি হয় প্রয়োজন, কর অনুমতি, নিজ করে বক্ষ চিরে ও চরণে করিব অর্পণ?

দ্রোণ।—বৎস রে, প্রাণে মোর নাহি প্রয়োজন, তা হ'তে সামান্য দ্রব্য চাই—যা' চা'ব আয়ত্ব তব। দিতে যদি প্রতিশ্রুত হও, বলি খুলে—

একলব্য।—গুরুদেব, এ অধম কোন অপরাধে অপরাধী? কেন কর এত বিড়ম্বনা? কেন কর এত অবিশ্বাস? করিলে কি মনে, প্রাণ বলিদান ইচ্ছা, অন্তরের ইচ্ছা নহে মোর—শুধু মনরাখা কথা?—ওহো! বড় ব্যথা বাজিল মরমে!—নীচ কুলে জন্ম বটে মোর!—কিন্তু নহি অবিশ্বাসী—কৃতঘ্নতা কভু নাহি জানি—গুরুদেব, হের তব প্রতিমূর্ত্তি, ওই মূর্ত্তি পাশে বসি, অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি নিজে—শিক্ষা পূর্ণ আজি মোর! ওই মূর্ত্তি পাশে দক্ষিণা করিব দান এ ছার পরাণ—(অসি লইয়া কণ্ঠচ্ছেদোদ্যম)

দ্রোণ।—(হস্ত ধরিয়া)—ক্ষান্ত হও, বৎস! প্রাণান্ত করিয়া দক্ষিণান্তে নাহি প্রয়োজন—

একলব্য।—কি দক্ষিণা দিব তবে গুরো?

দ্রোণ।—দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া নিজ করে, অর্পণ কর রে মোরে—

একলব্য।—গুরুদেব, এ সামান্য দ্রব্য তরে, এত বিড়ম্বনা করিলে কি হেতু মোরে?—এই লহ, গুরুদেব, অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া অর্পিলাম শ্রীচরণে—(বাম হস্তে অসি লইয়া অসি দ্বারা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া, দ্রোণের পাদমূলে রক্ষা)—গুরুদেব, এ তুচ্ছ দ্রব্যেতে, কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে তব?

দ্রোণ।—বৎস, অর্জ্জুনেরে দিয়েছিনু বর, মোর শিষ্যগণ মাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর হ'বে। কিন্তু তুমি, মোরে গুরু ভাবি', যে শিক্ষা শিখেছ নিজে, আমি নাহি জানি। কাজেই আপন সত্য রাখিবার তরে, অঙ্গুষ্ঠ লইনু তোর দক্ষিণার ছলে।

একলব্য।—গুরুদেব, হেন সত্য করে থাক যদি, অঙ্গুষ্ঠ লইয়া তাহা কি রূপে পূরাবে? অঙ্গুষ্ঠের কথা যা'ক্, আমূল দক্ষিণ হস্ত গেলে, ও চরণ ধ্যান করি', চরণে ধরিয়া বাণ করিলে ক্ষেপণ, কেহ না আঁটিবে মোরে এ তিন ভুবনে। কিন্তু, গুরো, রক্ষিব প্রতিজ্ঞা তব, করিনু প্রতিজ্ঞা, আজি হ'তে মহাঅস্ত্র না ধরিব আর। কিন্তু কর আশীর্ব্বাদ, নারায়ণ করে যেন যায় এ জীবন।

দ্রোণ।—মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ।

একলব্য।—দেহ অনুমতি, যাই চলি' পিতৃরাজ্যে।

দ্রোণ।—কুশলেতে করহ গমন। চলহ সকলে, বাড়িয়া উঠি'ছে বেলা।

[সকলের প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

হরিহর-মূর্ত্তি।

(স্তবগীতি)

অদ্ভুত দেব আধ আধ মধুর মধুর মিলন।
আধ শ্যামল, আধ ধবল, যুগল অচল তুলন॥
আধ মদনমোহন আধ মদনদাহন
আধ মধুর, আধ গভীর, সৃজন-লয়-কারণ॥
আধ চন্দন, আধ ভস্ম আধ বসন্ত, আধ গ্রীষ্ম,
আধ কম-বন কুসুম-হার, আধ হাড়-হার-ধারণ॥
আধ ললাটে তিলক ছাঁদ আধ ললাটে ঝলক চাঁদ,
আধ ধৌত পীতবাস আধ বাঘছাল ভীষণ॥
আধ নবীন, আধ প্রবীণ, আধ কোমল, আধ কঠিন,
আধ অধরে মধুর হাস্য, আধ অধরে গর্জ্জন॥
আধ কুণ্ডল, আধ ধুস্তূর, আধ প্রেমিক, আধ বিধুর,
আধ নয়ন বঙ্কিম ঠাম, আধ ঢুলু ঢুলু লোচন॥
আধ কেয়ুর, আধ ভুজঙ্গ, আধ কমল, আধ করঙ্গ,
আধ অধরে মধুর মুরলী, আধ অধরে বিষাণ॥



আধ চক্র, আধ শূল, আধ বক্র, আধ স্থূল,
আধ অমৃত আধ গরল, অমৃতে গরল মিশ্রণ ॥
আধ ওঙ্কার, আধ হুঙ্কার, আধ প্রেম, আধ বিকার,
আধ ভোগী, আধ যোগী, আধ হাসি, আধ রোদন ॥
আধ গোপিনী-হৃদি-রঞ্জন, আধ যোগিনী-যোগ-জীবন
আধ অঙ্গ গরুড়ারূঢ় আধ বৃষভবাহন ॥
আধ শিরে শিখি চূড়ার ছটা আধ শিরে কটা জটার ঘটা
আধ দেব হরি, আধ দেব হর, হরিহর জীব জীবন ॥

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

যন্ত্র-মাতৃকা।

(৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বল।

পদার্থ মাত্রেরই ভার, আকর্ষণের ফল। আবার আকর্ষণ আকর্ষণকেন্দ্রেই প্রযুক্ত আছে, এই জন্য আকর্ষণ-কেন্দ্রের নামান্তর **ভারকেন্দ্র**।

যাহা দ্বারা মনুষ্য একাকী নিজের সামর্থের অধিক কার্য্য অনায়াসে করিতে পারে, অথবা বহু সময়-সাধ্য কার্য্য অল্প সময়ে নিষ্পন্ন করিতে পারে, তাহারই নাম যন্ত্র।

যাহার দ্বারা যন্ত্র চালিত হয়, তাহার নাম বল।

যন্ত্র চালনের বল, মনুষ্য, অশ্ব, স্রোতস্বিনী, বাষ্প, অগ্নি ও বায়ু দ্বারা প্রযুক্ত হইতে পারে। এই সমুদায় ঈশ্বরদত্ত বল যথাযথ প্রযুক্ত হইলে যন্ত্রের সাফল্য হয়।

যন্ত্রের নিজের কোন সামর্থ নাই, কিন্তু সামর্থ যথাযথ প্রযুক্ত হইলে, যন্ত্র নিজ নির্ম্মাণপ্রকৃতি গুণে ফলদানে সমর্থ।

যন্ত্রে যে পরিমাণ বল প্রযুক্ত হয়, তাহা সমস্ত কার্য্যকর হয় না, স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক দ্বারা তাহার কতক নষ্ট হয়। এই জন্য স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক দ্বারা যতটা বল ক্ষয় হওয়া সম্ভব, তাহা অপেক্ষা অধিক বল-প্রয়োগ প্রয়োজন।

যে সকল বল যন্ত্রচালনে উপযোগী তাহাই আবার প্রতিকূলে প্রযুক্ত হইলে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান হয়।

মনে কর একখানি ছাগলে টানিবার গাড়ী একটি বালকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে। এখন প্রত্যেক বস্তুই (কি সজীব কি নির্জ্জীব) পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে প্রযুক্ত আকর্ষণ দ্বারা নিজ ভারকেন্দ্রে আকর্ষিত হইতেছে; সেই জন্যই সকল দ্রব্যের ভার আছে। গাড়ীর পক্ষেও তাই—সকল দ্রব্যের পক্ষেই তাই। গাড়ীখানি একটি সামান্য যন্ত্র। একজন শিশু, যতদূর গমন করিতে পারে না, এই গাড়ীর সাহায্যে সে তাহা অপেক্ষা অধিক দূর যাইতে পারে। উপযুক্ত বল প্রযুক্ত হইলে অল্প সময়েও সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

বালকের বল গাড়ীতে প্রযুক্ত হইয়াছে তাই গাড়ী চলিতেছে; এক্ষণে তুমি যদি গাড়ীর উপর বল প্রয়োগ করিয়া বালকের বলের প্রতিকূলতা কর, তাহা হইলে সে বালক আর উহা টানিয়া লইতে পারিবে না। কারণ তোমার বল-রূপ যে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক তাহা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, কিন্তু, যদি সে অন্য কাহারও সাহায্যে তোমার প্রযুক্ত বলের অপেক্ষা অধিক বল প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা হইলে সে ঐ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া গাড়ী টানিতে পারে।

মনুষ্যের বল যেমন এ স্থলে প্রতিকূলতা করিল, অন্য বলও সেই রূপ প্রতিকূলতা করিতে সমর্থ হয়। স্রোতস্বিনীর প্রতি-কূলে জলযান চালান, বায়ুর প্রতিকূলে গমন করিতে কিরূপ অধিক বলের প্রয়োজন করে, সে কথা সকলেই জানেন।

কিন্তু বলের প্রকৃতি ও প্রয়োগ পরিমাণ প্রভৃতি এ প্রবন্ধের বিষয় নয়, তাহা প্রস্তাবান্তরে আলোচিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

গতি।

গতি, সময় ও স্থানের দ্বারা পরিমিত হয়। কোন বস্তু বল দ্বারা চালিত হইলে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে যতদূর গমন করিতে পারে, তাহা দেখিয়াই তাহার গতির পরিমাণ স্থির হয়। যেমন রাম ঘণ্টায় ২॥০ ক্রোশ চলিতে পারে, কিন্তু শ্যামের ঘোড়া ৩ ক্রোশ বই পারে না।

যদি একখানি দ্রুতগামী ফিটন গাড়ীর চাকার দিকে দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, তাহার সম্মুখের ছোট চাকা পশ্চাতের বড় চাকা অপেক্ষা বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। কারণ এই যে, বড় চাকা দুখানি দুই আবর্ত্তনে যত পথ যাইতেছে, ছোট চাকা দুখানিকে সেই পথ যাইতে দুইবারের অধিক আবর্ত্তিত হইতে হইতেছে, অথচ সেই আবর্ত্তনকার্য্য সমান সময়েই সম্পন্ন হইতেছে। আবার যদি দ্বিবিধ চক্রের প্রতি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, যে, বেগ বশতঃ চক্রের ঊর্দ্ধভাগে পাখীগুলি লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু মধ্যভাগে স্পষ্ট চেনা যায়, ইহার কারণ এই চাকার মধ্য ও পার্শ্ব সম সময়েই এক একবার আবর্ত্তন করিতেছে সত্য, কিন্তু এক এক আবর্ত্তনে চক্রের পার্শ্ব যত স্থান ভ্রমণ করিতেছে, মধ্যস্থল তত স্থান

ভ্রমণ করিতেছে না। এ কথা সহজে বুঝিবার একটু কষ্ট হইতে পারে কিন্তু চক্রাবর্ত্তন তত্ত্ব বুঝিলে আর কোন গোল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু সে কথাও এখানে বর্ণনযোগ্য নয়। এখানে কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, চক্রের পার্শ্বের বেড় অপেক্ষা মধ্যের যে কোন স্থানে চক্র ধরিলে, উহা যে পার্শ্বের বেড় অপেক্ষা কম হইবে, তাহা নিশ্চয় এবং সহজ বোধ্য।

আরও একটু সহজ করিবার জন্য একটী উদাহরণ দিই। বোধ হয়, সকলেই দেখিয়া থাকিবেন, কোন মেলার সময় একজন লোক একটি চক্রে দশ বারটি কাষ্টময় ঘোটক টাঙ্গাইয়া তাহাতে বালকদিগকে ঘুরাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে, সে ব্যক্তি, চক্রের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বামহস্তে খুঁটিটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে চক্রের একটি পাখি ধরিয়া ঘুরিতে থাকে এবং তাহার সহজ চলার বহিস্থ অশ্বারোহীগণ বিশেষ বেগে ঘুর পাইয়া থাকেন। এই রূপ বড় চক্রে দুই তিন জন ঘুরাইয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি মধ্যস্তম্ভের যতদূরে থাকে, তাহাকে তত অধিক বেগে ঘুরিতে হয়।

গতি সম্বন্ধে যাহা আপাততঃ প্রয়োজন, তাহা বলা হইল। আর যাহা আছে, তাহা এ প্রস্তাবে বর্ণনীয় নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

দণ্ড।

বল প্রয়োগের জন্য, যে সকল যন্ত্র প্রয়োজনীয়, দণ্ড (Lever) তাহার মধ্যে একটি। ইহা যে কোন ভারসহ পদার্থে নির্ম্মিত হইতে পারে। দণ্ড দ্বারা বল প্রয়োগ করিতে হইলে, একটি গতিকেন্দ্র (Fulcrum) প্রয়োজনীয়। দণ্ড তিন প্রকার হইতে পারে।



প্রথম। তৃতীয় চিত্রে দ দণ্ড, গ গতিকেন্দ্র এবং প পদার্থ। এ স্থলে বল প্রয়োগকারী ব্যক্তি গতিকেন্দ্রের উপর দণ্ডের ধৃত পার্শ্ব ধরিয়া চাপ দিলে পদার্থ উত্থিত হইবে। এ স্থলে দণ্ডের একপ্রান্ত পদার্থের ভারকেন্দ্রের ঠিক নিয়ে অর্পণ করিয়া অপর পার্শ্বে বল প্রয়োগ করিতে হইবে। বল প্রয়োগকারীর দিকে দণ্ড যত অধিক থাকিবে পদার্থটি তত তুলিবার সুবিধা।

এই জাতীয় দণ্ড হইতে সামান্য তৌল দণ্ড প্রভৃতির উৎপত্তি। কোদালও এই জাতীয় দণ্ড হইতে উৎপন্ন। মাটি খুঁড়িবার সময় ভূমিই গতিকেন্দ্রের কাজ করে। লম্বা দণ্ডযুক্ত কোদালও কাজ করিবার পক্ষে সুবিধাজনক।

অনেকে হাতুড়ির পশ্চাৎভাগে পেরেক তুলিবার মুখ দেখিয়াছেন তাহাও দণ্ডের এই সূত্র নিষ্পন্ন।

জাঁতি, কাঁচি প্রভৃতি এই জাতীয় দণ্ড হইতেই উৎপন্ন। এই জাতীয় দণ্ড হইতে কতিপয় প্রয়োজনীয় যন্ত্রের বিবরণ বারান্তরে বিবৃত হইবে।

(ক্রমশঃ)



শীত।

১

কে ওই বুড়া হরিণ-চড়া,
লোম চামড়া গায়ে মোড়া,
চাম-পাগড়ী মাথায় যোড়া,
দেখ্‌ছে চেয়ে মিট্‌ মিট্‌ মিট্‌?
গালপাট্টা পাকা দাড়ী,—
একটি রাশি শোণের নুড়ি,
শুকিয়ে গেছে মস্ত ভুঁড়ি,
গায়ের মলা চিট্‌ চিট্‌ চিট্‌॥

২

দন্ত পড়া তোব্‌ড়া মুখে
হাই তুল্‌ছে ঝুঁকে ঝুঁকে,
হাই-হাওয়াটা প'ড়্‌ছে বুকে,
কাঁপ্‌ছে বুড়ো থর্‌ থর্‌ থর্‌।
ধাক্কা মেরে বুড়োর বুকে
উত্তর থেকে দখিন দিকে,
হাই-হাওয়াটা ছুট্‌ছে রুকে,
হাওয়ার আওয়াজ সর্‌ সর্‌ সর্‌॥

৩

হাই-হাওয়াটা লাগ্‌ছে জলে,
জল জোম্‌ছে তালে তালে,
ঢলঢলে জল জমাট বরফ,
বড্ড শাদা ধপ্‌ ধপ্‌ ধপ্‌।
সেই বরফের শক্ত পিঠে
বল্‌গা-হরিণ যাচ্ছে হেঁটে,
সেই হরিণের পিঠে উঠে
চোল্‌ছে বুড়ো থপ্‌ থপ্‌ থপ্‌॥

৪

হাই হাওয়াটা পাহাড়-চুড়ে
পোড়্‌ছে লুটে মাথা খুড়ে,
জোম্‌ছে বরফ পাহাড় যুড়ে,
রবির করে ঝক্‌ ঝক্‌ ঝক্‌।
হাই-হাওয়াটা উধাও মুখে
অগ্নি ছোটে রবির দিকে,
দখিন দিকে পালায় রবি,
ভয়ে রাগে লাল টক্‌ টক্‌

৫
গায়ে লেগে হাই-এর হাওয়া,
সুনীল আকাশ যেন ধোঁয়া,
চাঁদ তারকা চোঁয়া চোঁয়া,
নাইকো তেমন ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্।
হাই হাওয়াটার ঘোর দাপটে
জগৎ যেন পালায় ছুটে,
দীপ্ত আগুন্ নিগুণ হ'য়ে
এখন শুধু ধিক্ ধিক্ ধিক্॥

৬
হাই-হাওয়াটার এম্নি বেগ,
আকাশ-কোলে লুকোয় মেঘ,
উড়্‌ছে ধূলো থোলো থোলো,
ঝোর্‌ছে পাতা ঝর্ ঝর্ ঝর্।
ঢাক্‌লো ধূলোয় সবুজ পাতা,
ফুল বিষাদে নাড়্‌ছে মাথা,
উথ্‌লে ওঠে প্রাণের ব্যথা,
চক্ষে বারি দর্ দর্ দর্॥

৭
কালো-কোলো ভ্রমর বঁধু
পায়না ফুলে তেমন মধু,
তাই সে রেগে হাই-হাওয়াকে
গাল দিচ্ছে ভোঁ ভোঁ ভোঁ।
হাই-হাওয়া ফের ধাক্কা মারে,
ভ্রমর ভায়া পালান্ সোরে,
চড় চাপড়ে পাখ্‌না ছিঁড়ে
চোঁচা দউড় বোঁ বোঁ বোঁ॥

৮
কে ওই বুড়ো হরিণ-চড়া
জীব জন্তু কোল্লে মড়া?
হাই তুলে ও নিজেও সারা,
আমাদেরও কন্ কন্ কন্।
ওই বুড়োটার নামটা শীত,
বড়ই ওটার কঠিন চিত,
নিজেও মরে, পরকে মারে
ঠোনা মেরে ঠন্ ঠন্ ঠন্॥

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কনকলতা।

(৯০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইলে, যখন পাখীগণ স্ব স্ব কুলায় সন্নিহিত বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছিল—যখন তরুণ তপন সবে মাত্র গগনের পূর্ব্বপ্রান্তে উদিত হইতেছিলেন,—জ্যোতি-হীন অথচ ঈষৎ উজ্জ্বল তাম্রথালার ন্যায় গগন-সাগরের একপার্শ্বে ভাসিতেছিলেন—যখন পরিশ্রমীরা সুখের প্রভাতকে আদরে আলিঙ্গন করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে-ছিল, কিন্তু অলসেরা এখনও "সকাল হ'বার দেরি আছে" মনে করিয়া জাগ্রত নয়ন আবার মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, আর মনে মনে, সহজে লক্ষপতি হইবার পরামর্শ স্থির করিতেছিল, এমন সময়ে রাজগৃহের একটি ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতল বাটির সম্মুখে দুইজন যুবক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

বাটিটি দেখিলে গৃহস্বামীকে নিতান্ত নিঃস্ব বা অতি সমৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বহির্ভাগ বেশ পরিষ্কৃত। অভ্যন্তরও সেই রূপ।

দুইটি যুবকই আমাদের পরিচিত। একজন চন্দ্রপ্রভ, অপর ভীমসিংহ। চন্দ্রপ্রভ চৌকাটের উপর অর্দ্ধ হেলিত-ভাবে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া—যেন কিছু বিমর্ষ—সম্মুখে রাজপথের প্রান্তে ভীমসিংহ।

চন্দ্রপ্রভ বলিতেছেন, "আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তোমাদের সঙ্গে জয়েন্দ্রের অনুসন্ধানে যাই, কিন্তু পিতা যেরূপ পীড়িত, তা'তে এ সময় আমার অন্যত্র গমন করা উচিত নয়। জয়েন্দ্রের অনুসন্ধান আমার কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু পিতার পরিচর্য্যাও অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতার আমি মাত্র পুত্র, আমি তাঁর পরিচর্য্যা না কর্‌লে কে কর্‌বে? কিন্তু আমি জয়েন্দ্রের অনুসন্ধানে না গেলেও তোমাদের দ্বারা সে কার্য্যের ত্রুটি হ'বে না। যাই হ'ক পিতা আরোগ্য হলেই আমি তোমাদের অনুগামী হ'বো। তোমরা যেখানেই থা'ক আমায় মধ্যে মধ্যে সম্বাদ দিও।"

ভীমসিংহ।—"সে কথা বিশেষ ক'রে বল্‌তে হ'বে না। আমরা যেখানেই থাকি না, তুমি নিয়মিত সম্বাদ পাবেই। আর তোমার, তোমার পিতার এবং আমাদের সকলের পরিজনবর্গের সম্বাদ নিরন্তর লিখো। কাল আমি মহর্ষি চন্দ্রশেখরের আশ্রমে গিয়েছিলেম, মহর্ষি বল্লেন, জয়েন্দ্র জীবিত আছে। ভাই, যখন জয়েন্দ্র জীবিত আছে, তখন নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'বে। কিন্তু যখন জীবিত থেকেও আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌চে না, তখন নিশ্চয়ই সে নিতান্ত বিপন্ন; সুতরাং আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়, আমি আর বিলম্ব কর্‌বো না, যাই সকলে আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌চে।"

চন্দ্রপ্রভ।—"তবে এস, আমিও যাই, দেখিগে পিতার নিদ্রাভঙ্গ হ'লো কি না?"

অনন্তর ভীমসিংহ পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, চন্দ্রপ্রভ বাটীর অভ্যন্তরে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রপ্রভ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে একটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কক্ষমধ্যে একটি সুপরিষ্কৃত শয্যার উপর একজন বৃদ্ধ নিদ্রিত। চন্দ্রপ্রভ ধীরে ধীরে শয্যার নিকট গমন করিয়া বৃদ্ধের চরণোপান্তে উপবেশন করিলেন।

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া চন্দ্রপ্রভ অল্লোচ্চস্বরে বলিলেন, "পিতঃ, আপনি কি নিদ্রিত?"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বৎস, তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

চন্দ্রপ্রভ বলিলেন, "বড় অধিকক্ষণ নয়। আপনি এখন কেমন আছেন?"

বৃদ্ধ। "দেখ, বৎস, আমার আর জীবনের আশা নাই। বোধ হয়, আর অল্পক্ষণ পরেই আমার জীবন শেষ হ'বে। এই সময় আমি তোমায় গুটিদুই কথা বল্‌বো, বোধ হয় তা শুন্‌লে, আর আমার মৃত্যুতে তুমি শোকাকুল হ'বে না। দেখ, বৎস, আমি তোমার জনক নই, মহর্ষি চন্দ্রশেখর তোমাকে, আমার হস্তে, পালনের জন্য অর্পণ করেছিলেন, আমি জানি না তোমার পিতা মাতা কে? কিন্তু তোমার ব্যবহারে বোধ হয়, তুমি অবশ্যই উচ্চবংশজ। মহর্ষির মুখে শুনেছি তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান। তোমার পিতা মাতার পরিচয় মহর্ষি জানেন। আমার অবর্ত্তমানে আমার ধন সম্পত্তি সকলি তোমার হ'লো। তোমাদের মল্লগুরু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমি এক কালে গৌড়ের রাজা ছিলাম, কিন্তু, সে কথা থা'ক।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

চন্দ্রপ্রভ তাহা দেখিলেন না। বৃদ্ধের কথায় তাঁহার মনে ঝটিকা বহিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর বার কয়েক উপর্য্যুপরি দীর্ঘঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার স্থির হইলেন। প্রাণপক্ষী দেহত্যাগ করিল।

চন্দ্রপ্রভ তাহাও দেখিলেন না। তিনি অনেকক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আমি শৈশব হতেই আপনাকে পিতা বলে সম্বোধন ক'রে আস্‌চি, আপনাকেই পিতা বলে জানি, যতকাল জীবিত থাক্‌বো, আপনাকে পিতা বলেই মান্য কর্‌বো। আর কারুকে পিতা বল্‌তে আমার রসনা কখন সম্মত হ'বে না। পিতঃ, একবার চেয়ে দেখুন।"

কিন্তু কে উত্তর দিবে?—চন্দ্রপ্রভ দেখিলেন; তাঁহার মনে সন্দেহ হইল—গাত্রে হস্ত দিলেন, দেখিলেন সর্ব্বাঙ্গ হিম। বুঝিলেন,—চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল বহিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন, কিন্তু এমন সময়ে কে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল।

চন্দ্রপ্রভ চাহিয়া দেখিলেন—সৌম্য মূর্ত্তি—বল্কল পরিহিত—মস্তকে শুভ্রকেশভার—আবক্ষ-লম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু।

সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ বলিলেন, "বৎস, রোদন ক'রো না। আমার সঙ্গে এস।"

চন্দ্রপ্রভ যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাজপুরী ক্রন্দন রোলে পরিপূরিত। রজনীযোগে মহারাজকে কে হত্যা করিয়াছে।

রাজার বিশ্রাম গৃহ অমাত্য পরিজনে পূর্ণ। রাজার বক্ষস্থ ক্ষত হইতে অনবরত রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, পাদমূলে রাজকুমার। পার্শ্বে রাজবৈদ্য রক্তনির্গম বন্ধ করিবার জন্য অনবরত নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছেন, পার্শ্বে রাজকুমারী কনকলতা,—চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

অনেকক্ষণ পরে মহারাজা বলিলেন, "গুরুদেব কৈ?" এই কথা কয়টি অতি কষ্টেই উচ্চারিত হইল। এমন সময় সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ চন্দ্রপ্রভকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ, উপস্থিত হইয়াই বলিলেন, "মহারাজ, আজ দেখুন, এইই আপনার ঔরস পুত্র।"

মহারাজ দেখিলেন, দেখিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ, বলিলেন, "যাও সকলে মহারাজের সৎকারের উদ্যোগ করগে।

কবিরাজ হস্ত দেখিলেন, মহারাজের জীবন সমাপ্ত হইয়াছে।

রাজকুমারী আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ বলিলেন, "মন্ত্রি, যাও মহারাজের সৎকারের আয়োজন করগে, কুমার চন্দ্রপ্রভই মহারাজের মুখাগ্নি করিবেন।

যুবরাজ আর থাকিতে পারিলেন না, এতক্ষণ চক্ষে বস্ত্রার্পণ করিয়া কাঁদিতেছিলেন, এইবার বলিলেন, "মহাশয়, আমি মহারাজের পুত্র সকলেই জানে, আপনি এ কাকে এনে আমাকে অধিকারচ্যুত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন?"

সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ।—"শোন, বিক্রম, চন্দ্রপ্রভ আজ তোমায় অধিকারচ্যুত কর্‌তে আসে নাই, যে রাজ্যে তোমার অভিলাষ, তুমি, তা ভোগ কর, চন্দ্রপ্রভ কেবল, তার জনকের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করেই আমার সঙ্গে চলে যাবে। তা'র সম্মুখে এখন অসীম কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত রয়েছে, তারে নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর,—আততায়ী-কর্ত্তৃক আহত বন্ধুর—উদ্দেশ কর্‌তে হ'বে।"

যুবরাজ। "আমার পিতার ঔর্দ্ধদেহিক—"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ তাঁহার দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ তোমার জনক নন, পালক পিতা। তুমি মহারাজের রাজ্য পেতে পার, কিন্তু ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যে তোমার অধিকার নাই। আমার বাক্যে প্রতিবাদ কর্‌লে তোমার পক্ষে ভাল হবে না।"

যুবরাজ সে প্রখর দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলেন না। নীরবে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ, রাজকন্যাকে বলিলেন, "বৎসে, তোমার সখী কোথায়? একবার দেখ দেখি।"

রাজকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়েই রাজার দেহ আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির করা হইল।

* * * * * *

দুই প্রহরের পর মহারাজ বল্লভশক্তি এবং গৌড়েশ্বর বীরেন্দ্রসিংহের মৃতদেহ অমাত্য বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হইয়া মহর্ষি চন্দ্রশেখরের আশ্রম সন্নিহিত গঙ্গাতীরে পৌঁছিল।

রাজমহিষী, মহর্ষির হস্তে কনকলতার রক্ষাভার অর্পণ করিয়া স্বামীর সহগামিনী হইলেন। রাজকন্যা কনকলতা ও তাহার সঙ্গিনী চন্দ্রপ্রভা সৌম্যমূর্ত্তি মহর্ষি চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। মহর্ষি বলিলেন, "ইহাঁরা, বিবাহের উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত আমারই আশ্রমে থাকিবেন।"

চন্দ্রপ্রভ, জনক ও পালক উভয়ের মুখাগ্নি করিয়া, গঙ্গা স্নানান্তে মহর্ষির অনুমতি লইয়া স্বীয় বন্ধুর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। মুনিবর তাঁহার কানে কানে কি কথা বলিলেন, কেহ বুঝিতে পারিল না।

বিক্রমশক্তি, রাজকন্যা ও চন্দ্রপ্রভাকে রাজপুরীতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি বলিলেন, "রাজকন্যা এখন শোকসন্তপ্তা, রাজপুরীতে কে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে, এখন কিছুদিন, আমার নিকটেই থাকুন।"

বিক্রমশক্তির আর দ্বিতীয়বার বাক্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পাঠক, একবার মহর্ষি চন্দ্রশেখরের আশ্রমে চলুন। দেখা যা'ক মাতৃহীনা কনকলতা ও তাঁহার সখী কি করিতেছেন।

ঐ দেখুন, মহর্ষির কুটীর সম্মুখে, শোকবিহ্বলা রাজকুমারী সঙ্গিনী সঙ্গে উপবিষ্টা আছেন। চক্ষের জলে গণ্ডস্থল অভিষিক্ত।

বহুক্ষণ পরে রাজকুমারী বলিলেন, "সখি, আর ত পৃথিবীতে থাকতে ইচ্ছা করে না, কি সুখে আর বেঁচে থাক্‌বো ? বাপ মা ছেড়ে গেলেন। যা'কে এতদিন ভাই ব'লে মনে কর্ত্তেম, সে ভাই নয়।—যে ভাই, সে যে কোথা গেল জানি না, তা'কে কোন কালে ভাই বলে—আপনার বলে—চিন্‌তে পার্‌বো কি না জানি না। এ বন আমার উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু এখানেও কি কখন সুখী হ'তে পার্‌বো ? ভাই, আমার মন কেমন কর্‌চে।—দেখ আমার স্বপ্ন একে একে ফল্‌লো। মহর্ষির মুখে শুনেছি হৃদয়েশ্বর আততায়ী শত্রু কর্ত্তৃক আহত—সে আততায়ী কে ?—যা'কে এতকালে দাদা বল্‌তেম, সেই কি ?—তা'র পর বাবাকে কে হত্যা কর্‌লে, বক্ষে তরবারির আঘাত!—সে তরবারি কা'র ?—তা'র পর আমি বনে—কেউ কোথাও নাই—ভাই এ কি হলো ?"

চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, "সখি, একটি গুপ্ত রহস্য বলি শুন, কা'ল রাত্রে যখন আমি তোমার ছবি আন্‌তে তোমার ঘরে গিয়েছিলেম, সেই সময় শুনেছি, রাজপুত্র নিজে নিজে বল্‌ছিলেন, তিনি জয়েন্দ্রকে হত্যা করেছেন। কিন্তু মহর্ষি বলেছেন, "জয়েন্দ্র আজও বেঁচে আছে।" যখন বেঁচে আছে, তখন নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তোমার সঙ্গে মিলন হবে——"

রাজকুমারী।—"বিশ্বাস যে হয় না সখি, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, নৈলে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার কপালে এমন দারুণ বজ্রাঘাত কেন হ'লো ?"

চন্দ্রপ্রভা।—"সখি, অতঃপর তুমি সুখিনী হবে, মহর্ষি, যা'তে তোমার ভাল হয়, তাই ক'র্‌বেন, জয়েন্দ্র কোথায় আছে তিনি জানেন, দেখ্‌লে না তাঁর কথা তোমার দাদার কানে কানে বলেদিলেন। জয়েন্দ্রকে এখানে এনে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন, তার আর ভুল নাই।

এমন সময়ে মহর্ষি চন্দ্রশেখর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইয়াই বলিলেন, "বৎসে, তোমরা প্রস্তুত হও, আজ সন্ধ্যার পরই শুভমুহূর্ত্তে আমি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হব, তোমাদেরও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। দেখ, বৎসে, পিতৃ মাতৃ বিয়োগ ব্যথায় তোমার মন কাতর, এ সময় নানা স্থানের মনোহর দৃশ্যনিচয় দেখ্‌লে তোমাদের মন সুস্থ হ'তে পার্‌বে।" এই কথা বলিয়াই তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

শোক-বিহ্বলা বালিকা দুটি, তীর্থ যাত্রার আর কি উদ্যোগ করিবে, সেইখানে বসিয়াই স৹্যা করিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আকাশে দুই একটি করিয়া অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিল। এমন সময় একজন তাপসী আসিয়া রাজকুমারী ও তাহার সখীকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে ঠিক এই সময়ে রাজগৃহের বহিস্থ উদ্যানে বিক্রমশক্তি কতিপয় সঙ্গীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। সঙ্গীগুলি কেহই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত নহে। যাঁহাদের পরিচয়ের প্রয়োজন, পরে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া যাইবে, এক্ষণে তাঁহাদের কথোপকথনের কিয়দংশ পাঠকদিগকে জ্ঞাপন করিব।

বিক্রমশক্তি তাঁহার সঙ্গীগণের একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, বীরচন্দ্র, আমি বড় আশা করেছিলেম, যে, চন্দ্রপ্রভাকে বিয়ে করে সুখে রাজত্ব কর্‌বো, কিন্তু দেখ্‌চি সে আশা সফল হ'লো না। চন্দ্রপ্রভা কনকলতার সঙ্গে, চন্দ্রশেখরের আশ্রমেই থেকে গেল, রাজপুরীতে থাক্‌লে ছলে, বলে, কৌশলে যে কোন উপায়েই হ'ক না কেন, তারে সম্মত কর্‌তে পার্‌তেম, কিন্তু তার আর উপায় দেখ্‌চি না

বীরচন্দ্র বলিলেন, "আমরা থাক্‌তে উপায়ের অভাবই বা কি ? অনুমতি করুন মুনির আশ্রম থেকে তাকে আনিগে।"

বিক্রমশক্তি।—"দেখ, মুনির আশ্রম থেকে আন্‌তে হ'লে, তা'রে চুরি ক'রে আন্‌তে হয়। যদি এমন ক'রে আন্‌তে পার যে কেউ টের না পায়, তা'হ'লে তোমাকে আশাতীত পুরস্কৃত কর্‌বো।"

বীরচন্দ্র বলিলেন, "তবু পুরস্কারটা একবার শুন্‌তে পাই না ?"

বিক্রমশক্তি।—দেখ যদি ঐ রূপ অন্যের অজ্ঞাতসারে তা'কে এনে দিতে পার, তা হ'লে, তোমাকে এক সহস্র টাকা দিব।"

বীরচন্দ্র।—"মহারাজ, একটি নবযুবতী সুন্দরীর দাম কি এক হাজার টাকা ? তা'তে হবে না মহারাজ! যদি আপনি আমাকে লিখে দেন যে "চন্দ্রপ্রভাকে মহর্ষি চন্দ্রশেখরের আশ্রম হ'তে চুরি ক'রে এনে দিতে পার্‌লে দশ সহস্র মুদ্রা দেবেন, আর এই আমার বন্ধুদিগকেও অন্ততঃ এক এক শত টাকা দিতে পারেন, তা'হলে আমি এ কার্য্য কর্‌তে পারি।"

বিক্রমশক্তি অনেক ভাবিলেন, পরে বলিলেন,- "এখন লিখে দিতে পারি, কিন্তু না আন্‌লে, টাকা পাবে না।"

বীরচন্দ্র।—"না আন্‌তে পার্‌লে টাকা চাইবই বা কেন?"

এইরূপ কথোপকথনের পর চুক্তিপত্র লিখন জন্য সকলে রাজপুরীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

*   *   *   *   *

রাজপুরীর বহিস্থিত একটি প্রকোষ্ঠে, এই সমস্ত অনুচর সঙ্গে নূতন রাজা প্রবেশ করিলেন। এ রাজ্য যে কি সুখের হইবে, তাহা অনুমান করিতে কষ্ট নাই। যে রাজা পালক-পিতার মৃত্যুর দিনে এমন জঘন্য পরামর্শে লিপ্ত, তাহার রাজ্য যে কি হইবে, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

প্রকোষ্ঠে দীপ জ্বলিতেছিল, মস্যাধারে লেখনী ছিল। সম্মুখে লিখনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যই ছিল। নবীন মহারাজা, রাজ্যমধ্যে যেরূপ সৎকার্য্য করিবেন, তাহার প্রথম প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বহস্তে লিখিয়া, নিজ নামে চিহ্নিত করিলেন, সকলি স্থির হইল, বীরচন্দ্র লিপি নিজ হস্তগত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তা'কে আন্‌তে যে ব্যয় হবে তার কি? সে ত আর আমার পারিতোষিকের মধ্যে নয়। মনে করুন তাকে আন্‌বার জন্য একখানি শিবিকা ক্রয় কর্‌তে হবে, আমার নিজের লোকে বাহকের কাজ কর্‌বে বটে, কিন্তু তাদের ত পারিশ্রমিক চাই? মনে করুন এ সকল কত ব্যয় সাধ্য; এ সকলের টাকা আমার হাতে দিতে বল্‌চিনা, আপনি নিজে ব্যয় করুন, তা'তে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু তা'তে লোকে জান্‌বার সম্ভাবনা।"

বিক্রমশক্তি।—"দেখ, এ রাত্রে ত আর শিবিকা ক্রয় সম্ভব নয়, কাল প্রাতেই আমার কাছে কত ব্যয় হ'বে তার একটা তালিকা করে এনো, দেওয়া যাবে। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন জান্‌তে না পারে।"

বীরচন্দ্র।—"আপনি পাগল হয়েছেন নাকি, একি কা'রো কাছে বল্‌বার কথা, যে বল্‌বো? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, শিকার করতলস্থ!

বিক্রমশক্তি।—"তাহ'লে চিরদিনের জন্য তোমার কেনা হ'য়ে থাক্‌বো?"

বীরচন্দ্র।—"তবে অনুমতি করুন, এখন আসি, কাল প্রাতেই আস্‌বো, টাকা পেতে বিলম্ব হ'লে আপনার কার্য্যোদ্ধারেই বিলম্ব হবে।"

বিক্রমশক্তি।—"আমি এখনি দিতেম, কিন্তু, আজ এ শোকের সময় কোষাধ্যক্ষকে অর্থের জন্য অনুমতি করা ভাল নয়। কাল সকালেই পা'বে।"

রাজানুচরগণ স্ব স্ব অভীষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন। রাজাও পিতার শোকে আকুল হইয়া, মনকে আশার তরঙ্গে নাচাইতে নাচাইতে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আবার প্রভাত আসিল। আবার পাখী ডাকিল। জগত হাসিল, কিন্তু রাজগৃহ হাসিল না। প্রজাগণের মুখ বিষণ্ণ। যে রাজা তাহাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিতেন, সেই দেবোপম নরপতি বৃদ্ধ বয়সে দস্যু-করে নিহত। নগরে প্রফুল্ল মুখ নাই—বালকের ক্রীড়া নাই—লোকের চলাচল নাই বলিলেও চলে। এখনও ব্যবসায়ীরা স্ব স্ব বিপণী বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে—ক্রয় বিক্রয়ে তাহাদের ইচ্ছা নাই। ব্রাহ্মণগণ আজ আর বেদগান করিতেছেন না। সকলের মুখেই "হায়-কি হ'লো!" এই শব্দ। সহস্র সহস্র লোকের দীর্ঘনিঃশ্বাস এক হয়ে, নগরে যেন কি এক ভীষণ শব্দ উত্থিত হইতেছে। চারিদিক স্থির—গম্ভীর—অথচ কান্না মাখা।

এমন শোকের প্রভাতে চারিজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি রাজপুরী হইতে বহির্গত হইল, ইহারাই কল্য রজনীর রাজানুচর।

প্রধানের নাম বীরচন্দ্র। কৃষ্ণকায়, ভীমদেহ, বদনমণ্ডল গুম্ফ শ্মশ্রুতে আরও ভীষণ। অপর তিনজন তাহারই অনুচরের উপযুক্ত।

বীরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে অল্পোচ্চস্বরে সঙ্গীগণকে বলিলেন, অনায়াসে ত পাঁচশ টাকা হস্তগত হ'লো। তা'কে চুরি ক'রে আন্‌তে যা খরচ হ'বে, তা এর শত ভাগের একভাগ, বাকি আমাদেরই উদরসাৎ হবে। এ গণ্ডমূর্খটা যদি দিনেক দুদিন বাঁচে তা'হলে আমরা লক্ষপতি হ'বো। বেশী দিন বাঁচ্‌লে যে কি হ'বো, তা আর কি বল্‌বো, সে মুখে বল্‌বার নয়। এখন চল আড্ডায় যাওয়া যা'ক, খাওয়া দাওয়ার পর যা হয় পরামর্শ করা যাবে এখন।"

এই কথা বলিতে বলিতে সহাস্য বদনে সেই চারিটি পুরুষ, নগরোপান্তস্থ একটি জঘন্য গৃহে প্রবেশ করিল। পাঠক, যদি তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে ইচ্ছা করেন ত, গৃহ মধ্যে চলুন।

সেই জঘন্য গৃহের অভ্যন্তরে যে কয়জন ব্যক্তি বসিয়াছিল, তাহাদের দেখিয়া দস্যু বই আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করে না। তাহারা আকারে দস্যু, কথোপকথনে দস্যু, গৃহের আস্‌বাব দেখিলেও তাহাদিগকে দস্যু বই আর কিছু বোধ হয় না।

দলপতি বীরচন্দ্র প্রবেশ করিবামাত্র, তাহারা সকলে আনন্দে যেন নৃত্য করিতে লাগিল।

একজন বলিল, "গুরু কি হলো ?—"

বীরচন্দ্র নিজের দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন, পাঁচশখানি টাকা আদায় করা গেছে, ছুঁড়িটেকে বাগাতে পারলেত আরও পাওয়া যাবেই। না পারলেও যে পাওয়া যাবে না তা নয়। বাবা, মাছ একবার ভাল করে গাঁথতে পারলে, ত্রু'শ ঘণ্টা ধরে খেলাও, শেষে তোমার কোলেই আসবে কোথাও যাবে না।—আজ ভাল করে খাওয়ার উদ্যোগটা কর—এমন দিন আর হ'বে না, রাজা বেটা মরেছে না আপদ গেছে, এখন যে রাজা হলো, তাতে মনে কর, এ আমাদেরই রাজ্যি।"

এই কথা শুনিয়া দলশুদ্ধ লোক উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। ছুই তিন জন আহারের চেষ্টায় উঠিয়া গেল।

বীরচন্দ্র, অবশিষ্ট লোকদের একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাণিকচাঁদ, তুমি আজ আহারের পর একবার, আশ্রমে যাও, দেখে এস, ছুঁড়িটাকে চুরি করবার সুবিধা কি রকম ?"

মাণিকচাঁদ।—"তার চেয়ে আমার সঙ্গে আর ছুজন লোক দাও না, একেবারে কাজ হাসিল করে আসি। আজ এনে এখানে রেখে, কাল সকালে—ভোরে ভোরে একখান পাল্কীতে তুলে রাজবাটীতে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

বীরচন্দ্র।—"নারে তা হ'বে না, সে রকম করে আনা সুবিধে হ'বে না, আগে দেখতে হবে, কোথায় কোথায় সে বেড়ায়, কখন কোথায় একা যায়, তার পর সুবিধা করে আনতে হবে, কেউ না টের পায়, টের পেলে, রাজা বড় রাগবে, তা'হলে আমাদের লাভের আশা একেবারে ফসকে যাবে। এখন যাও তোমরা সব স্নান টান কর গে।"

দলপতির হুকুম হইবামাত্র সকলেই একে একে প্রস্থান করিল। তখন বীরচন্দ্র, একাকী বসিয়া নানা প্রকার চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

(ক্রমশঃ)

চিত্রবিদ্যা।

(৭৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

দ্বিতীয় প্রকরণ।

OUTLINE DRAWING.

সীমাঙ্কন বা লাঞ্ছন।

আলিম্পন অভ্যাস করিতে হইলে—

১। হস্তকে চক্ষুর বশ করিতে হইবে,

২। চক্ষুকে প্রত্যেক বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং

৩। মনকে তদুপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে।

হঠাৎ এই কয়টি কথা সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহার গুরুত্ব কার্য্যকালেই অনুভূত হয়। হস্ত দ্বারা অভিলাষানুরূপ রেখা বাহির করা যে কিরূপ আয়াসসাধ্য তাহা একবার চেষ্টা না করিলে বুঝিবার উপায় নাই। অবশ্য ক্রমাগত চেষ্টা করিলে ইহা সহজ হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই, কিন্তু, প্রথম অভ্যাস কালে যে গুরুত্ব অনুভূত হইবে, তাহাতে ভগ্নোদ্যম না হওয়াই, সিদ্ধ হইবার উপযুক্ত উপায়।

কোন একটি বস্তু দেখিলেই, কোন্ কোন্ স্থানের রেখা অঙ্কিত করিলে, বস্তুটির প্রতিরূপ চিনিতে পারা যাইবে, তাহা জানাই চক্ষুর শিক্ষা।

ক্ষেত্রের সীমাই রেখা।

ইহা ব্যতীত চক্ষুর দেখিবার আরও বস্তু আছে, কিন্তু তাহা প্রথম শিক্ষার সময় নয়, পরে প্রয়োজনীয়, সে কথা যথা সময়েই বলিব।

মনের শিখিবার জিনিস অনেক, কিন্তু প্রথম শিক্ষার সময়ে দ্রব্যের আকৃতর ধারণাই যথেষ্ট।

প্রথম শিক্ষা সময়ে কোন কিছু অঙ্কিত করিবার সময় মনে মনে ভাবিয়া দেখিবেন, কোন্ দিগের গঠন কিরূপ, চক্ষুর দ্বারা তাহা স্থির করিয়া অঙ্কিত করিবার স্থানাদি স্থির করিয়া লইবেন পরে হস্তকে চক্ষুর নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিবেন।

এই ত্রিবিধ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য সচরাচর যে সমুদায় উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ একখানি সুপরিষ্কৃত বড় শ্লেট, একটি বড়

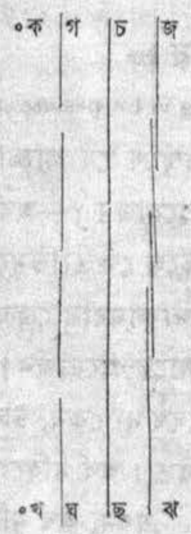
পেন্‌সিল, এবং একখানি আর্দ্র স্পঞ্জ বা পরিষ্কার ন্যাকড়া সংগ্রহ করিতে হইবে।

একেবারে কাগজে ড্রইং করা ভাল নয়। শ্লেট কাগজের অপেক্ষা মসৃণ এজন্য শ্লেটে শীঘ্রই হস্ত বশ হইয়া থাকে; তাহা ছাড়া প্রথম শিক্ষা সময়ে বহু আয়াসে একটি সামান্য চিত্র আলেখ্য দর্শনে অঙ্কিত করাও কষ্টকর হইয়া উঠে, এই জন্য অনর্থক কাগজ নষ্ট করা অপেক্ষা প্রথম প্রথম শ্লেটে অঙ্কিত করিয়া, হস্ত একটু আয়ত্ব হইলে, কাগজ ব্যবহার করাই ভাল।

শ্লেট প্রভৃতি সংগ্রহ হইলে———

১। একটি সরল লম্ব রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে।

প্রথমতঃ শ্লেটখানি লম্বভাবে ধরিয়া উপরে শ্লেটের ঠিক মধ্যস্থলে একটি বিন্দু স্থির কর। প্রথম চক্ষুর দ্বারা স্থির করিয়া, পেন্‌সিলের দাগ দিবে (যেমন ক) পরে মাপিয়া দেখিবে ঠিক হইল কি না? তার পর নীচে ঐ রূপ করিয়া মধ্যস্থলে একটি বিন্দু নির্দ্দেশ করিবে (যেমন খ)। বিন্দু স্থির হইলে, উপরের বিন্দু হইতে নিম্নের বিন্দু লক্ষ্য করিয়া একটানে যতটা টানিতে পার, ততটা রেখা টানিয়া আবার তাহার নীচে ঐ রূপ টান। এই রূপে অভিলষিত রেখা নিষ্পন্ন হইলে, (গ ঘ দেখ) ছিন্ন অংশগুলি যোগ করিয়া দাও, তাহা হইলে সুন্দর সরল রেখা হইবে (চ ছ দেখ)। জ ঝ এর মত আঁচড়াইয়া রেখা অঙ্কিত করা ভাল নয়।



তৃতীয় চিত্র।

পেন্‌সিল সূক্ষ্মাগ্র করিয়া লইতে হয়, এবং সাধারণ কলম ধরা অপেক্ষা অধিক দূরে ধরা উচিত।

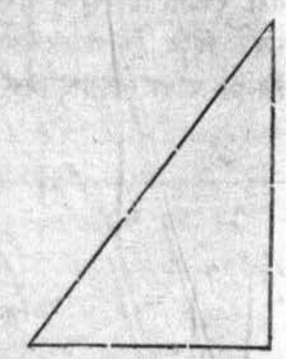
লম্ব রেখা অঙ্কিত হইলে সমতল রেখা, এবং কোণাভিমুখী রেখা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের রেখা সমুদায় উপরোক্ত উপায়েই অঙ্কিত করিতে হইবে।

রেখাঙ্কন সময়ে যে স্থান হইতে যে স্থান পর্য্যন্ত রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে, সেই দুই স্থানে দুইটি বিন্দুপাত করিয়া প্রথমতঃ উপরদিগের বিন্দু হইতে নিম্ন দিগে বিন্দু পর্য্যন্ত ভাঙ্গা ভাঙ্গা রেখায় অঙ্কিত করিয়া (গ ঘ এর মত) ছেদগুলি যুড়িয়া লইতে হয়।

রেখাঙ্কন শ্লেটে অভ্যস্থ হইলে পূর্ব্ব প্রকরণ কথিত ড্রইং-বোর্ড সংগ্রহ করিয়া তাহাতে একখণ্ড পুরু অথচ মসৃণ কাগজ আঁটিয়া লইবে এবং একটি HB পেন্‌সিল সূক্ষ্ম মুখ করিয়া লইবে। এবং একখানি ইণ্ডিয়া রবার সংগ্রহ করিয়া কাগজে ড্রইং আরম্ভ করিবে।

২। একটি সমকোণ অঙ্কিত করিতে হইবে

সর্ব্ব প্রথমে একটি সরল লম্ব রেখা পূর্ব্ব প্রক্রিয়া মত অঙ্কিত কর। ঐ রেখাকে সমান চারি ভাগ কর, তাহার পর নিম্নস্থ সীমা হইতে একটি রেখা পূর্ব্বোক্ত রেখার তিন ভাগের সমান করিয়া চক্ষুর দ্বারা সমকোণ অঙ্কিত কর। যদি যথার্থ সমকোণী হইয়া থাকে, তাহা হইলে রেখা দ্বারা অবশিষ্ট প্রান্তদ্বয় যোগ করিলে, যে রেখা হইবে তাহার পাঁচ ভাগের প্রত্যেক ভাগ, পূর্ব্বোক্ত রেখা দ্বয়ের এক এক ভাগের সমান হইবে (চতুর্থ চিত্র দেখ)। চিত্রটি অঙ্কিত হইলে, সূক্ষ্মাগ্র পেন্‌কলম দিয়া, পেন্‌সিলের লাইনের উপর কালির লাইন দিবে, লাইন টানিবার উপায়েই (তৃতীয় চিত্রের গ ঘ এর মত) কালির লাইন টানিবে, অথচ সাবধান, যেন পেন্‌সিলের দাগ হইতে বাঁকিয়া না যায়।


চতুর্থ চিত্র।

প্রত্যেক চিত্রাঙ্কন সময়ে যে স্থান হইতে আঁকিলে চিত্রটি ঠিক মধ্যস্থলে পড়িবে এমন স্থলে অঙ্কিত করিবে।

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত উপায়ে, সংজ্ঞাতে যে সকল প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে সে গুলি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিবে। ওগুলি ভবিষ্যতে যখন কাজে লাগিবে, তখন ঐ সকলের প্রয়োগ বুঝিতে পারিবে। কিন্তু আপাততঃ ঐ সকল অঙ্কনের জন্য অধিক সময়ক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই, যত অল্প সময়ের মধ্যে অনুরূপ আনিতে পার চেষ্টা করিবে।

তার পর আলেখ্য দর্শনে অঙ্কনের চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রথমে উভয় পার্শ্বে সমাকার আকার সমুদায় অঙ্কিত করা উচিত। আগামীবারে আমরা কয়েকটি ঐ রূপ চিত্র ও তাহার অঙ্কন প্রক্রিয়া দিব। ঐ রূপ চিত্রের আলেখ্য বহুল পরিমাণে বিক্রীত হয়, সে সকলের মূল্যও সুলভ, প্রথম শিক্ষার্থীগণ সেই রূপ আলেখ্য সংগ্রহ করিয়া অঙ্কন অভ্যাস করিলেই সহজে শিখিতে পারিবেন।

আঁকিবার প্রক্রিয়া আগামীবারে বলিব, কিন্তু এবারে, শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কিরূপে চিত্র নির্ভূল হইল কি না। পরীক্ষা করিতে হয়, তাহাই বলিব। যখন দেখিবে যে চিত্রিত অংশ তোমার চক্ষে নির্ভুল বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন তোমার অঙ্কিত চিত্রটি মধ্য রেখার সহিত, একখানি পাতলা কাগজে (Tracing Paper) তুলিয়া (ট্রেস করিয়া) আলেখ্যের উপর রাখ, মধ্য রেখায় মধ্য রেখায় মিলাইয়া রাখিবে, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে, আলেখ্যে আর তোমার অঙ্কিত চিত্রে কি প্রভেদ আছে। সেই অনুসারে তোমার চিত্র শুদ্ধ করিয়া লইলেই নির্ভূল হইয়া যাইবে।

এই সঙ্গে ট্রেসিং কাগজের কথাও কিছু বলা উচিত। উহা একপ্রকার স্বচ্ছ কাগজ বিশেষ। কোন কাগজে তেল লাগিলে তাহা দ্বারা চাপা দিলে, যেমন নিম্নস্থ কাগজের ক্ষুদ্রতম অক্ষর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়, ইহার দ্বারা কোন লেখা কাগজ বা চিত্র চাপা দিলেও সেই রূপ পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ছবির উপর এই রূপ কাগজ চাপা দিয়া, সেই ছবিটি যদি ঐ পাতালা কাগজে পেন্‌সিল দ্বারা আঁকিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, ঐ ছবি ট্রেস্ করা হইল বলা যায়।

(ক্রমশঃ)

অর্থ সঞ্চয়।*

"Not to have a mania for buying is to possess a fortune."

জগতে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কোন দ্রব্য সুলভ মূল্যে পাইলে, উহাতে প্রয়োজন না থাকিলেও ক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা, যদি উপরের ছত্রটির উপর কিছুক্ষণ চিন্তা করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের সে কার্য্য ভাল কি মন্দ?

সংসারী হইতে গেলেই অর্থের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া থাকিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারই অর্থের প্রয়োজন। অর্থ না হইলে, সামান্য প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত। ভিকারী ভিক্ষা করিতেছে; প্রয়োজন? —অর্থ। সামান্য মুটিয়া, তাহার ঝাঁকা লইয়া রাস্তার ধারে অপেক্ষা করিতেছে; প্রয়োজন? —অর্থ। আজানুলম্বিত চাপকান পরিহিত কেরাণী-বাবু দশটা না বাজিতে, ঊর্দ্ধশ্বাসে লালদিঘীর দিকে দৌড়িতেছেন; প্রয়োজন?—অর্থ। অলস অকর্ম্মণ্য, চাটুকার, বৈটকখানা বিহারী বাবুর সম্মুখে 'যে আজ্ঞার' ছালা লইয়া বসিয়া আছেন; প্রয়োজন?—অর্থ। নিদাঘ-রৌদ্র-তপ্ত কৃষক হল-স্কন্ধে ক্ষেত্রাভিমুখে চলিতেছে; প্রয়োজন?—অর্থ। দোকানদার ক্রেতার অপেক্ষায় দোকানে বসিয়া আছে; প্রয়োজন?—অর্থ। ফলতঃ যে দিকে চাহিয়া দেখ না কেন, উচ্চ নীচ সকলেই অর্থের জন্য লালায়িত। অর্থ নহিলে কাহারই এক দণ্ড চলে না।

যখন, অর্থ নহিলে একদণ্ড চলে না, তখন যে, সকলেরই অর্থোপার্জ্জন করা প্রয়োজনীয়, তাহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু অর্থোপার্জ্জন করিবে কি উপায়ে?—এ প্রশ্ন বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্তর পাইবে,—"চাকুরি করিয়া।" এরূপ উত্তর পাইবার হেতুও যথেষ্ট আছে। যাহার মূলধন নাই, তাহার পক্ষে "চাকুরী ব্যতীত" অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় চিন্তা করাও সহজ নয়। কিন্তু সেই মূলধনের অভাব হয় কেন?—না—আমরা কোন কালেই সঞ্চয়ী নই।

* দিনাজপুর পত্রিকা। শ্রীব্রজেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দিনাজপুর সেন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সঞ্চয় প্রত্যেক মনুষ্যেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত। যখন আমরা জীবনের প্রতিক্ষণে সামান্য পিপীলিকাটিকে পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিতে দেখিতেছি, তখন যে সঞ্চয়ী হই না কেন? এই আশ্চর্য্য! প্রত্যেকেরই উচিত, নিজের উপার্জ্জন হইতে যথা সম্ভব সঞ্চয় করা। যদি কেহ একথা বলেন, আমার অল্প আয়, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন, কেমন করিয়া সঞ্চয় করি? তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলিতে পারি, তাঁহারা তাঁহাদের আয় ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখুন, দেখিবেন, অপব্যয় আছে কি না? এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিব—(সেটি আমাদের অনুমোদিত হইলেও সমালোচ্য পত্রিকার কথা) তোমার বাড়ীর আসে পাশে যে দু এক হাত জমি থাকে, তাহা ফেলিয়া রাখিও না। তাহাতে "দুই চারিটা গাছ পালা আরজাও, চীনেবাজারে জুতা ছাড়, শান্তিপুরে উলঙ্গ-বাহার ছাড়, আর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মোগলাই-খিচুড়ী ও রসগোল্লার টক ছাড়"। ফল কথা, মিতব্যয়ী হইলে, অল্প আয় হইলেও সঞ্চয়ী হওয়া যায়।

আবার কেহ কেহ ব্যয়ের ধারা জানেন না, সেই জন্য তাঁহাদিগের অনেক আয় হইলেও সঞ্চয় করিতে পারেন না, প্রত্যেক ব্যক্তিরই একবার করিয়া দেখা উচিত, তাঁহার যাহা আয়, তাহা দ্বারা কতগুলি লোককে প্রতিপালন করিতে হইবে। কোন্ কোন্ দ্রব্য না হইলে কোন রকমেই চলিবে না, সেই সেই দ্রব্য কি পরিমাণ প্রয়োজন হইবে, তাহাতে তাহার কত ব্যয় হইবে, ব্যয় হইয়া কিছু থাকিবে কিনা? যদি দেখেন, যে কিছুই থাকিবে না, বা আয়ে সঙ্কুলান হইবে না, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে ব্যয় সঙ্কোচ, অথবা আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেই হইবে। দুইই কষ্টকর —কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, তাঁহার অপেক্ষা হীনাবস্থ লোক আছে। একজন ব্যক্তি বলিয়াছেন, "যাহার কোন উপায়ে সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারও উচিত নিজের ভোজ্য দ্রব্য হইতেও কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করেন। ফল কথা, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, ইচ্ছা করিলে সকলেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন।

দিনাজপুর পত্রিকায় এই সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার পূর্ব্বাংশ কি? তাহা আমরা দেখি নাই। কিন্তু যে টুকু দেখিয়াছি সে টুকু নূতন ধরণে বেশ সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। তবে দুই ফর্ম্মা কলেবর মধ্যে ৮।৯ টি প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা আমরা ভাল বোধ করিলাম না। শ্রী হঃ——



Peary chand Mittra

প্যারীচাঁদ মিত্র।

সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে যিনি বঙ্গের আঁধার আকাশের একটি উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন, যিনি বঙ্গের প্রথম সমাজ সংস্কারক দলের একজন অগ্রণী বলিয়া বিখ্যাত, যিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, স্বদেশের হিতসাধনাই যাঁহার কার্য্যময় জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, যিনি আত্মার অমরত্ব নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীর গভীর মোহাবরণ ভেদ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী অদ্য আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

১৮১৪ খৃঃ অব্দে ২২শে জুলাই প্যারীচাঁদ মিত্র কলিকাতা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। ইনি পিতার চতুর্থ পুত্র ছিলেন।

তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে লোকের লেখাপড়া শিখিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না। পুত্রের বয়ঃক্রম ৫।৬ বৎসর হইলে পিতা তাহাকে কোন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাইয়া দিতেন। কলিকাতাতে অনেক স্কুল হওয়াতে এই রূপ গুরুমহাশয়যুক্ত পাঠশালার সংখ্যা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পল্লিগ্রামে স-বেত্র গুরুমহাশয় ছাত্রদিগের ভীতি উৎপাদন করিয়া ও তাহাদের নিকট হইতে সিধা ও সময়ে অসময়ে দুই এক ছিলিম তামাকু আদায় করিয়া এখনও পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতেছেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে যে প্রণালীতে শিক্ষা দিতেন, বর্ত্তমান পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী হইতে তাহা কোন অংশে উৎকৃষ্ট ছিল না। পুত্র সেই পাঠশালায় 'ক খ' হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে 'সেবক শ্রী' পর্য্যন্ত লিখিত। অঙ্কশাস্ত্রেও তাহার কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মিত। এই শিক্ষাতে সাধারণতঃ পুত্রের ৬।৭ বৎসর হইলে, পিতা তাহাকে একটু পার্সী অথবা ইংরাজি শিখাইলেন। পার্সী সে সময়ে আদালতে ব্যবহৃত হইত, এজন্য তখন পার্সীর কিছু আদর ছিল। অধিকাংশ লোকে তখন ভালরূপ ইংরাজী শিখিত না এবং শিখিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখিত না। এ দেশব্যাপী অন্নকষ্ট তখন ছিল না। সাধারণতঃ লোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল। সে সময়ে চাকরীর এতদূর অনাটন হয় নাই। অতি অল্প ইংরাজী বিদ্যাতেই তখন বেশ দশটাকা উপার্জ্জন করা যাইত।

অতি অল্প বয়সে প্যারীচাঁদ মিত্র গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ করেন। পরে তাঁহার পিতা পুত্রকে পার্সী শিখাইবার জন্য একজন মুন্সী নিযুক্ত করিয়া দেন। এই রূপ বাঙ্গালা ও পার্সী ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিলে, ১৮২৯ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে ইনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইনি প্রথম প্রথম শুদ্ধ রূপে ইংরাজি শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, এই জন্য সময়ে সময়ে সহপাঠীদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন। কিন্তু অতি অল্পদিনেই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে তিনি আপনার উচ্চারণগত সমুদায় দোষ সংশোধন করেন। বুদ্ধিমান বলিয়া ক্লাসে প্যারীচাঁদের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল এবং শিক্ষকেরা তাঁহার সৎস্বভাব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষাতে তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতেন এবং যখন তিনি কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন, তখন তিনি প্রতিমাসে ১৬ টাকা বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই বৃত্তি সে সময়ে সম্যক্ পারদর্শীতার নিদর্শন ছিল এবং ছাত্রজীবনে এই বৃত্তি-লাভ অত্যন্ত সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। ইনি পঠদ্দশায় স্যার্ জন পিটার গ্র্যাণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রদত্ত হইয়াছিল। যখন ইনি কলেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করেন, তখন আপনার বাটীতে সাধারণের সুবিধার জন্য একটী অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সুবিখ্যাত হেয়ার ও ডিরোজিও সাহেব এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ সিকদার ও শিবচন্দ্র দেব অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলেজের শিক্ষা সমাপ্তির অতি অল্পদিন পরেই প্যারীচাঁদ কলিকাতা পব্লিক্ লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান হন। এই লাইব্রেরী পূর্ব্বে এস্প্লানেড্ রোডে ডাক্তার ষ্ট্রঙের বাটীর নিম্নতল গৃহে অবস্থিত ছিল। পরে যখন স্যার চার্লস্ মেটকাফের নাম (যিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করেন) চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সাধারণ চাঁদা হইতে গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত ও মহোদয় মেটকাফ সাহেবের নামানুসারে 'মেটকাফ হল' নামে অভিহিত হয়, তখন এই

লাইব্রেরী সেই নূতন গৃহে উঠিয়া আসে। প্যারীচাঁদ মেটকাফ হল নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে অম্লান বদনে দিবারাত্র যে রূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

এই লাইব্রেরিতে প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। তিনি ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ঐ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান্, সেক্রেটারী- ও কিউরেটর হন। তাঁহার পদের বেতন সামান্য ছিল, কিন্তু তিনি ইংরাজি সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে যে রূপ মহার্ঘ-রত্ন আহরণ করিয়া আপনার হৃদয়কে সজ্জীকৃত করেন, সে রূপ রত্ন সংগ্রহ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তিনি এই লাইব্রেরিতে আপনার অতৃপ্ত জ্ঞানস্পৃহা পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ সুবিধা পাইয়াছিলেন। যদিও তিনি আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, তথাপি লাইব্রেরির কার্য্যে তাঁহার বিন্দু মাত্র অমনোযোগীতা ছিল না। তাঁহার যত্নে ও পরিশ্রমে লাইব্রেরির অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য, সুপ্রীম কোর্টের জজ ও ব্যারিষ্টার, বণিক, সিভিলিয়ান, দালাল ও অন্যান্য নানা সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান লোকের উক্ত লাইব্রেরী অতি আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা তথায় মিলিত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা ও সদালাপ করিতেন। প্যারীচাঁদ ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে উক্ত লাইব্রেরির সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ানের পদ পরিত্যাগ করেন। সে সময়ে লাইব্রেরির অবস্থা অতিশয় সন্তোষজনক ছিল। তিনি কিরূপ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন ও লাইব্রেরির উন্নতির জন্য কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা উক্ত লাইব্রেরির কিউরেটারদিগের তাৎকালিক মন্তব্যে প্রকাশিত আছে।

চাকরীর প্রতি প্যারীচাঁদের বিশেষ আস্থা ছিল না। এক সময়ে তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া সার এডওয়ার্ড রায়ান ও ক্যামিরন সাহেব তাঁহাকে কোম্পানির চাকরী স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। যে সময়ে তিনি পব্লিক্ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান্ ছিলেন, তখন তিনি কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত মিলিত হইয়া বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠেন। প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সরলস্বভাব ছিলেন। তিনি সকলকেই বিশ্বাস করিতেন। এই অযথা বিশ্বাসই তাঁহার সম্পত্তির কাল স্বরূপ হইয়া উঠিল। তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইল। বিদেশীয় এজেন্টগণ প্রতারণা করিতে লাগিল এবং অল্পদিনেই তাঁহার উপার্জ্জিত প্রভূত সম্পত্তি দেখিতে দেখিতে কোথায় মিশাইয়া গেল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তিনি পূর্ব্বে যেরূপ সহাস্য বদন ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন, এই সম্পত্তি বিনাশেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পর প্যারীচাঁদ নিজে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে আপনার দুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া লন। বাণিজ্যে তাঁহার স্বাভাবিক সততার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় তাঁহাকে এরূপ বিশ্বাস ও সম্মান করিত যে, তিনি গ্রেট ইষ্টার্ণ্ হোটেল্ কোং, পোর্ট ক্যানিঙ্ ল্যাণ্ড্ ইনভেষ্ট্মেণ্ট্ কোং, বেঙ্গল টি কোং, ঈষ্টইণ্ডিয়া টি কোং, ডরং টি কোং এবং অন্যান্য অনেক কোম্পানির ডাইরেক্টর মনোনীত হন। ছোট লাট স্যার সেসিল বিডনের সময় বেলভিডিয়ার উদ্যানে যে কৃষি প্রদর্শনী হইয়াছিল, প্যারীচাঁদ তাহাতে একজন বিচারক ছিলেন।

প্যারীচাঁদ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে এদেশীয় লোকের মনে এক নূতন ভাব উপস্থিত হয়। বহুকাল নিদ্রার পর যেন দেশে চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। ইংরাজি শিক্ষার তীব্রজ্যোতি লোকের অজ্ঞানাচ্ছন্ন হৃদয় কন্দরকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইল; ঘোর কুসংস্কার অন্ধকার রজনীর ন্যায় দেশের মুখ ঢাকিয়াছে—সে অন্ধকার দূর করিতে শিক্ষিত সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর হইল। চারিদিকে সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল এবং সেই সকল সভায় কিসে স্বজাতির উন্নতি হইবে, কিসে বিদ্যার বিমল জ্যোতি লোকের হৃদয়কে আলোকিত করিবে, তাহার আলোচনা হইতে লাগিল। যে সকল মহাত্মা এই সকল সৎকার্য্যে ব্রতী ছিলেন প্যারীচাঁদ তাঁহাদের একজন অগ্রণী বলিয়া পরিচিত। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ সিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, দিগম্বর মিত্র এবং অন্যান্য মহানুভব ব্যক্তিগণ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন।

প্যারীচাঁদ পঠদ্দশাতেই একাডেমিক্ এসোসিয়েশন নামে এক সভার সভ্য হন। সেই সভায় তিনি আপনার ভবিষ্যৎ ক্ষমতার বিলক্ষণ পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ বাগ্মী জর্জ টমসনের সহিত মিলিত হইয়া তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে এক সভা স্থাপিত

করেন। জমীদার ও প্রজা উভয়ের মঙ্গল সাধনই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এই সভার সেক্রেটারী ছিলেন। পরে এই সভার বিলোপ হইলে, তিনি বর্ত্তমান ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন সভার সভ্য হন। তিনি কিরূপ আগ্রহের সহিত এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সভার মুদ্রিত বিবরণাবলীই তাহার সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ব্যতীত অন্যান্য অনেক দেশহিতকর কার্য্যে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত যোগদান করিতেন। তিনি বেথুন সোসাইটীর সর্ব্বপ্রথম সেক্রেটারী হন এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত সোসাইটীর কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ও আগ্রহে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কর্ত্তৃক বর্ত্তমান বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। তিনি স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন এবং কিরূপ চক্ষে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা তৎপ্রণীত পুস্তকাবলী পাঠে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। এই সকল সভা ব্যতীত প্যারীচাঁদ বেঙ্গল সোশিয়াল স্যায়ান্স এসোসিয়েশন, সোসাইটী ফর্ দি আকুইজিশন অফ্ জেনেরেল নলেজ., এগ্রি হর্টিকলচরেল সোসাইটী অফ ইণ্ডিয়া, স্কুল বুক সোসাইটী, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী, কলিকাতা পশু নিষ্ঠুরতা নিবারিণী সভা এবং অন্যান্য অনেক সভার সভ্য, সেক্রেটারী অথবা সম্পাদক ছিলেন। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতেই বিশেষ দক্ষতা দেখাইতেন। আলস্য কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিষ্ণুতা, আগ্রহ ও অধ্যবসায় অক্ষুণ্ণ ছিল।

অতি অল্প বয়স হইতেই প্যারীচাঁদ সংবাদ ও সাময়িক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া তিনি "জ্ঞানান্বেষণ" ও রামগোপাল ঘোষ এবং রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের সাহায্যে "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" পত্র বাহির করেন। "মাসিক পত্রিকা" নামে প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের তিনিই জন্মদাতা। এই সকল সংবাদ ও সাময়িক পত্র ব্যতীত ইংলিসম্যান, বেঙ্গল হরকরা, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড ও হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রে তিনি নিয়মিত রূপে লিখিতেন। কলিকাতা রিবিউ নামক পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই সুখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ। জমীদার ও রায়ত সম্বন্ধে তল্লিখিত একটী প্রবন্ধের খ্যাতি বিলাতের হাউস অফ লর্ডস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

প্যারীচাঁদ শান্ত অথচ স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। সুপণ্ডিত, সুলেখক, সদালাপী, সৎস্বভাব ও নিরহঙ্কার বলিয়া তাঁহার প্রভূত খ্যাতি ছিল। তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তদানীন্তন লেঃ গভর্ণর স্যার উইলিয়ম গ্রে তাঁহাকে বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্যপদে মনোনীত করেন। তিনি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ১৮ই জানুয়ারী হইতে ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ১৮ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত উক্ত সম্মানজনক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই বৎসর তিনি বৃথা নষ্ট করেন নাই। তাঁহারই উৎসাহ ও চেষ্টায় ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। পশু নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার স্থাপনা হইতেই তিনি তাহার একজন উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। ঐ সভার তিনি যে সমস্ত উপকার করেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। কোলেসওয়ার্দি গ্রান্ট সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি ঐ সভার সেক্রেটারী পদে মনোনীত হন। প্যারীচাঁদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাচীন 'ফেলো', একজন পুরাতন 'জষ্টিস্ অফ্ দি পিস্' ও 'অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট' ছিলেন। ডেল হউসীর রাজত্বকালে যখন পুলিসের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, প্যারীচাঁদ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি যেরূপ নির্ভয়ে ও দক্ষতার সহিত পুলিসের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সাধারণের অনুরাগ আকৃষ্ট হয়।

খড়দহ নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যার সহিত প্যারীচাঁদের বিবাহ হয়। তাঁহার ৮ পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করেন। এই শোচনীয় ঘটনার পূর্ব্বেই তাঁহার ৪ পুত্র ও ১ কন্যার মৃত্যু হয়। স্ত্রী বিয়োগের পর হইতে তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হয়। আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের নিমিত্ত তিনি নানাবিধ ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস জন্মে। ব্যানার অফ্ লাইট্, লাইট্ এবং স্পিরিচুয়ালিষ্ট পত্রিকায় তিনি মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড ও আমেরিকার অন্যান্য প্রেততত্ত্ব বিষয়িনী পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত।

বাল্যকালে হিন্দু দেব দেবীর প্রতি প্যারীচাঁদের বিশ্বাস ছিল। বয়োবৃদ্ধি ও ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সে বিশ্বাস ক্রমে বিলুপ্ত হয় এবং তিনি একেশ্বরবাদী হইয়া উঠেন। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। প্রাচীন বয়সে প্রেততত্ত্বানুশীলনেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে যখন মাডাম ব্লাভাট্স্কি এবং কর্ণেল অলকট্ ভারতবর্ষে আসিয়া থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, প্যারীচাঁদ তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। তাঁহার যত্নে ও পরিশ্রমে বঙ্গদেশে

শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি যোগ সাধন করিতে আরম্ভ করেন। যোগশিক্ষার নিমিত্ত তিনি ভূরি ভূরি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন। গভীর চিন্তায় দিবা নিশি তিনি নিমগ্ন থাকিতেন—সময়ে আহার ও বিশ্রাম হইত না। শেষ অবস্থায় তিনি মৎস্যমাংস ত্যাগ করেন এবং ফলমূলাহারই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু এই সকল কঠোর নিয়ম তাঁহার বৃদ্ধদেহে সহিল না। উদরী আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী ও কবিরাজী চিকিৎসায় কিছু ফল হইল না। দুই তিন বার তাঁহার উদরে ছিদ্র করিয়া উদরস্থ সঞ্চিত জল বাহির করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কিছুতেই সেই দুশ্চিকিৎস্য রোগের উপশম হইল না। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ২৩ শে নভেম্বর ৩ পুত্র ও ১ কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

বঙ্গসাহিত্যে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' একজন সুলেখক বলিয়া পরিচিত। চলিত কথায় ও সহজ ভাষায় কিরূপে বাঙ্গালা লিখিতে হয়, তিনিই তাহা প্রথমে দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস। যদিও এখনকার উজ্জ্বলতর উপন্যাস সমূহের তুলনায় 'আলালের ঘরের দুলাল' কে হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হয়, তথাপি উহা যে সময়ে লিখিতে হয়, সে সময় ও সে সময়ের ভাষার হীনাবস্থা ভাবিয়া দেখিলে প্যারীচাঁদের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। একদিকে যেমন তাঁহার আলালের ঘরের দুলালে সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর নাই, অন্য দিকে তাহাতে বর্ত্তমান অনেক বাঙ্গালা পুস্তকের ইংরাজী গন্ধ নাই। আলালের ঘরের দুলাল ব্যতীত তিনি 'অভেদী', 'কৃষিপাঠ', 'যৎকিঞ্চিৎ' প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোকদিগের অজ্ঞানাবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিবার জন্য তিনি 'বামাতোষিণী', 'রামারঞ্জিকা', 'আধ্যাত্মিকা' প্রভৃতি অনেক গুলি সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছেন। এই সকল বাঙ্গালা পুস্তক ব্যতীত তিনি ইংরাজিতে আত্মা ও আধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক এবং রামকমল সেন ও কোলসওয়ার্দি গ্রাণ্ট সাহেবের জীবন চরিত লিখিয়াছেন। ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি ইংরাজিতে হেয়ার সাহেবের এক সুন্দর ও সুখপাঠ্য জীবন চরিত লিখিয়াছেন। হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের তিনি একজন প্রবর্ত্তক। হেয়ার সাহেবের মৃত্যু তিথিতে প্রতিবৎসর যে সভা আহূত হইত, তিনিই তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে প্যারীচাঁদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

প্যারীচাঁদ অমায়িক, সৎস্বভাব, বদান্য ও সদালাপী ছিলেন। লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিতে তাঁহার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তাঁহার দেশহিতৈষিতা বর্ত্তমান দেশহিতৈষিতার ন্যায় বাক্যময় ছিল না। তিনি বিনা আড়ম্বরে ও নিঃশব্দে যে রূপ দেশের মঙ্গল চেষ্টা করিতেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি তাঁহার ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছিল না।

প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মরণার্থে দুইটী সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হইয়া মেটকাফ্ হলে একখানি অয়েলপেণ্টিং এবং টাউন হলে একটী প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি আমাদের হৃদয়ে যে প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে। আমাদের দেশের তিনি যে একজন মহৎ লোক ছিলেন—ইহা সর্ব্বসাধারণেই অবগত আছেন—এবং যতকাল বঙ্গ উপন্যাস লোকের চিত্তরঞ্জন করিবে—যতকাল স্ত্রীশিক্ষার শুভ ফল জনসমাজে দিন দিন অধিকাধিক বিকীর্ণ হইতে থাকিবে—যতকাল অকৃত্রিম ঈশ্বর ভক্তির দৃষ্টান্ত লোকের ভক্তি উদ্দীপন করিবে—যতকাল জীব জন্তুর প্রতি দয়া প্রকৃত মনুষ্যোচিত ব্যবহার বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত হইবে—ততকাল তাঁহার মহত্তর গুণ সকল জনসমাজের স্মরণে জাগিতে থাকিবে। তিনি এমনি দেশহিতৈষী ছিলেন যে, দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহাকেও তিনি তাঁহার বিশাল হৃদয় হইতে দূরে জানিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ পরিপূর্ণ উপন্যাস ও আর আর গ্রন্থ গুলি যেমন বালক বৃদ্ধ বনিতা সকল শ্রেণীর লোকের শিক্ষাপ্রদ এবং আমোদপ্রদ,—বাঙ্গালা ভাষায় সে রকমের গ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গভাষায় নূতন ধরণের উপন্যাস রচনার তিনি আদি প্রবর্ত্তক; তাহা কেবল নয়—এদেশে কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই, বা কোন প্রকার উন্নতি সাধনের প্রসঙ্গও হয় নাই, যাহাতে তিনি না সংলিপ্ত ছিলেন। প্যারীচাঁদের ন্যায় কার্য্যময় জীবন এদেশে অতি দুর্ল্লভ। তাঁহার জীবনের মহৎ দৃষ্টান্ত ভারতবাসী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ দত্ত।

তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

(Electric Telegraph.)

প্রাচীন হিন্দুজাতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কত দূর উন্নতিসাধন করিয়াছিল, এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রয়োজনীয় শিল্পাদিতে কি পর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে যথানুসন্ধান দ্বারাও স্থির করা অসাধ্য। তবে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে অগ্নি ও জলের চরম নিয়োগ হোমতর্পণে এবং ধাতব তারের ব্যবহার দেব দেবী প্রতিমূর্ত্তির মুকুটাদি অলঙ্কারেই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা দেথ সেই অপ ও তেজ ভূতদ্বয়ের তত্ত্ব অবগত হইয়া বাষ্পীয় শকটাদি বিবিধ যন্ত্র রচনা করিয়া এবং ধাতব তারে তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া কি পর্য্যন্ত মানব হিতসাধন করিয়াছেন! তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগকে ঐশীশক্তি সম্পন্ন দেবতা বিশেষ জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে প্রস্তুত এবং তাঁহাদের যন্ত্রাদি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকি। ইংরাজ শাসনাধীনে এতাবৎ বঙ্গবাসী মধ্যে সাহিত্য দর্শনাদির যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহার তুলনায় বিজ্ঞান শিল্পাদির আলোচনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদ্বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন আস্থা নাই, আধুনিক কৃতবিদ্যগণেরও ততোধিক ঔদাস্য উপলক্ষিত হয়। অধুনা যাঁহারা সুপণ্ডিত ও সুলেথক বলিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজশীর্ষে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারা উপন্যাস, নাটক, পদ্য প্রভৃতি সাধারণ সাহিত্য লইয়াই ব্যস্ত। সুতরাং তৎসমস্ত বিষয়ক পুস্তক পত্রিকাদিরও তাদৃশ অভাব নাই। কিন্তু বিজ্ঞানাদি বিষয়ের সম্যক আলোচনা কৈ? তদ্বিষয়ক সুলেথকই বা কয় জন? কয় খানি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অথবা কয়টি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব বৎসরান্তেও বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রসব করিতেছে? শিল্প বিজ্ঞানাদির যথেষ্ট উন্নতি যে জাতীয় উন্নতির মূলীভূত, তাহা কি এক্ষণে আর প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন আছে? অথচ এবম্বিধ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ে কৃতবিদ্যগণের এতাদৃশ অনাস্থা ও উদাসীন ভাব শোচনীয়, সন্দেহ নাই। 'গোপালভাঁড়,' 'পঞ্চানন্দ,' 'গুপ্তকথা' প্রভৃতির লেথকের অভাব নাই, পাঠকও পর্য্যাপ্ত। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, বিজ্ঞানের লেথক অল্প, পাঠক তদপেক্ষাও কম, এবং ক্রেতা নাই বলিলেও হয়! সুপরিচিত সুলেথকগণ বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি প্রণয়নে ও প্রস্তাবাদি রচনায় যে কি জন্য পরাঙ্মুখ তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবে বৈজ্ঞানিক পাঠকের যে অভাব দৃষ্ট হয়, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবের অভাবই তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কথাটিও কতক সত্য। যে অল্প বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও প্রস্তাবাদি প্রচারিত হইতে দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই ইংরাজী পুস্তকাদির অবিকল অনুবাদ মাত্র। অনেক স্থলে মূলাপেক্ষা ভাষান্তরিত অনুবাদ কঠিনতর ও নিরস হইয়া পড়ে। অধিকন্তু ব্যয় বাহুল্য নিবন্ধন যন্ত্রাদির প্রতিকৃতিরও অভাব হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তৎপাঠে পাঠকের কৌতূহলোদ্দীপ্ত না হইয়া বরং ধৈর্য্যচ্যুতি হয় ও বিরক্তি জন্মে। বৈজ্ঞানিক বিষয় মাত্র প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত, প্রচুর উদাহরণ ও পরীক্ষণ দ্বারা সুব্যাখ্যাত ও বিশদীকৃত এবং প্রয়োজনানুরূপ সুচিত্রাদি দ্বারা স্পষ্টীকৃত হওয়া উচিত। অন্যথা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের স্পষ্ট জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর তত্ত্ব স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তদ্বিষয়ক বহুল পরীক্ষণ প্রত্যক্ষ করা অথবা স্বহস্তে সাধন করা আবশ্যক। প্রকৃতিকার্য্যের সাক্ষাৎকার জ্ঞানলাভ আত্মোৎকর্ষের উপাদানীভূত। পরীক্ষা সম্বলিত পর্য্যালোচনা দ্বারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলে, তৎসমস্ত জড় সম্পত্তির ন্যায় স্মৃতি ভাণ্ডারে সঞ্চিত মাত্র না থাকিয়া জীবন্ত বীজ স্বরূপ মানস ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং পরিণামে বিবিধ সুফল ধারণে সক্ষম হইবে। প্রকৃতিকার্য্য সাক্ষাৎকার সজীবতা প্রাপ্ত হয়। লিপিবদ্ধ হইলে অর্দ্ধরস বর্জ্জিত হইয়া পড়ে। তাহাতে আবার যদ্যপি ব্যাখ্যার যথেষ্ট প্রাঞ্জলতা ও বহুল চিত্রাদির অসদ্ভাব হয়, তাহা হইলে তদ্রূপ বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব কথনই হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না, অথবা তদধ্যয়ন আদৌ ফলপ্রদ হয় না।

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকর্ত্তাগণ তাঁহাদের গ্রন্থবর্ণিত পরীক্ষণগুলি কথনই স্বহস্তে সাধন করেন না। তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের বর্ণনায় স্পষ্টতা, বলবত্তা ও কথন কথন সত্যতারও অভাব দেখা যায়। তাঁহারা যতই লিপিকুশল ও নৈতিক সাহসী হউন না, তাঁহাদিগের বর্ণনা কথনই প্রত্যক্ষ দর্শনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। পরীক্ষা প্রণালী দ্বারা নৈসর্গিক সত্যের সহিত অব্যবহিত সংসর্গে আসিয়া তাহার

জ্ঞান লাভ করিলে, অনেক নূতন তত্ত্ব ও নূতন যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা হইতে পারা যায়। ভৌতিক শক্তি সমূহের কার্য্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে হয়। প্রায় যাবতীয় নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার প্রত্যক্ষ পরীক্ষকগণ ব্যতীত শুদ্ধ গৃহাধ্যায়ী পণ্ডিতদিগের দ্বারা হইতে দেখা যায় না। এমন কি প্রত্যক্ষ পরীক্ষার এতদূর উদ্ভাবনী শক্তি যে অনেক অশিক্ষিত অথবা অর্দ্ধ শিক্ষিত সহকারী পরীক্ষক পর্য্যন্তও অনেক স্থলে উচ্চতম অভিনব তত্ত্ব ও মহোপকারী নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। জনৈক বর্ত্তমান ইংলণ্ডবাসী শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রাদিকে প্রকৃতির ভাষা স্বরূপ তুলনা করিয়াছেন। যন্ত্রযোগে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহের আলোচনা প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিবার ভাষা স্বরূপ। ঐ ভাষা দ্বারা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতিকে পরীক্ষাধীন বিষয় সম্বন্ধে প্রতি পদে জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রশ্ন করিতে থাকেন, প্রকৃতিও সঙ্গে সঙ্গে তৎসমস্তের উত্তর প্রদান করিতে থাকে। এইরূপে কত অভিনব প্রাকৃতিক তত্ত্ব ও নিয়মাদি ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়া মানব করায়ত্ত হইতে থাকে এবং ভূমণ্ডলে তাহার চরম উৎকর্ষ ও সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির মূল হইয়া দাঁড়ায়। বৈজ্ঞানিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পদে পরীক্ষা করিয়া এক একটী তত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে আয়ত্ত করিবে। ক্রমে পরীক্ষা করণে সুন্দর দক্ষতা জন্মাইবে। এমন কি নূতন নূতন পরীক্ষারও আবিষ্কারের আভাসও পাইবে। অধিকন্তু পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়গুলি মনে চিরাঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

আমরা এই প্রস্তাবে তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের মূলতত্ত্ব এবং তাহার গঠন প্রকরণ ও কার্য্য প্রণালীর বিশদ বিবরণ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম। এই জটিল যন্ত্রটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, তৎসমস্তের সংযোজন প্রকরণ এবং কার্য্যপ্রণালীর মূল তত্ত্ব স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য প্রয়োজন মত সুচিত্রাদির অভাব দৃষ্ট হইবে না। প্রস্তাবান্তর্গত পরীক্ষণ সমূহ ও যন্ত্রাদির প্রতিরূপ ইংরাজি পুস্তকাদির অবিকল অনুকৃত নহে। যাহাতে পরীক্ষণানুষ্ঠানোপযোগী সামগ্রী সকল সর্ব্বজন সুলভ ও তৎসমস্তের সংযোজনা প্রকরণ অনায়াস সাধ্য হয়, তৎপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। তাহাতে এরূপ ভরসা করি, এতৎ প্রস্তাব পাঠে বিজ্ঞানোৎসাহীগণ টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের যে কেবল মূল তত্ত্ব ও কার্য্যপ্রণালী মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এমত নহে, অধিকন্তু তাঁহারা নিজ নিজ কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য অতি অল্প মাত্র ব্যয়ে ও অনায়াসে এক একটী কার্য্যকারী যন্ত্র রচনাও করিতে সক্ষম হইবেন।

যদ্যপি কলিকাতার কোন স্থানে একটী লৌহ শলাকাকে মাঝামাঝি একটী কীলক বা গোঁজের উপর সমতল অথবা লম্ব ভাবে অথচ এরূপ শিথীল করিয়া সন্নিবেশিত করা যায় যে, উহা অতি অল্প মাত্র বল সহকারে বাম অথবা দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাইতে বা হেলিতে পারে, অথচ পড়িয়া না যায়, এবং এক গাছি দীর্ঘ ধাতু নির্ম্মিত সরু তার লইয়া তাহার এক প্রান্ত ঐ শলাকার অতি সন্নিধানে স্থাপন করিয়া সমগ্র তারটীকে কোন দূরস্থিত স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাখিয়া তাহার সেই দূরস্থ অপর প্রান্তে এরূপ কোন বল প্রয়োগ করা যায় যে, সেই বল তার মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইয়া গিয়া প্রথম প্রান্তস্থ লৌহশলাকার এরূপ গতি সম্পন্ন করে যে, দূর প্রান্তস্থ বলপ্রয়োগকারীর ইচ্ছামত শলাকার এক প্রান্ত বাম অথবা দক্ষিণদিকে হেলিয়া পড়ে, এবং লম্বিত তারের উভয় প্রান্তস্থ দুই ব্যক্তির মধ্যে যদ্যপি এরূপ সঙ্কেত ধার্য্য থাকে যে, শলাকার ক্রমান্বয়ে বাম ও দক্ষিণ গতির বিবিধ সংযোগে ক্রমান্বয়ে ভাষার সকল অক্ষরগুলি বুঝাইবে, অর্থাৎ শলাকার একবার বাম ও একবার দক্ষিণ পার্শ্বগতিতে 'ক' বুঝাইবে, একবার বাম ও দুইবার দক্ষিণ গতিতে 'খ,' এইরূপ বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বিক গতির বিবিধ সংযোগে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত ভাষার সকল অক্ষরগুলি সঙ্কেতে বুঝাইবে, তাহা হইলে ঐ দূরস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তি কলিকাতাস্থ ব্যক্তিকে আপনার বক্তব্য জানাইতে সক্ষম হইব। আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট পূর্ব্বোক্তমত আর একটী শলাকা সংযোজনা থাকিবে এবং কলিকাতাস্থ ব্যক্তি দূরস্থিত ব্যক্তির ন্যায় পূর্ব্বোক্ত কোনরূপ বল ঐ তার মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করিয়া ঐ শলাকার পার্শ্বিকগতি নিষ্পাদন করিলে, কলিকাতাস্থ ব্যক্তিও ঐ দূরস্থ ব্যক্তিকে আপন বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে পারিবে।

ইহাই এক কথায় বর্ত্তমান হুচ বা কাঁটা বার্ত্তাবহ যন্ত্রের (Needle Telegraph) স্থূল তাৎপর্য্য। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, যে, এই যন্ত্রের কেবল তিনটী মাত্র প্রধান অঙ্গ।

প্রথম।—ব্যাটারী; এতদ্দ্বারা দুইটী পরস্পর দূরবর্ত্তী স্থান মধ্যে বিস্তৃত তার মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ যে বল সঞ্চালনের বিষয় উল্লিখিত হইল সেই বল উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। ইহাকে স্বতন্ত্র যন্ত্র বলিলেও হয়। এই যন্ত্রোৎপন্ন বলকে তাড়িত বল কহে। ব্যাটারীতে তাড়িত বল ইচ্ছামত বা প্রয়োজনানুরূপ ন্যূনাধিক পরিমাণে উৎপাদন করা যায়।

দ্বিতীয়।—ধাতুবিনির্ম্মিত তার; ইহা ব্যাটারী জনিত তাড়িত

বলের বাহক স্বরূপ। ইহা ব্যটারীর তাড়িত বলকে দূরান্তরে—

তৃতীয়।—অঙ্গ শলাকা সংযোজনার নিকট বহন করিয়া লইয়া গিয়া শলাকার পার্শ্বিক গতি সম্পাদন করে। এই শলাকাটী চুম্বক ধর্ম্ম বিশিষ্ট। এবং ইহা মাঝা মাঝি একটী কীলক বা গোঁজের উপর লম্ব অথবা সমতল অথচ শিথীল ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে।

ব্যাটারীতে তাড়িত বল উৎপন্ন হয়; দীর্ঘ তার সেই বলকে দূরে বহন করিয়া লইয়া যায়; এবং সেই বল প্রভাবে চুম্বক শলাকার পার্শ্ব গতি বা হেলন্ সংঘটিত হয়। ঐ পার্শ্ব গতিগুলির বিবিধ সংযোগ ভাষার সমস্ত অক্ষর বাচক সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ ধার্য্য হইয়া থাকে। তদ্দারা অনায়াসে সংবাদাদি প্রেরিত হয়।

এক্ষণে ক্রমান্বয়ে এই তিনটী অঙ্গের বিষয় সবিশেষ বর্ণন করা যাইতেছে।

প্রথম অঙ্গ ব্যাটারীর মূল তত্ত্ব অবগত হইবার অগ্রে রাসায়নিক কার্য্যের মর্ম্ম উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। অতএব তদ্বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিব। পাঠক বিশেষের পক্ষে এই অংশ টুকু কিছু বিরক্তিজনক ও কষ্টকর বোধ হইলে তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। তাহাতে মূল বিষয় বোধের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ব্যাটারীর মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের অজ্ঞতা রহিয়া যাইবে। তন্নিমিত্ত যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারা এই অংশটুকু একবার বিশেষ মনযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া যান, আমাদিগের অনুরোধ।

আদিভূত—আধুনিক বিজ্ঞান বলে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উদ্ভিজ্জ ও জীব শরীর প্রভৃতি ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় জড় পদার্থ কেবল মাত্র ৬৬ টী মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে কোন জড় পদার্থ লইয়া উপযুক্ত উপায়ে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে, উহা ঐ কয়টী মূল পদার্থের হয় একটী মাত্র অথবা তাহাদের দুই, তিন বা ততোধিকের যোগে উৎপন্ন। ঐ ষড় ষষ্টিটী মূল পদার্থের এক একটী অমিশ্র রূঢ়, অর্থাৎ দুই কি তদধিক ভিন্ন জাতীয় পদার্থের পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন নহে। এতাবৎ কোন উপায়ে তাহাদের যৌগিক অর্থাৎ একের অধিক ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের যোগে উৎপন্ন বলিয়া সপ্রমাণ করা যায় নাই। তন্নিমিত্ত ঐ কয়টী মূল পদার্থকে আদিভূতকহে। আদিভূতগুলির মধ্যে কতিপয় ধাতু, যেমন, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনম্, পারদ, তাম্র, দস্তা, লৌহ, সীসাদি। অবশিষ্টগুলি সমস্ত অধাতব। অধাতবগুলির মধ্যে কতিপয় বাষ্প যেমন, অম্লকর (Oxygen), জলকর (Hydrogen), যবক্ষারজান (Nitrogen), ক্লোরিন্ (Chlorine); আর বাকীগুলির কতক তরল এবং অধিকাংশই কঠিন পদার্থ। তন্মধ্যে গন্ধক, দীপক (Phosphorus), অঙ্গার (Carbon), সিকতাদ (Silicon), এবং সেঁকো (Arsenic) এই কয়টীই প্রধান।

এই বিশ্বসংসারে যে অসংখ্য পদার্থ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার সমস্তই পূর্ব্বোক্ত আদিভূত কয়টীর যোগে উৎপন্ন হইয়া নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং ঐ ষড় ষষ্টিটী ভূত ছাড়া অন্যবিধ জড় পদার্থ নাই। উহাদেরই পরস্পর মিলন হইতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি। আদিভূতগুলিই পদার্থ মাত্রের উপকরণ, জড় শরীর গঠনের উপাদান স্বরূপ। এই যে তৃণ, শস্য, ফল ফুল পরিশোভিত জীব সঙ্কুল বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্টি দেখিতেছ, তাহার গোড়ায় ঐ ৬৬টী মাত্র আদিভূত। অনেকে দেহ ব্যবচ্ছেদ (Anatomy) বিষয়ক পুস্তকে জীবের রক্ত মাংসহীন কঙ্কালের (Skeleton) প্রতিকৃতি দেখিয়াছেন। প্রকৃতি দেহ তন্ন তন্ন করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিলে, তাহা ঐ কয়টী আদিভূত বিনির্ম্মিত কঙ্কালাবশেষে পরিণত হইবে। জামা জোড়া, ক্রেপ্, কিংখাপ্ পরা বিচিত্র প্রকৃতি তখন পরিচ্ছদাদি শূন্য হইয়া আদিভূতরূপ অস্থিসার হইয়া পড়িবে! প্যাকম্ ধরা প্রকৃতির বিমোহন মূর্ত্তি তখন নানাবর্ণ বিরঞ্জিত পুচ্ছ বিরহিত হইয়া আদিভূতরূপী মুরগী শাবকে পর্য্যবসিত হইবে! এক্ষণে দেখা যাউক, এই সর্ব্বে সর্ব্বা আদিভূত কয়টীর পরস্পর কিরূপ সংমিলন কার্য্য হইতে এই সৃষ্টি বৈচিত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরমাণু—প্রথমতঃ দেখিতে হইবে আদিভূতগুলির শরীর কিরূপে সংগঠিত হইল। কেবল পরমাণু ও আকর্ষণের কার্য্যে আদিভূতের সৃষ্টি। পরমাণু কাহাকে বলে? পদার্থ মাত্র অসংখ্য অংশে ভাষ্য। যে কোন পদার্থ লইয়া তাহাকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিয়া গেলে ক্রমে এক একটী বিভক্ত অংশ অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে। সেই ক্ষুদ্র অংশের একটী লইয়া তাহাকে আবার আমাদিগের সাধ্যানুসারে ভাগ করিয়া গেলে শেষে বিভক্ত এক একটী অংশ এত সূক্ষ্ম হইয়া পড়িবে যে, তাহাদের আর ভাগ করা যাইবে না। কিন্তু এরূপ এক একটী অতি ক্ষুদ্র অণুও যে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা আমরা অনেক দৃষ্টান্তস্থল দেখিয়া

স্পষ্ট বুঝিতে পারি। যাহাদের আণুবীক্ষণীক কীটাণু বলে, অর্থাৎ যে সমস্ত অত্যন্ত ক্ষুদ্র কীটাণু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাদের এক একটীকে বলশালী অনুবীক্ষণ মধ্য দিয়া দেখিলে, তাহারা যে জীব দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিশিষ্ট তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এক একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ্য বহুতর সূক্ষ্মতরাংশের যোগে হইয়াছে। তাহাতেই বিবেচনা করিয়া দেখ, দৃষ্টির অগোচর ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র কীটাণু শরীরও আরও কত সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইতে পারে। সুতরাং পদার্থকে ক্রমে ভাগ করিয়া গেলে, বিভাগ কার্য্য যে কোথায় শেষ হইবে এবং এক একটী বিভক্ত সূক্ষ্ম অংশ যে আরও কত সূক্ষ্ম হইয়া পড়িতে পারে, তাহা আমরা মনে ধারণাও করিতে পারি না—(কল্পনা বলেও তাহা স্থির করিতে পারি না) কল্পনা হারি মানিয়া যায়। কিন্তু এরূপ বিভাগ কার্য্যের যে শেষ থাকিতেই হইবে, এবং বিভক্ত সূক্ষ্ম অণু এক একটী যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, তথাপি তাহাদের প্রত্যেকটীতে যে পদার্থের গুণ বর্ত্তমান থাকিবে. এরূপ না স্বীকার করিয়া লইলে. পদার্থের উৎপত্তিই আদৌ সম্ভব-পর হয় না; কারণ, পদার্থকে ভাগ করিতে করিতে যদ্যপি শেষে কিছুই না থাকে শূন্যে দাঁড়ায়, তবে শূন্য হইতে শূন্য ব্যতীত আর কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তি বলে পদার্থবিৎ পন্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে, পদার্থ মাত্র অসংখ্য, কল্পনাতীত সূক্ষ্ম ও অবিভাজ্য অণু সকলের সমষ্টি। এবম্বিধ সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অণুকে পরমাণু কহে। সুতরাং পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ পরমাণু কল্পনা ব্যতীত পদার্থ তত্ত্ব বুঝিবার সুবিধা হয় না, অথচ ইহার সহিত পদার্থ বিদ্যার কোনও সত্যের কখনও বিরোধ ঘটিতে দেখা যায় না। যে কোন পদার্থ লইয়া ক্রমে ভাগ করিয়া গেলে শেষে বিভাগ কার্য্য অসাধ্য হইয়া উঠে; তখন এরূপ কল্পনা করিতে হইবে যে বিভক্ত সূক্ষ্ম অণুগুলি আরও অনেক সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইতে পারে। আরও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে পরিণামে এক একটী অবিভাজ্য পরমাণুতে বিভাগ কার্য্যের শেষ। সুতরাং পরমাণুই পদার্থ বিভাগের চরম সীমা, এবং পদার্থের চরম, শেষ, মূল বা আদি অণু বা উপকরণ। যেমন আদি-ভূতগুলি অসংখ্য পদার্থের মূল বা উপকরণ স্বরূপ, সেইরূপ পরমাণুরাশি আবার ঐ অদিভূত সকলের মূল বা উপকরণ। সুতরাং যত প্রকার আদিভূত তত রকম পরমাণু। আবার এক এক প্রকার পরমাণুর যে কত সংখ্যা তাহার স্থির কে করিবে? প্রত্যেক আদিভূতের যত পরমাণু তাহার সকল গুলিই আকৃতি, আয়তন, ভারত্বাদি সর্ব্ব বিষয়ে পরস্পর সম-তুল্য এবং প্রত্যেক আদি ভূতের সমস্ত পরমাণু অন্যান্য আদিভূত সকলের পরমাণু রাশি হইতে ভারত্ব ও রাসায়নিক গুণে পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তন্নিমিত্ত যতগুলি আদিভূত, তত রকমের ভিন্ন জাতীয় পরমাণুপুঞ্জ বিদ্যমান আছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে প্রত্যেক আদিভূতগত অসংখ্য পরমাণুরাশি কি প্রকারে একত্র সংযুক্ত হইয়া স্থূল জড় শরীর ধারণ করিয়াছে।

পারমাণবাকর্ষণ।—বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের মূল বা উপকরণ স্বরূপ কেবল পরমাণু মাত্রের কল্পনা করিয়া নিরস্ত হন নাই। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী শক্তিও কল্পনা করিয়া লইবার 'আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন। কোনরূপ শক্তির কার্য্য ব্যতীত বহুতর পরমাণুরাশি কখনই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র অণু, তাহা হইতে ক্রমে স্থূল জড়রূপ ধারণ করিতে পারিত না। তন্নিমিত্ত পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ পরমাণুর সহিত একটী শক্তিও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ঐ শক্তিকে পার-মাণবাকর্ষণ কহে। আকর্ষণ পরমাণুর একটী প্রধান প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। পরমাণু সমূহ স্বভাবতঃ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। পরমাণুও আকর্ষণ হইতেই সমগ্র জড় জগতের উৎপত্তি। পারমাণবাকর্ষণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া, ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, আমরা যে অসংখ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ করি তাহার কিয়দংশ আদিভূতাবস্থায় বিদ্যমান আছে, আর অবশিষ্ট সমস্ত আদিভূত গুলির দুই কি তদধিকের পরস্পর সংযোগে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। পারমাণব আকর্ষণের যে কার্য্যে এক জাতীয় পরমাণুরাশি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া স্থূল জড় শরীরী এক একটা আদিভূতের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাকে যোগাকর্ষণ বহে। আবার যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন আদি-ভূতের পরমাণু সমূহ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক—সর্ব্বতোভাবে নূতন যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে, সে স্থলে ঐ আকর্ষণকে রাসায়নিক আকর্ষণ বলা যায়। এ স্থলে এই রাসায়নিক আকর্ষণই আমাদিগের আবশ্যক।

[ক্রমশঃ।]

যন্ত্র মাতৃকা।

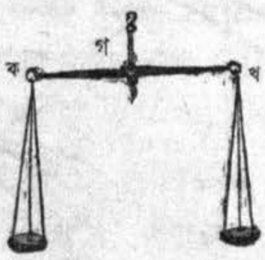
(১১০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

পঞ্চম অধ্যায়।

তুলা যন্ত্র।

তুলাযন্ত্র।—প্রথম প্রকার দণ্ডের প্রয়োগ বিষয়ে একটি প্রধান উদাহরণ। চতুর্থ চিত্রে যে প্রতিরূপটি দেওয়া গেল, উহা যে একটি তুলাযন্ত্রের প্রতিরূপ তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে উহার যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন, তাহা কিছু বলা যাইতেছে।

ঐ চিত্রে ক ও খ দুই দিকের বাহু, ঐ দুইটি সমান আকারের হইলেই ঐ দণ্ডের, ভারকেন্দ্র ঠিক মধ্যস্থলেই হইবে।



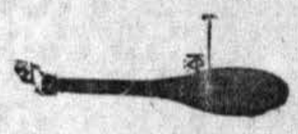
চতুর্থ চিত্র।

এক্ষণে ঐ মধ্যস্থলে 'গ' চিহ্নিত স্থলে একটি ছিদ্র করিয়া বা যে কোন উপায়ে কোন কিছুদ্বারা ঝুলাইলে ঐ দণ্ড ঠিক সরল ভাবেই শূন্যে ঝুলিয়া থাকিবে। এখন ঐ দণ্ডের উভয় পার্শ্বের একদিকে কোন দ্রব্য ঝুলাইয়া দিলে, অপর দিকে তাহার তুল্য ভার না দেওয়া পর্য্যন্ত আর ঐ দণ্ড সমান হইবে না।

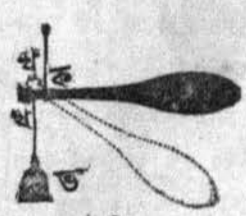
এই সূত্র অবলম্বনেই দেশী সামান্য দাড়ি পাল্লা হইতে ঔষধ ওজনের বিলাতি অতি উৎকৃষ্ট নিক্তি পর্য্যন্ত, সমস্ত নির্ম্মিত হইতেছে। উহার মধ্যস্থ কাঁটা, খিল প্রভৃতি সকলই ওজন কার্য্য নির্ভুল করিবার জন্যই নির্ম্মিত। দেশী তুলা যন্ত্র (দাড়ি পাল্লা) সকল সময়ে ঠিক পাওয়া যায় না, কারণ দণ্ডের উভয় দিক সমান মাপ হইলেও কাষ্ঠের স্থূলতা সারত্ব প্রভৃতির ব্যতিক্রম, বা তুলাধার ও তাহার দড়ির সরু মোটা ও কমি বেশীর জন্য একদিকের অপেক্ষা অপর দিকের ভার অধিক হইতে দেখা যায়, এরূপ অবস্থায় যত দ্রব্য ওজন করিতে হইবে, তাহার অর্দ্ধেক একদিকের পাল্লায় ওজন করিয়া, অপর অর্দ্ধেক অন্য দিকের পাল্লায় ওজন করিলেই নির্ভুল হইয়া থাকে। অন্য দ্রব্যের দ্বারা তুলাযন্ত্র সমান করিয়া লইলেও চলে।

অনেকেই দেখিয়াছেন, পুরাণ কাগজ ক্রয়কারী ও পাটওয়ালা প্রভৃতি এক প্রকার তুলাযন্ত্র ব্যবহার করে, উহা তুলা বা তুল নামে পরিচিত। উহা দ্বারা যে নিয়মে ওজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

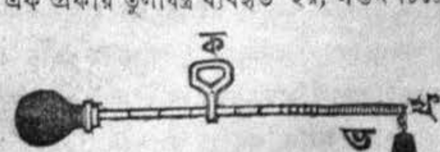
ভারকেন্দ্র নির্ণীত হইলে, সেই স্থানে কোন প্রকার সূত্রাদির দ্বারা ঝুলাইলে দণ্ডটি সরল ভাবে থাকে, কিন্তু তাহা হইতে অন্য পার্শ্বে সেই সূত্রটি সরাইলে, আর উহা সমান ভাবে থাকে না। পঞ্চম চিত্রে অঙ্কিত তুলটির 'ক' চিহ্নিত স্থানে ভারকেন্দ্র, অতএব ঐ স্থানে কোন সূত্র বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলে ঐ তুলটি সরল ভাবে থাকিবে, কিন্তু ঐ সূত্রটি যতই (খ) প্রান্তের দিকে সরান যাইবে, তুলটির মোটা পার্শ্বটি অপর দিকে ততই ঝুলিয়া পড়িবে। কিন্তু 'খ' চিহ্নিত প্রান্তে ভার প্রয়োগ করিয়া তুলটিকে পুনরায় সমান করা যাইতে পারে (ষষ্ঠ চিত্র দেখ)। 'ক' চিহ্নিত সূত্রটি 'খ' প্রান্ত হইতে যত দূরে থাকিবে, 'খ' প্রান্তে তত অল্প ভার দিয়া তুলটি সমান করা যাইতে পারিবে। তুলের 'খ' প্রান্তে কত ভার দিলে, কোন্ থানে 'ক' সূত্র বাঁধিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন ভার দিয়া তাহা নির্ণয় করিয়া দাগ দিয়া রাখিলেই তুলের দ্বারা ওজন চলিতে পারে। দিনামারদের দেশে এই জাতীয় এক প্রকার তুলাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সপ্তম চিত্রে তাহার প্রতিরূপ দেওয়া গেল। এই চিত্রে অঙ্কিত তুলে 'ক' চিহ্নিত কাঁটাটি ধরিয়া ওজন করিতে হইবে, ভার 'ভ' বা দ্রব্য, 'খ'



পঞ্চম চিত্র।



ষষ্ঠ চিত্র।



সপ্তম চিত্র।

প্রান্তের আংটায় ঝুলাইয়া দিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন দাগে ভিন্ন ভিন্ন ওজন। আমাদের দেশে তুলও ঠিক তজ্জাতীয়, তবে এটিতে একটু শিল্পের পারিপাট্য। এই জাতীয় আর এক প্রকার তুলাযন্ত্র আছে, তাহার প্রকার ইহা হইতে অতি অল্প বিভিন্ন। ঐ যন্ত্রের কাঁটাটি একস্থানেই লগ্ন থাকে, দ্রব্যও 'ভ'



অষ্টম চিত্র।

চিহ্নিত স্থানে লগ্ন 'দ' চিহ্নিত পালা বা বাটির মধ্যে রাখিয়া 'ও' চিহ্নিত ওজনটি সরাইয়া সরাইয়া ও তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাটখারা দিয়া ওজন করা হয় (অষ্টম চিত্র)। রেলওয়ে ষ্টেসনে দ্রব্যাদি ওজন করিবার জন্য সচরাচর যে তুলাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাও এই জাতীয়, তবে উহা আকারে বড়, এই মাত্র।

স্প্রিংএর তুলাযন্ত্র অনেক প্রকার আছে, কিন্তু তাহার উল্লেখ এখন করিব না। প্রথম জাতীয় দণ্ডের প্রয়োগ ইহা হইতেই বুঝা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার দণ্ড।

পূর্ব্বে তিনপ্রকার দণ্ডের কথা বলা হইয়াছে। এতক্ষণ প্রথমবিধ দণ্ডের প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয় বিধ দণ্ডের প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে।

দ্বিতীয়বিধ দণ্ড দ্বারা, যে দিকে ভার বা পদার্থ, সেই দিকেই বল প্রযুক্ত। প্রথম প্রকার দণ্ড দ্বারা, বল প্রয়োগ প্রকার বুঝাইবার সময় যেরূপ চিত্র দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছিল, এবারও সেইরূপ চেষ্টা করা যাইতেছে। নবম চিত্রে 'ব' ব্যক্তি 'দ' দণ্ড দ্বারা 'প' পদার্থটি বল প্রয়োগ করিয়া সরাইতেছে। পূর্ব্বটিতে বল নিম্ন দিকে অর্থাৎ পদার্থ যে দিকে আছে,



নবম চিত্র।

তাহার বিপরীত দিকে প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু এটিতে বল ঊর্দ্ধ দিকে অর্থাৎ পদার্থটি যে দিকে আছে, সেই দিকে প্রযুক্ত হইতেছে। জাঁতী প্রভৃতি এই যাতীয় দণ্ডের প্রয়োগ।

তৃতীয় বিধ দণ্ডের এক দিকে ভার ও অপর দিকে Fulcrum থাকে। এই জাতীয় দণ্ডের কথা বুঝিতে হইলে, খুব বড় বাঁশ এক ব্যক্তি কিরূপে সোজা করে, তাহা লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মনে কর, যে বাঁশটিকে তুলিতে হইবে, তাহার মাথার দিকে কত ভার,



দশম চিত্র।

সেটিকে তুলিতে হইলে, তাহার অপর প্রান্ত (মোটাদিক) একটা কিছুতে আটকাইয়া ঠেলিলেই সোজা হইয়া উঠিবে। এখানে ঐ আটকান ভাগটিই Fulcrum এর কার্য্য করিল।

মনুষ্যের হস্তই এই জাতীয় দণ্ডের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সেই বিষয় কিছু বলিয়া আমরা ভবিষ্যতে দণ্ডের অন্যান্য প্রয়োগ ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

মহাভারত। *

উপমন্যু উপাখ্যান।

আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে এক শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরু কর্ত্তৃক গোচারণে নিযুক্ত হইয়া, অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। গুরু তাহাকে ভিক্ষান্ন, দুগ্ধ ও দুগ্ধফেন ভক্ষণে নিষেধ করিলে—

"উপমন্যু শিরে ধ'রি গুরুর বারণ।
কোন মতে নাহি করে ভিক্ষান্ন ভোজন॥
ভিক্ষায় দ্বিতীয় বার কোথাও না যায়।
ধেনু দুগ্ধ, দুগ্ধ ফেন তাহাও না খায়॥
এক দিন উপমন্যু অরণ্য ভিতর।
গোচারণ কালে হৈল ক্ষুধায় কাতর॥
ক্ষুধার জ্বালার তরে কিবা আর করে।
আকন্দের পাতা খায় ক্ষুধানাশ তরে॥
ক্ষার তিক্ত কটু রুক্ষ অতি গুরু পাকে।
হেন পত্র খেয়ে শিষ্য পড়িল বিপাকে॥
চক্ষুদোষ জনমিল, বিষম বিভ্রাট।
অন্ধ হৈল আঁখি বন্ধ দৃষ্টির কপাট॥
উপমন্যু অন্ধ হ'য়ে ঘূরে চারি ধারে।
ঘূরিতে ঘূরিতে পড়ে কূপের মাঝারে॥
"ক্রমে ক্রমে দিন গেল, রবি অস্তাচলে।
উপাধ্যায় শিষ্যগণে কাছে ডেকে বলে॥
'শুন শুন, শিষ্যগণ! সন্ধ্যা হ'য়ে গেলো।
তবু কেন উপমন্যু ফিরে নাহি এলো?॥'
শিষ্যগণ কহে,—'প্রভু! গোচারণ তরে।
পাঠা'য়েছ তা'রে তুমি অরণ্য-ভিতরে॥'
শিষ্যগণে উপাধ্যায় কহিলা তখন।—
'আহার করিতে তা'রে ক'রেছি বারণ॥
বোধ হয়, উপমন্যু রুষ্ট সে কারণ।
তেঁই সে এখনো নাহি করে আগমন॥
এবে মোর বাক্য সবে করহ শ্রবণ।
সবে মিলে চল তা'রে করি অন্বেষণ॥'
'চলিলা আয়োদধৌম্য শিষ্য সনে বনে।
'বৎস্য উপমন্যু কোথা?' ডাকিলা সঘনে॥
গুরুকণ্ঠ উপমন্যু বুঝিতে পারিয়া।
উচ্চ্যরবে বলে—'কূপে গিয়াছি পড়িয়া॥',
উপাধ্যায় গিয়া সেথা কহিলা তাহারে।—
'কিরূপে পড়িলে তুমি কূপের মাঝারে॥'?
উপমন্যু কহে,—'প্রভু! করহ শ্রবণ।
আকন্দের পাতা খেয়ে অন্ধ দু'নয়ন॥
অন্ধ আঁখি, নাহি দেখি, সবি অন্ধকার।
ঘূরিতে ঘূরিতে পড়ি কূপের মাঝার॥"
উপাধ্যায় কহে,—'বৎস! করহ শ্রবণ।
দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই জন॥
সে দোঁহার স্তব কর বেদ মন্ত্র যোগে।
চক্ষুলাভ হ'বে, দুঃখ না পা'বে এ রোগে॥'
উপমন্যু গুরুর আদেশ-অনুসারে।
বেদমন্ত্রে স্তবে দুই অশ্বিনীকুমারে॥—
'অশ্বিনীকুমারদ্বয়! দুই জনে মিলে।
সৃষ্টির আরম্ভ কালে বিদ্যমান ছিলে॥

* * * *

---

* কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক পদ্যে অনুবাদিত হইয়া মহাভারত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। রাজকৃষ্ণ বাবুর লেখার পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কিছুই নাই। মহাভারতের অনুবাদ কিরূপ হইতেছে, তাহা উপমন্যু উপাখ্যানে উদ্ধৃত পদ্যাংশ দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। অনুবাদক দুই বৎসরে সমগ্র মহভারতের পদ্যানুবাদ অগ্রিমদাতা গ্রাহকদিগকে ৪॥০ টাকা মূল্যে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার সদভিলাষ পূর্ণ হইলেই আমরা সুখী হইব।—(শি সং,)

আঁখির অন্ধতা এবে করিয়া মোচন।
দয়া করি' এ অন্ধের বাঁচাও জীবন॥
"উপমন্যু শিষ্যের এ হেন স্তব শুনি,।
অশ্বিনীসুতেরা তথা আইলা তখনি॥
কহিলেন,—'উপমন্যু! করহ শ্রবণ।
তোমা' প্রতি প্রসন্ন হইনু দুইজন॥
এ হেতু তোমার করে করিনু অর্পণ।
একটি পিষ্টক, তুমি করহ ভক্ষণ॥'
এরূপ শুনিয়া তবে উপমন্যু কয়।—
'তোমাদের বাক্য অবহেলনের নয়॥
কিন্তু আমি গুরুরে না করি নিবেদন।
করিতে না পারি এই পিষ্টক ভক্ষণ॥'
অশ্বিনী তনয়দ্বয় উপমন্যু প্রতি।
কহিলেন ধীরে ধীরে এই সে ভারতী॥—
'পূর্ব্বে সে আয়োদধৌম্য আচার্য্য তোমার।
করিয়াছিলেন স্তব আমা' দোঁহাকার॥
আমরা তাঁহার প্রতি হ'য়ে তুষ্ট-মন।
এইরূপ এক পিঠা করিনু অর্পণ॥
গুরুর আদেশ কিন্তু না লইয়া তিনি।
খাইলেন সেই পিঠা তাহা মোরা জানি॥
আচার্য্য তোমার কৈলা যেই আচরণ।
তুমিও সেরূপে কর পিষ্টক ভক্ষণ॥'
উপমন্যু কহে,—'দেব! করি অনুনয়।
গুরুরে না দিয়া পিঠা না খাব নিশ্চয়॥'
অশ্বিনী কুমারদ্বয় কহেন তখন।—
'গুরুভক্তি তোমার নহেকো সাধারণ॥
গুরুভক্তি হেরি তব আমরা উভয়।
হইলাম অতিশয় সন্তুষ্ট-হৃদয়॥
তোমার গুরুর দন্তগুলি লৌহময়।
তব দন্ত স্বর্ণময় হইবে নিশ্চয়॥
তা' ছাড়া হারানো চক্ষু পুন ফিরি' পা'বে।
সক্ষম হইবে তুমি সদা শুভলাভে॥'
"উপমন্যু দেব-বরে লভি' চক্ষু-মণি।
হৃষ্ট-চিতে গেলা গুরু গোচরে তখনি॥
গুরু-পদে উপমন্যু প্রণিপাত করি'।
আদ্যোপান্ত সব কথা কহিল বিবরি'॥
তুষ্ট হ'য়ে গুরু বলে,—'অশ্বিনীতনয়।
যা' বলিলা, সেই শুভ লভিবে নিশ্চয়॥
সর্ব্ববেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, শুন বাছাধন!।
স্মৃতিপথে র'বে তব সদা জাগরণ॥"

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মভাব।

আজ কাল সাধারণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছে, কেমন একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে, বিজ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ধর্ম্মভাব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা মনে করেন, বিজ্ঞান আর ধর্ম্ম পরস্পর এমনই বিরোধী,—তাহাদের মধ্যে এমনই মজ্জাগত প্রভেদ যে, যাহা একের অবলম্বন অপরের তাহা ত্যজ্য, যাহা একের প্রাণ—অপরের তাহাই সর্ব্বনাশ। বিজ্ঞান পড়িলে আর ঠাকুর দেবতাদিগকে মানিতে নাই, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করিতে নাই, আর সেই সকলের মূলীভূত কারণ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিতে নাই। বিজ্ঞানের কাছে ধর্ম্মের আসন বড় নিচু। বিজ্ঞানের সমক্ষে ধর্ম্মকে মাথা হেঁট করিয়া দাড়াইতে হয়। এবং আর কিছুদিন বিজ্ঞানের এইরূপ চর্চ্চা হইতে চলিলে সমাজ হইতে ধর্ম্মভাব একেবারেই লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

সাধারণের এইরূপ ধারণা—এইরূপ বিশ্বাস—ভ্রান্তিসংকুল হইলেও ইহার অভ্যন্তরে সেই ভ্রমের যে একটা গূঢ় কারণ আছে, তাহা অবশ্যই মানিতে হইবে। কোন ধারণা—কোন বিশ্বাস একদিনে জন্মায় না—জন্মাইতে পারে না।



উপমন্যুর গুরু ভক্তি।

একটা বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে, ঘটনারাশির মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ নিয়ম আছে কি না দেখিতে হয়। কিন্তু সমাজে ঘটনারাশি যেরূপ দ্রুতভাবে সাগরোর্ম্মির মত সম্মুখ দিয়া যাইতেছে ও আসিতেছে, তাহাতে এক দিনে তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থির করা বড়ই দুরূহ।

ভাল করিয়া বিবেচনা না করিয়া, ভাল করিয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, যা হউক একটা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করায় প্রকৃত কার্য্যকারণ নিয়ম স্থির হয় না। বাত্যা-তাড়িত তৃণরাশি একটীর পর আর একটী উড়িয়া যাইতেছে বলিয়া একটীই অপরটীর কারণ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। এই জন্য একটা ধারণা, একটা বিশ্বাস জন্মাইতে কিছু সময়ের আবশ্যক করে। যে বিশ্বাসের মূলে ভাবনা নাই—চিন্তা নাই, সে বিশ্বাস প্রায়ই ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কতকটা এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন।

বিশ্বাস জন্মাইতে আর একটী জিনিষ চাই। বিশ্বাসের একটী মূল ভিত্তি চাই। কেবল শূন্যে কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। সকলেরই যাই হউক একটা আশ্রয় চাই—একটা অবলম্বন চাই। বনিয়াদ না তুলিয়া বাড়ী প্রস্তুত করা যায় না। বীজটী না থাকিলে গাছটী জন্মিতে পারে না।

আবার বীজটী ভাল না হইলে, যেমন গাছটী ভাল রকম হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে না, অল্প স্বল্প ফল ফুল ফুটাইয়া শীঘ্রই মারা যায় অথবা বনিয়াদ পল্‌কা হইলে যেমন বাড়ীটী বড় অধিক দিন টেঁকে না, একটা বড় গোছের ঝড় বৃষ্টিতে ধাক্কা খাইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ কোন বিশ্বাসের মূলভিত্তি ভাল রকম মজবুত না হইলে, সে বিশ্বাসও অধিক দিবস টেকিতে পারে না। বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আছে বলিয়া যাঁহারা বিজ্ঞান শিক্ষার বিরোধী অথবা যাঁহারা বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া ধর্ম্মের বা ধর্ম্মভাবের প্রয়োজনীয় বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহবান, ইহাঁরা উভয়েই ভ্রান্তমতের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরে পরস্পরের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন।

নদী যেমন যে পথ দিয়া যাউক না কেন, শেষে সাগরে গিয়া মিলিবেই মিলিবে, সাগর ছাড়া নদীর আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ; ধর্ম্ম যে দিক দিয়া যাউক, বিজ্ঞানে মিলিবে, বিজ্ঞান যে দিক দিয়া যাউক না কেন, ধর্ম্মের সহিত মিলিবে। বিজ্ঞান আর ধর্ম্ম, উভয়ের একই স্বার্থ—একই উদ্দেশ্য—এক দিকেই উভয়ের গতি।

যদি তাই হয়, তাহা হইলে কেন লোকে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে বিরোধ আছে বলিয়া একটা রটনা করিয়া ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের উভয়েরই অবমাননা করে? ব্যাপারটা অতি সহজ—ইহার কারণ খুজিতে বড় অধিক দূর যাইতে হইবে না। আজি কালি বিজ্ঞানশিক্ষার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা বড় সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন, তাহার বিস্তৃতি নাই—গভীরতা নাই—তাহা একদেশী। ক্ষুদ্র ডোবার মত তাহার চারিদিকেই চড়া, নৌকা ভাসাইলেই চড়ায় ঠেকিয়া ফুটা হইয়া ডুবিয়া যায়। বিজ্ঞান শিক্ষার্থী যুবকেরা বিজ্ঞানের দুই চারি পাতা পড়িয়া সে সঙ্কীর্ণভাব আর ছাড়িতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, যাঁহাকে প্রবীণেরা দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন, তাহা সামান্য জড় পদার্থ মাত্র, জড় পদার্থের পূজা করা বাতুলের কাজ। তাঁহারা মনে করেন, প্রাচীনেরা যাহা ভৌতিক বা দৈব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, বা বিবেচনা করিতেন, তাহা বিজ্ঞানবলে অন্যরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। দৈব বা ভৌতিকের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহারা মনে করেন, সংসারে যাহা ঘটিতেছে, সবই স্বভাবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে। দেবতা বা ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কি—তাহাদের অস্তিত্বেরই বা আবশ্যক কি?

এই একদেশী ও সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন বিজ্ঞানশিক্ষার প্রভাবেই অনেকেই ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া, সাধারণে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ ভাব আছে বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু এ কল্পনার ভিত্তিটী—মূলটা বড় মজবুত নয়। এক জন হিন্দুকে সুরাপান করিতে দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করা যে ভ্রম, সেইরূপ দুই চারি জন বা দশ জন বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীকে ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ দেখিয়া ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ আছে বলিয়া স্থির করায়ও সেই ভ্রম।

বিজ্ঞান ভাঙ্গিতে পারে, গড়িতেও পারে। কিন্তু ভাঙ্গা কাজটা বড়ই সহজ। একটী মূর্ত্তি এক ঘা লাঠি মারিলেই ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে বড় বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক করে না। কিন্তু মূর্ত্তিটী গড়িবার সময়ই সর্ব্বনাশ। তাহাতে বিদ্যা আবশ্যক, বুদ্ধি আবশ্যক, শিক্ষা আবশ্যক। এখনকার বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা ভাঙ্গিতে মজবুত, কিন্তু গড়িতে পারেন না। এই জন্যই আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষাকে আমরা একদেশী শিক্ষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। আমরা ভাঙ্গার নিন্দা করিতেছি না। সংসারে ভাঙ্গা ও গড়া দুইয়েরই প্রয়োজন। কেবল

ভাঙ্গিলেই কাজ হয় না, কেবল গড়িলেও কাজ হয় না। দুইয়ের সমাবেশ চাই—দুইয়ের মিলন চাই।

যাহা মন্দ, তাহা ভাঙ্গ, আর তাই ভাঙ্গিয়া ভাল জিনিষ প্রস্তুত কর, তাহা হইলেই উন্নতি, তাহা হইলেই মঙ্গল। তা না করিয়া, যদি চক্ষু মুদিয়া ভাল মন্দ কিছুই না বাছিয়া সব ভাঙ্গিতে যাও, অথচ কিছুই ভাল গড়িতে না পার, তাহা হইলে সমূহ বিপদ ও অনর্থের সম্ভাবনা।

আজকালকার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা কিছুই বিচার না করিয়া ভাল মন্দ সব ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অথচ গড়িবার বেলা অকর্ম্মণ্য। তাঁহারা হিন্দুদিগের পবিত্র আচার ব্যবহার রীতি নীতি, সব ছাই ভস্ম বলিয়া ত্যাগ করিতেছেন, অথচ তাহার পরিবর্ত্তে কিছুই ভাল দাঁড় করাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা দেব দেবী ভাঙ্গিতে চাহেন, তাঁহারা জাতিভেদ ভাঙ্গিতে চাহেন, তাঁহারা আমাদের পূজা পার্ব্ব ভাঙ্গিতে চাহেন, কিন্তু এসব ভাঙ্গিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখেন না এবং এসব ভাঙ্গিয়া কি যে গড়িবেন, তাহাও তাঁহারা খুজিয়া পান না।

বিজ্ঞানে বাস্তবিক অনেক জিনিষ ভাঙ্গে ও অনেক জিনিষ গড়ে। ছেলেবেলা মাকড়সার জাল দেখিয়া হয়ত গ্রাহ্য করিতাম না, কিন্তু, এখন সেই জাল দেখিয়া কত আনন্দ হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিদ্যা বুদ্ধি বাড়ে অমনি প্রত্যেক পদার্থেই অধিকতর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই—একটা বিশ্বব্যাপী নিয়ম দেখিতে পাই ও তাহাতে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার এক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হই। বিজ্ঞান না থাকিলে, সে সৌন্দর্য্য, সে নিয়ম দেখিতে পাইতাম না। জীবতত্ত্ববিৎ না হইলে, এক বিন্দুবীজের যে কত মাহাত্ম্য তাহা কে বুঝিত? বিজ্ঞান না থাকিলে, পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি কে বুঝিত? কে এই নক্ষত্র, ছায়াপথ, ধূমকেতু প্রভৃতি নভোমণ্ডলের অনির্ব্বচনীয় শোভা ও সৌন্দর্য্য, গভীরতা ও অসীমতা অনুভব করিতে পারিত? এখন জিজ্ঞাসা করি যে, এই সকল দেখিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়া—এই সকল শোভা ও সৌন্দর্য্য গভীরতা ও অসীমতা অনুভব করিয়া, যে মহাশক্তি বলে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে ও চলিতেছে ও যাঁহার প্রভাবে এ সকল শোভা ও সৌন্দর্য্য বিরাজমান, তাঁহার প্রতি ভক্তি বাড়ে না কমে? তাই বলি বিজ্ঞান ধর্ম্মের বিরোধী নয়—বিজ্ঞান ধর্ম্মকে নষ্ট করিতে চায় না, বিজ্ঞান ধর্ম্মকে রাখিতে চায় ও ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইতে চায়। বিজ্ঞান ভাঙ্গে ও গড়ে আগেই বলিয়াছি। শৈশবে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া ধরিবার জন্য আহ্লাদে হাত বাড়াইতাম, বিজ্ঞান সে অর্থহীন শুষ্ক আহ্লাদকে নষ্ট করে—এইখানে বিজ্ঞান ভাঙ্গে। কিন্তু সে আহ্লাদকে নষ্ট করিয়া যখন বিজ্ঞান চন্দ্রের আকার, চন্দ্রের বিস্তৃতি, শব্দহীন, গন্ধহীন পর্ব্বত পরিপূর্ণ চন্দ্রের অবয়ব, চন্দ্রের গতি, গভীরতা, ও অসীমতার কথা আমাদিগকে শিখাইয়া দেয়, তখন সেই শৈশবের আহ্লাদ অপেক্ষা শতসহস্র গুণ অধিক আনন্দ হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকে এবং সেই অনন্ত মহাশক্তির মহত্ব ও অসীমত্ব ভাবিতে ভাবিতে মুগ্ধ হইয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়া পড়ি। এই খানে বিজ্ঞান গড়ে। শৈশবের আনন্দকে নষ্ট করিয়া আর এক প্রকার আনন্দে হৃদয়কে মজাইয়া তুলে। তাই আবার জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে সকলের আধার সেই মহাশক্তির প্রতি ভক্তি বাড়ে না কমে?

আবার অন্যপথ দিয়া দেখিতে গেলে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের একই স্বার্থ—একই উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা আকর্ষণী, তাড়িৎ প্রভৃতি শক্তি সমূহের মূলে যে এক মহাশক্তি আছে, তাহারই আবিষ্কারের জন্য মাথা খুঁড়িতেছেন। ধর্ম্মও বলে সবই এক মহাশক্তি-সমুদ্ভূত। ধর্ম্ম সেই মহাশক্তির ধ্যান করে, সকলের মূলীভূত কারণ বলিয়া তাঁহার পূজা করে ও তাঁহার চিন্তায় মুগ্ধ হইয়া মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়। বিজ্ঞানের মতেও তাই। ফুল চন্দন না দিলে যে পূজা হয় না, এ কথাই নয়। যদি এক মনে সেই মহাশক্তির বিষয় ভাব, যদি সব জিনিষ সেই মহাশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেই সেই মহাশক্তির ধ্যান হইল—তাহার পূজা করা হইল। তাই বলি, বিজ্ঞানও সেই মহাশক্তির জন্য লালায়িত—ধর্ম্মও সেই মহাশক্তির জন্য লালায়িত। তবে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের একই স্বার্থ—একই উদ্দেশ্য, একথা কেন না বলি? কেন ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে বিরোধ ভাবে কল্পনা করি ও উভয়কে পরস্পরের শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিই।

তবে একটা কথা আছে। বিজ্ঞানবিৎ, তুমি হয়ত বলিবে, তোমার মহাশক্তি নির্গুণ। কিন্তু বল দেখি, নির্গুণ কেমন করিয়া বুঝিব। আমি নিজে সগুণ হইয়া কেমন করিয়া নির্গুণকে কল্পনার ভিতর আনিব? সে মহাশক্তির স্বরূপ কি, তাহা তুমিও জাননা—আমিও জানিনা। নিরপেক্ষ ভাবে সংসারের কোন জিনিষই জানিবার উপায় নাই। এই জন্যই অনেকটা স্পেন্সর সেই মহাশক্তিকে অজ্ঞাত (The unknowable) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক, প্রকৃত পক্ষে সে শক্তি যে কি? নিরপেক্ষ ভাবে তাহা আমরা কখন জানিতে পারিব কি না, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। তবে



লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, সে মহাশক্তির যে টুকু জানিতে পারিব, তাহা সগুণ ভাবেই জানিব, কেন না আমরা নিজে সগুণ। সগুণ হইয়া কেহ কখন নির্গুণ কল্পনা করিতে পারে না।

কিন্তু সেই মহাশক্তি হইতে যে সমস্ত পদার্থই সমুদ্ভূত, আর আমরা সর্ব্বক্ষণই যে সেই মহাশক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছি, এ বিষয়ে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মাঝে মতদ্বৈধ নাই *। দুইই পরস্পরের সাহায্যকারী—দুইই পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। দুইই সেই এক মহাশক্তির উদ্দেশে ধাবমান। দুইয়ের সেই একই স্বার্থ—একই উদ্দেশ্য। আমরা সেই মহাশক্তির উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম করি।

শ্রীমনিলাল শেঠ।

* "But amid the mysteries, which become the more mysterious, the more they are thought about, there will remain the one absolute certainty, that he is even in the presence of an Infinite and Eternal Energy, from which all things proceed."

H. Spencer.

কলিকাতার ইতিহাস।

(১০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

দশম অধ্যায়।

বটরওয়ার্থ বেলী—লর্ড উইলিয়ম কাবেন্দিস্ বেণ্টিঙ্ক—ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসাইটি—দ্বারকা নাথ ঠাকুর—বেণ্টিঙ্কের ভারত্যাগ।

লর্ড আমহার্ষ্টের ভারতত্যাগের পর বেলী সাহেব চারি মাস কাল গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। খ্রীঃ ১৮২৮ অব্দের জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম, কাবেন্দিস্ বেন্টিঙ্ক ভারতের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিয়া প্রায় সাত বৎসর কাল ভারতবর্ষ শাসন করেন, ইহাঁর সময়ে ভারতবর্ষের অনেক উন্নতি হয়। কলিকাতাতেও অনেক উন্নতিকর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

ইহাঁর সময়ে—

(১) রাজ্য সম্পর্কীয় নানা প্রকার উন্নতি সাধন,

(২) সতীদাহ প্রথা নিবারণ,

(৩) ঠগদিগের শাসন,

(৪) ইউরোপীয় প্রণালীতে বিদ্যা শিক্ষাদান প্রণালী স্থাপন প্রভৃতি আরম্ভ হয়।

এই সময়ে স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ ঠাকুর প্রাদুর্ভূত হন। স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ও এই সময়েই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার অবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী রাম গোপাল ঘোষ এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় বাগ্মীতার বলে অনেক সৎ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মহাত্মা হেয়ার প্রভৃতি এই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন। ফলতঃ যে সময়ে যে দেশের উন্নতির সূত্রপাত হয়, সে সময় এইরূপ মণিকাঞ্চন যোগই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এসকল কথা সংক্ষেপে সারিলে কলিকাতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে, এজন্য একটু বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়েই ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসাইটি স্থাপিত হয় (১৮৩০)। খ্রীঃ ১৮৩৮অব্দে দ্বারকা নাথ ঠাকুর মহোদয়, দরিদ্র অন্ধদিগের সাহায্যের জন্য এই সভার হস্তে অনেক অর্থ দান করেন।

দ্বারকা নাথ যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। খ্রীঃ ১৭৯৪ অব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষ জয়রাম ঠাকুর প্রথমে কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়া সুতানুটীতে বাস করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের দুইজন হইতে কলিকাতার ঠাকুরদিগের দুই গোষ্ঠী হয়। দ্বারকা নাথ সেই দুইজনের অন্যতর নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র। ইহাঁর জ্যেষ্ঠতাত ইহাঁকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বারকা নাথ বাল্যকালে, পাঠশালে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া সেরবোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে রেবরেণ্ড উইলিয়ম আদম (Rev. William Adams) গর্ডন (Mr. J. G. Gordon) ও কালড (James Calder)

সাহেবের নিকট তাহার বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয়। অল্প বয়সে (রাজা) রামমোহন রায়ের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। প্রথম বয়সে হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপের প্রতি ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল, কিন্তু রামমোহনের সহবাসে তাহার সে সকলের প্রতি কতকটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল—ইহাই ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ। কিন্তু সে সকল কথা স্থানান্তরে উল্লিখিত হইবে। ইংরাজী বাঙ্গালা ব্যতীত তিনি আরব্য ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তদ্ব্যতীত জমিদারী কার্য্যেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। যখন তাঁহাকে জমিদারী কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল, সেই সময় হইতে তিনি ফর্গুসান (Mr. Cutler Fergusson) নামক বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের নিকট আইন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; এই সময় হইতে তিনি বঙ্গদেশের অনেক জমিদারের আইন বিষয়ে পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি বিলাতে নীল ও রেশম চালান দিতেন, এই সময়ে চব্বিশ পরগণায় নিমকের এজেন্ট ও কলেক্টর প্লৌডেন সাহেবের দেওয়ানের পদ শূন্য হওয়াতে দ্বারকা নাথ সেই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বোর্ডের দেওয়ান হন। কিছুদিন পরে তিনি ঐ সমুদায় সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং (Messrs. Carr, Tagore and Co.) নামে এক কুঠি স্থাপন করেন। তাঁহার এরূপ স্বাধীনভাবে ব্যবসার কথা শুনিয়া গবর্ণরজেনেরল বেণ্টিঙ্ক সাহেব তাঁহার অনেক প্রশংসা করেন। এতদ্ব্যতীত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ইনি নীল রেশম পাথুরিয়া কয়লা এবং চিনির ব্যবসা করিয়াছিলেন এবং পৈতৃক জমিদারিতে রাজসাহীর কালীগ্রাম, পাবনার সাহাজাদপুর, রংপুরের স্বরূপপুর, মণ্ডলঘাট পরগণার ৮/০ আনা অংশ, দ্বারবাসিনীর জগদীশপুর, যশোহরের মহম্মদ শাহী, কটকের সোরগাং। প্রভৃতি যোগ করিয়াছিলেন। তিনি দেশের উন্নতির জন্য অনেক করিয়াছিলেন, শিক্ষা সংক্রান্ত বা দাতব্য বিষয়ে যে কোন সভা সমিতি হইত, তাহাতেই তিনি যোগ দিতেন। স্বীয় সহচরগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি, যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবেক সন্দেহ নাই। হিন্দুকালেজ, মেডিকেল কালেজ, সহমরণ নিবারণ, মুদ্রণ স্বাধীনতা প্রভৃতিতে আমরা দ্বারকানাথ প্রভৃতির হস্ত দেখিতে পাই। তিনি ডেবিড হেয়ার ও এচ্ এচ্ উইলসন সাহেবের কার্য্যক্ষেত্রের প্রধান সহচর ছিলেন এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণকে তিন বৎসরের পারিতোষিক দান জন্য দুই সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। জমিদারদিগের সভাও তাহার একটি কীর্ত্তি।

খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

কলিকাতার উন্নতি কল্পে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকলের সহায়তার তিনি যে যে কার্য্যে যেরূপ যোগ দিয়াছিলেন, সে সকল কথা যথা স্থানে উল্লিখিত হইবে।

এই অব্দেই (১৮৩৫) বেণ্টিঙ্ক ভারতত্যাগ করেন, তাঁহার সময়ে কলিকাতার যেরূপ উন্নতির সময়, তাহা স্বতন্ত্ররূপে সমালোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই জন্য তাহা এ অধ্যায়ে বিবৃত হইল না।

[ক্রমশঃ।]

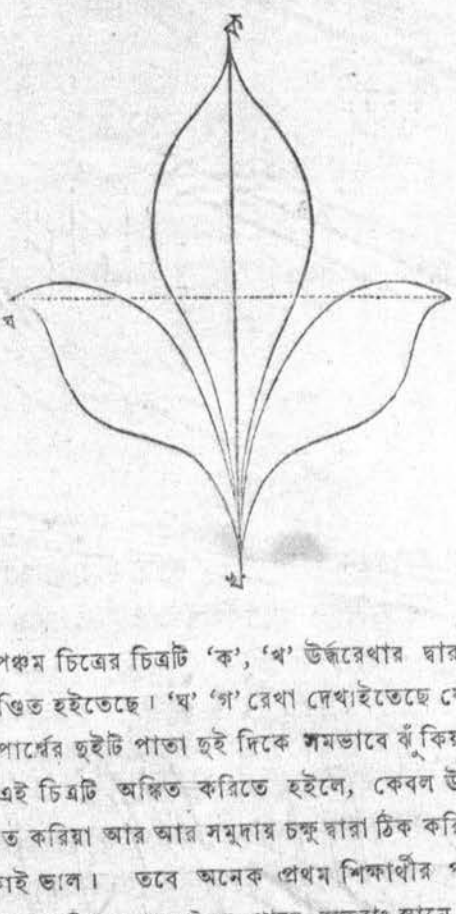


স্বর্গীয় মহাত্মা প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর।

চিত্রবিদ্যা।

(১১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

উভয় পার্শ্বে সমাকার আকার (Symmetrical forms) অঙ্কনে সুবিধা এই যে, ঐরূপ চিত্র মধ্যস্থল দিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, দুই দিকেই সমান হয়, তবে উভয় দিকের অংশ পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে।



পঞ্চম চিত্র।

পঞ্চম চিত্রের চিত্রটি 'ক', 'খ' উর্দ্ধরেখার দ্বারা সমভাবে দ্বিখণ্ডিত হইতেছে। 'ঘ' 'গ' রেখা দেখাইতেছে যে,ঐ চিত্রের দুই পার্শ্বের দুইটি পাতা দুই দিকে সমভাবে ঝুঁকিয়া আছে।

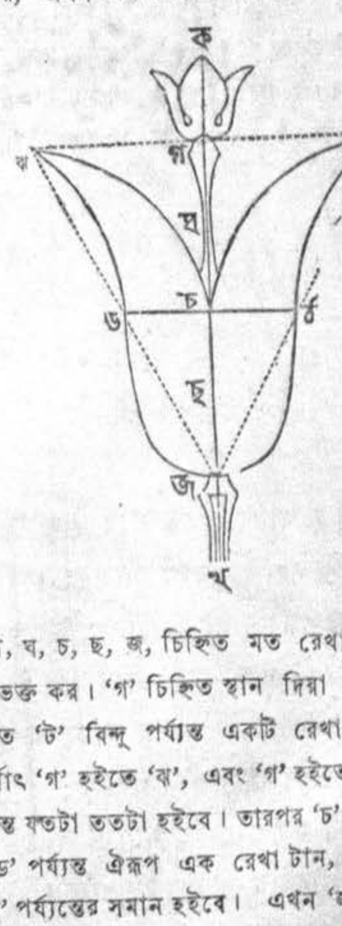
এই চিত্রটি অঙ্কিত করিতে হইলে, কেবল উর্দ্ধ রেখাটি অঙ্কিত করিয়া আর আর সমুদায় চক্ষু দ্বারা ঠিক করিয়া মাপিয়া আঁকাই ভাল। তবে অনেক প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহা নিতান্ত কঠিন বোধ হইতে পারে, সুতরাং স্থানে স্থানে মাপ করিয়া লইয়া 'গ', 'ঘ'র মত সমতল রেখা টানিয়া লইলে বিশেষ সুবিধা হইবে।

অঙ্কন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উর্দ্ধদেশ হইতে অতি আল্‌গা দিয়া রেখা টানিবে, এত আল্‌গা যেন তুমি ব্যতীত অন্যে সহজে সেখানে কিছু আছে বলিয়া বুঝিতে না পারে, প্রথমে বামদিকের অর্থাৎ 'গ' চিহ্নিত দিকের অংশ অঙ্কিত করিবে। কিন্তু অগ্রে মধ্যস্থলের পত্রটি অর্থাৎ 'ক' চিহ্নিত পত্রটির উভয় পার্শ্বে আঁকিয়া তবে অপর অংশ আঁকিবে।

আল্‌গা আঁকা হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, ঠিক হইল, কি না? তখন পরিষ্কার করিয়া আঁকিয়া কালির লাইন দিবে।

এক্ষণে দেখান যাইতেছে, কেমন করিয়া একই মাপের ছোট বড় নানা প্রকার চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়।

ষষ্ঠ চিত্রে যেরূপ একটি চিত্র দেওয়া গেল, ঐরূপ একটি ছোট বা বড় চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, প্রথম 'ক', 'খ' উর্দ্ধ রেখাটি অঙ্কিত কর, (তোমার যত বড় ইচ্ছা রেখা অঙ্কিত করিতে পার, প্রথম প্রথম বড় আঁকাই ভাল) রেখাটি অঙ্কিত



ষষ্ঠ চিত্র।

হইলে, গ, ঘ, চ, ছ, জ, চিহ্নিত মত রেখাটিকে সমান ছয় ভাগে বিভক্ত কর। 'গ' চিহ্নিত স্থান দিয়া সমকোণ করিয়া 'ঝ' হইতে 'ট' বিন্দু পর্য্যন্ত একটি রেখা টান, প্রত্যেক দিকে অর্থাৎ 'গ' হইতে 'ঝ', এবং 'গ' হইতে 'ট,' 'গ' হইতে 'চ,' পর্য্যন্ত যতটা ততটা হইবে। তারপর 'চ' বিন্দুর মধ্য দিয়া 'ঠ' ও 'ড' পর্য্যন্ত ঐরূপ এক রেখা টান, উভয় দিকে 'চ' হইতে 'ছ' পর্য্যন্তের সমান হইবে। এখন 'জ' হইতে 'ঝ', ও 'জ' হইতে 'ট', পর্য্যন্ত যোগ করিয়া দাও; তারপর বক্র রেখা গুলি সরল রেখা গুলির যে দিকে যে ভাবে আছে আঁকিয়া ফেল, পরে পরিষ্কার রূপে অঙ্কিত করিয়া কালি দাও এরূপ চিত্র এই রূপেই অঙ্কিত করিতে হয়।

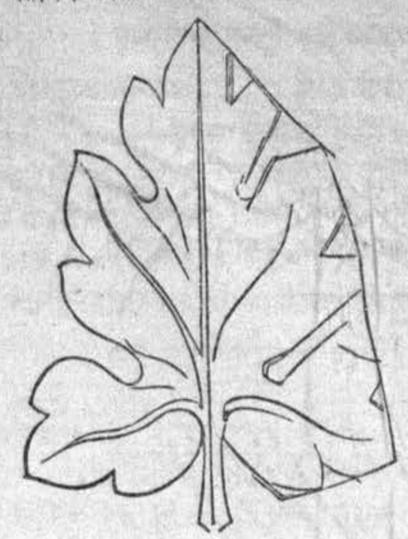
এক্ষণে সীমা চিত্রের কয়েকটি সঙ্কেত প্রদত্ত হইতেছে।

প্রত্যেক চিত্র প্রথমে ব্লক করিতে (Block in) অর্থাৎ মোটামুটি অঙ্কিত করিতে হইবে।

তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন অংশ গুলি পরিষ্কার করিয়া পরিশুদ্ধ রূপে অঙ্কিত করিতে হইবে।

তৎপরে অঙ্কিত অংশ প্রায় পরিষ্কার করিয়া পেনসিল না চাপিয়া এক এক টানে আঁকিয়া কালি দিবে।

কিরূপে ব্লক করিতে হয়, সপ্তম চিত্রের দক্ষিণ দিকের অংশ দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ঐ অংশ পরিশুদ্ধ করিয়া অঙ্কিত হইলে বামদিকের অংশের মতই হইবে। কিন্তু প্রথম আঁকিবার সময় ঐরূপ মোটা মুটি স্থির করা ভাল। কোন দ্রব্য দৃষ্টে আঁকিতে হইলে, এইরূপে আঁকায় কত সুবিধা তাহা পরে বলিব। এক্ষণে শিক্ষার্থীগণকে, উভয়পার্শ্বে সমাকার কতকগুলি আলেখ্য সংগ্রহ করিয়া তদ্দৃষ্টে অঙ্কন অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিয়া অদ্যকার মত এ প্রস্তাব সমাপ্ত



সপ্তম চিত্র।

করিলাম। সীমাচিত্র সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে তাহা আগামী বারে বলিব। (ক্রমশঃ)

ছায়া-চিন্তা।

(জল প্রপাত দর্শনে)

অহো!
কোথায় আইনু আমি! কোথায় দাঁড়ায়ে আছি!
একি দেখি সম্মুখে আমার!
অনন্ত আকাশ কেটে, কে এই উপরে ওঠে,
ভীম—ভীম—মহাভীমাকার!
নির্জ্জন গম্ভীর দেশ, মানবের দুষ্প্রবেশ,
প্রকৃতির গম্ভীর মূরতি;
সে গম্ভীর মূর্ত্তি হ'তে পরতে পরতে স্রোতে
গাম্ভীর্য্যের ছায়ার স্ফূরতি।
যে এই সম্মুখে মোর, তমোময় তনু ঘোর,
ইহা সেই ছায়ার কণিকা;
না জানি প্রকৃতি নিজে কি ঘোর, গম্ভীর কি যে,
বিস্ময়েরো বিস্ময়দায়িকা।

হরিমায়া প্রকৃতির ছায়াময়ী লীলা বই
এ ব্রহ্মাণ্ড আর কিছু নয়;
ছায়ার তপন, চাঁদ, ছায়া-দিগঙ্গনা-বাঁধ
বাঁধিয়াছে ছায়া-দিক্‌চয়।
ছায়ার অনন্ত শূন্য, ছায়া বই নাই অন্য,
গ্রহ তারা ছায়া-শূন্য-কোলে;
মায়া-প্রকৃতির মায়া ছায়া—ছায়া—শুধু ছায়া,
ছায়ায় ছায়ার ধরা দোলে।
ছায়ার ধরায় পুন ছায়া-কণা ভাগে ভাগে
জন্মিয়াছে ছায়াবাজী কত;—
ছায়ার সাগর তুমি, ছায়া কণা তুমি, আমি,
সম্মুখে এ ছায়ার পর্ব্বত।
এই যে গিরির কায় মহাবন শোভা পায়
ছায়া বই আর কিছু নয়;

ছায়ার অসংখ্য শাখী, ছায়ার অসংখ্য পাখী,
ছোট বড় শিলা ছায়াময়।
ওই যে পর্ব্বত হৃদি আপন বিক্রমে ভেদি
জলের প্রপাত বাহিরায়;
উহাও প্রকৃতি-ছায়া, ছায়ার তরল কায়া
মহাবেগে গড়াইয়া যায়।
ছায়ার শিলায় লেগে ছায়ার ভীষণ বেগে
ছায়ার গর্জ্জনে পড়ে জল;
ছায়ার হুঙ্কার ছুটে ছায়ার তরঙ্গ উঠে,
ছায়া-ফেনা ফুটে অবিরল।
অহো, কি অদ্ভুত কথা, ছায়ায় সকলি গাঁথা,
এ ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির ছায়া!
এ পর্ব্বত ছায়া-কণা, এ প্রপাত ছায়া-ফেনা,
কোথা তবে প্রকৃতির কায়া?
যেথা নাই দিবারাতি, যেথায় জ্যোতির জ্যোতি
বিভাতিত কি এক ছটায়;
সে জ্যোতির ছায়া নাই, 'ছায়া নাই' ছায়া তাই,
পুরুষ প্রকৃতি এককায়।
পুরুষের যেই ছায়া, প্রকৃতির সেই কায়া
প্রকৃতির কায়া ছায়া হেথা,
পুরুষ স্বয়ম্ হরি, সৃষ্টি-ইচ্ছা তাঁর নারী
হরি প্রাণে এক সূত্রে গাঁথা।
সে নারী প্রকৃতি নামে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধামে
মায়া-ছায়া করিয়া বিস্তার,
জড়াজড় করে সৃষ্টি, ছায়ার অনন্ত বৃষ্টি
তুমি—আমি—ব্রহ্মাণ্ড অপার।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

কৃষ্ণমোহন প্রায় ষোড়শ বর্ষকাল বিসপ্স্ কলেজে অধ্যাপকতা করেন। এই সময়ে কৃষ্ণমোহনের জীবনের অচিন্তনীয় সংঘটন,—জগতের নিকট তাঁহার উচ্চ সম্মান-লাভ। যে যুবক একদিন পরদ্বারে—পরাশ্রয়ে একমুষ্টি আহারীয় অন্নের ভিক্ষার্থী ছিল, বলিতে হৃদয় বিস্ময়ে চকিত ও আনন্দে উল্লাসিত হয়, যে, আজ সেই যুবককে জগজ্জীব সাদরে সম্ভাষণ করিয়া লইতেছেন; জগতে তিনি আজ অত্যুচ্চ সম্মাননায় সম্মানিত হইতেছেন। বঙ্গগৃহে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সহায়তায় ১৮৫১খৃষ্টাব্দে 'বেথুন সোসাইটি' সংস্থাপিত হয়; এসভা ইতিপূর্ব্বেই কৃষ্ণমোহনকে ক্রমান্বয়ে সভ্য ও সহকারী সভাপতির পদে সম্মানিত করেন। সিপাহি-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) এ সময় আবার "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা" এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে স্ব স্ব সদস্যপদ প্রদান করিতে সম্মান বোধ করিলেন। তা'র পর ক্রমাগত (১৮৬৭ ও ৬৮ খৃষ্টাব্দে) কৃষ্ণমোহন দুইবার "ফ্যাকল্টি অব্ আর্টের" সভাপতি হইলেন। এ পদে তিনি প্রায় তিন বৎসর কাল সম্মানের সহিত কার্য্য করেন। কৃষ্ণমোহন প্রথমতঃ বিসপ্স্ কলেজের তৃতীয় অধ্যাপকপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাঁহার কার্য্যদক্ষতার গুণে তিনি দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইলেন। এ সকল ভিন্নও অগণ্য সভাসমিতি হইতে এ সময় কৃষ্ণমোহন উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার চেষ্টায় এরূপ সম্মান-লাভ কয় জন করিতে পারে?

বিসপ্স্ কলেজে কৃষ্ণমোহন এখন সংসারী। তিনি অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে সামাজিক-তাড়নে সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন; আর বহুদিন পরে পরিবর্ত্তন-চক্রের অনুকূল ঘূর্ণন তাঁহাকে এখন তদপেক্ষা বিস্তৃত সংসারের কর্ণধার করিয়াছে! সংসার-চক্রের গতিই এইরূপ! সহধর্ম্মিণী ও দাস দাসী ভিন্ন কৃষ্ণমোহনের এ সময় চারি কন্যা। ইতিপূর্ব্বে, হেছুয়ার গির্জ্জায় খৃষ্ট-পৌরহিত্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তাঁহার একটি পুত্র সন্তানও জন্মিয়াছিল; কিন্তু অতি শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। কন্যাচতুষ্টয়ের জ্যেষ্ঠার নাম কমলমণি ও মধ্যমার নাম

দৈবকী। ইঁহাদের জন্মস্থানও হেছুয়ার ধর্ম্মালয়। অপর কন্যাদ্বয়ের তৃতীয় কন্যার নাম মনমোহিনী ও চতুর্থ কন্যার নাম মিলি। ইঁহারা এই বিসপস্ কলেজেই জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণমোহনের এই কন্যাগুলি সমধিক লাবণ্যবতী। জ্যেষ্ঠা কমলমণির লাবণ্য-জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর * তাঁহাকে বিবাহ করেন। অপর কন্যাত্রয়ের মধ্যমা দৈবকী সেল সাহেবের, তৃতীয় কন্যা মনমোহিনী প্রসিদ্ধ হুইলার সাহেবের এবং চতুর্থ কন্যা মিলি ষ্টুয়ার্ট সাহেবের সহিত পরিণীতা হন। কৃষ্ণমোহনের কন্যা কয়টিই সুশিক্ষিতা। তন্মধ্যে মনমোহিনী † শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা, স্ত্রী-বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা।

কৃষ্ণমোহনের শিক্ষানুরাগ অতুলনীয়। এ বয়সেও তাঁহার সে অনুরাগের অণুমাত্র হ্রাস পাইল না,—এ বার্দ্ধক্যেও তাহা যৌবনোচিত অটুট রহিল। বিভিন্ন প্রকৃতির অভিজ্ঞতা-লাভ-লালসা বহু দিন হইতে কৃষ্ণমোহনের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল ছিল। ইতিপূর্ব্বে, জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিনি বিভিন্ন জাতির ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের প্রকৃতি অবগত হইতেছিলেন; এখন বিসপ্স্ কলেজে আসিয়া তাঁহার সে চর্চ্চা আরও বৃদ্ধি পাইয়া আসিল। আশানুরূপ সংসঙ্গ পাইয়া তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে নানা দেশের নানা ভাষা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন।

বিসপ্স্ কলেজের অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও কৃষ্ণমোহন দেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চায় বিরত থাকেন নাই! এ সময়ে তাঁহার সাহিত্য-জগতের প্রধানতম কীর্ত্তি, ষড়দর্শন-প্রকাশ। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বিরল। কৃষ্ণমোহন এই ষড়দর্শন উভয় বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়া উক্ত ভাষাদ্বয়ের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করেন। ষড়দর্শন, কৃষ্ণমোহনের কেন, সমগ্র ভারতবাসীরই গৌরবের সামগ্রী। কৃষ্ণমোহন ১৮৬১ ও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ষড়দর্শন প্রকাশ করেন। এই ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ক্যানিংএর পর এলগিন ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

বিসপ্স্ কলেজে কৃষ্ণমোহন একটি ভয়ঙ্কর মনোবেদনা প্রাপ্ত হন। বিসপ্স্ কলেজ-প্রাঙ্গনে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে (১২৭৫ সালে) কৃষ্ণমোহনের প্রাণ-পত্নী বিন্দুবাসিনী মানবী-লীলা সম্বরণ করেন। কৃষ্ণমোহনের এই বিয়োগক্লেশ বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। এই মনোক্লেশ-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণমোহন অধ্যাপক পদ ত্যাগ করেন। এ সময় ভারতবর্ষ লরেন্সের শাসনাধীন। এ শাসনে, এ সময় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যার সর্ব্বনাশ হয়,—কৃষ্ণমোহনের ন্যায় ভারতমাতাও অনেক বিয়োগক্লেশ ভোগ করেন।

অধ্যাপকপদ ত্যাগ করিয়াই কৃষ্ণমোহন কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর কৃষ্ণমোহন পঞ্চদশবর্ষমাত্র জীবিত ছিলেন। এ সময় তাঁহার শরীর বার্দ্ধক্যগ্রস্ত; তাঁহার যৌবনোচিত দৈহিক বলবিক্রমের হ্রস্বভাব। কিন্তু দৈহিক বলবীর্য্যের হ্রস্বভাব হইলে কি হয়? এ সময় তাঁহার মানসিক চিন্তা-বীর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস নাই—বরং তাহা পূর্ব্বের অপেক্ষাও জ্যোতিষ্মান—প্রতিপদী শারদশশী যেন পূর্ণ বিকশিত। তাঁহার প্রকৃতি-দত্তা সাহিত্য-বিষয়িণী শক্তি এ সময়ে পূর্ণশক্তি। কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াই তিনি সে শক্তি সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদ হিন্দুদিগের প্রধান ও প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র। জাতিচ্যুতি-পার্থক্য সত্ত্বেও কৃষ্ণমোহন এই সময়ে (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) সেই হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতা টীকার সহিত প্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ হইলেন। আর্য্যসাক্ষ্য নামে আর একখানি গ্রন্থও এই সময়ে (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার যশোভাতি সাহিত্য-জগতে বিস্তৃত করিল। এ গ্রন্থদ্বয় প্রকাশের পর (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) কৃষ্ণমোহন আর্য্য-সাক্ষ্যের প্রতিপোষকতায় দুইটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধ দুইটিও সাহিত্য-জগতে সাদরে গৃহীত হয়।

এ সকল ভিন্ন কৃষ্ণমোহন আরও বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শারীরিক মীমাংসার ভাষ্য নারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্মপুত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি হিন্দুদিগের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত ও ইংরাজী টীকার সহিত প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগতের স্মরণীয় হইয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধেও অন্যান্য আকারেও কৃষ্ণমোহন বিস্তর পুস্তক প্রণয়ন করেন। এক জীবনে এরূপ বহুল সারবান পুস্তক প্রচার কীর্ত্তিমহত্ত্বের পরিচায়ক। এরূপ কীর্ত্তিরক্ষণ চেষ্টাবান ব্যক্তিরই ভাগ্যাধীন। আর এরূপ কীর্ত্তি রাখিতেও যাঁহারা চেষ্টা পান, এ জগতে তাঁহারাই ধন্য! কালে মহত্ত্ব তাঁহাদেরই অঙ্কশায়ী হয়।

* জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বর্গীয় মহাত্মা প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের পুত্র। এরূপ বিবাহে বিধর্ম্ম গ্রহণে ইনি পৈতৃক বিষয় ভোগে বঞ্চিত হন। কিছুদিন হইল ইঁহার পত্নী কমলমণির কাল হইয়াছে। অধুনা তাঁহার গর্ভজাত কন্যা কয়েকটিকে লইয়া জ্ঞানেন্দ্রমোহন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন।

† ইনি অধুনা মিষ্ট্রেস্, এম, হুইলার (Mrs. M.Wheeler) নামে সাধারণে পরিচিত।

সংসম্মান সৎকীর্ত্তির অনুসারী। কৃষ্ণমোহনের সৎকীর্ত্তিসমূহও এই নীতিক্রমে ক্রমে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম পদবীতে উন্নীত করিতে লাগিল। আণ্ডামানদ্বীপে দস্যু-হস্তে মেওর অকালমৃত্যুর পর এই সময় নর্থব্রুক ভারত-শাসকপদে অধিষ্ঠিত হন। কৃষ্ণমোহনের কীর্ত্তি-মহত্ত্ব স্বভাবের গুণে তৎপ্রতি তাঁহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কৃষ্ণমোহন ইতিপূর্ব্বে 'সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ' প্রচার করিয়া বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বল করেন। এই সময় নর্থব্রুকের দৃষ্টি কৃষ্ণমোহনের সেই সাহিত্য-পুষ্টিকারী কীর্ত্তির প্রতি পতিত হইল; তিনি 'সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ' প্রচার জন্য কৃষ্ণমোহনকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ইহার পর কৃষ্ণমোহনের নানা-বিষয়িণী বিদ্যা-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বও তাঁহার গোচর হইল; তিনি কৃষ্ণমোহনের জ্ঞান-বীর্য্যে চমকিত হইলেন; স্বয়ং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিরূপে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনকে ডি, এল পদবীতে (Doctor in Law) গৌরবান্বিত করিলেন। এ সময়ে এরূপ গৌরব দুর্লভ। কৃষ্ণমোহনের এই দুর্লভ গৌরব-প্রাপ্তির অব্দে ভারত-সম্রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া-সুত "প্রিন্স অব্ ওয়েল্স" ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন; নর্থব্রুকের পর দুরন্ত লিটন ভারত-শাসন প্রাপ্ত হন।

এই সময় 'ইণ্ডিয়ান লিগ' নামে একটি দেশহিতকরী সমিতি সংগঠিত হয়। বঙ্গ-হিতকামী এই সমিতিতে অনেক মান্য গণ্য বাঙ্গালির সহানুভূতি ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন এই সভার সভাপতিপদে সম্মানিত হন। এ সভার সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কৃষ্ণমোহন অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্যের সূচনা করেন; তন্মধ্যে বঙ্গদেশে বিজ্ঞান-মূলক শিল্পবিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভারতভূমি সকল ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্যই পরমুখাপেক্ষী। সুখসৌকার্য্যের দ্রব্যই বল, বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জৈবনিকই বল, ভারতবাসী সকলের জন্যই ভিন্নদেশের নিকট কৃতলঘী-বাস। পরিধেয় বস্ত্র হইতে সামান্য সূচ সুতাটিরও জন্য ভারতবর্ষ পরপ্রত্যাশী। 'ইণ্ডিয়ান লিগের' সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণমোহনের দৃষ্টি দেশের এই সকল অভাব দূরীকরণের প্রতি পতিত হইল। যাহাতে দেশের লোক শিল্পচর্চ্চায় নিযুক্ত হইতে পারে; যাহাতে দেশ হইতে বাষ্পীয়-যন্ত্রের নির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন ও কাচের বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করণ-ক্রিয়া সহজে নির্ব্বাহিত হয়, যাহাতে লৌহগঠন ও ধাতব গিল্টিকরণ প্রভৃতি কার্য্য দেশে অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে; কৃষ্ণমোহন এই সময়ে এইরূপ উদ্যম পাইতে লাগিলেন। ধনীর ধন সিন্দুক-জাত হইয়া বন্ধ্যাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, অথচ দেশে দুর্ভিক্ষ-পীড়ন ও দারিদ্র্য-প্রকোপ বর্ত্তমান। যাহাতে বন্ধ্যাবস্থায় পতিত ধন অসংখ্য শুভফল প্রসব করিয়া দেশের দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করিতে সক্ষম হয়, কৃষ্ণমোহন এ সময় সে জন্য স্বতঃই চেষ্টিত রহিলেন; শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, যথারীতি যন্ত্র-যন্ত্রালয় নির্ম্মাণের জন্য প্রয়াসী হইলেন।

বলা বাহুল্য, কৃষ্ণমোহনের এ প্রয়াস সম্যক ফলবতী হইতে পারে নাই। এ সময়ে এ সম্পর্কীয় আন্দোলনের জন্য দেশে দুইটি সম্প্রদায় সংগঠিত হয়। সে সম্প্রদায় দুইটির,—একটি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা, ও অপরটি আমাদের কৃষ্ণমোহনের পরিচালিত ইণ্ডিয়ান লিগ। শিল্প-শিক্ষার প্রস্তাবনা এইরূপ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় দেশের সাহায্যদাতা ধনীগণের মধ্যেও দুই মত হয়। তন্মধ্যে কেহ বা 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার' ও কেহ বা 'ইণ্ডিয়ান লিগের' পক্ষ লয়েন। এইরূপ মতভেদে কার্য্যভেদ হওয়ায় কৃষ্ণমোহনের উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত হইতে পারে নাই। অনেক বাক্ বিতণ্ডা ও আন্দোলনের পর, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার * কল্পনাই স্থায়ীত্ব লাভ করে। ফলতঃ, এ সভাকেও দেশে শিল্প-বিদ্যা বিস্তারের জন্য কৃষ্ণমোহনের উদ্যমের একটি সুফল বলিতে হইবে। আর এ উদ্যমের জন্য কৃষ্ণমোহন যে যথার্থই ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণমোহনের এ উদ্দেশ্য সম্যক সফলতা লাভ না করার আর একটি কারণ, 'ইণ্ডিয়ান লিগের' অকালমৃত্যু। যাহা হউক 'ইণ্ডিয়ান লিগের' অকালমৃত্যুর পর কৃষ্ণমোহন আর একটি সম্মানসূচক পদ প্রাপ্ত হইলেন,—এ সভার অকালমৃত্যুতে সুবিখ্যাত ভারতসভা কৃষ্ণমোহনকে সভাপতিপদ প্রদানে সম্মান বোধ করিলেন। ভারতসভায় আসিয়া কৃষ্ণমোহন প্রাণের মত সহকারীবৃন্দ প্রাপ্ত হইলেন; এতদিন পরে তাঁহার দেশহিতকরী প্রাণের আশা পূর্ণকাম হইবার পথ পাইল। তিনি এ সভায় প্রাণের ন্যায় সহকারীবৃন্দ পাইয়া নানারূপ দেশহিতকর কার্য্যে প্রাণ মন উৎসর্গ করিলেন; সতত সর্ব্বপ্রকারে জন্মভূমির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। জন্মভূমিও সৎপুত্র বলিয়া কৃষ্ণমোহনকে ক্রোড়ে লইলেন;

* ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা (The Indian Association for the cultivation of Science) অধুনাপি বহু-বাজার ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান আছে। এ সভা জীবিত থাকিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চায় দেশের অনেক হিতসাধন করিতেছে।

হিন্দুসমাজ ভাই বলিয়া, প্রাণের বন্ধু ভাবিয়া, কৃষ্ণমোহনকে আলিঙ্গন দিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে করদাতাদিগের নির্ব্বাচনক্রমে 'কলিকাতা মিউনিসিপালিটির' সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। এ নির্ব্বাচনের সময়ও হিন্দু-সমাজ অপূর্ব্ব গুণ-মাহাত্ম্যে ভুলিয়া কৃষ্ণমোহনকে আপনাদের মুখপাত্র নিযুক্ত করিলেন,—আপন ভাবিয়া, সম্মান করিয়া, মিউনিসিপালিটির সভ্যপদে নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহার স্বপক্ষে সম্মতি দিলেন। যে হিন্দুসমাজ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহনকে গৃহত্যাগী করাইয়াছিল; সতত কঠিন-হৃদয় কাপালিকের ন্যায় তাঁহার নির্য্যাতনলগ্ন অপেক্ষা করিতেছিল; আজ সেই হৃদয়ের এই ভাব! ধন্যা বীণাপাণি! তোমার অপূর্ব্ব মহিমা কে বুঝিতে পারে?

কৃষ্ণমোহনের দ্বারা বঙ্গদেশের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষা বিষয়েই বল, বা নীতি বিষয়েই বল, সকল বিষয়েই বঙ্গবাসী কৃষ্ণমোহনের নিকট ঋণী। যে উচ্চ ইংরাজীশিক্ষার গৌরবে বঙ্গবাসী আজ গৌরবান্বিত, সে গৌরবেরও একটি মূল কৃষ্ণমোহন। এক সময়ে পঞ্জাবের ন্যায় বঙ্গদেশের উচ্চ ইংরাজীশিক্ষার প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইল; বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী উপাধিদানের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত, হিন্দী ও পারসী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা পরীক্ষায় উপাধি দানের কথা উঠিল। ভারত-বিদ্বেষী ইংরাজগণও সে কথার পোষকতায় উত্তেজিত হইলেন,—সকলে স্বাধীন চিন্তার স্রোত অবরুদ্ধ রাখিয়া অভাগা বঙ্গবাসীগণের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা পাইলেন। এ সকল দেখিয়া, জন্মভূমির ভাবী দুর্দ্দশা ভাবিয়া কৃষ্ণমোহনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—তিনি প্রাণপণে এ দুরভিসন্ধির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন; যুক্তি দেখাইয়া, অবিচার প্রতিপন্ন করিয়া এ কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রতিবাদের ফল ফলিল; শিক্ষার প্রশস্ত পথ কণ্টকাকীর্ণ হইতে পাইল না।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত আছে, আর যাহার প্রচলনে আজ বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালাভাষার অস্তিত্ব রহিয়াছে, সে প্রথারও মূল কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহনের একান্ত যত্নেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষা-প্রথা প্রথম সংস্থাপিত হয়। সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গদেশের আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সকলেই কৃষ্ণমোহনের নিকট চিরঋণী—এ ঋণ আর কখনই পরিশোধ হইবার নহে।

সকল রাজনৈতিক আন্দোলনেই কৃষ্ণমোহনের যোগ ছিল; সকল আন্দোলনেই তিনি অগ্রণী ছিলেন। লিটন-শাসনে মুদ্রাযন্ত্র-আইন স্থাপিত হইল, দেশীয় মুদ্রন-স্বাধীনতা একেবারেই লোপ পাইল। এ সময়ও ভারতসভার প্রতিনিধি-রূপে কৃষ্ণমোহন লিটনের এ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন; সতত কঠোর আন্দোলনে এ বিষম প্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে সচেষ্ট থাকিলেন। বলা বাহুল্য, এই সকল আন্দোলনের ফলেই এ বিষম প্রথায় পরে সদাশয় রিপণের দৃষ্টি পতিত হয়; তাঁহার ন্যায়-শাসন এ কঠোর শাসনের উচ্ছেদসাধন করে।

কৃষ্ণমোহনের হৃদয় সাম্য-স্বাধীনতার আধার। তাঁহার হৃদয়ে কখনও বৈষম্যের ছায়ামাত্র প্রবেশ করে নাই; কি বিপদে, কি সম্পদে, কখনই তিনি হৃদস্থিত স্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দেন নাই। কৌমারে তিনি স্নেহময়ী জননী, প্রাণ-প্রিয় ভাই ভগ্নী ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি সমাজের বিষম বৈষম্য সহ্য করিতে পারেন নাই; আহারীয় অন্নের—পরিধেয় বস্ত্রের—আবাস গৃহের প্রচুরতম কষ্ট অবনত মস্তকে বহন করিয়াছিলেন, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আপনার আরাধ্য স্বাধীনতার পূজায় অমনোযোগী হন নাই। কৌমার হইতে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ের সাম্য-স্বাধীনতা সমুজ্জ্বল ও সমদীপ্ত ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 'সেণ্টপল ক্যাথিড্রাল' নামে একটি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণ-মোহন এই ধর্ম্মমন্দিরে একটি সম্মানসূচক পদবী প্রাপ্ত হন; তত্রত্য ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপ কৃষ্ণমোহনকে তাঁহার প্রথম ক্যানন নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে উক্ত ধর্ম্মাধ্যক্ষ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াই আপনার ধর্ম্ম-বৈষম্যের পরিচয় দিলেন; একজন ইউরোপীয়কে ক্যাননপদে বরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "কৃষ্ণমোহন বাঙ্গালী; সুতরাং তিনি বাঙ্গালী-খৃষ্টানের ক্যানন থাকিবেন; আর ইংরাজ ইংরাজ-সম্প্রদায়ের ক্যানন হইবেন।" ধর্ম্মরাজ্যেও শ্বেত-কৃষ্ণ বৈষম্য! সাম্যবাদী কৃষ্ণমোহনের এ বৈষম্য সহ্য হইল না। তিনি অবিলম্বেই সসম্মানে ক্যানন-পদ পরিত্যাগ করিলেন।

ক্যানন-পদ পরিত্যাগের পর ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপ কৃষ্ণমোহনকে অনেক বুঝাইলেন; বিনয়সহকারে উচ্চপদ পুনঃগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সকলই বিফল! সামান্য সামাজিক বৈষম্যের জন্য যিনি আত্মজন ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, ধর্ম্ম-জগতে এরূপ শ্বেত-কৃষ্ণ-বৈষম্য থাকিতে কেমন করিয়া তাহাতে তিনি সংলিপ্ত থাকিবেন? সুতরাং কৃষ্ণমোহন আর এ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, কোনক্রমেই স্বাধী-

নতার সমুজ্জল ভাতি তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না। তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপকে স্পষ্টতঃই বলিলেন, "আমি কখনই ওপদ পুনগ্রহণ করিতে পারিব না। ধর্ম্মরাজ্যে এরূপ পার্থক্যভাব দর্শন করিতে আমার বড়ই কষ্ট হয়।"

একাধারে সাম্য-স্বাধীনতার আরও প্রচুরতম দৃষ্টান্ত কৃষ্ণমোহনের হৃদয়ে বর্ত্তমান। এক সময়ে কৃষ্ণমোহন কোন খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরের অবৈতনিক মাননীয় চ্যাপলেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্ম্মালয়ের নিয়ম, রবিবারে—ভজনার দিন সম্মানোচিত বেশ-বিন্যাসে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপ অগ্রে ভজনালয়ে প্রবেশ করিবেন, ও তৎপরে নির্দ্দিষ্ট পদসূচক পরিচ্ছদে চ্যাপলেনগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ পদ-পার্থক্য সাম্যবাদী কৃষ্ণমোহনের বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইল; তিনি আর এরূপ লৌকিক আচারে যোগ দিতে পারিলেন না। তিনি প্রকৃত হৃদয়বান ধার্ম্মিকের ন্যায় লোক-কোলাহলের অন্তরে—ধর্ম্মালয়ের একপার্শ্বে, সরল বেশে, পবিত্র মনে ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার এরূপ ভাব ধর্ম্মযাজক বিশপের গোচর হইল। একদা বিশপ কৃষ্ণমোহনকে ডাকিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মালয়ের নিয়মানুবর্ত্তী হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের বৈষম্য-বিরোধী স্বাধীন-হৃদয় এরূপ অধীন নিয়মের অনুবর্ত্তী হইবে কি প্রকারে? সুতরাং কৃষ্ণমোহন সসম্মানে ধর্ম্মযাজক বিশপের কথার উত্তর দিলেন; বলিলেন, "রাজাপারিষদের মানাপমান কি ধর্ম্ম জগতেও বর্ত্তমান? এখানেও কি পার্থিব জাঁকজমক ও মান সম্ভ্রমের সমাদর করিতে হইবে?"

কৃষ্ণমোহনের আত্মীয়-প্রীতি অচলা,—মাতৃভক্তি প্রশংসনীয়া। সামাজিক-তাড়নে স্বজন-ত্যাগী হইয়াও কৃষ্ণমোহন এক দিনের জন্যও আপনার স্নেহময়ী অভাগিনী জননীকে, প্রাণপ্রিয় সহোদর-সহোদরাগণকে ভুলেন নাই। বিধর্ম্মী হইলেও, হিন্দুসমাজের কুটিল দৃষ্টি সতত তাঁহার প্রতি পতিত থাকিলেও, কৃষ্ণমোহন সতত আপনাকে জননীর সেবায় ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন; হিন্দু-সমাজের অলক্ষ্যে তিনি পূজনীয়া জননীর চরণ অর্চ্চনা করিতেন,—সতত অর্থসাহায্যে ও লোকসাহায্যে জননীর সেবা করাইতেন। তাঁহার পৈতৃক সংসারে নিদারুণ দারিদ্র্য-পীড়ন; কিন্তু কৃষ্ণমোহনের গুপ্ত-সাহায্য তাহার প্রভাব সম্যক পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল। সে সাহায্যে ক্রমে সে পতিত সংসার পার্থিব সুখের আগার হইয়া আসিয়াছিল।

কৃষ্ণমোহন সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত,—বহুভাষায় সুপণ্ডিত। ভারতবর্ষে প্রচলিত এরূপ ভাষা অতি অল্প আছে, কৃষ্ণমোহন যাহা অধ্যয়ন করেন নাই। ভারতবর্ষে প্রচলিত কি সংস্কৃত, কি আরবি, কি উর্দ্দূ, কি পার্শী কৃষ্ণমোহন সকল ভাষাতেই সুপণ্ডিত; লাটিন, গ্রিক, ইংরাজী, হিব্রু, বাঙ্গালা ও উড়িয়া এ সকলই কৃষ্ণমোহনের বিশেষ আয়ত্ব। সমগ্র জীবনে মানবসমাজ একটি ভাষাও সম্যকরূপে শিক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু কৃষ্ণমোহন আপনার ঐকান্তিক যত্নের গুণে (একটি দুইটি তো তুচ্ছ কথা!) একাদশটি ভাষায় পাণ্ডিত্য-লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে, বহু ভাষা শিক্ষার বহু অন্তরায় সত্ত্বে আপনার অধ্যবসায় ও উদ্যমে, যিনি এত ভাষায় সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, তিনি কি জীব-জগতে মহত্তের দৃষ্টান্ত নহেন? তাঁহার অনুসরণে জীব-জগৎ কি পতিত অবস্থায় উন্নতকরণের প্রশস্ত পন্থা চিনিয়া লইবেন না?

কৃষ্ণমোহন উপকারীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। কখনও কাহারও নিকট সামান্য উপকার পাইলে, তিনি তাহা কোনক্রমে বিস্মৃত হইতেন না। ভারত-শাসক হার্ডিঞ্জ বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করেন; পতিত বাঙ্গালীর শিক্ষাকল্পে উৎসাহ দেন। হার্ডিঞ্জের এ উপকার কৃষ্ণমোহন সতত স্মরণ রাখিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হার্ডিঞ্জ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার ইংলণ্ড-গমন সময় কৃষ্ণমোহন-প্রমুখ দেশের মুখপাত্রগণ একটী সভার আহ্বান করেন। সে সভা অধিবেশনের উদ্দেশ্য,—বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা উপহার জন্য হার্ডিঞ্জকে কৃতজ্ঞতা প্রত্যুপহার প্রদান। বঙ্গ-বিদ্বেষী ইংরাজগণের কিন্তু ইহা সহ্য হইল না। বঙ্গের বিদ্যোৎসাহী হার্ডিঞ্জকে এরূপ প্রকাশ্য সভায় ধন্যবাদ প্রদান ও সম্মান প্রদর্শন করিলে পরবর্ত্তী ভারত-শাসকগণ সে আশায় আবার বঙ্গবাসীর উপকার করিতে পারেন, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় কলিকাতার ইংরাজ বারিষ্টারগণ এ সভার প্রতিবাদী হইলেন। গৃহবিচ্ছেদ জন্মাইয়া, বা মতবিরোধ দেখাইয়া, যাহাতে এ সভায় শিক্ষা-সহায়তার জন্য হার্ডিঞ্জকে ধন্যবাদ না দেওয়া হয়, তজ্জন্য ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের তেজস্বিনী বক্তৃতায় সে আন্দোলনে কাহারও মন টলিল না। বঙ্গের মুখপাত্রগণ এক প্রাণ হইয়া কৃষ্ণমোহনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, সে সভায় হার্ডিঞ্জকে অন্তরের ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

হেয়ার সাহেব শিক্ষা-সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বিস্তর উপকার করিয়াছেন, সে জন্য ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট চিরঋণী। যখন বঙ্গদেশে ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজ-দৃষ্টি পতিত হয় নাই,—ভারতের শিক্ষা-সখা খৃষ্টান-সম্প্রদায়ে

ভারতবাসীগণকে শিক্ষাদান-কল্পনা মুকুলিত হইবার বহুপূর্ব্বে, মহাত্মা ডেভিড হেয়ারই ভারতবর্ষে ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম ভিত্তি-সংস্থাপন করেন। তিনিই সে ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক ছিলেন। কৃষ্ণমোহনের অন্ধকার-আচ্ছন্ন বাল্য-জীবনও ডেভিড হেয়ারের সহায়তায় সে অন্ধকার হইতে আলোকে নীত হইয়াছিল, তিনিই সে জীবন ক্রম-সংগঠনের প্রধান সহায় ছিলেন। এ অন্ধকারের পথ প্রদর্শক, ভগ্নপ্রায় জীবনের সংগঠক মহাত্মাকে (কৃতজ্ঞ হৃদয় কৃষ্ণমোহন তো অন্য কথা!) কোন্ পাষণ্ড-হৃদয় ভুলিতে পারে? কৃষ্ণমোহন তাঁহার ও স্বদেশের এ উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এক দিনের জন্যও বিরত থাকেন নাই। যেখানে ডেভিড হেয়ারের নাম হইত; যেখানে তাঁহার স্মরণ-সভার অধিবেশন হইত, অনুগত কৃতজ্ঞ ভৃত্যের ন্যায়—আরাধ্য দেবের আরাধনার প্রায়, কৃষ্ণমোহন সততই সেখানে উপস্থিত থাকিতেন। আর যাহাতে ভাবী বঙ্গ-সমাজও ডেভিড হেয়ারের নামে কৃতজ্ঞ থাকেন, এ চেষ্টাও কৃষ্ণমোহনের সম্পূর্ণ ছিল। তিনি দৃঢ়-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া স্পষ্টতঃই বলিতেন, "যে পর্য্যন্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার ছায়ামাত্র বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের নাম তাঁহাদের নিকট সমাদৃত হইবে।"

কৃষ্ণমোহন দয়ার অন্যমূর্ত্তি ছিলেন; দীনে দান তাঁহার নিত্যক্রিয়া ছিল। তিনি অন্নাভাবে দরিদ্রের ক্রন্দন বা বস্ত্রাভাবে দীনের উলঙ্গ অঙ্গ দর্শন করিতে পারিতেন না। সে দর্শনে তাঁহার প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিত, হৃদয় বিষম শেলে শতধা বিদীর্ণ হইত। নাম পাইবার আশায়, ধনবানের দান বৃহদ্ব্যাপারে; অষ্ট্রেলিয়ার ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত হইবে, কিম্বা নব-ইয়র্কে প্রদর্শনী খুলিবে, নাম-প্রয়াসী ধনবান তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রচুর অর্থ দান করিতে পারেন; কিন্তু সম্মুখে পিপাসায় শুষ্কতালু কিম্বা অনাহারে আসন্ন-মৃত্যু দেখিলে তাঁহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। কৃষ্ণমোহনের প্রকৃতি কিন্তু এরূপ ছিল না। তিনি এরূপ যশঃপ্রত্যাশীর পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-প্রত্যাশী ছিলেন। দীনের সাহায্যই তাঁহার ধর্ম্মের একটি অঙ্গ ছিল; তাহাদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ দান করিয়াই তিনি চরিতার্থতা লাভ করিতেন।

কত বলিব, কৃষ্ণমোহন সর্ব্বগুণাধার। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, সৎসাহসী, আত্মনির্ভর ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি জগতে বিরল। দুঃখের বিষয়, এই সর্ব্ব গুণাধার কৃষ্ণমোহন এখন আর নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে (১২৯২ সালের বৈশাখ শেষে) ৭২ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুণ্যাত্মা আজ দিব্যধামে—জননী জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি আজ স্বর্গীয় পিতার ক্রোড়ে। পিতৃ-ক্রোড়ে বসিয়া তিনি ভ্রাতৃভাবে আমাদিগকে স্মরণ রাখিয়া সেই স্বর্গীয় পিতার নিকট আমাদের মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করুন, এই আমাদের প্রার্থনা। পিতার নিকট হইতে সদ্দৃষ্টান্ত পাইয়া আমরা যেন সৎপথ চিনিয়া লইতে পারি, পিতা যেন আমাদিগকে অসৎপথে যাইতে বাধা দেন। *

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

* শিল্পপুষ্পাঞ্জলীর উদ্দেশ্য, চিত্রসহ মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণমোহনের কোন জীবন-চরিত প্রকাশিত হয় নাই ও প্রবন্ধলেখক অনেক কষ্টে তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলাম। দুর্গাদাস বাবু শীঘ্রই কৃষ্ণমোহনের একখানি জীবনচরিত্র প্রণয়ন করিবেন। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে আর আর বিশেষ জ্ঞাতব্য ঘটনা সাধারণে সে পুস্তকে জ্ঞাত হইবেন। আমরা ইহার এই স্থানেই উপসংহার করিলাম। শি, সং।

শিল্পপুষ্পাঞ্জলি।

শিল্প, সাহিত্য, সরল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সম্বৎ ১৯৪২। সন ১২৯২ সাল।

দুই-একটি কথা।

নানা কারণে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই ছয়মাসে প্রথম খণ্ড শেষ করিতে হইয়াছে। সেই সকল কারণ কি? তাহা সাধারণের জানিবার কিছুই প্রয়োজন নাই, সুতরাং সে কথা এক্ষণে অব্যক্তই থাকিল।

পূর্ব্ব প্রকাশিত ছয় সংখ্যায় আমাদের আশানুরূপ শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে পারি নাই, তাহার প্রধান কারণ এদেশে শিল্প বিষয়ক লেখকের অভাব। অনেক লেখকই আমাদিগকে পদ্যাদি লিখিবার অভিপ্রায়ে পত্র লেখেন, কিন্তু শিল্প সম্বন্ধীয় রচনা আমরা এপর্য্যন্ত একটিও প্রাপ্ত হই নাই।

পদ্যাদি যে এ পত্রের অনুপযোগী, একথা আমরা কখনই স্বীকার করিব না; কিন্তু পদ্য বা উপন্যাস বাহুল্যও অবশ্য প্রার্থনীয় নয়। কাজেই আমরা প্রাপ্ত পদ্যাদি প্রাপ্তিমাত্রেই প্রকাশ করিতে পারি না। প্রবন্ধ মনোনীত হইলে যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অনেকে একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র পাঠাইয়া, আমাদিগকে তাহা প্রকাশ করিতে বলেন। নানা কারণে আমরা স্থির করিয়াছি, অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ (বিশেষতঃ দূরস্থ লেখকের) এই পত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিব না।

এক্ষণে এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম হইতে যাহাতে আমাদের পুষ্পাঞ্জলি শিল্পপুষ্পে পরিপূর্ণ হয়, তৎপক্ষে প্রাণপণে চেষ্টা করিব, তার পর জগদীশ্বরের ইচ্ছা। তবে আশা হয়, আর ছয় মাস পরে, ইহা আরও পরিপুষ্ট হইতে পারে। এক্ষণে আমরা অনুগ্রাহক গ্রাহকগণের অনুকম্পা ও জগদীশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আবার ছয়মাসের জন্য এই গুরুতর দায়ীত্ব স্কন্ধে লইলাম।

(শি, সং।)

তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

ELECTRIC TELEGRAPH.

(প্রথম খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

রাসায়নিক আকর্ষণ—বিভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ সমূহের মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। এক জাতীয় পদার্থের পরমাণুসমূহ এই আকর্ষণ বলে সংযুক্ত হয় না। দুই খণ্ড লৌহ,দুই খণ্ড তাম্র অথবা দুই খণ্ড গন্ধক মধ্যে ইহার কার্য্য নাই। লৌহে লৌহে, তাম্রে তাম্রে অথবা গন্ধকে গন্ধকে মিলিত হয়, কিন্তু রাসায়নিক সম্বন্ধে নহে, কেবল যোগাকর্ষণ বলে সংযুক্ত হইয়া উহাদের আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে মাত্র। রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তিতে দুই কি তদধিক ভিন্ন জাতীয় পদার্থ পরস্পর এরূপে সংমিলিত হইয়া যায়, যে, তাহাতে তাহাদের কেবল যে আয়তন মাত্র বৃদ্ধি হয় তাহা নহে,—রূপে, গুণে, সকল রকমে একটী নূতন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইতি পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, দুই কি ততোধিক ভিন্ন জাতীয় পদার্থ মধ্যেই রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তির প্রাদুর্ভাব। গন্ধকে লৌহে অথবা গন্ধকে তাম্রে পরস্পর প্রবল রাসায়নিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান। আদিভূতগুলির মধ্যে যে কতিপয় ধাতু, কতিপয় বাষ্প বা বায়বীয় পদার্থ, এবং আর কতকগুলি অধাতব কঠিন ও তরল পদার্থ আছে, তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে, ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পে ও ভিন্ন ভিন্ন অধাতব কঠিন পদার্থে, অথবা ধাতুতে বাষ্পে,বাষ্পে অধাতবে ও অধাতবে ধাতুতে রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি প্রবল। ফলতঃ এই আকর্ষণের কার্য্যাধীন পদার্থগুলি পরস্পর যত বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে,তাহাদের রাসায়নিক সংযোগ বলও তত অধিক হইবে। ক্লোরীন্, অম্লজান ও গন্ধক, সকল ধাতুর সহিত প্রবল রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তিতে সংযুক্ত হয়। আবার, সমজাতীয় পদার্থ মধ্যে, বাষ্পে বাষ্পে অথবা ধাতুতে ধাতুতে রাসায়নিক সংযোগের বল অত্যন্ত ক্ষীণ। ক্লোরীন্ ও অম্লজান সংযুক্ত হয়; কিন্তু উহাদের সংযোগে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা অল্প মাত্র উত্তাপ পাইলেই, তাহার উপাদনীভূত মূল পদার্থ দুইটী পৃথক হইয়া পড়ে। তদ্রূপ, তাম্র ও দস্তা ধাতু দুইটী যেমন অধিক তাপ সহকারে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ হয়, আবার সেই পরিমাণে তাপ দ্বারা উহারা পরস্পর পৃথক হইয়া পড়ে। দস্তা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, এবং তাম্র পড়িয়া থাকে।

জগতের অসংখ্য পদার্থের সহিত তুলনায়, ৬৬টি মূল পদার্থকে অতি অল্প সংখ্যক বলিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ কয়টী মাত্র মৌলিক পদার্থের বিবিধ রাসায়নিক সংযোগে সংখ্যাতীত পার্থিব পদার্থের উৎপত্তি। যেমন বর্ণমালার কয়টী মাত্র আদি বর্ণের বিবিধ সংযোগে ভাষার যাবতীয় শব্দের উৎপত্তি, অথবা সঙ্গীতে যেরূপ কেবল ৭ টী মাত্র আদি স্বরের বিবিধ সংযোগে সমস্ত রাগ রাগিণী ও গানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ ৬৬ টী আদি পদার্থের বিবিধ রাসায়নিক সংযোগে পৃথিবীর অসংখ্য খনিজ উদ্ভিজ্জ ও জীবশরীরী পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

পৃথিবীস্তরের অধিকাংশই কেবল পাঁচটী মাত্র আদিভূতের যোগে সংগঠিত হইয়াছে। পৃথিবীস্তরের সর্ব্বত্রেই তিনটী মাত্র যৌগিক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে, খড়িমাটি (Chalk), প্রস্তর (Flint), এবং সাধারণ মৃত্তিকা, এই তিনটী যৌগিক পদার্থ আবার পাঁচটী মাত্র আদিভূতের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গার (Carbon), অম্লজান (Oxygen), ও চূর্ণকের (Calcium) যোগে চাখড়ি; অম্লজান ও সিকতাদের (Silicium) যোগে সিলিকা নামক যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রস্তরের উপাদান; এবং সাধারণ মৃত্তিকার অধিকাংশই সিলিসিয়ম্, অম্লজান ও এলুমিনিয়ম্ নামক লঘুতম ধাতুর যোগে উৎপন্ন হইয়াছে।

আদিভূতগুলির মধ্যে অম্লজান প্রায় সকল পদার্থের উপাদান। বায়ুমণ্ডলের পরিমাণের প্রায় পাঁচভাগের এক ভাগ অম্লজান ও অবশিষ্ট অংশ যবক্ষারজান (Nitrogen)। উদজান ও অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে জলের উৎপত্তি। ধরাপৃষ্ঠের সমগ্র জলের গুরুত্বের প্রায় নয় ভাগের আট ভাগ অম্লজান। পৃথিবী যে সকল কঠিন বা অদ্রব পদার্থে নির্ম্মিত, তাহার প্রায় অর্দ্ধ ভাগ অম্লজান। এতদ্ব্যতীত যত অম্ল (Acids) আছে, তৎসমুদায়ের একটী উপাদান অম্লজান। অম্লজানের সংযোগ ব্যতীত অম্ল হয় না। তন্নিমিত্ত এই ভূত-বাষ্পটীকে অম্লজান বা অম্লকর কহে। আরও, ইহা প্রায়

সকল ধাতুরই সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। অম্লজান ঘটিত যে সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তকে সাম্লকর (Oxides) কহে। যেমন লৌহে অম্লকরে সংযুক্ত হইয়া যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে লৌহাম্লজানিক বা সাম্লকর লৌহ (Oxide of Iron) কহে। চলিত ভাষায় ইহাকেই মরিচা কহে। দস্তার সহিত অম্লকরের যোগে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সাম্লকর দস্তা (Oxide of Zinc) বলে। ইহা সচরাচর বাজারে সফেদা নামে বিক্রীত হয়। ইহা বাটী প্রভৃতির জানালা, কপাটাদির রঙ্ প্রস্তুত করিবার একটী প্রধান উপকরণ।

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বা ভাগ অনুসারে রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ রাসায়নিক যৌগিক পদার্থে উপাদান পদার্থ সকলের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যেমন বিশেষ বিশেষ ভৌতিক পদার্থের পরস্পর সংযোগে বিশেষ বিশেষ যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক যৌগিক পদার্থের যত উপাদান তাহাদের প্রত্যেকের একটী করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। উপাদান পদার্থগুলি সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে মিলিত না হইলে কখনই রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তিতে পরস্পর সংযুক্ত হইবে না। সেই পরিমাণের কখনই ব্যতিক্রম ঘটে না। এ বিষয়ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। অম্লজান ও উদজান বাষ্প দুইটার যোগে জলের উৎপত্তি, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জলের ঐ উপাদান বাষ্প দুইটার একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ঐ দুইটী বাষ্প সংমিলিত হইলে তবে জল হইবে। ঐ বাষ্পদ্বয়ের ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অল্পমাত্রও ন্যূনাধিক্য হইলে, তাহারা কখনই রাসায়নিক আকর্ষণ বলে সংযুক্ত হইয়া জল হইবে না। আবার ঐ বাষ্প দুইটাই অন্যবিধ পরিমাণে একত্রিত হইলে ভিন্ন প্রকার যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইবে। কিয়ৎ পরিমাণ জল লইয়া তাহার উপাদানীভূত আদিভূত দুইটাকে পৃথক করিয়া ফেলিয়া পরীক্ষা করিলে, দেখা যায় যে, অম্লজানের পরিমাণ গুরুত্বে উদজানের ঠিক্ আটগুণ। আরও, পরীক্ষা দ্বারা উদজান ও অম্লজান ভূত-বাষ্প দুইটার তুলনায় বা আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির হইয়াছে, উদজান অপেক্ষা অম্লজান ১৬ গুণ ভারি। তাহার অর্থ এই যে, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আয়তনের, মনে কর এক ছটাক জল ধরে এমন একটী শিশিতে যে পরিমাণ উদজান ধরে, তাহার ভার যদ্যপি এক ধরা যায় (এক কাঁচ্চা, ছটাক, সের যতই হউক), তাহা হইলে সেই আয়তনের অম্লকরের ভার ১৬ হইবে। সমান আয়তনের উদজান ও অম্লজানের ভার বা গুরুত্ব যখন এত বিভিন্ন —অম্লজান উদজানের ১৬গুণ ভারি—তখন গোড়ায় যে কল্পিত পরমাণুর যোগে বাষ্পদ্বয়ের প্রত্যেকের স্থূল আয়তন দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেকের সেই এক একটী পরমাণুরও ভার বা গুরুত্ব অপরটীর প্রত্যেক পরমাণুর ভার বা গুরুত্ব হইতে বিভিন্ন। অর্থাৎ অম্লজানের এক একটী পরমাণু উদজানের এক একটী পরমাণু অপেক্ষা ১৬ গুণ ভারি। ইহাকে উহাদের পারমাণব গুরুত্ব কহে। সুতরাং উদজানের পারমাণব গুরুত্ব ১ (কাঁচ্চা, ছটাক অথবা যতই ধরা যাক) হইলে, অম্লজানের ১৬ (ঐরূপ কাঁচ্চা, ছটাক অথবা যতই ধরিবে) হইবে, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, যে কোন পরিমাণ জলে উদজানের ৮ গুণ (গুরুত্বে) অম্লজান সংযুক্ত থাকে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন রাসায়নিক কার্য্য পরমাণুতে পরমাণুতে সংঘটিত হইয়া যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, এবং এক একটী পরমাণু আবার অবিভাজ্য, সে স্থলে অম্লজানের ও উদজানের প্রত্যেকের কয়টী পরমাণু মিলিত হইয়া এক একটী জলের অণু হয়। এক একটী জলের অণুতে উদজানের ৮ গুণ অম্লজান থাকিবেই; সুতরাং দুইটী উদজানের পরমাণু ও তাহার ৮ গুণ (১৬) গুরুত্ব বিশিষ্ট একটী অম্লজানের পরমাণুর যোগে এক অণু জল হয়। তাহাতেই স্থির হইল যে, জল করিতে হইলে দুই পরমাণু বা দুই ভাগ উদজান ও এক পরমাণু বা ১৬ ভাগ অম্লকর যোগ করিতে হইবে। তবেই জলের পারমাণব ভার বা গুরুত্ব ২+১৬ অর্থাৎ ১৮,—উহার উপাদানের পারমাণব ভারের সমষ্টি মাত্র। দুই সের উদজানে, তাহার ৮ গুণ অর্থাৎ ১৬ সের অম্লকর যোগ করিলে ১৮ সের জল হইবে। কিয়ৎপরিমাণে জল লইয়া তাহার উপাদান দুইটীকে পৃথক করিয়া ফেলিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, দুই ভাগ উদজান ও ১৬ ভাগ অম্লজান, অর্থাৎ উদজানের ৮ গুণ অম্লজান থাকে। এইরূপে, রাসায়নিক পণ্ডিতগণ লঘুতম ভূতবাষ্প উদজানের গুরুত্ব ১ ধরিয়া অবশিষ্ট সকল ভূতগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব বা পারমাণব ভার স্থির করিয়াছেন। এবম্বিধ পারমাণব গুরুত্ব স্থির করাতে, রাসায়ণিক তত্ত্বালোচনায় অনেক সুবিধা হইয়া থাকে।

আবার ঐ উদজান ও অম্লজান ভূত দুইটীর অন্যবিধ পরিমাণ বা ভাগের সংযোগে ভিন্ন প্রকার যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দুইভাগ উদজান ও ১৬ ভাগ অম্লজানের যোগে জল হয়; আবার ঐ দুইভাগ উদজান ও দুই

গুণ ১৬, অর্থাৎ ৩২ ভাগ অম্লকরের যোগে স্বাস্থ্যকর হয়। এক পরমাণু গন্ধক (৩২ ভাগ) ও এক পরমাণু (১৬ ভাগ) অম্লকরের যোগে একায় গন্ধক হয়। আবার ঐ ১ পরমাণু (৩২ ভাগ) গন্ধক ও চারি পরমাণু (৪×১৬ অর্থাৎ ৬৪ ভাগ) অম্লকর সংযোগে মহাদ্রাবক (Sulphuric acid) হয়। এক পরমাণু পারদ (২০০ ভাগ) ও এক পরমাণু (৩৫.৫ ভাগ) ক্লোরীনের যোগে ক্যালোমেল (Calomel) হয়। আবার ঐ এক পরমাণু পারদ (২০০ ভাগ) ও দুই পরমাণু (৭১ ভাগ) ক্লোরীনের সংযোগে করোসিভ্ সব্লিমেট্ (Corrosive Sublimate) হয়, ইহাকে রসকর্পূর কহে।

রাসায়নিক আকর্ষণের আর একটী বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, এই আকর্ষণের বলে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই যৌগিক পদার্থ তাহার উপাদানীভূত পদার্থগুলি হইতে সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন প্রকৃতিক হইয়া উঠে, অর্থাৎ তাহার সম্পূর্ণ গুণান্তর হইয়া দাঁড়ায়। যৌগিক পদার্থ মাত্র রূপে, গুণে সকল রকমেই তাহার উপাদান পদার্থ সকল হইতে বিভিন্ন, —আকৃতি, আয়তন, স্বাদ, গন্ধ, গুরুত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ে উপাদান পদার্থ হইতে বিসদৃশ। কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখ,—

স্বাদ, গন্ধহীন ও দহন সহায় অদৃশ্য বায়বীয় বাষ্প অম্লকর এবং স্বাদ গন্ধহীন দাহ্য অদৃশ্য জলকর বাষ্প—এই দুইটীর পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে জলের উৎপত্তি; জলের তরলত্ব, অগ্নি নির্ব্বাপকত্ব প্রভৃতি গুণ তদুপাদান বাষ্প দুইটীর কোনটীতেও নাই।

জলকর ও অম্লকর বাষ্প দুইটী আর অঙ্গার এই তিন ভূতের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সংযোগে চিনির উৎপত্তি। প্রথম উপাদান দুইটী অদৃশ্য বাষ্প, এবং তৃতীয়টী একটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন কঠিন ভূত—এই তিনটীর যোগে শ্বেতবর্ণ মিষ্টতাদি গুণ বিশিষ্ট চিনি হইয়া থাকে।

পীতবর্ণ অধাতব কঠিন ভূত-পদার্থ গন্ধক ও শ্বেতবর্ণ ধাতু পারদের পরস্পর সংযোগে লোহিত বর্ণ ও সম্পূর্ণরূপে নব গুণ বিশিষ্ট হিঙ্গুল হয়।

ক্লোরীন্ বায়ু ও সোডিয়ম্ ধাতুর যোগে লবণ উৎপন্ন হয়; এই লবণ আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ দুইটী পদার্থই পৃথক অবস্থায় প্রাণ নাশক।

হরিদ্রাবর্ণ কঠিন পদার্থ গন্ধক এবং অদৃশ্য বায়ু—অম্লজানের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে গন্ধক দ্রাবক বা মহাদ্রাবক (Sulphuric acid) নামক তেজস্বী তরল অম্ল জন্মে; ইহাতে দস্তাদি কতিপয় ধাতু দ্রব হয়।

পূর্ব্বোক্ত গন্ধক দ্রাবকের সহিত লৌহের রাসায়নিক সংযোগে হরিত বর্ণ হিরাকস (Sulphate of Iron) জন্মে।

ঐ গন্ধক দ্রাবকের সহিত তাম্র সংযোগে নীলবর্ণ তুঁতে (Sulphate of Copper) হয়।

ভূত পদার্থ অঙ্গার ও জলজানের পরস্পর বিবিধ পরিমাণ সংযোগে গোলাপী আতর প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

এমন অনেক মিশ্রিত পদার্থ আছে, যাহারা রাসায়নিক যৌগিক নহে। সামান্য মিশ্র পদার্থ হইতে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের প্রভেদ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। তরল পদার্থে কঠিন পদার্থ গুলিয়া, দুই কি ততোধিক কঠিন পদার্থ একত্রে নিষ্পেষিত অথবা চূর্ণীকৃত করিয়া, দুইটী তরল পদার্থ একত্রে মিশাইয়া, এইরূপ নানা প্রকারে যে মিশ্র পদার্থ উৎপাদন করা যায়, তৎসমস্ত ভৌতিক বল সহকারে মিশ্রিত মাত্র, রাসায়নিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ বা রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ নহে। রাসায়নিক সংমিশ্রণে ও ভৌতিক বল সহকারে মিশ্রিত পদার্থে অনেক প্রভেদ। রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত যৌগিক পদার্থের প্রত্যেক উপাদান-পদার্থের নিত্যনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আরও রাসায়নিক মিশ্রণোৎপন্ন যৌগিক পদার্থের সম্পূর্ণ গুণান্তর হইয়া যায়। কিন্তু ভৌতিক বল দ্বারা যে সকল পদার্থ মিশ্রিত হইয়া সামান্য মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাদের পরিমাণের ঠিক নাই—যে সে পরিমাণে মিশ্রিত হইতে পারে। এবং মিশ্র পদার্থের তদুপাদান পদার্থ সমূহের গুণ সকলই বিদ্যমান থাকে। চিনি ও বালি একত্রিত করিলে, একটী সামান্য মিশ্র পদার্থ হইবে, তাহারা রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবে না; সুতরাং উহাদের কোনটীর ধর্ম্মেরও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। ঐ মিশ্র পদার্থের একটু মুখে দিলে উহার মিষ্ট আস্বাদন অনুভূত হইবে। আবার, জলে গুলিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইলে, বালি অনেক পরিমাণে পৃথক হইয়া পড়িবে, অবশিষ্ট থাকিবে চিনির পানা।

সোরা, গন্ধক ও কয়লার সংমিশ্রণে বারুদ প্রস্তুত হয়। কিন্তু বারুদ একটী সামান্য মিশ্র পদার্থ মাত্র, রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ নহে; কারণ উহার সোরা, কয়লা ও গন্ধক একত্রে মিশ্রিত থাকিলেও উহারা রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় পরস্পর পরমাণুতে পরমাণুতে সংযুক্ত হয় না, উহাদের প্রত্যেকেই অপরিবর্ত্তিত থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকের আকার,

আয়তন, বর্ণ, ভারাদি সমস্ত গুণই মিশ্র পদার্থ বারুদে বিদ্যমান থাকে। এক কুঁচ পরিমাণ বারুদ লইয়া উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ; উহাকে অল্প জলে ভিজাইয়া লইয়া ও অঙ্গুলি দ্বারা রগড়াইয়া গুঁড়াইয়া ফেলিয়া একটি বলশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে পরীক্ষা করিলে দেখিবে, গন্ধকের হরিদ্রা বর্ণকণা ও কয়লার কৃষ্ণ বর্ণকণা সমূহ স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছে। আবার ঐ কুঁচ পরিমাণ বারুদকে অল্প জল দিয়া ভিজাইয়া লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিয়া সকল জল বাহির করিয়া লইয়া সেই জল টুককে শুকাইয়া লইলে পরে দেখিবে সোরার কোণাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা স্ফাটিকাকারে দানা বাঁধিয়াছে। ইহাও অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে পাইবে। কিন্তু রাসায়নিক আকর্ষণ ঘটিত একটি যৌগিক পদার্থের কিয়ৎপরিমাণ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ; একটু চিনি অথবা এক টুক্‌রা মিছরিকে উত্তম রূপে গুঁড়াইয়া ফেলিলে উহারা অসংখ্য ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত হইয়া পড়িবে, তাহাতে তাহার উপাদান পদার্থ তিনটি পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িবে না। এক একটি কণিকাতেও ঐ তিন মূল পদার্থের সমাবেশ থাকিবে। আবার কিয়ৎ পরিমাণ চিনিকে জলে গুলিয়া ফেলিয়া ঐ জলের এক এক বিন্দু লইয়া পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যেও চিনির কণা বর্ত্তমান দেখিবে। এই রূপে চিনির ক্ষুদ্রতম অংশেও উহার উপাদানীভূত মূল পদার্থ তিনটি পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িবে না। ঐ তিনটি মূল পদার্থের প্রত্যেকের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু পরস্পর রাসায়নিক আকর্ষণ বলে মিলিত হইয়া প্রথমতঃ যে এক একটি আদি যৌগিক অণু হয়, উহারাই চিনির এক একটি মৌলিকাণু। এই রূপে রাসায়নিক আকর্ষণ গুণে সর্ব্ববিধ যৌগিক পদার্থের মৌলিকাণু সমূহ উৎপন্ন হইলে, পরে ঐখানেই রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। তদনন্তর ঐ চরম, শেষ বা আদি যৌগিক অণু অর্থাৎ এক কথায় মৌলিক অণু সমূহ যোগাকর্ষণ শক্তি সহকারে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া ক্রমে স্থূল রূপ ধারণ করে। রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য পরমাণু মধ্যে। কিন্তু যোগাকর্ষণের কার্য্য ও পরমাণু মধ্যে আছে। পদার্থের অণুর সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, অবিভাজ্য চরম অণুকে পরমাণু কহে। সুতরাং পরমাণু সকলের কল্পনাসিদ্ধ অস্তিত্ব থাকিলেও উহাদের কোন রূপ স্বতন্ত্র আকারে আমরা জানিতে পারি না। যখন বহু সংখ্যক পরমাণু একত্রিত হইয়া স্থূল জড়রূপ ধারণ করে, তখনই তাহাকে আমরা দেখিতে পাই। এই রূপে আদি ভূত গুলির দেহ সংগঠিত হইয়াছে। সুতরাং এক একটী আদিভূতগত পরমাণু রাশি যোগাকর্ষণ বলে সংযুক্ত হইয়া আদি ভূতের স্থূল শরীর ধরিয়াছে। রাসায়নিক আকর্ষণ বিষম প্রকৃতিক পদার্থ সকলের পরমাণু সমূহকে আকর্ষণ করিয়া একত্রে সংযুক্ত করিয়া একটী সম্পূর্ণ অভিনব গুণ-বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। আরও উল্লিখিত হইয়াছে, যে প্রত্যেক যৌগিক পদার্থের এক একটি মৌলি-কাণুতে তদুপাদান পদার্থ গুলির নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু সংযুক্ত হইয়া থাকে। তবেই রাসায়নিকাকর্ষণ শক্তিতে যখন যৌগিক পদার্থ সকলের মৌলিকাণু সমস্ত উৎপন্ন হয়, যোগাকর্ষণ বলে তখন সেই যৌগিক মৌলিকাণু রাশি সংযুক্ত হইয়া স্থূল যৌগিক জড় পদার্থের রূপ ধারণ করে।

রাসায়নিক আকর্ষণ সম্বন্ধে যতদূর বলা গেল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে, যে, এক মাত্র পারমাণবাকর্ষণের ত্রিবিধ বিকাশ; সমধর্ম্মী বা একবিধ পদার্থের মধ্যে ইহা যোগা-কর্ষণ, বিষম বা বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থের পরমাণুর মধ্যে ইহা রাসায়নিক আকর্ষণ, আবার বৃহদাকার জড়ের পরস্পর আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। মাধ্যাকর্ষণ গুণে কি ক্ষুদ্র, কি বড়, জড় পদার্থ মাত্র পরস্পরকে স্ব স্ব অভিমুখে টানি-তেছে। বাস্তবিক ইহাও ঐ পারমাণব আকর্ষণের প্রকার-ভেদ মাত্র। অধিকতর পরমাণু বিশিষ্ট জড় ন্যূনায়তন জড়কে স্বাভিমুখে টানিয়া লয়। ইহারই ফলে নিরবলম্ব জড় মাত্র ধরাপৃষ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া পতিত হয় এবং চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্রাদি পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া স্ব স্ব আবর্ত্তমার্গে গতিযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে যোগাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণে প্রভেদ নাই বলিলেও হয়। সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের সূত্রপাত। অন্যথা স্থূল জড় সকলের পরস্পর আকর্ষণ সম্ভবপর নহে। সুতরাং যোগাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ একতুভয় একই আকর্ষণের পূর্ব্ব ও পর পক্ষ মাত্র। মাধ্যাকর্ষণের সধর্ম্মে প্রত্যেক জড়াণু, যতই সূক্ষ্ম হইক না, অপর প্রত্যেক জড়াণুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহার নির্ব্বাচন শক্তি নাই। অর্থাৎ এই আকর্ষণ, জড়াণু বিশেষ বাছিয়া লয় না। সমানায়তন বহু সংখ্যক পরমাণু পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণ সম প্রবল, তাহার ন্যূনাধিক্য নাই। পরস্পর আকর্ষণকারী জড় সমূহের আয়তন অনুযায়ী তাহাদের আকর্ষণের ন্যূনা-ধিক্য হইয়া থাকে। মাধ্যাকর্ষণ পরমাণুর প্রকৃতি দেখে না,

পরিমাণ মাত্র দেখে। কিন্তু রাসায়নিক আকর্ষণের প্রকৃতি বিভিন্ন। ইহা বিষম প্রকৃতিক পদার্থের পরমাণু মধ্যে কার্য্য করে। সমজাতীয় দুই পরমাণু কখনই রাসায়নিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় না।

যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদিগের কল্পনার অতীত দূরস্থিত জড় মধ্যে কার্য্য করে, রাসায়নিক আকর্ষণের ধর্ম্ম তাহার বিপরীত অর্থাৎ এই আকর্ষণের অধীন পরমাণু সমূহ পরস্পরের অতীব সন্নিকটে না আসিলে উহারা রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবে না। রাসায়নিক আকর্ষণ পরমাণু সকলের পরস্পর এত অল্প দূর মধ্যে কার্য্য করে যে, সেই দূরত্বের পরিমাণ আমরা কল্পনায়ও স্থির করিতে পারি না। আমরা যে সোডা (Soda) ও এসিড (Acid) জলে গুলিয়া পান করিয়া থাকি, তাহার দুইটি গুঁড়া পদার্থ; সোডা শ্বেত বর্ণ একপ্রকার ক্ষারের গুঁড়া এবং তিন্তিড়াম্ল (Tartaric acid) একটি শ্বেতবর্ণ গুড়া অম্ল বিশেষ। এই দুই পদার্থের পরস্পর রাসায়নিক শক্তি প্রবল; কিন্তু শুষ্ক গুড়ার অবস্থায় উহাদের একত্রিত করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া মর্দ্দন করিলেও তন্মধ্যে কখনই রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হইবে না; কারণ উহারা চূর্ণীত হইয়া সূক্ষ্ম গুঁড়া হইয়া আসিলেও উহাদের কণা সকল তথাপি এত বড় বড় থাকিয়া যায় যে, সেরূপ অবস্থায় তাহারা পরস্পর যথেষ্ট সন্নিকৃষ্ট হয় না এবং অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট না হইলেও তাহারা কখনই রাসায়নিক সম্বন্ধে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটি অভিনব রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ হইতে পারিবে না। সেই জন্য উহাদের পরস্পর আরও ঘনিষ্ট সংমিলন সাধন করিবার উপায় স্বরূপ উহাদের সহিত জল মিশ্রিত করিতে হয়। জল সহকারে ঐ দুই পদার্থ পরস্পর এত সন্নিকৃষ্ট হইয়া আইসে যে তখন তন্মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হইয়া ফুটিয়া উঠে। এবং তাহাদের এবম্বিধ সংযোগে একটি সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহাতে ক্ষারের ক্ষারত্ব এবং অম্লের অম্লত্ব স্বতন্ত্রভাবে থাকে না। দুই গুণে মিলিয়া একটি নূতন গুণ লবণত্বে দাঁড়ায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই আকর্ষণ শক্তি এরূপ কল্পনাতীত অল্প দূর মধ্যে কার্য্য করিলেও উহার বল কিছু সামান্য নহে। একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, যে লৌহময় তার এক মণ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিতে সক্ষম, সেই তার কিয়ৎপরিমাণ যবক্ষার দ্রাবক (Nitric acid) ও জলের মিশ্রণে নিমগ্ন করিলে দুই চারি মিনিটের মধ্যে নিঃশব্দে দ্রবীভূত হইবে। সমগ্র কঠিন ধাতুময় তারটী একেবারে গলিয়া তরল ভাবাপন্ন হইবে। তাহার পূর্ব্ব কাঠিন্য ও ভারবহত্ব গুণের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতার ইতিহাস।

(প্রথম খণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

একাদশ অধ্যায়।

সতীদাহ বিষয়ক আন্দোলন—ডাক্তার জনস্—জে, পেগস্—বিবি ফ্যানি পার্কস—রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবন—সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেলের সহিত পরামর্শ—সতীদাহ নিবারণ—তদ্বিরুদ্ধে ধর্ম্ম সভার বিলাত আপীল—সংবাদ প্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ডফ সাহেব—আদি ব্রাহ্মসমাজ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বেণ্টিঙ্কের সময়ে সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয়; এস্থলে ঐ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে।

সহমরণ প্রথা বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুগণ এই প্রথাটি হিন্দুধর্ম্ম সঙ্গত বলিয়া প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। কখন কখন পতিপ্রাণা রমণী স্বেচ্ছায় পতির জলচ্চিতায় অকাতরে দেহ ঢালিয়া দিয়া পতিবিয়োগ দুঃখের অবসান করিতেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলে কুটিল দায়াদগণের কূটচক্রে এরূপ ভয়ঙ্কর রূপে নারীহত্যা ঘটিত, যে, তদ্দর্শনে সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয় কাঁদিয়া থাকে। ধর্ম্মবীর আকবরসাহ এই বীভৎস কাণ্ড নিরাকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং কতক অংশে সকলমনোরথও হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্য স্থায়ী হয় নাই। ইংরাজেরা প্রথমতঃ হিন্দুদিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ হইবার ভয়ে



রাজা রামমোহন রায়।

এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষিত হয়।

"রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু আডাম সাহেব তাঁহার বিলাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, 'আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপন অবধি গবর্ণমেণ্ট ও তাহার কর্ম্মচারীদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিদিন অন্ততঃ এই রূপ দুইটি হত্যাকাণ্ড সুস্পষ্ট দিবালোকে সংঘটিত হইত, এবং প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৫।৬ শত অনাথা রমণীকে এই রূপে নিহত করা হইত।" *

প্রথমে যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ ভয়ে সতীদাহ নিবারণে উপেক্ষা করিতেন, তাহাই নহে, অন্য কোন ইংরাজ যাহাতে এ বিষয়ে কোন কথা না কহেন, সে বিষয়েও সতর্ক ছিলেন, এমন কি ডাক্তার জন্স নামে একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক, "সতীদাহ নিবারণ" সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করিয়া ভারত হইতে বিতাড়িত হন।

খ্রীঃ ১৮২৮ অব্দের ৯ই মার্চ্চ, জে, পেগ্‌স নামক এক ব্যক্তি, "The Suttee's cry to Britain" এবং তৎপরে বিবি ফানি পার্কস (Fanny Parks) তাঁহার "Wanderings of a Pilgrim &c." নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের হৃদয় বিদারক দৃশ্য সকল বর্ণনা করেন। তৎপরে রাজা রামমোহন রায় এই আন্দোলনে যোগ দেন।

এই সহজ ধার্ম্মিক মহাত্মা হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর নামক গ্রামে খ্রীঃ ১৭৭৪ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি সংক্ষেপে আত্মজীবন বর্ণনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার বাঙ্গালা জীবন চরিতে † তাহার অনুবাদ প্রকাশিত আছে, এ স্থলে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

"আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশীয়েরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিতেছেন। * * * "কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযাজক ব্যবসায়ী।" * * * "আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম।" * * * "আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই।" * * * ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইলে, আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে, আমার পিতা আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিলেন; আমি পুনর্ব্বার তাঁহার স্নেহ লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের আইন ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে একপ্রকার জ্ঞানলাভ করিলাম তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিকতর দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম; তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিল, তাহাদিগের শাসন, বিদেশীয় শাসন হইলেও উহা দ্বারা শীঘ্র দেশবাসীগণের অবস্থোন্নতি হইবে। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস পাত্র ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্ক বিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার প্রতি পুনর্ব্বার বিমুখ হইলেন, কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর, আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী। ৮১ পৃষ্ঠা।

† শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ৪-৮ পৃঃ।

সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, যে দুই তিন জন স্কটলণ্ডবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাঁহারা যে জাতি অন্তর্গত তাহাদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ।”

"আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন, বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মত বিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্বেও আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।”

“এই সময়ে ইয়ুরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। ইত্যাদি”—

সতীদাহ নিবারণ পক্ষে যত্ন করাতে রামমোহনকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সে সকলই অচলের ন্যায় অটল হইয়া সহ্য করিয়া ছিলেন।

খ্রীঃ ১৮০৫ অব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, সহমরণ প্রথা নিবারণ করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পরে গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম কেভেন্দিস বেণ্টিঙ্ক, ইহাঁরই যুক্তিতে, সতী দাহ নিবারণে হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, বুঝিয়া খ্রীঃ ১৮২৯ অব্দের শেষ ভাগে ইহা আইন দ্বারা নিবারিত করেন।

এই উপলক্ষে বেণ্টিঙ্ককে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়, তাহাতে বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর, বাবু কালীনাথ রায়, তেলিনী পাড়ার বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তিন চারিজন লোক ব্যতীত দেশের কোন সম্ভ্রান্ত লোক স্বাক্ষর করেন নাই।

সতীদাহ নিবারণের আইন রদের জন্য ধর্ম্মসভা বিলাত আপীল করেন। সেই সময়ে খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে মহাত্মা রাম মোহন রায় বিলাত গমন করেন।

খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত খ্রীঃ ১৮০৯ অব্দে ত্রিবেণীর পরপারস্থ কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়া পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইহাঁরা বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। ইনি যদিও বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষালাভ করেন নাই তথাপিও এক কবিত্ব গুণেই আজ তিনি বঙ্গদেশে বিখ্যাত। সংবাদ প্রভাকর প্রথম সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া ক্রমে ১৭৬১ শকের ১লা আষাঢ় হইতে প্রাত্যহিকরূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়া অদ্যাপিও প্রকাশিত হইতেছে। তৎপরে ইনি সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ড পীড়ন নামে আরও দুই খানি সপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করেন, এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসে কবিতাময়ী মাসিক প্রভাকর প্রকাশিত হইত। এতদ্ব্যতীত ইনি, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ কবিকঙ্কন প্রভৃতি কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন প্রকাশিত করিয়া ছিলেন। ইনি পাঁচালীর হাফআকড়াই প্রভৃতিতে গীতাদি রচনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দু বিকাশ প্রভৃতি রচনা করিয়া খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই সময়েই মহাত্মা ডফ্ কলিকাতায় আগমন করিয়া তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয় প্রথম রাজা রামমোহন রায়ের সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই স্থাপিত হয়।

খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। এই সমাজ অদ্যাপি যোড়াসাঁকোতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহারই বর্ত্তমান নাম আদি ব্রাহ্ম সমাজ।

(ক্রমশঃ)



এচ্ মচ্ ঃকু

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্টস স্কুলের মৃত প্রিন্সিপাল

এচ্ এচ্ লক।

শিল্পজগতে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে, আমাদিগকে, শোকসন্তপ্তহৃদয়ে একজন প্রধান শিল্পবন্ধুর মৃত্যু সম্বাদ পাঠকদিগকে জ্ঞাপন করিতে হইল। গবর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ সুশিল্পগুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত এচ্, এচ্, লক গত খ্রীষ্টমস্ উৎসব সময়ে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ আকাস্মিক মৃত্যুতে শিল্পবিদ্যালয় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলিতে ইচ্ছা করিনা। আমাদের যাহা কিছু তাঁহার সম্বন্ধে বক্তব্য আছে, তাহা কলিকাতার ইতিহাসে যথা সময়ে লিখিত হইবে। অদ্য কেবল, তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহার কতক জানাইবার জন্য সুযোগ্য সঞ্জীবনী সম্পাদকের লেখনী-নিঃসৃত প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২৫শে ডিসেম্বর শুক্রবারে কলিকাতা আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত এচ্, এচ্, লক সাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন। লক সাহেব গত ৩।৪ বৎসরাবধি দারুণ রোগাক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু ইদানীং রোগের এমন কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই যদ্দ্বারা তাঁহার জীবন সংশয় হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। মিঃ লক লাহোর শিল্প বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ কিপ্লীং ও বোম্বাই শিল্প বিদ্যালয়ের সুপারিটেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্রিফীথসের সহিত বিলাতের কেনসিংটন কলেজে একত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং উক্ত কলেজের কর্তৃপক্ষদিগের বিশেষ অনুরোধেই তিনি প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যালের পদে অভিষিক্ত হন। যখন তিনি প্রথম স্কুলে পদার্পণ করেন, তখন আমাদের দেশ মধ্যে শিল্প চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব বড়ই অল্প ছিল। কামার, কুমার, ছুঁতার প্রভৃতি শ্রমজীবি শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভদ্রবংশীয় সন্তানগণ এখানে শিক্ষালাভ করিতে বড় অগ্রসর হইত না। কিন্তু কালের অপ্রতিহত গতি কে রোধ করিতে পারে? চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার জন্য অনেক হিন্দুসন্তান প্রথমতঃ শবদেহ স্পর্শ করিতে অস্বীকার করেন। সমাজপতিগণ ঘোররবে ধর্ম্মহানির ভাণ করিয়া রাজপুরুষদিগের সংকার্য্যের প্রতিবন্ধকতায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু এখন সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন শত শত শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় পুরুষ, এমন কি অল্প সংখ্যক হিন্দুরমণী পর্য্যন্ত, সেই ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। চিকিৎসা বিদ্যার ন্যায় শিল্প বিদ্যারও অনেক দুরবস্থা আমাদের দেশে পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। শিল্পবিদ্যালয় যখন প্রথম খোলা হয়, তখন বালকদিগকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তাহাদিগকে যন্ত্রাদি ও কাগজ পত্র দিয়া বিনা বেতনে শিক্ষাদান করা হইত; তারপর কিছুকাল অতীত হইলে যখন অল্প সংখ্যক দেশীয় বালকের চিত্ত এদিকে আকৃষ্ট হয়, তখন যন্ত্রাদি না দিয়া কেবল মাত্র বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদিন স্কুলটী একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে ন্যস্ত ছিল, কিন্তু ক্রমে দেশবাসীর ইচ্ছা যখনই বাড়িতে লাগিল, বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যখন পরিবর্দ্ধিত হইল, তখন গবর্ণমেণ্ট উহার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া এক টাকা বেতন ধার্য্য করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই লক আসিয়া যোগদান করেন। এইরূপে কিছুকাল কার্য্য চলিলে বিগত ১৮৭৬ সালে যখন গবর্ণমেণ্টের সদয় দৃষ্টিতে ও লক সাহেবের আন্তরিক যত্নে বিদ্যালয়ের জন্য বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটী ভবনের পরিবর্ত্তে তিনটী শিক্ষাভবন ভাড়া লইয়া কার্য্যাবলী বাড়ান হয়, তখন হইতে স্কুলের বেতন ৩ টাকা করিয়া ধার্য্য হয়। এখনও সেই বেতন চলিতেছে। এখন এই বিদ্যালয়ে সদ্বংশীয় ও শিক্ষিত বালকগণের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার সহিত অদ্যকার তুলনায় আমরা এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম প্রায় তাহার সমস্তই মিঃ লকের সময়ে ঘটিয়াছে। যখন লক সাহেব প্রথম যোগদান করেন, তখন ছাত্র সংখ্যা ৩৫ জন ছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় ২২৫ জন হইয়াছে। গতবারের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের মন্তব্যে ইহাদিগের প্রশংসা শুনিয়া কে না সন্তুষ্ট হইবেন? মিঃ লকের সাহায্যেই আমাদের দেশে আজ কাল কয়েকটি প্রসিদ্ধ শিল্পীর নাম শুনা যাই-

তেছে। তাঁহার সাহায্যে কয়েক জন মূক ও বধিরের উদরান্নের সংস্থান হইয়াছে। যে খ্যাতনামা শিল্পীবর অন্নদা প্রসাদ বাগ্‌চীর কথা পাঠকগণ আমাদের পত্রিকায় সময়ে সময়ে পাঠ করিয়াছেন—লক্ সাহেবই তাঁহার শিক্ষাদাতা—অন্নদা বাবু আজ কলিকাতা আর্টস্কুলের শিরোভূষণ। যে আর্টষ্টুডিও কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিগত কয়েক বৎসর কাল হিন্দু সমাজে শিল্প সম্বন্ধে এক নবযুগের আবির্ভাব করিয়াছে—যাহার জীবনদাতাগণের সদ্দৃষ্টান্তে দেশের নানাস্থানে শিল্পসমিতি, চিত্রালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে—সেই আর্টষ্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতাগণও লক সাহেহেবের বনেয়া। লর্ড নর্থব্রুক যে আর্টগেলারি স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশ মধ্যে প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগের চিত্রালেখ্য এক স্থানে দেখিবার সুবিধা করিয়াছেন—পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে সেই চিত্রশালা সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী মিঃ লক। বঙ্গের এমন উপকারী ব্যক্তির নাম আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে চিরকাল স্মরণ করিব।

আর একটী বিষয়ের জন্যও লকের নাম না করিয়া থাকা যায় না। ১৮৭৪ সালে যখন সার জর্জ্জ কাম্বেল বাহাদুর ইকনমিক্ মিউসিয়াম স্থাপন করেন, তখন লক সাহেব তাহার সেক্রেটরীর পদে মনোনীত হন। এখানকার সেক্রেটরী স্বরূপে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত হইয়া পড়ে। লণ্ডন, ভিয়েনা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বৈদেশিক প্রদর্শনীতে বঙ্গদেশ হইতে দ্রব্যজাত পাঠাইবার জন্য যখন যে কোন সভা সংস্থাপিত হয়, মিঃ লক সেই সমস্ত সভার সেক্রেটরীর পদে বরিত হন। ইহাতে ভারতবর্ষের শিল্প ও শ্রমজাত দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁহার বহুল জ্ঞান জন্মে। কিন্তু লকের মেজাজ বড় ভাল ছিল না। বিচক্ষণ কার্য্যপটু ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইয়াও সামান্য ত্রুটিতে তাঁহার অন্তরে ক্রোধ বহ্নি জলিয়া উঠিত, সেই জন্য তাঁহার নামে একটু কলঙ্ক পড়িয়াছে। এই অপরিহার্য্য ক্রোধের হাত এড়াইতে না পারিয়াই বিগত ১৮৮১-৮২সালের প্রদর্শনীর সময়ে উক্ত মেলার সভাপতি জষ্টিস প্রিন্সেপ সাহেবের সহিত সাধারণের অজানিত কোন এক বিষয় লইয়া লকের বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদ ঘনীভূত হইয়া মেলার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়। বিবাদের সময় লক অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন—পীড়িতাবস্থায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়াতে তিনি সভাপতির নিকট অবনত হইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তিনি যেরূপ স্বাধীন-চেতা ছিলেন তাহাতে অপরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক বলিয়া বোধ হইত। এই সময়ে ইডেন সাহেব বঙ্গের ছোট লাট ছিলেন। তিনি নিজে প্রদর্শনী সম্বন্ধে লকের ন্যায় একজন সুদক্ষ ব্যক্তি মেলা ভার এমন সকল উচ্চ দরের কথা লিখিয়া লক সাহেবকে বিবাদ মিটাইবার জন্য গোপনে অনুরোধ করেন। কিন্তু তত্রাচও লকের অটল প্রতিজ্ঞার ব্যত্যয় হইল না। তিনি রাজপুরুষদিগের ক্রোধে পড়িয়া মিউসিয়ামের কর্ম্ম হইতে কলে কৌশলে অপসৃত হইবার জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ পীড়াপীড়িতে ২॥০ বৎসর ফর্লো লইয়া বিলাত গমন করিতে বাধ্য হইলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর মিউসিয়ামের কর্ম্ম পাইলেন না। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার পর সিভিল লিষ্টে বরাবর মিউসিয়ামের সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট রহিল অথচ কার্য্যতঃ আর একজন প্রতিনিধি সেক্রেটারী মিউসিয়ামের কার্য্য করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের এ লীলার অর্থভেদ কে করিবে? লকের নিকট যাঁহারা কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অনেকেই তাঁহার ঔদ্ধত্য ও খিটখিটে মেজাজের পরিচয় দিয়া যথেষ্ট নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা শুদ্ধ নিন্দায় কর্ণপাত করি না। আমরা বেশ জানি তিনি গুণীর গুণগ্রাহী ছিলেন, কেবল অকর্ম্মণ্যের পক্ষে ত্রাসস্বরূপ ছিলেন। কোন ভাল ছাত্র বা তাঁহার অধীনস্থ সুদক্ষ কর্ম্মচারীগণ কখনও তাহার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয় নাই।”—

(সঞ্জীবনী,—১৯এ পৌষ, ১২৯২ সাল।)

পাণ্ডব-চরিত।

(প্রথম খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

দ্বাদশ দৃশ্য।

ব্যায়ামশালা।

দ্রোণ।

দ্রোণ।—(স্বগত)—সফল আয়াস মোর—এতদিনে, পূরিবে বাসনা সম্ভাবনা হ'য়েছে তাহার। বীর পরিপূর্ণ রঙ্গভূমে-যে পরীক্ষা দিয়াছে অর্জ্জুন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর সে যে ধরা মাঝে, বিন্দুমাত্র নাহিক সন্দেহ তাহে—সন্তুষ্ট হয়েছে সবে—সন্তুষ্ট হয়েছি আমি সবাকার চেয়ে—সত্য বটে, অধিরথসূত কর্ণ, অর্জ্জুনের মত ধনুর্দ্ধর তবুও সে সূতপুত্র—অর্জ্জুন—ক্ষত্রিয়—হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন, প্রাণাধিক শিষ্যমোর—দ্রুপদ! এইবারে লব প্রতিশোধ—সভামাঝে করিয়াছ অপমান, দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলি, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ আজ কি অমূল্য রত্নে ধনী দেখেছে কৌরবগণ—কালি প্রাতে দেখিবে জগৎ—ভীমার্জ্জুন! দীর্ঘ-জীবী হ'রে বৎস তোরা—হ'রে তোরা ভুবন বিজয়ী—আশী-র্ব্বাদ করি তো সবারে আমি। হরির কৃপায়—তোদেরি সহায়ে—অন্তরের দারুণ অনল নিভিবে নিভিবে আজি। আজো মনে আছে জাগি' সে তীব্র বচন—আজিও বিঁধিছে হৃদে তীক্ষ্ণ সূচী সম বাক্যবাণ দ্রুপদের—যবে সভাতলে গেলাম অবোধ শিশু অশ্বথামা সনে, করাতে স্মরণ বাল্যসখ্য—বাল্যসখা দ্রুপদের কাছে। বলিলেক মন্দবুদ্ধি—ধনি সনে দরিদ্রের বন্ধুত্ব কখন নহেক সম্ভব—ওঃ নিদারুণ অপমান—নিশ্চয় লইব প্রতিশোধ—আজি শিষ্যগণ পাশে, দক্ষিণা চাহিব দ্রুপদেরে—অর্জ্জুনের বাহুবলে নিশ্চয় দ্রুপদ আসিবেক পদতলে মোর। তখন বুঝাব তারে কেবা ধনী কে নির্দ্ধনী আমা দোঁহাকার মাঝে। ঐত—আসিছে শিষ্যগণ—দক্ষিণা মাগিব এই বার।

ভীম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরু-বালকগণের প্রবেশ।

দ্রোণ।—শুন, শিষ্যগণ, শিক্ষাপূর্ণ হইয়াছে তোমা সবা-কার—কর দান দক্ষিণা আমারে—অর্থে মোর নাহি প্রয়োজন—শুধু এই মাত্র চাই—করি রণ পাঞ্চালের পতি দ্রুপদেরে বন্দী করি, দেহ আনি মোরে—যেই জন একার্য্য সাধিবে, সেই প্রিয়তম শিষ্য মোর—মোর আশীর্ব্বাদে জয়-শ্রী সর্ব্বদা তার রবে বশীভূত।

ভীম।—দেহ অনুমতি মোরে এখনি একার্য্য তব আসিব সাধিয়া।

দ্রোণ।—সবে মিলি করহ গমন।

অর্জ্জুন।—গুরুদেব! দেহ পদধূলি শিরে, কালি, প্রাতে দ্রুপদেরে দিব তব পদে।

দ্রোণ।—শ্রীহরি করুন কৃপা তোরে।

দুর্য্যো।—দুঃশাসন, জলসন্ধ, সুলোচন ভাই, ভাইরে যুযুৎসু, চল সবে মিলিয়া এখনি পশি দ্রুপদের দেশে, বন্দী করি আনি তারে। অর্জ্জুনের আস্ফালন আস্ফলনে হ'ক অবসান।

[ভীমার্জ্জুন ব্যতীত কুরুবালকগণের প্রস্থান।

দ্রোণ।—ভীমসেন নাহি গেলে তুমি?

ভীম।—দুর্য্যোধন সনে কোথাও না করিব গমন।

দ্রোণ।—কহরে অর্জ্জুন কখন যাইবে তুমি?

অর্জ্জুন।—যাইব এখনি গুরো, তুমিও'ত যাইবে সংহতি।

দ্রোণ।—অবশ্য যাইব আমি, কিন্তু নাহি পশিব সমরে।

অর্জ্জুন।—আজি অস্ত্র পরীক্ষা মোদের। দেহ অনুমতি জননীর পদধূলি করিয়া গ্রহণ, জ্যেষ্ঠে তব আদেশ কহিয়া—খুল্লতাত বিদুরের ল'য়ে অনুমতি, এখনি আসিব।

দ্রোণ।—যাও ভীম অর্জ্জুনের সাথে—আমি যাই, যথা এবে শান্তনু নন্দন। জননীর আশীর্ব্বাদ করিয়া গ্রহণ, এস দোঁহে ত্বরা মোর পাশে।

[সকলের প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

রণক্ষেত্র—দূরে দ্রুপদের রাজধানী

বৃক্ষমূলে দ্রোণ ও ভীমার্জ্জুন।

দ্রোণ।—হের পার্থ, ঐ সবে করি'ছে সমর, পাঞ্চালেরা ঘোর বলে আক্রমণ করেছে সবারে—এখনি কৌরব শিশুগণ রণে ভঙ্গ দিবে, হেন হয় অনুমান। তুমি একা কিরূপে যুঝিবে বুঝিতে না পারি।

অর্জ্জুন।—অন্য বল কিছু নাহি চাই, শুধু এচরণ ধূলি বলে পারি ধরা রসাতলে দিতে, দ্রুপদে বাঁধিব রণে, কি আশ্চর্য্য তাহে।

দ্রোণ।—কহ বৎস, অসংখ্য পাঞ্চালবীর সনে কিরূপে যুঝিবে একেশ্বর। এই মাত্র বলিলে ভীমেরে সাহায্য না করিতে তোমারে। বল বীর, কিরূপ করিবে যুদ্ধ করিয়াছ স্থির।

অর্জ্জুন।—গুরুদেব, করিয়াছি মনে, মহাবল দিব্য অস্ত্র-চয় থাকিবেক তূণে, শুধু সামান্য সায়কে যুঝিব ক্ষণেক সৈন্য-গণ সনে, পরে নাগপাশ—

দ্রোণ।—নাহি এড় নাগপাশ—দ্বাপরের হীনবল মানব দ্রুপদ।

অর্জ্জুন।—তবে সম্মোহনে মোহিত করিয়া সৈন্যগণে, দ্রুপদের সনে করিব দ্বৈরথ যুদ্ধ।

দ্রোণ।—উপযুক্ত করেছ মনন, কিন্তু হের ঐ কুরু শিশু-গণ—রণে ভঙ্গ দিয়া করে পলায়ন—এই বেলা পশহ সমরে, করি আশীর্ব্বাদ, হরির কৃপায় মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ।

[অর্জ্জুনের দ্রোণ-পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

ভীম।—দেখুন আচার্য্য, একবার চেয়ে—বাণে বাণে আচ্ছন্ন গগন। হের গুরো, একাই অর্জ্জুন এড়ি শত শত বাণ ক্ষণে ক্ষণে, আক্রমিছে শত শত জনে—কি আশ্চর্য্য অস্ত্রখেলা—ইচ্ছা করে এই দণ্ডে পশি রণাঙ্গনে—কিন্তু, অর্জ্জুন করেছে নিবারণ পশিবারে রণাঙ্গনে—

দ্রোণ।—কি আশ্চর্য্য রণে ভঙ্গ দিল, ক্ষণ মধ্যে পাঞ্চালের সেনা—ঐত অর্জ্জুন এড়িলেক সম্মোহন বাণ—মূর্চ্ছিত সকল সেনা ধন্য ধন্য ধন্যরে অর্জ্জুন, সন্তুষ্ট হ'য়েছি তোর হেরি বীরপণা—আশীর্ব্বাদ করি হওরে ভুবনজয়ী বীর—এইবার দ্রুপদেরে আক্রমণ করেছে অর্জ্জুন—ঐ আসে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে করিতে দুইজনে।

দ্রুপদার্জ্জুনের অসিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর দ্রুপদের অসিস্খলন।

অর্জ্জুন।—(দ্রুপদের স্খলিত অসি লইয়া দ্রোণের প্রতি)—গুরুদেব এই লহ পাঞ্চাল ঈশ্বরে—প্রতিজ্ঞা পূরণ হ'ল মোর—

দ্রোণ।—অর্জ্জুন, বৃদ্ধ মহারাজে কর প্রণিপাত। (অর্জ্জুনের দ্রুপদকে প্রণিপাত)—হে পাঞ্চালরাজ, আমারি আদেশে মথিত হ'য়েছে তব সেনা—রাজ্য তব আমারি আয়ত্ত এবে—পার কি এখন সখা বলি সম্বোধন করিতে আমারে? অর্জ্জুনের বাহুবলে অর্জ্জিত পাঞ্চাল রাজ্য—অর্দ্ধেক তোমায় করিলাম দান, উত্তর পাঞ্চাল হইল আমার, চল এবে মোর সনে, অহি-চ্ছত্র নগরীতে রাজধানী আমি করিব স্থাপন।

[দ্রুপদকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

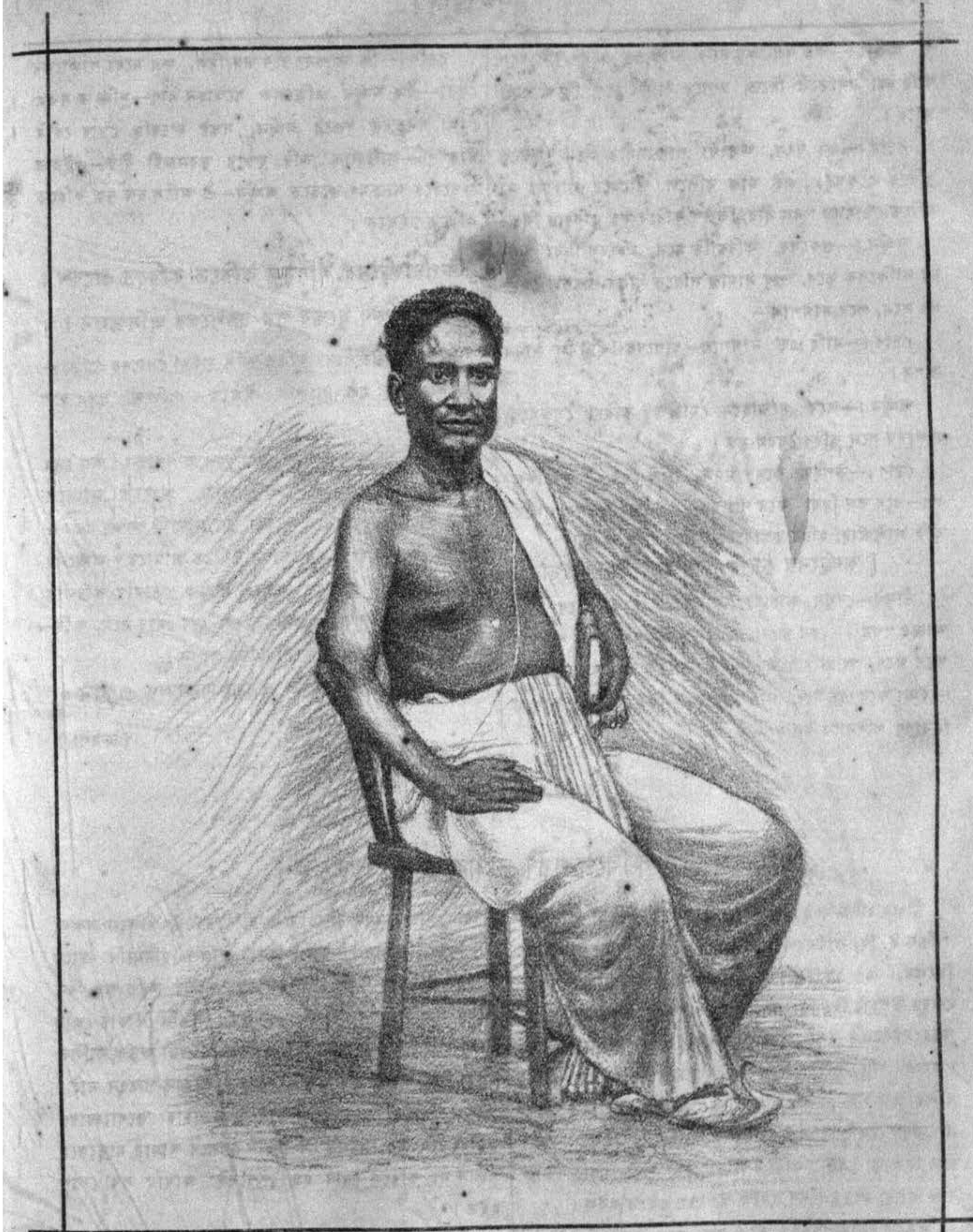
(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন।

যাঁহার রচিত সংস্কৃত দক্ষযজ্ঞ কাব্য পাঠ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ই, বি, কাউয়েল "কবিকেশরী" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর স্বর্ণ কেয়ূর উপহার দিয়াছিলেন, যাঁহাকে বঙ্গদেশের প্রথম নাটক-কার বলিলেও বলা যাইতে পারে। যাঁহার আর্য্যাশতক ও দক্ষযজ্ঞ পাঠ করিলে সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচনা বলিয়া ভ্রম হয়, যাঁহার নাটক রচনার জন্য "নাটুকে রাম-নারায়ণ" বলিয়া সর্ব্বত্র বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, আজি আমাদিগকে সেই "কবিকেশরীর" মৃত্যু সম্বাদ শোকসন্তপ্ত-বক্ষে লইয়া পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল।

তর্করত্ন মহাশয় ১৭৪৪ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রামধন শিরোমণি দারিদ্রের উৎপীড়নে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কলিকাতার দক্ষিণ হরিনাভি গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তর্করত্নের জন্মের অতি অল্প দিন পরেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ও তৎপত্নী কর্ত্তৃক লালিত হইয়া পিতৃ মাতৃ বিয়োগ কষ্ট অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে স্বীয় ভ্রাতৃজায়ায় গুণোদ্ঘোষণ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে "তিনি শৈশবে আমার মাতৃস্নেহে পালন না করিলে বোধ হয় শৈশবেই আমার সত্তা লোপ হইত।"

তিনি বাল্যকালে স্বীয় জন্মগ্রামেই হরিনাভি নিবাসী



কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন।



দ্রুপদ-বিজয়।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, স্মৃতি ও কয়েক খানি সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তৎপরে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পূর্ব্বদেশস্থ পোড়া নামক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াই কনিষ্ঠ সহোদরকে আপনার নিকট আনিয়া, সংস্কৃত কালেজেই শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বাল্যেই তর্করত্নের রচনার স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু সে সময়ের রচনা সূর্য্যালোক দেখে নাই। খ্রীঃ ১৮৫২ অব্দের প্রারম্ভে রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যে, "পতিব্রতা উপাখ্যান বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচয়িতাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" সেই বিজ্ঞাপনানুসারে অনেকেই ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। তর্করত্ন মহাশয় তখন সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনিও ঐ বিজ্ঞাপন দৃষ্টে "পতিব্রতোপাখ্যান" রচনা করিয়া ভূম্যধিকারী মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায়, তিনিই বিজ্ঞাপিত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে পতিব্রতা রমণীগণের স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তৎসম্বন্ধীয় নানা প্রকার উপদেশ শাস্ত্রীয় শ্লোকাদি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে ও সতী অসতীদিগের নানারূপ উপাখ্যানাদিও বর্ণিত আছে। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ঐ সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত ভূম্যধিকারী মহাশয় কৌলিণ্যের দোষোদ্ঘোষক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচয়িতাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন বলিয়া আর এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তর্করত্ন মহাশয় এই বিজ্ঞাপন অনুসারে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক রচনা করিয়া বিজ্ঞাপিত পারিতোষিক লাভ করেন। তর্করত্নের কালেজ ত্যাগের এক বৎসর পরে খ্রীঃ ১৮৫৪ অব্দে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব রচিত হয়।

তাঁহার পাঠ সমাপ্তির দুই বৎসর পরে তিনি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। সেই পদে তিনি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া খ্রীঃ১৮৮৩ অব্দের জানুয়ারি মাসে পেন্সন গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্য্যময় জীবন কোন কালে স্থির থাকিবার নয়, তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল, শেষাংশও সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে পারে নাই। তিনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াও বাটীতে দেশস্থ ব্রাহ্মণ বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ কার্য্যের সুবিধার জন্য খ্রীঃ ১৮৮৪ অব্দের ৩০শে নবেম্বর রবিবার স্বীয় জন্মগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেশস্থ লোকেরা উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় ছাত্রগণের অবস্থান ব্যয়ের সাহায্য জন্য মাসিক ১০ টাকা করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দূরদেশ হইতে ছাত্র আসিয়া চতুষ্পাঠীতে অবস্থান করিয়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জন্মগ্রামের—অভিশপ্ত হরিনাভি গ্রামের—সৌভাগ্য স্বপ্ন সুদূরস্থ—এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তর্করত্ন মহাশয় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। প্রায় ৬মাস কাল উদরী রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া ১২৯২ সালের ৭ই মাঘ গত ১৯এ জানুয়ারিতে তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

তর্করত্ন মহাশয় পূর্ব্বোল্লিখিত দুইখানি গ্রন্থের পরে ক্রমে ক্রমে রত্নাবলী, বেণীসংহার, শকুন্তলা, নবনাটক, মালতীমাধব, রুক্মিণীহরণ, স্বপ্নধন, ধর্ম্মবিজয় ও ধনুর্ভঙ্গ নাটক এবং যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, চক্ষুদান ও উভয়সঙ্কট এই তিন খানি প্রহসন প্রণয়ন করেন। নবনাটক, মালতী-মাধব প্রভৃতি নাটক ও কয়েক খানি প্রহসন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের উৎসাহে রচিত, প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়াছিল। ধর্ম্মবিজয় তাঁহার জন্মগ্রামে, তাঁহারই যত্নলালিত বঙ্গনাট্য সমাজের জন্য প্রণীত এবং সেই সমাজের দ্বারাই প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়াছিল। ধনুর্ভঙ্গ নাটক অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

এই সমুদায় নাটক ও প্রহসন ব্যতীত, তিনি আর্য্যাশতক ও দক্ষযজ্ঞ নামে দুই খানি সংস্কৃতকাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

তর্করত্ন মহাশয় অতি মধুরভাষী ও পরিহাসরসিক ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থনিচয়, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষোক্তিমালায় পূর্ণ। বঙ্গে সে সকল গ্রন্থের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই।

আমরা এই স্থলে সুযোগ্য সোমপ্রকাশ সম্পাদকের উক্তি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"তর্করত্ন নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যাঁহারা ইঁহার সহিত অল্প সময়ের জন্যও আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার রসপূর্ণ মিষ্টালাপ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

বাঙ্গালা নাটকের ইনি এক প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে *। * * * তিনি সংস্কৃত ভাষা, কাব্য ও অলঙ্কার বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত কবি আর কেহ ছিল না। তাঁহার প্রণীত "দক্ষযজ্ঞ" ও "আর্য্যাশতক" সর্ব্বত্র বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। * * বস্তুত সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কবিত্বশক্তি এতদূর মধুর এবং গাঢ় ছিল যে তাঁহার নাম না থাকিলে কেহ তাহার প্রণীত কাব্যগুলি আধুনিক কবির রচিত বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না। তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কার পূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অলঙ্কারের পণ্ডিতরূপে বহুকাল অধ্যাপক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ছাত্রদিগের নিরতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য, ইহাঁর এতদূর যত্ন ছিল যে, একটি হরিসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি রবিবার বক্তৃতা ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠাদির দ্বারা সভ্যদিগকে উপদেশ দান করিতেন। * * * * তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তাদৃশ সুবক্তাও ছিলেন। যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলেই ব্যগ্র হইতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে রসগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা মুগ্ধ করিতেন। ইহাঁর অভাবে আপামর সাধারণ এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই।"

* সাধারণতঃ তর্করত্ন মহাশয়ের কুলীনকুলসর্ব্বস্ব বঙ্গ-ভাষায় প্রথম নাটক বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু ভদ্রার্জ্জুন নামে একখানি নাটক কুলীনকুলসর্ব্বস্বের পূর্ব্বে ইংরাজি নাটকের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ গ্রন্থ এক্ষণে বোধ হয় আর বাজারে পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্রের চণ্ডী নাটক তাহারও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দু বিকাশও বোধ হয় কুলীনকুলসর্ব্বস্বের পূর্ব্বে রচিত। তথাপি আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে এই অর্থে বাঙ্গালা ভাষার আদিনাটককার বলিতে পারি যে, তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ নাটক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই।—শিং—সং

বসন্ত। *

(গীত)

বসন্ত—চৌতাল।

"পীত-বসন, কুসুম-ভূষণ,
যুবক-যুবতী-রঞ্জন।
কোকিল-ভ্রমর, মধুর মধুর,
করয়ে কূজন গুঞ্জন ॥
ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়,
পীত বসন উড়ি'ছে তায়,
ফুল-কুল-কলি ফুটিয়ে চায়,
প্রেমিক-নয়ন-শোভন;—
প্রাণের প্রতিমা মধুর হাসে,
কুসুমে সাজিয়ে দাঁড়া'য়ে পাশে,
অপরূপ রূপ-ছটা বিকাশে;
দূরে ফুলধনু মদন ॥"

(গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, ৩২৩ পৃঃ)

এই গীতটি উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, গীতটি ও কবিতাটি একই চিত্রের বর্ণন, পাঠক চিত্রের সহিত মিলাইয়া উপরের গীতটি ও নীচের কবিতাটি দেখুন।

(কবিতা)

(১)

এস বসন্ত, কর জীবন্ত,
শীত দুরন্ত পীড়িত প্রাণ।
ভীত প্রকৃতি কাঁপে সঘনে,
কর তাহারে ভরসা দান ॥

* গ্রন্থাবলী (পদ্য ও গদ্য) দ্বিতীয় ভাগ। প্রহ্লাদচরিত্র, গঙ্গামহিমা, যদুবংশধ্বংস, রাজা বিক্রমাদিত্য, বামনভিক্ষা, দশরথের মৃগয়া, হরধনুর্ভঙ্গ, রামের বনবাস, অবসরসরোজিনী—তৃতীয় ভাগ, ষড়ঋতু কাব্য, অনন্ত কি?—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।—বীণাযন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ৪৲ টাকা।



তরু কাতর, ঝরি'ছে ফুল,
অতি আকুল, ভ্রমরকুল,
দোঁহে বাঁচাও, সদয়ে চাও,
ফুল্ল কুসুমে পাদপ ছাও,
তোল অলির পাখায় তান।
লতা লুটায় শীতের ভরে,
তুমি প্রেমিক তাহারে ল'য়ে,
দেহ জড়া'য়ে তরুর গায়ে,
ধীরে দোলাও মলয়-বায়ে ;
প্রেম-বিকাশে উভয়ে পুন
কর সরস, কর নতুন ;
ফুল-অধরে হাসিটি দাও,
সেই হাসির চুমোটি খাও ;
কাল কোকিলে পাঠাও হেথা
সুখে গাহিতে তোমার গান !
কানে শুনিনি অনেক দিন
তব মলয়-অনীল বীণ্ ;
চোখে দেখিনি অনেক দিন্
চূত-মুকুলে সাজিতে ডাল।
গোছা অশোক-মুখের হাসি
চোখে দেখিনি অনেক কা।
প্রাণে পাইনি প্রাণের সুখ,
ভয়ে দিইনি খুলিয়ে বুক।
এস, বসন্ত ! মুখটি তুলে,
শোভা সাজানো বুকটি খুলে,
শীত-পীড়িত আমার বুক,
দাও সে বুকে একটু সুখ,
তব মাধুরি বুকেতে রাখি'
বিনা নিমেষে চাহিয়ে দেখি,
সুখ-সাগরে ভাসাই প্রাণ।

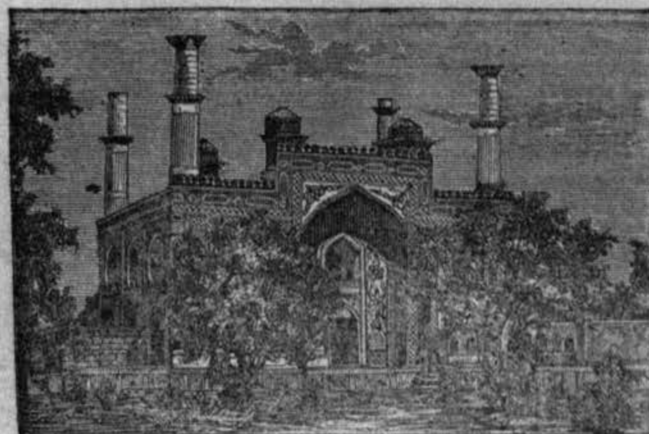
(২)

এল বসন্ত করি' জীবন্ত
শীত দুরন্ত পীড়িত প্রাণ.।
এবে প্রকৃতি ভরসা পেয়ে
গাহে বসন্ত-বিজয়-গান।
এল বসন্ত প্রিয়ার সনে,
প্রেম বিকাশ হইল বনে ;

দূরে মদন দাঁড়া'য়ে চায়,
ফুল-ধনুক কোমল কায়,
ফুল-ধনুকে ফুলের বাণ
হানে মদন মা'রিয়ে টান।
বাজে সে বাণ প্রাণের বুকে,
জাগে জীবন জীবিত সুখে,
বেঁচে উঠিল মৃতের প্রাণ।
তরু বাঁচিল, ফুটিল ফুল,
উড়ি' ছুটিল ভ্রমরকুল,
ফুল্ল কুসুমে পাদপ ছায়,
মধু লুটিয়ে ভ্রমর খায়
তুলি' পাতল পাথায় তান।
লতা উঠিল তরুর বুকে,
মুখ রাখিল তরুর মুখে,
দেহ জ'ড়ায়ে তরুর গায়ে
ধীরি দোলয়ে মলয় বায়ে;
প্রেমবিকাশে উভয়ে পুন
হলো সরস, হলো নতুন,
কচি হাসিটি ফুল-অধরে
নাচি' কেমন ধীরে সিহরে;
প্রাণপ্রিয়ার সহিত সুখে
খায় চুমোটি ফুলের মুখে
সুখে বসন্ত মোহিত প্রাণ।
কাল কোকিল পঞ্চম গ্রামে
হেঁকে গাহিল প্রেমের গান।
শুনি' কোকিল কুহুর রব
তুলি' পেকম ময়ূর সব,
কেকা শবদে ভরি'ছে দিক্,
রূঢ় শীতেরে বলি'ছে ধিক্!
মৃদু মলয়-অনিল বীণে
বাজে মধুর মধুর দিনে!
চূত-মুকুলে সাজিল ডাল
গোছা অশোক-মুখের হাসি
ফুটে উঠিল মধুর লাল।
প্রাণে পাইনু প্রাণের সুখ,
দিনু বসন্তে খুলিয়া বুক।
এল বসন্ত মুখটি তুলে
শোভা সাজানো বুকটি খুলে।
শীত-পীড়িত আমার বুক,
দিল সে বুকে একটু সুখ,
বুকে বসন্ত-মাধুরী নিয়ে
বিনা নিমেষে রহিনু চেয়ে
সুখ সাগরে ভাসা'য়ে প্রাণ।"

(গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ২১১ ও ২১৮ পৃঃ)

আমরা গত বারে কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্বীকার সময়ে বলিয়াছিলাম, এবারে উহার একটি কবিতা উপহার দিব। সেই কবিতাটি বসন্ত। আমাদের শিল্পপুষ্পাঞ্জলির পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় শরৎপ্রভৃতি তিনটি ঋতু-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; অপর তিনটিও প্রকাশিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলী পূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়ায় ঐ তিনটিই এ পত্রে আর প্রকাশিত না হইবার কথা, তবে নব বসন্তাগমে বসন্ত চিত্রটির প্রকাশ তত দোষের না হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ করা গেল, সেই সঙ্গে আমরা তাঁহার হরধনুর্ভঙ্গের বসন্তবর্ণন গীতটিও তুলিলাম।



সেকন্দ্রা

বা

সম্রাট্ আক্‌বরের সমাধি-মন্দির। *

[স্থান—আগ্রার অন্তর্গত সেকন্দ্রাবাদ। সময়—মধ্যাহ্ন]

(দৃষ্ট ২৪এ ফেব্রুয়ারি—১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ)

ইতিহাস! প্রণিপাত করি আমি প্রত্যেক অক্ষরে তব; বিধাতার লীলার দর্পণ তুমি, ইতিহাস!
জানি আমি, অতীতের মহামূর্ত্তি তুমি এই বিশাল জগতে; তব অঙ্গে মানুষের উত্থান পতন পরকাশ।

---

* আগ্রা (প্রাচীন অগ্রবণ) নগরীর সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে সম্রাট্ আক্‌বরের সমাধি-মন্দির (কবর) অবস্থিত। এই সমাধি-মন্দির একটি ২০০ বিঘা পরিমিত উদ্যান মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। সমাধি মন্দিরটি স্বয়ং ৪৪ বিঘা-পরিমিত। ইহার উচ্চতা ১০০ ফুট। সম্রাট্ আক্‌বর সাম্যবাদী ছিলেন। হিন্দু মুসলমানের প্রতি তাঁহার মনোগত ভাব ভিন্ন ছিল না। এই জন্য বোধ হয়, তাঁহার অনুমতি-ক্রমে এই সমাধি-মন্দিরের গঠন-প্রণালী হিন্দু ও মুসলমানী ধরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিকন্তু বৌদ্ধ গঠন প্রণালীও এই মন্দিরে পরিলক্ষিত হয়। আমরা যখন এই সমাধি-মন্দির দর্শন করিবার জন্য সেকন্দ্রাবাদে উপনীত হইলাম, তখন তত্রত্য মুসলমানেরা কএকটি হাত লণ্ঠন জ্বালিয়া, আমাদিগকে লইয়া একটি অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা সুড়ঙ্গের মধ্যস্থলে গিয়া সম্রাট্ আকবরের সমাধি-বেদি দেখিতে পাইলাম। সেই বেদিটি একটি মনুষ্য-প্রমাণ অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণ-প্রস্তর-খোদিত কোরাণ-মন্ত্রে মণ্ডিত। বেদির নিম্নস্তরে অর্থাৎ ভূগর্ভে আক্‌বরের মৃতদেহ প্রোথিত আছে। বেদির মস্তকের দিকে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর দৃষ্ট হইল। আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, একজন মুসলমান বলিল, "এই গর্ত্তের ঠিক নীচে বাদশাহের মস্তক আছে, সেই জন্য এই স্থলে একখানি বহুমূল্য বৃহৎ হীরকখণ্ড স্থাপিত ছিল। কিছুকাল পরে (কোন্ বাদশাহের সময়ে বলিল, এক্ষণে স্মরণ হইতেছে না) দীগের রাজা স্বীয় সৈন্যগণের সহিত আসিয়া ঐ হীরাখানি এবং সমাধি-মন্দিরস্থ অন্যান্য অনেক রত্ন অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে কেবল শূন্য গহ্বরটি আছে"। সমাধি-বেদির সমস্ত অংশ একখানি উৎকৃষ্ট কিংখাপের আবরণে ঢাকা আছে। উহার মূল্য ১০,০০০ দশ হাজার টাকা। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক সরকারি খরচে সেই আবরণ-বস্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সমাধি-বেদির উপর দ্বিতীয় তল। সেখানেও একটি সমাধি-বেদি আছে। উহা ভূতলস্থ বেদির সহিত সমস্বরূপাতে নির্ম্মিত। তাজমহল প্রভৃতি সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ সমাধি-মন্দির এইরূপ ধরণে নির্ম্মিত, তবে বাহ্য গঠন প্রণালী ও অঙ্গসৌষ্ঠবাদি কতক কতক ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু গুম্বজ ও মিনার, সকল সমাধি মন্দিরে (কবর বা মস্‌জিদে) আছে। আকবরের এই সমাধি-মন্দির তৎপুত্র জাহাঁগীর বাদশাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সুখ দুঃখ, আলোক আঁধার, জীবনের জয় পরাজয়, প্রত্যেক অক্ষরে তব অঙ্কিত রয়েছে চিরকাল ;
বিধাতারে দেখি নাই, কিন্তু তাঁ'র কার্য্য দেখি ; ইতিহাস ! তুমি সেই কার্য্যের ভাণ্ডার সুবিশাল।
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তব মানুষের অদৃষ্টের জটিল ঘটনা, অক্ষরে অক্ষরে তব মানুষের অসারতা-ছায়া ;
কিবা ছিল—কিবা হ'ল ; কিবা হয়—কিবা রয় ; কিবা হ'বে—কিবা র'বে, শুধু এই ইন্দ্রজাল-মায়া।
ইতিহাস ! ইতিহাস ! বিদ্যালয়ে শৈশব সময়, প্রথম সাক্ষাৎ হয় 'ই—তি—হা—স' এই চারি অক্ষরের সনে ;
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরে জ্ঞানযোগে মর্ম্মযোগ,—চিন্তার অস্ফুট রেখা দিল দেখা—হ'ল আঁকা শৈশবের অস্ফুটন্ত মনে।
অস্ফুটন্ত মন মোর ক্রমে ক্রমে লাগিল ফুটিতে, লাগিল উঠিতে তায় কি এক নূতন চিন্তা-স্রোত ;
অতীতের রাশি রাশি ছবি কে যেন খুলিয়ে দিল, বর্ত্তমান ভুলে গিয়ে অতীতেই হৈনু ওতপ্রোত।
অতীতের অতিথি হইনু, মিশাইনু অতীতের অনন্ত ছায়ায় ; অতীতের তরে প্রাণ পাগল হইল একেবারে ;
বর্ত্তমান-আলোকের ঝলা ঝালাপালা করিল আমায় ; শুধু সাধ—ডুবে থাকি অতীতের অভেদ্য আঁধারে।
সে সাধের এক অঙ্গ আজ পূর্ণ হ'ল মোর, ইতিহাস ! লেখা ছবি দেখা দিল এত দিনে নয়নের পথে ;
ভারত-ঈশ্বর আক্‌বর + লুটি'ছেন কবরের মাঝে, মৃত্তিকার দেহ তাঁর মৃত্তিকায় মিশিতেছে পরতে পরতে।

+ আক্‌বর—(খ্রীঃ ১৫৪২—১৬০৫ অব্দ) "জলাল্ উদ্দিন্ মহম্মদ আক্‌বর শাহ, দিল্লির তৃতীয় মোগল সম্রাট্ দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের পুত্র। ইনি খোরাসানী হামিদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। খ্রীঃ ১৫৪২ অব্দে সিন্ধুপ্রদেশস্থ অমর কোটে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি ১৫৫৩ অব্দ হইতে ১৫৫৫ অব্দ পর্য্যন্ত কাবুল ও কান্দাহারে স্বীয় খুল্লতাত কামরণের নিকট ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৩ বৎসর চারিমাস বয়সে বায়রম খাঁর তত্ত্বাবধানে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম অবস্থায় ইহাঁর অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী উত্থিত হয়,কিন্তু বায়রাম সকলকেই বিনাশ করিয়া সিংহাসন শত্রুশূন্য করিয়াছিলেন। ১৫৬০ অব্দে আকবর আঠার বৎসর বয়সে বায়রামের কর্তৃত্ব লোপ করিয়া নিজে রাজা হন। প্রথমে পঞ্জাব ও দিল্লির চতুপার্শ্বই ইহাঁর রাজ্য ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইনি প্রায় সমস্ত ভারতেই আধিপত্য বিস্তার করেন। প্রথমতঃ ইহাঁকে খাঁ জমান, বাজ বাহাদুর, আদম খাঁ, আবদুল খাঁ ও আসফ খাঁ প্রভৃতিকে আপনার বশে আনিতে হইয়াছিল, তৎপরে ১৫৬১ হইতে ১৫৭২ পর্য্যন্ত অম্বরেশ্বর বিহারী মল্ল, চিতোরেশ্বর রাণা সঙ্গ, যোধপুররাজ মল্লদেব, প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ইনি বিহারী মল্লের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এবং মানসিংহের ভগিনীর সহিত সেলিমের বিবাহ দিয়া ও মানসিংহকে ৫০০০ সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া, অম্বরের সহিত সন্ধি করেন। চিতোর ইহাঁ কর্তৃক জিত হয়। যোধপুরেশ্বর ইহাঁর সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন।

বাহাদুর শার মৃত্যুর পর খ্রীঃ ১৫৭৩ অব্দে ইনি গুজরাট অধিকার করেন।

খ্রীঃ ১৫৭২—১৫৭২ অব্দের মধ্যে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা আকবরের করতলগত হয়। এই কার্য্যে মানসিংহ ও তোডর মল্লের যশ বৃদ্ধি ও সম্রাট সমীপে সম্মান বৃদ্ধি হয়।

১৮৫১ অব্দে পঞ্জাব বিজিত হয়। মানসিংহের পিতা ভগবান দাস তথাকার শাসনকর্ত্তা হন, এবং আটক নামক সহরও নির্ম্মিত হয়। তৎপরে ১৫৮৬ অব্দে আকবর স্বয়ং গিয়া কাশ্মীর জয় করেন। কাশ্মীররাজ তাঁহার একজন প্রধান ওমরাহ হন।

খ্রীঃ ১৫৮৬—১৬০০ পর্য্যন্ত পঞ্জাব প্রান্তে য়ুসুফজি ও বোসেনিয়াগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম চলে। পরে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

খ্রীঃ ১৫৯২অব্দে ইনি সিন্ধু জয় করিয়া সিন্ধুর রাজাকে ৫০০০ সৈন্যের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেন। পর্ত্তুগিজেরা সিন্ধুরাজের পক্ষ হইয়া আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

খ্রীঃ ১৫৯৪ অব্দে কান্দাহার আকবরের রাজত্বে যোজিত হয়। তৎপরে ইনি দাক্ষিণাত্য জয় করিতে উদ্যোগী হন।

এই সূত্রে ১৫৬৫ অব্দে তালিকোটের যুদ্ধ হয়। খ্রীঃ ১৫৯৫ ৯৯ অব্দে দুইবার আমেদনগর আক্রমণ হয় এবং ১৫৯০—১৬০০ অব্দে খান্দেশ আকবরের অধিকারভুক্ত হয়। অবুলফজেল এইখানকার শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হন।

ইহাঁর তিন পুত্র, সেলিম, মোরাদ ও দেনিয়াল। কিন্তু ইনি তাহাদের কাহারও হইতে সুখী হন নাই।



সম্রাট আকবর সা

মহৈশ্বর্য্য, রাজ্য, ধন, আত্মীয় স্বজন, প্রজাগণ, রাজদণ্ড, রাজসিংহাসন, রাজোষ্ণীশ, রাজবেশ কই ?
কোথা সে সম্রাট্ আক্‌বর ?-তা'জানিনা; কোথা তাঁ'র প্রাণ ?—তা জানি না; কোথা তাঁ'র দেহ ? তা' জানি হে, ভূমিগর্ভে ও ই
হের ওই—হের ওই,—দূরব্যাপ্ত সেকন্দ্রা-সমাধি—প্রস্তরের বিশাল মন্দির উচ্চ কায় ;
নভস্পর্শী চারিটি মিনার ‡ চারিকোণে দাঁড়াইয়া, জীবগণে জীবন্মের শূন্যভাব শূন্যেতে দেখায়।
রাজদণ্ড দু'দণ্ডের তরে—দেহখণ্ড দু'দণ্ডের তরে—এ ব্রহ্মাণ্ড দু'দণ্ডের তরে—ওই চারি স্তম্ভদণ্ড বলে ;
শূন্য হ'তে আসে সব—শূন্য পথে ভাসে সব—দু'দণ্ডের তরে ঘুরি' পুনরায় দেহ ছাড়ি' শূন্যতায় মিশাইয়া চলে।
সেকন্দ্রা! যাঁহারে তুমি শিল্পময় শৈল-আবরণে বিশেষ যতনে রাখিয়াছ কোলের মাঝারে,
সে বাদ্‌শাহ কোথা এবে ?—সে আক্‌বর কোথা এবে ?—ব'লে দাও ; তাঁ'র তত্ত্ব জানিবারে আসিয়াছি তোমার দুয়ারে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ইনি মৃত্যুকালে সেলিমকেই রাজত্ব অর্পণ করিয়া যান। ১৬০৫ অব্দে ১৩ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইনি বলিষ্ঠ ও শ্রীমান ছিলেন। মিতাহার ও পবিত্রাচার ইঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। ইনি উত্তম অশ্বারোহী ছিলেন। ইনি দুই দিনে আজমীর হইতে আগরায় আসিয়াছিলেন।

ইনি লেখা পড়া বড়ই ভালবাসিতেন, সংস্কৃত বুঝিতে পারিতেন, বিদ্যার উৎসাহ দিতেন।

ইনি মুসলমান ধর্ম্মে আস্থাবান হইলেও সকল ধর্ম্মের লোককেই ভালবাসিতেন। সকল ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা ইঁহার সভায় হইত। ইনি সকল প্রজাকে সমান দেখিতেন, মুসলমান ও কাফেরে প্রভেদ করিতেন না। ইনি রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ইঁহার সভায় অবুল-ফজল ও ফায়জি নামে দুই জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। অবুল-ফজলের আইন আকবরী বিশেষ বিখ্যাত। ইঁহারা দুই ভ্রাতায় মহাভারত পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

আকবরের রাজত্বে তোডরমল্লের রাজস্ব নীতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহার সভায় বিখ্যাত মিঞা তানসেন থাকিতেন। অধিক কি আকবর সকল শ্রেণীর লোকেরই প্রিয় ছিলেন। ইনি দিল্লি ও আগরা সুরম্য অট্টালিকায় শোভিত করেন।

‡ মিনার অর্থে উচ্চ স্তম্ভ। মুসলমানেরা নেমাজ করিবার সময় মিনারের সর্ব্বোর্দ্ধভাগে আরোহণ করিয়া আজান্ দেয় অর্থাৎ চতুর্দ্দিকস্থ মুসলমানগণকে নেমাজ পড়িতে আহ্বান করে।

কনকলতা।

(প্রথম খণ্ডের ১১৭ পৃষ্ঠার প্রকাশিত অংশের পর)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে এক দুই করিয়া অষ্টাহ অতীত হইল। নূতন রাজার উৎপাতে নগরে আর কাহারও তিষ্ঠিবার যো নাই। নবীন নরপতি বহুদিনের বৃদ্ধ মন্ত্রীকে কার্য্য হইতে অবসৃত করিয়া নিজের একজন বিশ্বস্ত লোককে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজ্যের সকলেই উত্যক্ত—সকলেই শঙ্কিত। নগরমধ্যেই তস্করেরা অবাধে চৌর্য্যবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে—বাধা দিবার কেহই নাই। স্বর্গীয় নরপতির প্রধান নগরপাল আজ অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে বীরপ্রধান বীরচন্দ্র আজ নগর-রক্ষক। অবশ্য তাঁহারই অনুচরগণ শান্তিরক্ষক প্রহরী একথা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং যাহারা রক্ষক তাহারাই ভক্ষক—চৌর্য্য নিবারণ করিবে কে? রাজ-দরবারে জ্ঞাপন করিলেও তাহার কোন অনুসন্ধান হয় না। আর নবীন রাজা—তিনি ত নিরন্তর নিজের ছুপ্রবৃত্তি নিচয় লইয়াই ব্যস্ত—রাজকার্য্য দেখিবে কে?—রাজাকে সকল দিন রাজ সভায় পাওয়াই ভার।

বৃদ্ধ মহারাজের মৃত্যুর পর অষ্টম দিনে—নবীন মহারাজ একাকী এক নিভৃত কক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি অর্দ্ধ হেলিত ভাবে উপবিষ্ট আছেন—বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে—তথাপি এখনও নয়নের আবিল ভাব যায় নাই। সম্মুখে একখানি রৌপ্য পাত্রে নানাবিধ খাদ্য সজ্জিত রহিয়াছে। পাত্র খানি শয্যারই উপর স্থাপিত—অবশ্য নরনাথ আহারে ব্যস্ত!

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একজন ভৃত্য—দ্বারের বহিঃপার্শ্বে উৎকর্ণ হইয়া উপবিষ্ট আছে। এমন সময়ে নবীন রাজার নবীন মন্ত্রী দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

দ্বারস্থিত ভৃত্য অনুচ্চস্বরে বলিল "মহারাজ এখন আহার করচেন।"

মন্ত্রীও তদ্রূপ অনুচ্চস্বরে বলিলেন "এখন আহার?"

ভৃত্য। কাল রাত্রে আহার করেন নি।"

মন্ত্রী। তুমি একবার গিয়ে আমার নাম করে বল বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ভৃত্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "সম্বাদ কি?"

ভৃত্য। "আজ্ঞে, মন্ত্রী মশাই এসেছেন।"

রাজা। "ভাল এখানে আসতে বল।"

ভৃত্য গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই মন্ত্রী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক নিকটস্থ হইলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "সম্বাদ কি।"

মন্ত্রী—"মহারাজ, অষ্টাহ অতীত হলো বৃদ্ধ মহারাজ পর-লোকগত হয়েছেন, আর চারিদিন পরেই তাঁর শ্রাদ্ধাদি করতে হবে। সে বিষয়ে কিরূপ উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য আপনার আদেশ না হলে কিছুই উদ্যোগ হচ্চে না, কিন্তু আর ত বিলম্ব করা ভাল দেখায় না।"

রাজা।—"দেখ, মন্ত্রী, মহর্ষি চন্দ্রশেখরের কথা কি তোমার মনে নাই?—আমি যখন মৃত মহারাজের মুখাগ্নির পাত্র নই, তখন শ্রাদ্ধাদির অধিকারও আমার নাই, সুতরাং বৃথা কার্য্যে অনর্থক ব্যয় করা আমার অভিপ্রেত নয়। আমি তাঁর শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কিছুই করিব না স্থির করিয়াছি।"

মন্ত্রী।—"কিন্তু লোকে নিন্দা করিবে।"

রাজা।—"লোকের নিন্দায় আমার কি ক্ষতি?"

মন্ত্রী।—"মহারাজের সঙ্গে উত্তর প্রত্যুত্তর আমার সাজে না। তবে কি মহারাজের শ্রাদ্ধের কিছুই উদ্যোগ হবে না?"

রাজা।—"আপাততঃ কিছুই নয়। ভাল আমি বিবেচনা করে দেখি, অপরাহ্নে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও, যাহা হয় বলিব।"

মন্ত্রী পুনরায় অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজার সে অর্দ্ধ হেলিত ভাবের কিছুই ব্যতিক্রম হইল না। তিনি সেই ভাবেই ভোজন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন অর্দ্ধবয়সী ব্রাহ্মণ সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এবার ভৃত্য আসিয়া সম্বাদ দিবার প্রয়োজন হইল না, কারণ—ব্রাহ্মণ রাজার প্রিয় পার্ষদ।

ব্রাহ্মণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাজা তাহার আগমন উপেক্ষা করিলেন, ব্রাহ্মণও রাজাকে কিছুই বলিল না কেবল

নীরবে পুত্তলিকার ন্যায় কিয়ৎক্ষণ গৃহ মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রাহ্মণের মস্তকে কেশের সম্পর্ক নাই, মধ্যস্থলে একটি সুদীর্ঘ শিখা,—অর্দ্ধকৃষ্ণ অর্দ্ধশ্বেত কেশে পরিপূর্ণ। একখানি তসর কাপড় পরিধান, তদুপরি একখানি তসরের চাদর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া বদ্ধ। বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। হস্ত পদাদিতে মাংস নাই বলিলেই হয়। সমস্ত শরীরের মাংসের অভাব উদরে পূরিত হইয়াছে। নাসিকার অগ্রভাগ হইতে শিখার মূল পর্য্যন্ত শ্বেত বর্ণ সুদীর্ঘ উজ্জ্বল তিলক।

ব্রাহ্মণ কিয়ংক্ষণ দাঁড়াইয়া রাজাকে ভোজনে একাগ্রচিত্ত দেখিয়া বলিলেন "একি মহারাজ, আমার অধিকার আপনি গ্রহণ কর্‌লেন কেন?"

রাজা সহাস্যাস্যে বলিলেন "কৈ সখা, তোমার অধিকার কৈ অধিকার কর্‌লেম।"

ব্রাহ্মণ।—"মহারাজ, ভোজনে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, প্রাতর্ভোজন রাজার পক্ষে এক প্রকার নিষিদ্ধ আছে।"

রাজা।—"ভাল, সখা, তোমার ভোজন কি এখনও বাকী আছে?"

ব্রাহ্মণ।—"বালাই, আমার ভোজন বাকী আমি ত আর রাজা নই।"

রাজা।—"রাজার ভোজন নিষিদ্ধ কেন?"

ব্রাহ্মণ।—"কি জানেন, মহারাজ, সকলেরই উচিত এক একটা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা, তা রাজার রাজকার্য্যই প্রশস্ত, আর ব্রাহ্মণের ভোজকার্য্য।—কিন্তু, মহারাজ, ঐ সঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা হচ্চে। বুড় রাজার শ্রাদ্ধের উদ্যোগ আজো হচ্ছে না কেন? মন্ত্রী ব্যাটা কি নাকে সর্ষপ তৈল প্রয়োগ করে নিদ্রা দিচ্চে নাকি?"

রাজা।—"সখা, মন্ত্রী নিশ্চিন্ত নয়, আমিই মনে করেছি মহারাজের শ্রাদ্ধ কর্‌বো না।"

ব্রাহ্মণ।—"কেন?"

রাজা।—"আমি কি তাঁর মুখাগ্নি করেছি?"

ব্রাহ্মণ।—"ভাল, তাই যেন হ'লো, আপনি শ্রাদ্ধ যেন নাই কর্‌লেন, কিন্তু লোক জন খাওয়াতে দোষ কি? আমাদের উদর পূর্ত্তি আর আপনার যশোবৃদ্ধি—তাতে ক্ষতি কি?—বুড়ো রাজা এতটা টাকা রেখে গেছে, তার নাম করে যৎকিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণসাৎ করুন—আপনার ক্ষতি হবে না—একার্য্য না কর্‌লে লোকে রটাবে আপনিই মহারাজকে মেরে ফেলে রাজ্যটা নিজে সাৎ করেছেন। একে ত মহর্ষিটা আপনি রাজার ছেলে নন বলে একটু একটু গোল বাঁধিয়ে গেছে। মহারাজের শ্রাদ্ধ না কর্‌লে নিশ্চয়ই আপনাকে বিপদে পড়্‌তে হবে।"

রাজা সহসা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "সখা, সখা, তুমি যথার্থ বলেছ। সখা, তুমি আমার যথার্থ হিতৈষী, তোমার উপর আমি কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি বল্‌তে পারি না। তুমি এখনি মন্ত্রীর নিকট যাও, তাকে শীঘ্র আমার নিকট ডেকে নিয়ে এস। এখনি শ্রাদ্ধের উদ্যোগ কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ, চলিয়া গেল। যাইবার সময় কি জানি কেন একটু ঈষৎ হাসিয়া গেল। সে হাসি কেহই দেখিল না।

রাজা গৃহ মধ্যে ইতস্তত পাদচারণ করিতে লাগিলেন। আমরাও কিছুদিনের জন্য রাজগৃহ হইতে বিদায় লইলাম।

কনকলতা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গের এককালে এমন দিন ছিল, যখন শত শত অর্ণবযান বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্যে পূরিত হইয়া নীলবারি পার হইয়া দূরস্থিত দ্বীপাদিতে গমনাগমন করিত। কিছুদিন আগে একথা বলিলে সহজে আমাদের দেশের লোকে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু এখন একথায় অল্প লোকেই সন্দেহ করেন, কারণ এখন আমাদের শিক্ষাগুরু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একথা যথার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যখন "মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীষ্ট জন্মিবার ২২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা ইংলণ্ডে বাণিজ্যার্থী হইয়া যাতায়াত করিতেন।"* তখন একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে তাম্রলিপ্তি, সমুদ্রতটে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে ভাদ্র মাসের শেষে, একদিন এই তাম্রলিপ্তি নগরীর একটি সামান্য গৃহে একটি বিধবা আপনার শিশু তনয়াকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন, পার্শ্বে দুইটি বালক বসিয়া আছে—বালক দুইটির জ্যেষ্ঠটির বয়স ষোড়শ বৎসর, কিন্তু হঠাৎ দেখিলে বিংশতি বর্ষীয় যুবক বলিয়া ভ্রম হয়। কনিষ্ঠটি যদিও জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কেবল এক বৎসরের ছোট, তথাপি তাহাকে দেখিলে দ্বাদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হয় না। বালক দুইটির মুখশ্রীতে মাতৃ-বদনের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৃহস্থিত জীব কয়টিই সুশ্রী, কিন্তু দারিদ্রের কঠোর পীড়নে যেন নির্জীব হইয়া রহিয়াছে।

বিধবার নয়ন যুগল হইতে দর দর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে কনিষ্ঠ বালকটি বলিল, "মা কেঁদে কি করবে বল; কষ্টের সময় যে সাহায্য করে, সেই প্রকৃত বন্ধু বটে, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু জগতে কয় জন মেলে। তুমি কেঁদ না। যিনি পৃথিবীর সামান্য কীট পতঙ্গটির পর্য্যন্ত আহার দিচ্ছেন, তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন। যদিও কাকা আমাদের খাওয়া পরার ভার নিলেন না, কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছে, যে ভিকারীকে বিমুখ করে না।"

কনিষ্ঠ ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ভাই সুধীর, অর্থলোলুপ বণিক ধনদাসকে আর কাকা ব'লো না। পিতার সম্পদের সময় সে উপকার পেত, তাই পিতার নিকট আনুগত্য দেখা'ত আমরা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি, কেন তার কাছে ভিক্ষা চাইব—আমি তখনি বলেছিলাম, মা, ভিক্ষা অতি নীচের কাজ। আমার শরীরেত প্রচুর বল আছে, আমার পরিশ্রমের বিনিময়ে কি চারিটি জীবের প্রাণধারণ উপযোগী অর্থ সঞ্চিত হ'তে পারে না? দেখি চেষ্টা করি——" এই বলিতে বলিতে বালক গৃহ হইতে বহির্গত হইল। মাতা কি যেন বলিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিবার আগেই পুত্র চলিয়া গেল।

চলিয়া গেল দেখিয়া মাতা বলিলেন, "প্রদ্যোত কোথা গেল? ছেলে মানুষ সংসারের কি জানে?"

সুধীর বলিল, "মা! দাদা আর যাবে কোথায়, বাহিরে একটু এদিক ওদিক করে এখনই ফিরে আস্‌বে।"

মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইয়া স্নেহ মধুর স্বরে বলিলেন, "আহা! বাছা, বেলা প্রায় দুপুর হয়ে গেল, এখনো কিছু খেতে পেলে না?——" বলিতে বলিতে দর দর ধারে অশ্রু বহিল, আর কথা কহিতে পারিলেন না।

সুধীর বলিল, "মা! আমার ত ক্ষুধা পায়নি, কিন্তু তাহারও চক্ষের জল বহিল।"

জগদীশ্বর তোমার লীলা বুঝা ক্ষুদ্র মানব বুদ্ধির অতীত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রদ্যোত মাতৃ দুঃখে কাতর হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহ পরিত্যাগের পূর্ব্বে কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, তাহা ভাবেন নাই। রাজপথে উপস্থিত হইয়াই

---

* সোম প্রকাশ ১১৮৩ শাক, ভাদ্র, বানিজ্যদর্পণ, ভারত কোষের ভূমিকা প্রভৃতি দেখ।

তাঁহার চিন্তা সে দিকে গেল। ভাবিলেন "আমার শরীরে বল আছে সত্য—পরিশ্রম করিতে পারি বটে, কিন্তু কোথায় গেলে, কে আমায় পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ দিবে?"

এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি ক্রমাগত পশ্চিমমুখে চলিলেন এবং নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে দুইজন অশ্বারোহী প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্ত হইতে সেই দিকেই আসিতেছিলেন।

অশ্বারোহীদ্বয়ের মধ্যে এক জনের বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে, অপরের বয়স দ্বাদশ বর্ষের কিছু অধিক।

অশ্বারোহীদ্বয় প্রদ্যোতের নিকটবর্ত্তী হইলে, বালকটি যে অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া ছিল, সেই অশ্বটি এরূপ উৎশৃঙ্খল হইল যে, বালক কোন রূপেই তাহাকে সংযত করিতে পারিল না। বালকের পিতা—যিনি অপর অশ্বে ছিলেন,—স্বীয় অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া অপর অশ্বটিকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারও সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে তিনি পুত্রকে অশ্ব হইতে নামাইয়া লইলেন। বালক অশ্বের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, সে অবতীর্ণ হইয়াই অশ্বের পদে কশাঘাত করিল।

তদ্দর্শনে প্রদ্যোত কাতর স্বরে বলিলেন, "আহা! অবোধ পশু, উহাকে প্রহার করো না।"

এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া অশ্বের গলদেশে হস্তার্পণ করিলেন। অশ্ব সুস্থ হইল। তখন তিনি বালককে পুনরায় আরোহণ করিতে বলিলেন, এবং সে আরোহণ করিবামাত্র আপনি অশ্বের পশ্চাতে গমন করিলেন, অশ্ব আর দৌরাত্ম্য করিল না, গন্তব্য পথে শান্তভাবে গমন করিতে লাগিল।

বালকের পিতা, পুত্রকে অগ্রগামী হইতে বলিয়া প্রদ্যোতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি এই অশ্বকে যেরূপে শান্ত করলে, তাহাতে বোধ হয় অশ্বটি তোমাকে চেনে।"

এই কথায় প্রদ্যোতের নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সঙ্গে মৃত শুনক সিংহের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

প্রদ্যোত।—"মহাশয়, আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ঐ অশ্বটি এককালে আমারই ছিল।——" এই বলিতে বলিতে আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ।—"বৎস, এখন তুমি কি কর?"

প্রদ্যোত।—"কিছুই না, কর্ম্ম অভাবে দারিদ্রগ্রস্থ হ'য়ে মাতা আর শিশু ভ্রাতা ভগ্নিকে লয়ে অতি কষ্টেই কাল-যাপন করচি। পিতা যা কিছু রেখে গিয়েছিলেন ঋণদায়ে সকলি বিক্রীত হয়েছে, ঘরে এমন কিছু নাই যা বিক্রয় করলেও একদিনের অন্নের সংস্থান হয়, আহার্য্য অভাবে, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি সকলে এ পর্য্যন্ত উপবাসী. আমি তাঁদের কষ্ট দেখতে না পেরে এই দিকে বেড়াতে এসেছিলেম—"

বৃদ্ধ। "তোমার পিতার বন্ধু ধনদাস এ সময় কিছু সাহায্য করচেন না?"

প্রদ্যোত। "মহাশয়, তাঁর নাম করবেন না, আজ সকালে মাতার আদেশে তাঁর কাছে গিয়াছিলাম, ভিক্ষার জন্য নয়—শুধু যদি তিনি কাকেও বলে আমার একটু কর্ম্ম করে দেন, তিনি বললেন, তুমি বালক আমি তোমার প্রতিভূ হ'তে পারি না। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যদি না খেতে পেয়ে মৃত্যু হয় সেও ভাল, তথাপি আর তাঁর দ্বারে পদার্পণ করবো না।"

বৃদ্ধ বুঝি প্রদ্যোতের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "কাল প্রাতে তুমি আমার বাটিতে যেও। আমার নাম সজ্জন সিংহ। সমুদ্রের ধারে যে উদ্যানযুক্ত বৃহৎ অট্টালিকা আছে, সেই আমার বাটী। তোমার নাম কি বাপু?"

প্রদ্যোত।—"প্রদ্যোত সিংহ।"

বৃদ্ধ।—"দ্বারদেশেই আমাকে দেখতে পাবে, যেতে ভুলো না। আর এই পাঁচটি মুদ্রা নাও, এ আমি তোমাকে তোমার বেতনের অগ্রিম স্বরূপ দান করলেম, এর পর পরিশ্রম দ্বারা পরিশোধ করো।" এই বলিয়া বৃদ্ধ পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রদ্যোত সিংহও জগদীশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহ মধ্যে মাতা, শিশু পুত্র কন্যা লইয়া বসিয়া আছেন, দণ্ড দুই হইল প্রদ্যোত গৃহ হইতে বাহিরে গিয়াছে—মাতা কত কি ভাবিতেছেন—মায়ের ভাবনা মা বই আর কে জানিবে?—জানেন আর একজন—সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান। এমন সময় প্রদ্যোত খাদ্য সামগ্রী লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, এ কি? এ সব পেলে কোথায়?"

প্রদ্যোত।—"বিধাতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। আমার কর্ম্ম হ'য়েছে—কি কর্ম্ম জানি না—কিন্তু কাল হ'তে আমি কর্ম্মে নিযুক্ত হবো।"

মাতা ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় বাবা? কোন মহাপুরুষ আমাদের মত দুঃখীর দুঃখে কাতর হয়েছেন?"

প্রদ্যোত।—"তাম্রলিপ্তির প্রধান ধনী সজ্জন সিংহ।" এই কথা বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন।

মাতা, সজ্জন সিংহ, বেতন অগ্রিম দিয়াছেন শুনিয়া পুত্রের কর্ম্ম হইয়াছে স্থির বুঝিলেন। পুত্রও খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের ব্যয় বাদে যা কিছু ছিল মাতার হস্তে দিলেন। মাতা পুত্রের উপার্জিত অর্থ হস্তে পাইয়া কি যে আনন্দিত হইলেন, তাহা বলিবার নয়। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "যাও বাবা তোমার জন্য ভাল কাপড় চোপড় কিনে নিয়ে এসো। সুধীর তুমি খুকীকে ধর, আমি তোমাদের খাবার তৈয়ার করিগে।" সুধীর খুকীকে ধরিল। মাতা আহার্য্য প্রস্তুত করিতে গেলেন। প্রদ্যোতও পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করিতে গেল।

* * * * *

যথা সময়ে আহার্য্য প্রস্তুত হইল—প্রদ্যোতও পরিধেয় বস্ত্রাদি লইয়া ফিরিল। মাতা উপবাসী পুত্রাদিকে খাওয়াইয়া কত যে আনন্দিত হইলেন—তা মা বিনা অন্যের বুঝা সহজ নয়। পুত্রাদিকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া মাতাও আহার করিলেন।

* * * * * *

দেখিতে দেখিতে তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। সকলেই বিশ্রাম করিতেছে। কেবল সুধীর একাকী গৃহের দ্বারদেশে বসিয়া কি ভাবিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে সুধীর অস্ফোচ্চস্বরে বলিল, "দাদার কর্ম্ম হ'লো, আমার কবে কর্ম্ম হ'বে, কবে আমি মায়ের উপকারে লাগিব।" সঙ্গে সঙ্গে দুই বিন্দু অশ্রু পড়িল। সে অশ্রু সর্ব্বদর্শী ভিন্ন আর কেহ দেখিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে, সজ্জিত হইয়া, প্রদ্যোত সজ্জন সিংহের ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সিংহদ্বারে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত চৌকীর উপর উপবিষ্ট হইয়া, সজ্জন সিংহ, নিজ হস্তে দীনগণকে অর্থ ভিক্ষা দিতেছেন, নিকটে পুত্রটি উপবিষ্ট আছে। ভিখারীগণ কেহ আসিতেছে,—কেহ ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছে—কেহ বা ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া সজ্জন সিংহের যশোঘোষণা করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় প্রদ্যোত সিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন।

সজ্জন সিংহ, প্রদ্যোতকে দেখিয়া, নিজ পুত্রকে বলিলেন, "জগৎ, যাও এঁকে জয়সিংহের নিকট লইয়া যাও, তাকে বলগে, এঁর হস্তাক্ষর যদি ভাল হয় তবে যে সমস্ত পত্র লিখিবার আছে, এঁকে লিখিতে দেওয়া হয়। আমি এরপর অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিব।"

জগৎ সিংহ প্রদ্যোতকে লইয়া চলিয়া গেলেন। পাঠক, চলুন আমরাও অনুসরণ করি।

একটি প্রশস্ত কক্ষ। বিস্তীর্ণ গালিচার উপর প্রায় ৪০ জন লোক লিখন পঠন কার্য্যে নিযুক্ত। উভয়ে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

একটি বিশাল বক্ষ যুবক একপার্শ্বে বসিয়া একখানি খাতা দেখিতেছিলেন। যুবকের বয়স বিংশতি বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে বোধ হয়।

জগৎ সিংহ তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, পিতা বল্লেন, আপনি এঁর হাতের লেখা দেখে, চিঠি লিখ্‌তে দিন; এর পর তিনি এসে যা হয় বন্দোবস্ত করবেন।"

জয়সিংহ, প্রদ্যোতকে লিখিতে বলিলেন। প্রদ্যোত লিখিলেন। জয়সিংহের মনোমত হইল। তিনি প্রদ্যোতকে নিজের নিকট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া চিঠি লিখিতে দিলেন। জগৎসিংহ চলিয়া গেলেন।

দণ্ড চারি পরে সজ্জনসিংহ সেই গৃহে উপনীত হইলেন। তিনি প্রদ্যোতের হস্তাক্ষর দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। এবং বলিলেন "দেখ, বাপু, আমি তোমার কার্য্য দর্শনে বড়ই পরিতুষ্ট হয়েছি। তুমি এখন গৃহে গিয়ে তোমার জননীকে বলগে, আজ হতে তোমার দশ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত হ'ল, আর তুমি আমার আবাসেই আহার্য্য ও পরিধেয় পাবে। এখানেই তোমাকে থাক্‌তে হবে, মধ্যে মধ্যে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য অবকাশ পাবে। কর্ম্মঠ হলে তোমার বেতন বৃদ্ধি করে দেওয়া যাবে।"

প্রদ্যোত অনুমতি পাইয়া কার্য্যালয় ত্যাগ করিল, এবং প্রফুল্ল বদনে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

আসামের শিল্প।

পিতলের কাজ।

"আসামে পিতলের বাসন প্রস্তুত করিবার জন্য এক ভিন্ন জাতি আছে, তাহাদের নাম মোরিয়া। তাহারা নীচ শ্রেণীর মুসলমান। ১৫১০ সালে মুসলমানেরা আসাম আক্রমণ করে ও হারিয়া ফিরিয়া আইসে। সেই সময়ে কতকগুলি মুসলমানকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়. তাহারাই পরে কারামুক্ত হইয়া এই ব্যবসায় অবলম্বন করে।

"আসামের নানা স্থানে পিতলের কাজ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিচে যে বিবরণ দেওয়া হইতেছে, তাহা ডারাং জেলা হইতেই সংগৃহীত। তথায় দুই স্থানে পিতলের কাজ হইয়া থাকে। গাবরু তহশিলের অন্তর্গত বিনবাড়ি মৌজার মধ্যে এক মোরিয়া-গাঁও (অর্থাৎ পিতলের বাসন প্রস্তুতকারীদের গ্রাম) ও তেজপুরের ৫ ক্রোশ দূরে বোরেলি নদীর তীরে দ্বিতীয় মোরিয়া-গাঁও। তাহারা ঢালাইএর কাজ করে না, যেরূপ প্রকার আকারের বাসন আবশ্যক, তাহারা ঢালাই করিয়া তাহা প্রস্তুত করে না। তাহারা অতি পাতলা (এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগ পুরু) পিতলের খণ্ড খণ্ড চাদর জুড়িয়া, যেরূপ আবশ্যক সেই রূপ আকারের বাসন প্রস্তুত করে। সেই সকল বাসন প্রস্তুত করিতে নানা প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা নিয়াই (Anvil), হাতুড়ি, ছোট বড় চিম্‌টে, কাতারি, জাতা, হাপর, মুচি, ছাঁচ, বাটালি, জল রাখিবার কাঠের পাত্র, গোল ও তিন কোণা উকো এবং একপ্রকার কুঁদিবার যন্ত্র। যোড়ের মুখে পিতল, রাঙ ও টিনের "পান" দেওয়া হয়। পান গলাইবার সময় মুচিটা দুই তিনবার হাপর হইতে তুলিয়া তুঁষের উপর ঘসিয়া লওয়া হয়, কারণ তাহা না করিলে মুচি ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ছাঁচে ঢালিবার পূর্ব্বে, তাহাতে ছাগলের চর্ব্বি যোগ করা হয়। "পান" ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন হইলে, হাতুড়ির আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

"দুই খণ্ড পিতলের পাত যুড়িবার সময়, একখানি পাতের ধারে দাঁত কাটিয়া ও দ্বিতীয় খানির ধারে সেই রূপ খাঁজ বাটিয়া, খাঁজে ও দাঁতে মিলাইয়া দিয়া হাতুড়ির দ্বারা পিটিয়া দেওয়া হয়। তাহার পরে "পানের" গুঁড়া ও সোহাগা মিশাইয়া যোড় মুখে দিয়া তাপ দিলে "পান" গলিয়া যোড়-মুখ বন্ধ হয়। মোরিয়ারা হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া বা পাত যুড়িয়া যেরূপ আবশ্যক, সেই রূপ আকারের বাসন প্রস্তুত করে। বিলাতের আমদানি পিতলের পাত মাড়ওয়ারীরা আসামে লইয়া যায় এবং আসামীয়া মাড়ওয়ারিদের নিকট তাহা ৩০ হইতে ৪০ টাকা মণ দরে ক্রয় করে। পুরাতন পিতলের বাসন বদল দিয়াও নূতন পিতল পাওয়া যায়। নূতন বাসন ১৷৷০ টাকা সেরে বিক্রয় হয়।

"হাপরে পুড়াইবার জন্য কয়লা ব্যবহার হয়। নদী দিয়া যে সকল কাঠ ভাসিয়া যায়, মোরিয়ারা তাহা তুলিয়া তাহা হইতে নিজে নিজে কয়লা প্রস্তুত করে।"

জড়োয়া কাজ।

"শিবসাগর জেলার অন্তর্গত জোড়হাট নামক স্থানেই অধিকাংশ জড়োয়া কাজ হইয়া থাকে। যাহারা জড়োয়া কাজ করে, তাহারা জাতিতে "সোনার" অর্থাৎ স্বর্ণকার। তাহারা জড়োয়া কাজে বেশ পটু। তাহাদের কাজে বেশ হস্তনিপুণতা প্রকাশ পায়, কিন্তু যতদূর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পালিশ হওয়া উচিত, তাহা হয় না।

"জোড়হাটে অনেক সোনারের বসতি, তাহারা কেবল সোনার কাজ করে। জড়োয়া কাজ অর্থাৎ তাহার উপর নানা বর্ণের কাচ গলাইয়া দিয়া পাথর বসান-র ন্যায় যে কাজ করা হয়, তাহা তাহারা করে না। কিন্তু যাহারা শেষোক্ত কাজ করে তাহারা সোনার কাজও করিয়া থাকে। ৩৮টি পরিবারের মধ্যে কাচের কাজ হইয়া থাকে এই রূপ অনুমান করা যায়। তিন রকমের কাচময় পদার্থের ব্যবহার আছে, ঘোর নীল, ঘোর সবুজ ও সাদা। লাল ও হলদে কখন কখন দেখা যায়। মাড়ওয়ারী ব্যবসাদারেরা কলিকাতা হইতে এই কাচময় পদার্থ লইয়া আসামে যায় এবং ৷৷০ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত তোলা বিক্রয় করে। ছোট হাতুড়ি, উকো চিম্‌টা ও নিয়াই এই কয়েকটি যন্ত্র এই কার্য্যে ব্যবহার হয়। এই যন্ত্রগুলি বিলাতী ও কলিকাতা

হইতে লইয়া যাওয়া হয়। কোন কোনটি বা শ্রীহট্টে প্রস্তুত হয়।

"অলঙ্কার প্রস্তুত হইলে বোধ হয় যেন কাচের উপর সোনার কাজ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, অগ্রে সোনার তার বসাইয়া পরে ফাঁকে ফাঁকে নানা বর্ণের কাচ গলাইয়া দেওয়া হয়। কাচের গুঁড়ার সহিত জল মিশাইয়া পাতলা কাদার মত করিয়া তারের ফাঁকে ফাঁকে নরুণ দিয়া তাহা বসাইয়া দেওয়া হয়। হাপরের মধ্যে কলার পেটোর ন্যায় দুইধারে উঁচু ও মাঝে খাল এই রূপ একটা মাটীর বাসন উপুড় করিয়া রাখিয়া তাহার মধ্যে কাচ মাখান সোনার জিনিসটি দেওয়া হয়। তাহার পর গন্‌গনে কয়লা দিয়া সমস্ত ঢাকিয়া দিয়া জাঁতা তাইতে থাকে। অল্প সময় মধ্যে মাটীর পাত্র ও সোনার গহনা সমস্ত তাতিয়া লাল হইয়া উঠে এবং কাচ গলিয়া ফাঁকে ফাঁকে বসিয়া যায়। গহনা ঠাণ্ডা হইলে লেবুর রস ও জলে তাহাকে ফুটাইতে হয়। তাহার পর কোথায় কাচ পড়িল না পড়িল দেখিয়া আবশ্যক মত যেখানে যেখানে কাচ পড়ে নাই, সেই খানে সেই খানে আবার কাচ যোগ করা হয় এবং আবার পুড়াইয়া লেবুর রসে ফুটাইতে হয়। কাচ দেওয়া ও গলানকে এ দেশে "ভরণ দেওয়া" কহে। যখন আর কোন স্থানে ভরণ দিবার বাকি থাকে না, তখন স্বর্ণকারেরা উকো দ্বারা তাহা ঘসিতে থাকে। সোনার তারের সহিত ভরণ একসা হইলে ঘসা বন্ধ হয়। ঘসার পর মনে হয় যেন কাচের মধ্যে তার বসান হইয়াছে। ঘসিবার সময় জিনিসটাকে ভিজা রাখা আবশ্যক, ঘসার পর পুনরায় একবার লেবুর রস ও জলে ফুটাইয়া ঠাণ্ডা হইলে শূকরের চুলের কুঁচি দ্বারা ঝাড়িয়া লইয়া আর একবার উকো দ্বারা পালিস করা হয়। এই রূপ দুই তিনবার করিলে পর, অলঙ্কারের উপরিভাগটা বেশ একসা হইয়া আইসে, কিন্তু ইহাতে পালিস হয় না।

"ভরণ দেওয়া জড়োয়া কাজের উপর পালিস করা কিছু কঠিন। উপরোক্ত মাটির পাত্রের মধ্যে অলঙ্কারকে রাখিয়া পুনরায় গরম করিতে হয়, কিন্তু এবার পূর্ব্ব বারের ন্যায় জাঁতা ব্যবহার না করিয়া হাত পাখা দ্বারা বাতাস দেওয়া হয়। যখন জিনিষটা গরম হইয়া লাল হইয়া ভরণটা গলিয়া উঠে তখন আগুন হইতে তাহাকে তুলিয়া চুঙ্গির দ্বারা বাতাস দিয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়। তাহার পর উপরোক্ত রূপ লেবুর রসে ফুটাইলে উপরটা বেশ পালিস হইয়া যায়। একটী ক্ষুদ্র মাটির পাত্রে (যেমন সরায়) একটু জল দিয়া তাহার উপরিভাগটা গন্ধক দিয়া ঘসিয়া, তাহাতে একটু লুণ তুঁতে ও থেকেরা টেঙ্গা নামক সেই দেশীয় গাছের পাতা দিয়া ফুটান হয়। অলঙ্কার একটা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া এক মিনিট কি দুই মিনিটের জন্য দড়ি দ্বারা ঝুলাইয়া, তাহাকে সেই পাত্রের ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া ধরা হয়। ফুটন্ত জল হইতে তুলিয়া কাপড় দিয়া ঘসিলেই কাজ শেষ হইল। ইহাতে সোনার উপর কতক লাল্‌চে রঙ ধরে।

"প্রথম জলে বেশী করিয়া লুণ ও তুঁতে গুলিয়া তাহাতে অলঙ্কারকে ডুবাইয়া উপরোক্ত পাত্রের মধ্যে রাখিয়া গরম করিতে হয়। যখন জলে ফেনা উঠা বন্ধ হয়, তখন জিনিসটিকে তুলিয়া ফেলিতে হয়। ইহার নাম "বড় রঙ্গ"। ইহাতে যদি রঙ্গ ভাল না হয়, তাহা হইলে দুই কি এক মিনিটের জন্য গন্ধক গোলা জলে ফুটাইলে উত্তম রঙ হয়। ইহার নাম "পান রঙ"।"

কৃষিগেজেট।

চায় যাঁরে সদা প্রাণ তাঁয় কেন পায় না।

(১)

অনন্ত সুষমা ল'য়ে বসন্ত আইল ধেয়ে,
কচি মুখে মৃদু হাসি সুধায় সুধায় না ;
তমালে কোকিল ডাকে, কুসুম ফুটিল শাখে,
মলয় লয়েছে সুখে সুবাসের বায়না ;
সুনীল আকাশ তল, শ্যামল শাদ্বল দল
সুখ-চিত্র এ সকল মন মোর চায় না ;—
চায় যাঁরে সদা প্রাণ তাঁয় কেন পায় না !

(২)

শারদ পূর্ণিমা নিশি, নীলাকাশ-তলে শশী
ঢেলে হাসি সুধা-রাশি কাহারে হাসায় না ?
বিভোর চকোর পাখী, উড়ে, বসে, থাকি' থাকি',
খেলে যেন লুকালুকি—সুখ বলা যায় না ;
আকাশেতে তারা হাসে, নীরে কুমুদিনী ভাসে,
ভুলেও এসব পাশে ফিরে মন চায় না ;—
চায় যাঁরে সদা প্রাণ তায় কেন পায় না !

(৩)

ঊষার অতুল ছবি, সন্ধ্যার সুন্দর রবি,
নিশ্চয় সুন্দর সবি মন তায় চায় না ;
শিশুর মধুর হাসি, যৌবনের রূপ-রাশি,
সত্য সবি ভাল বাসি—প্রাণ তায় যায় না
বসুধা-সুন্দরী-কোলে অনন্ত সুষমা দোলে,
নাচে গায় হাসে খেলে, মানস নাচায় না ;—
চায় যাঁরে সদা প্রাণ তাঁয় কেন পায় না।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

ELECTRIC TELEGRAPH.

(১২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থের পরস্পর রাসায়নিক আকর্ষণ স্থল বিশেষে ক্ষীণ ও প্রবল দেখা যায়। অর্থাৎ এমন বিষম প্রকৃতির অনেক পদার্থ আছে, তন্মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণ অতি প্রবল; আবার অন্যবিধ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত এমন অনেক পদার্থ আছে, তন্মধ্যে রাসায়নিক সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ বা অল্প মাত্র। রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তির এই রূপ ন্যূনাধিক্য বশতঃ রাসায়নিক সংযোগ দুই প্রকারে সংঘটিত হইয়া যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। প্রথমতঃ যে স্থলে দুইটি বিভিন্ন পদার্থ মধ্যে রাসায়নিক সম্বন্ধ এত অধিক যে তাহারা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিবামাত্রই সংযুক্ত হইয়া গিয়া রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ হয়।

এই রূপ রাসায়নিক সংযোগ হইতেই প্রায় উত্তাপ ও কোন কোন স্থলে আলোকও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ রাসায়নিক সংযোগ কার্য্য যত শীঘ্র হইবে তজ্জনিত উত্তাপও ততই প্রখর হইবে। ঐ উত্তাপ যে স্থলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে উদ্ভূত হয়, তখন কোন দাহ্য পদার্থ নিকটে থাকিলে অমনি জ্বলিয়া উঠে। রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ উৎপাদনের এই প্রথম প্রণালী অনুসারে অম্লজান ও উদজান বাষ্পের যোগে জল হয়। অ্যামোনিয়া (Ammonia) একটী যৌগিক পদার্থ তিন ভাগ উদজান (Hydrogen) ও এক ভাগ যবক্ষার জানের (Nitrogen) যোগে উৎপন্ন। এই অ্যামোনিয়া ও মিউরিএটীক্ অম্লের (Muriatic acid) যোগে নিশাদল উৎপন্ন হয়। বাখারি সামুক চূণে জল দিয়া যখন গুঁড়া চূণ প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে জল সংযোগে চূণ হইতে ধূম উত্থিত হয় এবং উহা এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, যে স্পর্শ করা যায় না। আবার কলি চূণ প্রস্তুত করিবার সময় ঐ বাখারি চূণ যখন অধিক পরিমাণে জলে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন উহা তেজে 'টগ্', 'বগ্' করিয়া ফুটিতে থাকে। এক টুকরা পোটাসিয়ম্ (Potassium) ধাতু লইয়া জলে নিক্ষেপ করিলে উহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিবে; জল ও উক্ত ধাতু একত্র হইবামাত্র তন্মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হয়। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে অম্লজানের সহিত ধাতু মাত্রের প্রবল রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাতেই পোটাসিয়ম্ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, জলের অম্লজান বা জলকরের সহিত মিলিত হয়। তখন—সেই রাসায়নিক সংযোগ কালে এত উত্তাপ উদ্ভূত হয় যে, জলের অপর উপাদান—দাহ্য উদজানটি জ্বলিয়া উঠে। এই গুলি সমস্ত পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রণালী মত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থোৎপাদনের দৃষ্টান্ত স্থল।

রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ উৎপাদনের দ্বিতীয় প্রণালী অনুসারে কোন একটি পদার্থ একটি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া, অধিকতর রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে তাহার উপাদান পদার্থের একটিকে স্থানচ্যুত করিয়া দিয়া তাহার স্থান নিজে গ্রহণ করে। জোর যার জয় তার। বিতাড়িত উপাদানটি ঐ যৌগিক পদার্থের অন্য উপাদানের সহিত যে পরিমাণ রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তিতে সংযুক্ত ছিল, তদপেক্ষায় যদ্যপি নবাগত পদার্থের ঐ অন্য উপাদানের সহিত অধিকতর রাসায়নিক [illegible]ম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে ঐ অন্য উপাদান অল্প রাসায়[illegible] সম্বন্ধ বিশিষ্ট প্রথম পদার্থটিকে ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ [illegible] হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়া অধিকতর রাসায়নিক সম্ব[illegible] বিশিষ্ট নবাগত পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়; এবং সেই [illegible]যোগ ফ[illegible] একটি সর্ব্বতোভাবে নূতন রাসায়নিক যৌগিক [illegible]দার্থ উৎ[illegible] হয়। এবম্বিধ রাসায়নিক সংযোগ প্রণালীকে রাসায়নিক 'স্থ[illegible]ত্ত' বা 'প্রতিনিধি' প্রকরণ কহে। এইরূপ রাসায়নিক [illegible]গ অনুসারে অধিকাংশ রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ [illegible] হইয়া থাকে। এই 'প্রতিনিধি' বা 'স্থানচ্যুতি' [illegible] মত যৌগিক পদার্থ উৎপাদন সময়ে অপেক্ষাকৃত [illegible] তেজঃ বা তাপ উৎপন্ন হয় যে তাহা কৌশল বিশেষ[illegible] না করিলে প্রায় অনুভূত হয় না। এই প্রণালীর [illegible] দৃষ্টান্ত দৃষ্টেই ইহার কার্য্য স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। [illegible] দ্রাবক (Nitric acid) একটি যৌগিক অম্ল পদার্থ—[illegible] অম্লজান (Oxygen), একভাগ উদজান (Hydrog[illegible] একভাগ যবক্ষারজানের (Nitrogen) যোগে [illegible] এই অম্লটিতে রৌপ্য, পারদ, তাম্র, সীসাদি অধিকা[illegible]

দ্রব হয় এবং তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ধাতু এক একটি যবক্ষারকর ধাতু (Nitrate metal) হয়। রৌপ্য ও যবক্ষারাম্লের যোগে যবক্ষারকর রৌপ্য (Nitrate of silver) হয়; ইহাকে কাষ্টকি কহে। পোটাসিয়ম্ ধাতু ও যবক্ষারজানের যোগে (Nitrate of potass) হয়; ইহাকে সোরা কহে। কিন্তু যবক্ষার দ্রাবকের সহিত সকল ধাতুর রাসায়নিক সম্বন্ধ বা আকর্ষণ সমান নহে। সীসের সহিত ইহার সর্ব্বাধিক সম্বন্ধ। তামার সহিত তদপেক্ষা অল্প, আবার তদপেক্ষায়ও অল্প পারদের সহিত, এবং রৌপ্যের সহিত সর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূনতম সম্বন্ধ। সুতরাং এ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এইরূপ দেখা যায়:—এক কাঁচ্চা পরিমাণ কাষ্টকি লইয়া পাঁচ ছটাক জলে নিক্ষেপ কর; উহা অল্প ক্ষণ মধ্যেই দ্রব হইয়া যাইবে। তখন তন্মধ্যে অল্প পরিমাণ বিশুদ্ধ পারদ ঢালিয়া দিয়া কয়েক দিবস রাখিলে দেখিবে, যবক্ষার দ্রাবক রৌপ্যকে ছাড়িয়া দিয়া পারদের সহিত মিলিত হইয়াছে, আর রূপা পৃথক হইয়া পড়িয়া সুন্দর কঠিন দানা বাঁধিয়াছে; এবং সেই পরিমাণে পারদ গলিয়া গিয়া, যবক্ষার দ্রাবকের যে পরিমাণ পূর্ব্বে রূপার সহিত সংমিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। অনেক রাসায়নিক কৌতুক বা রহস্য পূর্ণ পুস্তকে যে রূপার বৃক্ষ প্রস্তুত প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখা যায়, তাহা এই রাসায়নিক সত্যমূলক। আবার ঐ রূপে যদ্যপি যবক্ষারাম্লিক পারদের (Murcurous Nitrate) দ্রাবণে (solution) এক ফালি তাম্র ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে যবক্ষার দ্রাবক পারদকে ছাড়িয়া দিয়া তাম্রের সহিত সংযুক্ত হইবে। পারদ পৃথক হইয়া পাত্রের তলদেশে পড়িবে। আবার যবক্ষারাম্লিক তাম্রের (Cupric Nitrate) দ্রাবণে সীস ডুবাইয়া রাখিলে, যবক্ষারাম্ল তাম্রকে ছাড়িয়া সীসের সহিত সংযুক্ত হইবে। তাম্র তলায় পড়িবে। পুনশ্চ যবক্ষারাম্লিক সীসের (Plumbi Nitrate) দ্রাবণে দস্তা ডুবাইয়া রাখিলে যবক্ষারাম্ল, সীস ছাড়িয়া দস্তাকে ধরিবে, সীস পাত্রের তলায় পড়িয়া যাইবে।

রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ বিবিধ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, রাসায়নিক কার্য্য মাত্রে তদধীন পদার্থ সমূহের যে প্রকার রূপান্তরই সংঘটিত হউক না, এমন কি সমস্ত উপাদানগুলিই অদৃশ্য ভাবাপন্ন হইলেও তাহাতে তাহাদের এককালীন ধ্বংশ বা বিনাশ সাধিত হয় না। তাহাদের পদার্থগত ভার বা গুরুত্ব পূর্ব্ববৎই থাকে। বারুদ একটি সামান্য মিশ্র পদার্থ মাত্র, ইহা পূর্ব্বে এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বারুদে অগ্নি প্রদান করিলে তখন তাহার উপাদানীভূত পদার্থগুলি রাসায়নিক কার্য্যাধীন হইয়া পড়িয়া অদৃশ্য হয়, এবং তাহার ফলে কতিপয় অদৃশ্য রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। যদ্যপি কিয়ৎ পরিমাণ বারুদ লইয়া তাহাকে কোন সুকৌশল সম্পন্ন পাত্র মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তন্মধ্যে কৌশল বিশেষ অবলম্বন করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করা যায়, তাহা হইলে সেই বারুদ টুকুর রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে; অর্থাৎ উহা জ্বলিয়া গিয়া অভিনব যৌগিক পদার্থে, প্রধানতঃ বাষ্পে পরিণত হইবে। তাহাতে উহা অদৃশ্য হইয়া পড়িবে বটে কিন্তু সেই রূপান্তরিত যৌগিক পদার্থ সমূহ গুরুত্বে ঠিক পূর্ব্ব বারুদের সমতুল্যই থাকিবে। তাহা, ঐ বারুদ টুকুকে পূর্ব্বে তৌল করিয়া রাখিয়া দিয়া, তাহাতে অগ্নি প্রদান করিবার পরে আবার উহার রূপান্তরিত অবস্থায় ঐ কৌশলময় পাত্রসহ ওজন করিলে জানা যাইবে। রসায়ন-বেত্তাগণ বারুদ সদৃশ 'গন্ কটন্' (Gun Cotton) নামক এক প্রকার দাহ্য পদার্থ লইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

এই জড় জগতে আমরা প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য পরিবর্ত্তন বা প্রকৃতিকার্য্য প্রত্যক্ষ করি, তৎসমুদায় কেবল রাসায়নিক সংযোগ ও বিয়োগের ফল মাত্র। উদ্ভিদ ও জীব শরীর মধ্যে রাসায়নিক কার্য্যের পরমাশ্চর্য্য উদাহরণ দৃষ্ট হয়। বিবিধ ভুক্ত খাদ্য দ্রব্যাদি অন্তরস্থ হইয়া অম্ল ও পাক রসাদি সংযোগে রাসায়নিক কার্য্যাধীন হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে শোণিতের উৎপত্তি। আবার নিশ্বাস গৃহীত বায়ুর অম্লজান সহকারে শোণিত সংস্কৃত হইয়া তাহা হইতে পরিণামে মেদ, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি জীবদৈহিকাংশ সমস্ত সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। আবার, সূর্য্যোত্তাপ সহকারে মাটির রস ও বায়ুর যবক্ষারজানের রাসায়নিক সংযোগ হইতেই যাবদীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি।

যৌগিক পদার্থের উপাদানীভূত মৌলিক পদার্থগুলিকে উপযুক্ত উপায়ে পরস্পর হইতে পৃথক করাকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ কহে। এবং তাহাদের পুনঃ একত্র করণকে রাসায়নিক সংশ্লেষণ কহে। এতদুভয় কার্য্যই রাসায়নিক পণ্ডিতের প্রধানতম সাধন।

রাসায়নিক আকর্ষণ সম্বন্ধে যতদূর বলা গেল, তাহাতে অন্যান্য আকর্ষণ হইতে ইহার প্রভেদ নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে স্পষ্ট উপলক্ষিত হইবে:—

রাসায়নিকাকর্ষণ শক্তির অসাধারণ বলপ্রাখর্য্য; পদার্থের সূক্ষ্মতম অণু সমূহের মধ্যে ইহার কার্য্য; এবং ইহা অপরিমিত ও অনন্নুমেয় অল্প দূর মধ্যে কার্য্যকারী। এই শক্তি সহকারে, আদিভূত কয়টি অল্প সংখ্যক হইলেও উহাদেরই পরস্পর বিবিধ সংযোগে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ রাজ্যের অসংখ্য পদার্থ বৈচিত্র সমুদ্ভূত হইয়াছে। রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের উপাদান সমূহের নিত্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে; তাহার কখনই ব্যতিক্রম হয় না। বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ মধ্যেই এই আকর্ষণের কার্য্য সংঘটিত হয়; এবং রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ মাত্র তদুপাদান পদার্থ সমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হইয়া উঠে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মধ্যে ইহার বেগ ন্যূনাধিক লক্ষিত হইয়া থাকে। এই আকর্ষণের কার্য্যফলে জড় পদার্থের এককালীন ধ্বংশ বা বিনাশ হয় না; সুতরাং ইহার অধীন পদার্থ সকলের ভার বা গুরুত্বেরও কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, কেবল তাহাদের স্থানান্তরতা ও রূপান্তরতা মাত্র ঘটিয়া থাকে। রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়,—হয় তদন্তর্গত উপাদান পদার্থগুলি পরস্পরের অব্যবহিত সংযোগে আসিয়া মিলিত হয়, নতুবা 'স্থানচ্যুতি' বা 'প্রতিনিধি' প্রণালীমত উপাদান পদার্থগুলির কোন একটি, অধিকতর রাসায়নিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট কোন পদার্থের সন্নিধানে আসিয়া, পূর্ব্বসহযোগীকে ছাড়িয়া দিয়া, তাহার সহিত সংযুক্ত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধুমাসে রাসলীলা।

বসন্ত পূর্ণিমা নিশি—বৃন্দাবন ধামে,
বসি তমালের ডালে, আমোদে বিভোর
পিকগণ গায় গান—জুড়াইয়া প্রাণ।
ফুটি নানা জাতি ফুল—নিকুঞ্জ মাঝারে
কি যে শোভা বিকাশিছে—মানস মোহন—
বর্ণের নাহিক শক্তি বর্ণিতে সে শোভা।
এ হেন রজনীকালে গোপাঙ্গনাগণ—
ব্রজেশ্বরে হেরিবারে, সে নিকুঞ্জ মাঝে
উপনীত; শুনি তাঁর মধুর মুরলী।
শ্যামের মুরলীধ্বনি ভক্তের হৃদয়ে
ঢালে যে মধুর ধারা—অতীব মধুর—
ভক্তের হৃদয় বিনা অন্যে কে জানিবে?
সখাভাবে শ্রীহরিরে পেয়ে গোপীগণ
আমোদে বিভোর সবে—হরিগুণ গায়।
মাঝে রাখি শ্রীরাধারে শ্রীহরির সনে
হেরিয়ে রূপমাধুরী—আকুল পরাণে
ভকত সম্পদ পদে পরাণ বিকায়।
এমন সময়ে সুখে দেবর্ষি নারদ
যেতে যেতে ব্যোমপথে—হেরিলা নয়নে
হরির অপূর্ব্ব লীলা—অমনি ত্বরিতে
পশিলা সে কুঞ্জ মাঝে—কণ্ঠ মিলাইয়া
বীণা সনে; এক মনে গাইতে গাইতে

"হের রে নয়ন!
নয়ন সম্মুখে আজি
বৃন্দাবন-বিহারী-শ্রীহরি
রাধা সনে
গোপিনী মণ্ডলে পরিবৃত
কিবা
নয়ন রঞ্জন শিখিপুচ্ছ
শিরে,—চূড়া'পরে সুশোভিত।
অধরে মধুর হাসি
হেরিলে ভক্তের প্রাণ হয় রে উদাসী।
শুনি মুরলীর ধ্বনি,
প্রাণ মন চিরদিন তরে



মধুমাসে রাসলীলা।

লুটাইতে চায় কোমল চরণে,
বামে হেলিত সে শিখিচূড়া
মৃদু মন্দ বায়ু ভরে,
হেলিয়া দুলিয়া
যেন ডাকিতেছে ভক্তগণে—
'আয় আয় ভক্তগণ!
নয়ন ভরিয়া দেখ
মধুর মধুর
যুগল রূপ মাধুরী—
মোক্ষপদ পাইবি রে যদি।'
কিবা
বনমালা গলে বিলম্বিত,
যেন
কজ্জল গিরির'পরে
স্বচ্ছ স্রোতস্বতী।
নীলাম্বরে কিম্বা যথা বলাকার মালা।
কিবা
পীতাম্বর কটিতটে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ শোভি
রাতুল চরণে
শোভিছে নূপুর—
যেন
দেখাইবে ভক্তে
ভক্তি কারে বলে;
যেন
বলিতেছে—
'আয় রে পাতকি,
আয় আয় চলে,
যদি
পাপভার হ'তে মুক্ত হবি,
আয় আয়—
আমার মতন লুটাইয়ে পড়।

ভকত-সম্পদ এই কমল চরণ
ছাড়িস্‌নে ক্ষণ তরে;
একবার ছেড়ে দিলে
পুন মেলা হইবে কঠিন।'
কিবা
শ্যাম বামে কমল বরণী
ভক্তি মূর্ত্তিময়ী
রাধিকার রূপে।
আহা!
এ অপূর্ব্ব শোভা
আর কি পাইব পুন হেরিতে রে
নয়ন সম্মুখে?
জাগিবে কি চিরদিন
হৃদয় পঙ্কজে?
এমন সৌভাগ্য হবে কি রে মোর,
কাটিবে রে কর্ম্ম-ফাঁসী—
উদাসী হইয়ে—
'জয় রাধে কৃষ্ণ' বলি মাতাব ভুবন।
ওহে ভক্তের বাসনা,
ভক্তের বাসনা কি যে—
জানত হে।
কি বলিব আর,
বলিবার যা আমার
বলিবার আগে বুঝিয়াছ তুমি।
বুঝেছ যেমন
সহস্র বৎসর বর্ণি বর্ণে যদি,
তথাপি তেমন
নারিব বুঝাতে অন্যে।
তাই বলি—
বলিব না মনের বাসনা,
চাহিব না কিছু
যাহা ভাল বুঝ কর তাই।

ভববাসীগণে লয়ে—
খেলাও খেলাও সদা
ওহে খেলুয়াড়।
ইচ্ছাময়,
ইচ্ছা তব হউক।"

গাহিতে গাহিতে রূপ অনিমেষে হেরি
হইলা বিভোর ঋষি—পোহাল রজনী—
ফুরাইল রাসলীলা—হরিগুণ গানে
মাতিল ভুবনবাসী জীবজন্তুগণে।

কলিকাতার ইতিহাস।

(১৫২.পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

দ্বাদশ অধ্যায়।

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা—রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব—শব্দকল্পদ্রুম—ধর্ম্মসভার বিলাত আপিলের ফল—মেডিকেল কলেজ—সার চার্লস মেট্‌কাফ—'মুদ্রণ স্বাধীনতা' আইনের স্থূলমর্ম্ম—মেট্‌কাফহল—কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী।

ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সঙ্গেই 'সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা' সংস্থাপিত। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই সভার সভাপতি ছিলেন।

স্যর রাধাকান্ত খ্রীঃ ১৭৯৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শোভাবাজার রাজবংশের প্রসিদ্ধ রাজা গোপীমোহন দেব তাঁহার পিতা। তিনি বাঙ্গালা, হিন্দী, পারসী, আরবী ইংরাজী ও সংস্কৃততে সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্কলিত "শব্দ-কল্পদ্রুম'' আজিও তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। গোপীকান্ত সিংহের প্রপৌত্রীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তাঁহার গর্ভে কুলধূরন্ধর তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ তিন পুত্র যথাক্রমে মহেন্দ্রনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ ও দেবেন্দ্রনারায়ণ নামে পরিচিত। তাঁহার বিদ্যার পুরস্কার স্বরূপ, বঙ্গ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, ডেন্মার্ক, রুসিয়া ও আমেরিকার অনেক সভা, তাঁহাকে স্ব স্ব সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল। খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে তিনি কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট পদ ও খ্রীঃ ১৮৩৭ অব্দে পৈত্রিক রাজা উপাধি ও খেলাত কৌন্সিল হইতে প্রাপ্ত হন। খ্রীঃ ১৮৪৩ অব্দে গয়া গমন প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নবাব সাহেবও তাহাকে খেলাত প্রদান করিয়াছিলেন।

"শব্দকল্পদ্রুম" তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি তদ্ব্যতীত স্কুলবুক সোসাইটীতে "নীতিকথা'' "বাঙ্গালাশিক্ষা" প্রভৃতি পুস্তক, বালকগণের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে রচনা করিয়া অর্পণ করেন। পারস্য ভাষায়ও তাঁহার শিল্পিনৈপুণ্য অল্প ছিল না। ঐ ভাষায় তিনি "হেকমতে আশ্‌গীর" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বিলাতে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই রূপে গ্রন্থাদি প্রনয়ণ জন্য তিনি গ্রন্থ জগতে একজন উপযুক্ত লেখক ছিলেন বলিতে হইবে। সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্যও তিনি অল্প চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার আশ্রিত সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা, সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল।

পুর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা "সতীদাহ নিবারণ আইন" রদ করিবার জন্য বিলাতে আপিল করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

খ্রীঃ ১৮৩৪ অব্দে মহাত্মা বেণ্টিক কলিকাতার মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। এই সময়ে এদেশে চিকিৎসার বড়ই দুরবস্থা ছিল। বৈদ্যক শাস্ত্রের রীতিমত আলোচনা না থাকায় চিকিৎসকের সংখ্যা এত অল্প হইয়াছিল যে অল্পবিত্ত লোকদিগের পক্ষে চিকিৎসা একপ্রকার দুষ্প্রাপ্যই হইয়াছিল। মহাত্মা বেণ্টিক দেশের সেই কষ্ট নিবারণের জন্য এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে বর্ত্তমান কলেজ গৃহ নির্ম্মিত হয়। ক্রমেই ইহার উন্নতি সাধিত হইতেছে।



রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কে, সি, এস, আই।



স্যর চার্লস মেটকাফ।

মহাত্মা বেণ্টিঙ্ক ভারত ত্যাগ করিলে, তাঁহার কৌন্সিলের প্রধান সভ্য সার চার্লস মেট্‌কাফ অতি অল্প দিনের জন্য (খ্রীঃ ১৮৩৫—৩৬) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য করেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ইনি যেরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ইহাঁর নাম চিরকাল ভারতবাসীর স্মৃতিপথে জাগরুক থাকিবে। ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনতা ইহাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি!

পূর্ব্বে, কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, কোন সংবাদ পত্রেরই স্বাধীনতা ছিল না। হেষ্টিংসের সময়ে "হিকের গেজেট" নামে একখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময় যখন ইংরাজ ফরাসীতে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল, সেই সময়ে সম্বাদপত্রের জন্য এই নিয়ম হয় যে রীতিমত পরীক্ষিত না হইয়া কোন প্রবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে পারিবে না। এই বিধি লঙ্ঘিত হইলে সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারীকে বিলাতে ফিরিয়া যাইতে হইত, এ দেশে বাস করিবার অধিকার আর তাঁহার থাকিত না। এই নিয়ম অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক দিন চলিয়া আসিয়াছিল। লর্ড হেষ্টিংস সে নিয়মে তত লক্ষ্য রাখেন নাই; তাঁহার সময়ে সংবাদপত্রে তাঁহার কার্য্য সমালোচিত হইতে পারিত। তৎপরে আবার আডাম সাহেব কর্ত্তৃক ঐ নিয়ম পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয় এবং 'কলিকাতা জর্ণলের' এডিটর ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হন।

মেটকাফ গবর্ণর জেনেরল হইয়াই ঐ আইন রদ করেন। খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দের এপ্রিল মাসে মুদ্রণ স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। আইনের স্থূল মর্ম্ম এই—

"ব্রিটিশ রাজ্যে যে সমস্ত সংবাদ পত্র আছে বা হইবে তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগকে যে যে বিভাগে ঐ সমস্ত সংবাদ পত্র বাহির হইবে সেই সেই বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনাদের নাম ধাম প্রকাশ করিতে হইবে। এই অবধি সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক, পত্রিকা ও কাগজাদিতেই মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম থাকিবে। যাহার মুদ্রাযন্ত্র থাকিবে, তাহাকেই যথানিয়মে তদ্বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা এই আইনের কোন ধারার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে, তাহারা জরিমানা ও কারাদণ্ড পাইবে। সংবাদপত্রাদির প্রকাশক ও মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীর নাম ধাম প্রকাশ করা ব্যতীত নূতন আইন মুদ্রণ-স্বাধীনতায় অন্য কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবে না।" *

খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এই আইন অনুসারে কার্য্য হইতে আরম্ভ হয়। মেটকাফের এই মহৎকার্য্য চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভাগীরথী তীরে "মেটকাফ হল" নামক সুপ্রশস্ত ও সুদৃশ্য অট্টালিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর খ্রীঃ ১৮৪০অব্দে প্রোথিত হইয়া ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১৮৪৪ অব্দে সমাপ্ত হয়।

মেটকাফ সাহেবের শাসন সময়ে, খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দের আগষ্ট মাসে, একটি সাধারণ সভা আহূত হইয়া স্থির হয় যে কলিকাতার একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তদনুসারে "কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগার" (Calcutta Publ Library) খ্রীঃ ১৮৩৬ অব্দের মার্চ মাসে স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ গ্রন্থাগারটি এস্‌প্লানেডে, ডাঃ এফ্, পি, ষ্ট্রং (Dr. F. P. Strong) সাহেবের বাটীতে অবস্থিত ছিল। তথায় উহা খ্রীঃ ১৮৪১ অব্দের জুলাই পর্য্যন্ত অবস্থিত ছিল। তৎপরে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে স্থানান্তরিত হয়। তথায় খ্রীঃ ১৮৪৪ অব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত ছিল, তৎপরে মেটকাফ হলে স্থানান্তরিত হয়, এবং ঐ গৃহে ইহা এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

* শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের ভারতবর্ষের ইতিহাস।

কনকলতা।

(১৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাতা আহার্য্যের উদ্যোগ করিতেছেন। সুধীর ভগ্নীকে লইয়া অঙ্গনে ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় প্রদ্যোত বাটিতে আগমন করিলেন।

মাতা পুত্রকে পাইয়া সানন্দে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুধীর শুনিবার জন্য নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রদ্যোত বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মা, আমার বেতন মাসে দশ টাকা নির্দ্ধারিত হয়েছে; খাওয়া পরা তিনি দেবেন। কিন্তু আমাকে সেই খানেই থাক্‌তে হ'বে,—রোজ রোজ বাটিতে আস্‌তে পার্‌বো না।"

মাতা বলিলেন, "তাতে কষ্ট কি বাপু? আমাকে না দেখ্‌লে যদি কষ্ট হয়, দুই প্রহরের সময় বা সন্ধ্যার সময় আমাকে দেখে যেও,—তোমরা ভাল থাক্‌লেই আমি ভাল থাকি।"

প্রদ্যোত। "কিন্তু মা, তুমি কত যত্ন কর, এমন যত্ন কি আর কেউ কর্‌তে পার্‌বে?"

মাতা। "ভাল হয়ো, সকলেই ভাল বাস্‌বে, সকলেই যত্ন কর্‌বে। দিন কত সেখানে থাক্‌তে থাক্‌তে একটু মন বস্‌লে আর কষ্ট বোধ হবে না। এত আর দুদিন দশদিনের পথ নয়, ভাবনা কি?"

প্রদ্যোত। "তিনি বলেছেন, আমি ভাল করে কাজ কর্‌তে পার্‌লে আরও বেতন বৃদ্ধি ক'রে দেবেন, আমি খুব পরিশ্রম ক'র্‌বো, যেন চার পাঁচ মাসের মধ্যেই আমার বেতন বৃদ্ধি হয়।"

মাতা। "যাও, বাছা, এখন স্নান করগে।—মাতঃ অম্বিকে! তোমার মনে যা আছে সেই মতই হ'ক। আমি ত দুঃখের কিছুই দেখ্‌ছিনে।" এই বলিয়া আবার সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

পাঠক, এই স্থলে, তোমাকে এই ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে আরও গোটা দুই কথা বলিব। জ্যেষ্ঠটি কার্য্যপ্রিয়, বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। কনিষ্ঠটি ক্ষীণকায়, অল্প কষ্টেই ক্লান্ত হয়, লোকসমাজ বড় ভালবাসে না। দুইটিই সুশ্রী, কিন্তু বড়টি যেমন ছোটটি তেমন নয়। বড়টির গঠন পুরুষবৎ, কিন্তু ছোটটির গড়ন মেয়েলি মেয়েলি।

ক্রমে স্নানাহার হইল। মাতা পুত্রগণকে লইয়া অনেকক্ষণ নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন। শেষে প্রদ্যোত আবার আপনার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল।

প্রদ্যোত চলিয়া গেলে, মাতা সুধীরকে বলিলেন, "সুধীর! তুমি আমার জন্য কয়েকটা জিনিস কিনে আন্‌তে পার?"

সুধীর। "কি মা?"

মাতা। "দেখ বাপু, আলস্য ভাল নয়,—মিছে মিছে সময় নষ্ট করায় ফল কি? তাই মনে কর্‌চি, আমি যে সকল কাজ পিতৃ-গৃহে আমোদের জন্য শিখেছিলাম সেই সকল কাজের চর্চ্চা করি; বোধ হয় তাতে অর্থ লাভও হতে পার্‌বে। তুমি যাও, আমার জন্য শ-খানেক ময়ূরপুচ্ছ ও কতকটা সুতা নিয়ে এস আমি ময়ূরপুচ্ছের পাখা প্রস্তুত কর্‌বো।

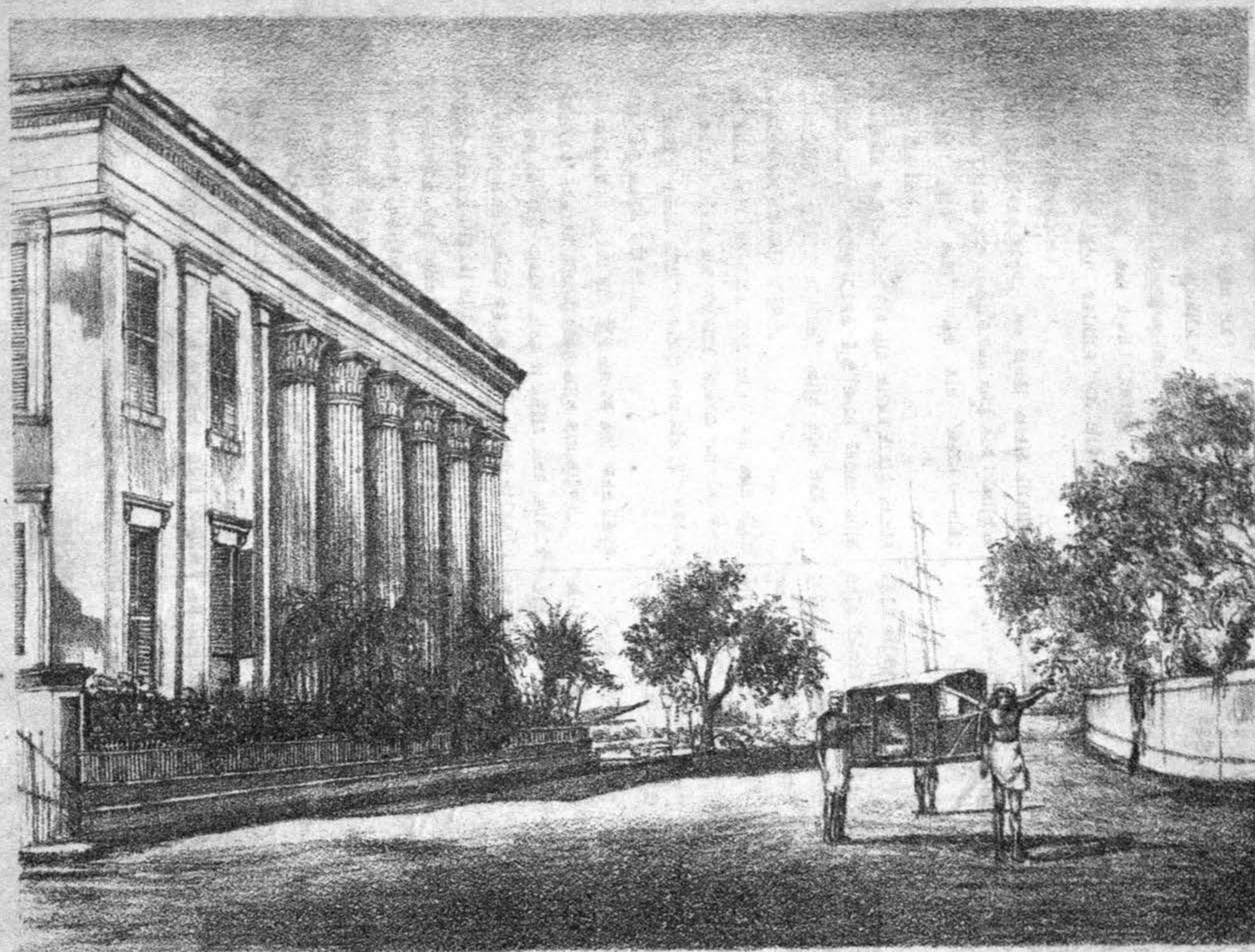
সুধীর মাতার আদেশ মত বাটীর অদূরবর্ত্তী কোন দোকান হইতে কথিত দ্রব্য গুলি কিনিয়া আনিয়া দিল। বেশী দূরে যাইতে তাহার সাহস হইল না।

"আলস্য ভাল নয়" এই উপদেশটি সুধীরের মনে গাঁথা রহিল। সুধীর এখন আর বৃথা বসিয়া ভাবে না। সুখের সময় গুরুর নিকট যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিল, এখন নিজেই পুথি লইয়া সেই সকল আলোচনা করে। আলোচনাই শিক্ষার প্রশস্ত পথ। সুধীরের সংস্কৃত-জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাহ অতীত হইয়াছে, প্রদ্যোত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। অষ্টাহকাল তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন। সজ্জনপত্নী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। সজ্জনসিংহের পুত্র কন্যাগণও তাঁহাকে বড় ভালবাসেন।

সজ্জনসিংহের দুইটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ জগৎসিংহ আমাদের পূর্ব্বপরিচিত। কনিষ্ঠ উদয়সিংহ,—বয়স নয় বৎসর মাত্র। কন্যাটি কনিষ্ঠা,—বয়স ছয় কি সাত বৎসর,—নাম প্রভাবতী।



মেটকাফস্ হল।

এখন প্রদ্যোত সজ্জনসিংহের এতদূর প্রিয় হইয়াছেন যে তিনি তাঁহাকে নিজের পত্র-লেখক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন আর প্রদ্যোত, সাধারণ দপ্তর-খানায় বসিয়া কাজ করেন না,—এখন তিনি সজ্জনসিংহের নিজের বসিবার ঘরে বসিয়া তাঁহার আদেশ মত লিখন পঠন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

এক দিন সেই কক্ষে, প্রদ্যোত বসিয়া লিখিতেছেন,—সজ্জনসিংহ বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছেন,—এমন সময় একটি বৃদ্ধা, একটি যুবককে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল।

যুবাটির বয়স আন্দাজ কুড়ি বৎসর। অত্যন্ত কুরূপ, অস্থিচর্ম্মাবশেষ। বর্ণ নিতান্ত কৃষ্ণবর্ণ নয়। বৃদ্ধাকে দেখিলে তাহার জননী বলিয়াই বোধ হয়। মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য।

বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বসিল। সজ্জনসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?"

বৃদ্ধা। "বাবা! আমি বড় গরিব। এক কালে আমার অনেক টাকা কড়ি ছিল। অনেক দাসী নফর খাট্‌তো,—আমার সাত বেটা ছিল,—সবাই গেছে, কেবল এই টুকুই এখন আমার ভরসা। বাবা! আমার বড় ছেলে কত বড় মহাজন ছিল, তা আর তোমায় কি বল্‌বো? আমি—"

সজ্জন। "তুমি কি চাও?"

বৃদ্ধা। "আমার এ ছেলেটিকে অনেক কষ্টে লেখা পড়া শিখ্‌য়েচি,—কিন্তু কেউ সহায় নেই যে একটু কাজ কর্ম্ম জোগাড় করে দেয়।"

সজ্জন। "তোমার ছেলের একটু কর্ম্ম ক'রে দিতে হবে?"

বৃদ্ধা। "হ্যাঁ বাবা! তাহলে তোমায় আর কি আশীর্ব্বাদ করবো? তুমি চিরজীবি হয়ে থাক! তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হ'ক বাবা!"

সজ্জনসিংহ, বৃদ্ধার পুত্রকে বলিলেন, "বাপু! তোমার নাম কি?"

পুত্রের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা বলিল, "বাবা! ওর নাম সুবোধ।"

সজ্জনসিংহ বলিলেন, "দেখ, বাপু সুবোধ! তুমি যদি যথার্থই সুবোধ হও, তা'হ'লে তোমার কাজের কখন অভাব হবে না।"

বৃদ্ধা। "বাবা! ও আমার বড় সুবোধ ছেলে।"

সজ্জন। "ভাল, সুবোধ! তুমি এ দিকে এস। একটু লেখ দেখি।"

সুবোধ লিখিল,—সে লেখা সজ্জনসিংহের পসন্দ হইল না। সে লেখার ছাঁদ অতি কদর্য্য। ছত্র বাঁকিয়া গেল। প্রত্যেক কথায় প্রায় দুই একটি বর্ণ স্খলিত হইল। সজ্জনসিংহ লেখা দেখিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "দেখ, বাছা, তোমার ছেলের লেখা বড় ভাল নয়।"

বৃদ্ধা। "তা হক, বাবা, উ-ই ঢের, ও ত ছেলে মানুষ, এরপর আরও লিখ্‌তে পারবে। আমি বড় গরিব আমার উপায় তোমায় করতেই হবে। আমি খেতে পাইনে, বাবা!"

সজ্জন। "দেখ, বাছা, আমি তোমার ছেলেকে আমার কাছে রাখ্‌বো, খেতে পরতে দেবো, এবং কাজকর্ম্ম শেখাবো। তারপর কাজকর্ম্ম শিখ্‌লে,—হাঁতের লেখা একটু দুরস্ত হ'লে, মাইনে ক'রে দেব। তোমার ছেলে যদি চালাক হয় এক মাসের মধ্যেই মাইনে হবে। এই দেখ, এই ছেলেটিকে আটদিন হলো দশ টাকা মাইনে দিব বলে রেখেছিলেম, কিন্তু এর কাজে আমি এম্নি সন্তুষ্ট হয়েছি যে এই মাস থেকেই দশ টাকার বদলে পনর টাকা মাইনে দেব স্থির ক'রেছি।"

কথাটা শুনিয়া প্রদ্যোতের একটু যেন আনন্দ হইল। তাঁহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু বহিল। কেহ দেখিবার আগেই তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন।

বৃদ্ধা বলিল, "দেখ, বাবা, আমার ছেলেটিকে তোমার আপনার কাছে বসয়ে কাজকর্ম্ম শিখ্‌যো।"

সজ্জনসিংহ "আচ্ছা" বলিয়া প্রদ্যোতকে বলিলেন, "প্রদ্যোত, তুমি সুবোধকে সঙ্গে করে স্নানাদি কর গে। অনেক বেলা হয়েছে।"

প্রদ্যোত। "এই চিঠিটা আর দুই ছত্র লিখিলেই শেষ হবে।"

সজ্জন। "ভাল, পত্রটা শেষ ক'রেই যাও।" পরে বৃদ্ধাকে বলিলেন, "দেখ, বাছা, আজ অনেক বেলা হয়েছে, আমার বাটীতে খাওয়া দাওয়া করে বিকালে বাড়ীতে যেও।"

এই বলিয়া সজ্জনসিংহ উঠিয়া গেলেন। প্রদ্যোতের পত্র লেখা শেষ হইলে আর সকলেও সে গৃহ ত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। সেই গৃহে প্রদ্যোত বসিয়া লিখিতেছেন। সুবোধ বসিয়া আছে। সুবোধের সম্মুখে মস্যাধার,—মস্যাধারে লেখনি এবং ক্রোড়ে কাগজ।

প্রদ্যোত বলিলেন, "ভাই, সুবোধ, লেখ না,—বসে রয়েছ কেন? লিখ্‌লিই হাত দুরস্ত হ'বে। শীঘ্র শীঘ্র বেতন হবে। মায়ের কষ্ট দেখে কি তোমার দুঃখ হয় না?

সুবোধ। "নাও, আর মিছে বক্ বক্ করো না, আপনার চরকায় তেল দাও।"

প্রদ্যোত আর কিছু বলিলেন না, আপনার কাজ করিতে লাগিলেন।

সুবোধও ক্রমে ক্রমে নিদ্রার উপাসনা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। সজ্জনসিংহ উপস্থিত হইলেন। প্রদ্যোত অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁহার আগমন জানিতে পারিলেন না।

সজ্জনসিংহ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রদ্যোতকে কার্য্যে অভিনিবিষ্ট দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু সুবোধের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তাঁহার সে ভাব তিরোহিত হইল, মুখ একটু বিষন্ন হইল। তিনি যেন আবার পূর্ব্ব আনন্দ লাভ মানসে প্রদ্যোতের পানে চাহিলেন, দেখিলেন প্রদ্যোতের মুখে একটু হাসির রেখা,—সে হাসি টুকু দেখিলেই বুঝা যায় যেন তাহার মনে কত আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

সজ্জনসিংহ বাৎসল্যপূরিত স্বরে বলিলেন, "প্রদ্যোত!—"

প্রদ্যোত চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন।

সজ্জন। "প্রদ্যোত, তুমি হাসিতেছিলে?"

প্রদ্যোত অপ্রতিভ হইয়া কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আপনি এর মধ্যে এসেছেন?"

সজ্জন। "হাঁ এসেছি। ভাল প্রদ্যোত, তুমি এই মাত্র হাসিলে কেন?"

প্রদ্যোত বলিল, "আপনি হয় ত আমায় পাগল মনে করবেন।"

সজ্জন। "না না, পাগল মনে কর্‌বো কেন? তোমাদের ত এই আশার সময়, এ সময় উচ্চ আশা করে সেই রূপ হবার জন্য চেষ্টা করলে তবে ত বড় হতে পারবে,—বল কি ভাবছিলে?"

প্রদ্যোত। "আমি কিছুই ভাবিনি,—সুবর্ণগ্রামের রত্নদত্ত নামক মহাজন আপনাকে যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রের উত্তর লেখ্‌বার জন্য, পত্র খানি পাঠ করছিলাম; একটি ছত্র পাঠ করে আমার হাসি এসেছিল।"

সজ্জন। "রত্নদত্ত এমন কি লিখেছে যা পড়ে হাসি আসতে পারে?

প্রদ্যোত। "তা কিছুই নয়। সে ছত্রটি এই,—'বিধাতার ইচ্ছা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজা ভিকারী এবং ভিকারী রাজা হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া যে ব্যক্তি উপার্জ্জিত অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করে সেই ধন্য'।"

সজ্জন। "এতে হাসির কথা কি?"

প্রদ্যোত। "এতে হাসির কথা নাই কিন্তু ঐ ক'টি কথা পড়ে আমার মনে উদয় হ'লো, আমি ত ভিকারী, আমি কি কখন রাজা হতে পারবো? তখনি 'আমি কি পাগল, মিছে মিছে আশা কর্‌চি' এই ক'টি কথা মনে হতেই হাসি এলো।"

সজ্জন। "প্রদ্যোত, চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই।" এই কথা কয়টির সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হইল। পরে বলিলেন, "তোমার মত উৎসাহী যুবক যে রাজা হতে পারে তাও অসম্ভব নয়,—কিন্তু ঐ হতভাগ্য কি রূপে জীবন কাটাবে তা ভাবতেও কষ্ট হয়। এই বলিয়া তিনি নিজ স্থানে বসিলেন এবং বলিলেন, "সুবোধ, এখনো ঘুমুচ্ছো, ওঠ, কাজ কর।"

সুবোধ উঠিল,—নিজ দেব-অক্ষরে কাগজ পূর্ণ করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে ঢুলিতে লাগিল।

সজ্জনসিংহ অনেকক্ষণ এ কাগজ সে কাগজ দেখিয়া একখানি দেবনাগরাক্ষরের চিঠি লইয়া বলিলেন "প্রদ্যোত, এই পত্র খানি পড়িতে পার?"

প্রদ্যোত দেখিলেন, সুদশার সময়ে অল্প অল্প সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন, পত্র খানি কষ্টে মনে মনে পড়িলেন।

সজ্জনসিংহ বলিলেন, "পড়িতে পারিলে কি? পত্রখানি কে লিখিয়াছে?"

প্রদ্যোত পত্রের মর্ম্ম কতক বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বলিলেন, "বারাণসী হতে অরিন্দম উপাধ্যায় এই পত্র লিখেছেন।"

সজ্জন। বুঝেছি, তুমি পত্রখানি পড়তে পেরেছ। দেখ, ও পত্রের উত্তরে এই লেখ যে তাঁর কার্য্য এই মাসেই সম্পন্ন হবে; তিনি যেন পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই এখানে আসেন। পত্র খানি সংস্কৃততেই লিখ্‌তে হবে। তুমি যদি পত্র লিখে আমায় সন্তুষ্ট কর্‌তে পার তা'হলে তোমায় এই মাস [illegible] কুড়ি টাকার হিসাবে বেতন দিব। পত্রখানি আমার কাল প্রাতেই চাই।"

প্রদ্যোত পলকমাত্র কি ভাবিয়াই বলিলেন, "মহাশয়! আমি অনেকদিন মাকে দেখিনি, আজ একবার তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।"

সজ্জন। "ভাল, তুমি এখনি যেতে পার, কিন্তু পত্রখানি আমার কাল প্রাতেই প্রয়োজন।"

প্রদ্যোত "যে আজ্ঞা" বলিয়া সমস্ত কাগজ পত্র বাঁধিয়া

রাখিলেন এবং পত্রখানি সঙ্গে লইয়া বাটীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সজ্জনসিংহের বাটী পরিত্যাগ করিয়া চল, পাঠক, প্রদ্যোতের অনুসরণ করি।

প্রদ্যোত দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথের কোন দিকে লক্ষ্য নাই। অল্পক্ষণেই বাটিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাতা সেই সময়ে ময়ূর পুচ্ছে ব্যজন নির্ম্মাণ করিতেছিলেন; শিশু কন্যাটি তাঁহার পাশে নিদ্রিত। অদূরে সুধীর একখানি পুথি লইয়া পাঠে ব্যাপৃত ছিল।

প্রদ্যোত, মাতাকে কোন কথা না বলিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে সুধীরের নিকট গেলেন। মাতাও কার্য্যত্যাগ করিয়া সে দিকে চাহিলেন।

সুধীরও পুস্তক রাখিয়া বলিলেন, "দাদা, এত দুপুর বেলা তুমি ব্যস্তসমস্ত হয়ে এলে কেন?"

প্রদ্যোত। "সুধীর, কর্ত্তা মহাশয় বলেছেন, যদি আমি একখান সংস্কৃত চিঠি লিখ্‌তে পারি, তাহ'লে আমাকে এই মাস থেকেই কুড়ি টাকা করে দিবেন। তুমি ত জান, সংস্কৃত যদিও আমি লিখ্‌তে পারি কিন্তু আমার রচনা ভাল নয়। আমি কেবল হস্তাক্ষর আর হিসাবের দিকেই নজর দিয়েছিলেম; রচনার দিকে কোন কালে মনোযোগী ছিলাম না। এখন করি কি?"

সুধীর। "তার জন্য ভাবনা কি, দাদা? আমি এখন চিঠি খানা লিখে দেব। কি লিখ্‌তে হবে বল,—তবে আমার হাতের লেখা ভাল নয়; তা তুমি নিজে লিখে নিও, তাহলেই হবে।"

প্রদ্যোত। "আমি সেই জন্যেই এসেছি। কর্ত্তা মহাশয় আমায় আজকার মত অবসর দিয়েছেন,—কাল প্রাতে পত্র খানি চাই।"

সুধীর। "তা হ'বে; বল ত আমি এখনি লিখে দিচ্ছি।"

প্রদ্যোত। "তুমি ধীরে সুস্থে একটু ভাল করে লিখো। এই নাও, এই চিঠি খানিরই জবাব লিখ্‌তে হবে। অরিন্দম উপাধ্যায় ঠাকুর যে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, সকলি এই মাসের মধ্যে শেষ হবে; পত্র পাঠ মাত্র তাঁকে আস্‌তে লিখ্‌তে হ'বে।" এই বলিয়া সুধীরের হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিলেন। সুধীর পত্রখানি দেখিতে লাগিল।

প্রদ্যোত এই অবসরে মাতার নিকট আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, "মা! আমাদের প্রতি ভগবান সুপ্রসন্ন। কর্ত্তা মহাশয় এখন আমাকে নিজের হিসাব ও চিঠি পত্র প্রভৃতি লেখ্‌বার জন্য নিযুক্ত করেছেন। বাড়ীর সকলেই আমাকে ভাল বাসে।"

মাতা। "শুনে বড় সন্তুষ্ট হলেম। দেখো বাবা, এই রূপ সন্তুষ্ট হয়েই যেন চিরকাল কাটাতে পারি,—যেন আমায় তোদের নিন্দা শুনতে না হয়।"

প্রদ্যোত। "মা! মনে মনে স্থির করেছি, এ জন্মে এমন কাজ কখনো করবো না যাতে অবনতি হ'তে পারে। মা! যে ভগবান রাজাকে ভিকারী করেন, ভিকারীকেও তিনি রাজা কর্‌তে পারেন। তুমি ভেবো না। দুঃখের কথা মনে হয়ে যখন কষ্ট হয় তখনই কে যেন আমার প্রাণের ভিতর থেকে বলে, "প্রদ্যোত! কাঁদিস্‌নে, দুঃখের দিন চিরদিন থাক্‌বে না। সুখ দুঃখ চক্রবৎ ঘুর্‌চে; এখন দুঃখ ভোগ কর্‌চিস্ সত্য, কিন্তু সে কেবল ভবিষ্যতে সুখী হবি বলে বইত নয়।"

মাতার চক্ষে দুইবিন্দু অশ্রু বহিল। তিনি বলিলেন, "বাছা, যে ভগবান রাজাকে ভিকারী করেছেন, তিনি কি সেই ভিকারীকে আবার রাজা কর্‌বেন? তাঁর ইচ্ছা তিনি জানেন,—আমি সে জন্য কিছুই ভাবি না। তাঁর মনে যা আছে তাই হ'বে ভেবেই নিশ্চিন্ত আছি।"

প্রদ্যোত উপস্থিত বিষয় চাপা দিবার জন্য জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মা, ময়ূর পুচ্ছের পাখায় কি হ'বে?"

মাতা। "নিষ্কর্ম্মা বসে থাক্‌তে পারিনে, তাই তৈয়ার কর্‌চি। এ পাখা বিক্রী কর্‌লে কি এর খরচা উঠবে না?"

প্রদ্যোত। "কেন উঠবে না? আচ্ছা মা, তুমি ত কাপড়ের উপর জরির ফুল তুল্‌তে জান, একখান রেসমী কাপড়ের উপর জরীর ফুল তোল না কেন?"

মাতা। "কি হবে?"

প্রদ্যোত। "অনেক দামে বিক্রী হবে।"

মাতা। "পাগল ছেলে, রেসমী কাপড় কিনবো কি দিয়ে? সে ত দু চার পয়সার জিনিষ নয়।"

প্রদ্যোত। "তাও বটে।"

মাতা পুত্রে এই রূপ কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে সুধীর পত্রখানি লিখিয়া ভ্রাতার নিকট আনিল,—বলিল, "দাদা, দেখ দেখি এই হ'লে হবে কি না?"

প্রদ্যোত দেখিলেন,—বলিলেন, "বেশ হয়েছে।"

সুধীর। "আচ্ছা, দাদা! তুমি কি রোজ বাড়ীতে আস্‌তে পার না?"

প্রদ্যোত। "কেন?"

সুধীর। "তা হলে বেশ হয়।"

প্রদ্যোত। "কি বেশ হয়?"

সুধীর। "দুজনে একত্রে যদি দিন কত পড়ি, তা'হলে তুমি চিঠি পত্র লেখ্‌বার মত সংস্কৃত শিখ্‌তে পার।"

প্রদ্যোত। "তা আমি বল্‌তে পার্‌লাম না; কর্ত্তা মহাশয় যদি আস্‌তে দেন ত আস্‌বো।"

এই সময়ে মাতা বলিলেন, "প্রদ্যোত, বেলা গেল,—আমি তোমাদের খাবার উদ্যোগ করি গে,—তোমরা দুজনে এখানে থাক,—খুকীকে দেখো।" এই বলিয়া মাতা চলিয়া গেলেন। সুধীর খুকীর কাছে বসিয়া পুথি পড়িতে লাগিল,—প্রদ্যোত পত্রখানি নকল করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে সজ্জনসিংহ নিজে কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। আর সুবোধ?—নরলোকের অবোধ্য বর্ণমালায় কাগজ চিত্রিত করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে নিদ্রার সহিত সাক্ষাৎ ও পরক্ষণেই প্রভুর ভয়ে চমকিত হইতেছিলেন। প্রভুও যে তাঁহার কার্য্য দেখিতেছিলেন না তাহা নয়,—অবশেষে বিরক্ত হইয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "জয়সিংহকে এখানে ডাক।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই জয়সিংহ আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি প্রভুর কথা কহিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "মহাশয়, প্রদ্যোত কোথায়?"

সজ্জন। "সে অনেক দিন তার মাকে দেখে নাই তাই বাটীতে গিয়েছে। দেখ, জয়, এই অলস যুবাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। দেখ, এক সপ্তাহের মধ্যে এর হস্তাক্ষরের কোন উন্নতি হয় কি না?"

জয়সিংহ।—"যে আজ্ঞা।" পরে সুবোধকে ডাকিতে গিয়া দেখিলেন, সে দেওয়াল আশ্রয় করিয়া নিদ্রিত। বলিলেন, "মহাশয়, এর নাম কি?"

সজ্জন। "শুনেছি সুবোধ,—কিন্তু এর মত অবোধ বুঝি আর একটি পাওয়া ভার।" পরে সুবোধকে বলিলেন, "আবার ঘুমুচ্ছো?"

সুবোধের চেতনা হইল। সে লিখিবার জন্য কলম লইতে গিয়া বিছানার উপর কালি ফেলিয়া দিল।

সজ্জনসিংহ আরও বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, যাও, দপ্তরখানায় গিয়া লেখা অভ্যাস করগে।

জয়সিংহ বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস।"

সজ্জনসিংহ ভীতিপ্রদর্শন জন্য বলিলেন, "দেখ, কাজে অমনোযোগী হ'লে শাস্তি পাবে।"

জয়সিংহ সুবোধকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

সজ্জনসিংহ আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "প্রদ্যোত ছেলেটি দিব্য। কাজে বেশ মনোযোগী, ওর যাতে ভাল হয় তা আমি কর্‌বো। আহা শুনকসিংহ কষ্টে পড়ে এখানে এসেছিল। বড় ভাল লোক ছিল,—তার পরিবারেরা কষ্ট পায় সেটা ভাল নয়। আমি তাদের, আপনার বাটীতে এনে রাখ্‌তে পারি, কিন্তু সেটাও ভাল নয়। আর বোধ হয় সে কথা বল্‌লে তাঁদেরও অপমান বোধ হ'তে পারে।"

এমন সময়ে বৃদ্ধা আবার সেই গৃহে উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধা উপস্থিত হইয়াই বলিল, "কৈ, বাবা! আমার সুবোধ কোথায়?"

সজ্জন। "দপ্তরখানায় কাজ শিখ্‌চে।"

বৃদ্ধা। "এখেনে বস্‌য়ে তোমার কাছে কাজ শেখালে না কেন?"

সজ্জন। "দেখ, বাছা, ছেলেটি বড় কুড়ে। ঐ দেখ বিছানাময় কালি ছড়াছড়ি করে ফেলেছে।"

বৃদ্ধা। "তাড়াতাড়ি লিক্‌তে গেলেই কালি পড়ে থাকে। তায় সুবোধ আমার ছেলে মানুষ।"

সজ্জন। "আর একটি ছেলেও ত লিখ্‌ছিল সে কত কালি ফেলেছে বলতো?"

বৃদ্ধা। "সে বড় কুড়ে,—আস্তে আস্তে লেকে, তাই তার কালি পড়েনি। তুমি, বাবা, সুবোধকে তোমার কাছে বস্‌য়ে লেকাও,—নইলে শীগ্‌গির শীগ্‌গির কাজ শিক্‌তে পার্‌বে না। আমি গরিব, কি খেয়ে থাক্‌বো?"

সজ্জন। "দেখ, বাছা, সে যে কোন কাজ পারুক, তাকে আমি এক মাসের মধ্যেই শিখ্‌য়ে নেব। তুমি ভেব না,—তার আপাততঃ পাঁচ টাকা মাইনে হ'লো। মাসে মাসে তুমি এসে টাকা নিয়ে যেও। সে যেমন কাজ শিখ্‌বে তেমনি মাইনে বাড়্‌য়ে দেওয়া যাবে।"

বৃদ্ধা। "বাবা! তোমার জয় জয়কার হোক।" এই বলিয়া বৃদ্ধা সহস্র আশীর্ব্বাদ করিল,—শেষে আশীর্ব্বাদ বাক্য বকিতে বকিতেই প্রস্থান করিল।

সজ্জনসিংহ অনেকক্ষণ বসিয়া কাগজপত্র দেখিতে

লাগিলেন। অপরাহ্ন সময়ে জগৎ, উদয় ও প্রভা আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। আসিয়াই প্রদ্যোতকে না দেখিয়া তিন জনেই একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দাদা কোথায়?"

সজ্জন। "বাড়ি গিয়েছে।"

জগৎ। "কেন, বাবা?"

সজ্জন। "তার মাকে দেখ্‌তে।"

জগৎ। "তাঁর মার কি কোন অসুখ হ'য়েছে?"

সজ্জন। "না, অসুখ করেনি।—মাকে অনেক দিন দেখেনি, তাই দেখ্‌তে গেছে।"

প্রভা। "আস্‌বে কখন?"

সজ্জন। "আজ আস্‌বে না।—কাল সকালে আস্‌বে।"

প্রভা। "তবে কি হ'বে,—আমাদের সঙ্গে গল্প করবে কে?"

সজ্জন। "আজ আমি গল্প কর্‌বো এখন।"

প্রভা। "তুমি তেমন গপ্প জান না। আমি যাই, মার কাছে গল্প শুনিগে।"

প্রভা চলিয়া গেল। সজ্জনসিংহ, পুত্র দুইটিকে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ন সময়ে জয়সিংহ সমুদ্রতটে একাকী পাদচারণা করিতেছিলেন। নিকটে অপর কেহই ছিল না। তিনি একমনে কত কি ভাবিতেছিলেন। হস্তাদির ভঙ্গী দেখিলে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়।

জয়সিংহ ভাবিতে ভাবিতে গুটিকয়েক কথা অস্ফোচ্চস্বরে বলিলেন, "পরাধীন জীবন কি কষ্টকর! যদিও এখানে পরম সুখে আছি; যদিও পিতার স্নেহ, মাতার যত্ন, আমার ভাগ্যে লাভ হ'য়েছে তথাপি আমি পরাধীন। কিন্তু যার মন পরাধীন, তার দৈহিক অধীনতায় কি কষ্ট? আমি ইচ্ছা মত স্থানান্তরে যেতে পারি না—কেন?—সজ্জনসিংহের চাকর বলে কি?—না!—তা কখনই নয়—আমি ইচ্ছা কর্‌লে এখনি চাকুরী ত্যাগ কর্‌তে পারি,—কিন্তু তাম্রলিপ্তি ত্যাগ আমার সাধ্যাতীত। আমি যারে হৃদয়ের দেবতা ব'লে পূজা করি সেই এই তাম্রলিপ্তিতে। আমি চাকুরী করি তারি সুখের জন্য। সত্য, তাকে সঙ্গে করে আমি অরণ্যবাসী হ'তে পারি।—হিংসা দ্বেষ পূর্ণ লোকালয় ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে আমি সুখী হই বটে, কিন্তু আমার প্রিয়পত্নী তাতে সুখী হবেন কি?—কখনই নয়—বন্য ফল মূল আমি ভাল বাসি,—কেন না সংসারের বিষফলের স্বাদ আমি ভাল করে জেনেছি—কিন্তু আমার পত্নী তাতে সুখী হবে কেন?—আমি বন্ধুবান্ধবহীন—আমার পক্ষে অবশ্য সুখের।—কিন্তু সংসারে নবপ্রবিষ্টা বালিকার পক্ষে অবশ্য সুখের নয়। তবে এ বিভিন্ন প্রকৃতির জীবের একত্র সম্মিলন হ'লো কেন?—বিধাতা এরূপ অযোগ্য যোজনা কর্‌লেন কেন?—না, আর ও সকল বিষয় ভাব্‌বো না—যাই। যখন সকলি সুখের, তখন শুধু পরাধীনতা দুঃখকে প্রবল জ্ঞান করি কেন?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জয়চন্দ্র ক্রমে সমুদ্র তট হইতে নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সম্মুখে একখানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ। জয়চন্দ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

একটি বৃদ্ধ রোয়াকের উপর শয্যায় শয়ান আছেন,—একটি সুন্দরী বালিকা—ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যাকে বালিকা বই আর কি বলিব—তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বীজন করিতেছিলেন।

বৃদ্ধ পীড়িত নন,—শুদ্ধ বার্দ্ধক্যের প্রকোপেই অত্যন্ত কৃশ। বয়স প্রায় অশীতি বর্ষ হইবে।

জয়চন্দ্র বাটী মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বালিকাটি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিল। বৃদ্ধ বলিলেন, "সুকুমারি! ঘোমটা দিলি কেন? জয় বুঝি আস্‌চে? তোকে আমি বলে পার্‌লেম না—জয় আর আমি কি ভিন্ন? তোরা আমার দু-পাশে ব'সে দুজনে কথা ক, আমি চক্ষু বুজে শুয়ে শুয়ে শুনি।"

জয়চন্দ্র আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, "পাখা আমার হাতে দাও, আমি ঠাকুরদাদাকে বাতাস দিচ্ছি।" বলিয়াই সুকুমারীর হস্ত হইতে পাখা খানি লইলেন। সুকুমারীও, উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এ দরিদ্র পরিবারের সুকুমারীই রন্ধন কর্ত্রী,—সুকুমারীই গৃহিণী।—গৃহকার্য্যের সহায়তার জন্য একটি বৃদ্ধা দাসী আছে। সে বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গিয়াছে।

সুকুমারী রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ, জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া, তোমার শ্বশুরের কোন সংবাদ পেলে কি? সে রাজগৃহে আর কত দিন থাক্‌বে?"

জয়চন্দ্র। "আমি তাঁকে একখান পত্র লিখেছি।"

বৃদ্ধ। "কি লিখেছ?"

জয়চন্দ্র। "লিখেছি, আপনি যে কার্য্যের উদ্দেশে ওখানে

গিয়াছেন, সিদ্ধ না হইলেও এখানে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন। আপনার পিতৃদেব এইরূপ অভিলাষ করেন।"

বৃদ্ধ। "আমার মরণকাল সন্নিকট—লেখ নাই কেন?"

জয়চন্দ্র। "আপনার শরীরে ত কোন অসুখ নাই।"

বৃদ্ধ। "জরা কি রোগ নয়?"

এই রূপ কথোপকথনে সময় কাটিতে লাগিল। এ দিকে সুকুমারী আহারের উদ্যোগ করিয়া স্বামী ও পিতামহকে আহার করাইলেন। পরে নিজে আহার করিলেন।

রাত্রি ক্রমে প্রহর উত্তীর্ণ হইল। শয়ন কক্ষে জয়সিংহ শয্যায় উপবিষ্ট, সুকুমারী পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। সুকুমারীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে।

জয়সিংহ সুকুমারীকে আপনার নিকটে আনিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, সুকুমারি, আমি আদর করিলেই তুমি কাঁদ কেন? তোমার কষ্ট কি আমায় খুলে বল?—আমি কি তোমার কষ্ট দূর কর্‌তে পার্‌বো না?—যদি তাও না পারি—তোমার কষ্টের অংশী হ'বার অধিকারও কি আমার নাই?"

সুকুমারী। "কি বল্‌বো, প্রাণেশ্বর? আমি তোমার আদরের যোগ্য নই। যদিও বাল্যকাল হ'তে তোমাকে বই আর কারেও জানি নে, তথাপি আমার হৃদয়ের জ্বালা এক মুখে বলবার নয়। জান কি নাথ? কেন পিতা রাজগৃহে?"

জয়চন্দ্র। "কৈ কিছুই ত জানি না?"

সুকুমারী। "প্রাণেশ্বর! সে সব কথা বল্‌লে হয় ত তুমিও আমার প্রতি বিমুখ হবে। কিন্তু না! কোন কথা তোমার কাছে লুকয়ে রাখ্‌বো না। প্রাণেশ্বর! শোন বলি, কিন্তু বল্‌বার আগে বুঝি আমার মৃত্যু হ'লেই ছিল ভাল। প্রাণেশ্বর! তোমাকে হারা হয়ে কি কষ্টেই যে রাজগৃহে বাস কর্‌ছিলাম, তা বল্‌তে পারি নে। একদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের পুখুরে গা ধুয়ে উঠে বাড়ীতে আস্‌বো, এমন সময় কে একজন যমদূতের মত আমায় ধরে, মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে চল্লো, আমি ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লেম, সে যে কোন্ পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল, জান্‌তে পার্‌লেম না। যখন চেতনা হলো, দেখ্‌লাম আমি একটা ঘরে শয্যার উপর শুয়ে রয়েছি, পাশে পাপিষ্ঠ বিক্রমশক্তি বসে রয়েছে। নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠ আমার সর্ব্বনাশ করেছে। আমি তখনি আত্মঘাতিনী হতেম, কিন্তু নাথ! তোমার আত্মজ আমার গর্ভে, সেই জন্য প্রাণত্যাগ কর্‌তে পার্‌লেম না। পিতা সন্ধান পেয়ে সেই রাত্রে আমায় সেখান হ'তে উদ্ধার করেছেন বটে, কিন্তু সে পাপিষ্ঠ ত আজও প্রতিফল পেলে না?"

জয়সিংহ সুকুমারীকে বক্ষমধ্যে আনিয়া অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি! আমি নিশ্চয়ই বলচি সে তোমার কিছুই করে নাই। আর যদিই তোমার সতীত্ব রত্ন হরণ করে থাকে, তাতেই বা তোমার অপরাধ কি? সে পাপীর পাপের ভরা বুঝি পূর্ণ হয়েছে। জগদীশ্বর অবশ্যই তার পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।"

সুকুমারী। "আমি যদি ক্ষত্রিয় কন্যা হই—নিশ্চয় এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো—নিশ্চয়ই একদিন তার রক্তাক্ত মুণ্ড দর্শন ক'রে সেই মুণ্ডে পদাঘাত কর্‌বো—নইলে আমার মনের অনল নির্ব্বাপিত হ'বে না!"

জয়চন্দ্র সুকুমারীকে অনেকক্ষণ সান্ত্বনা করিলেন, শেষে নিদ্রা আসিয়া কতকক্ষণের জন্য তাঁহার মনে কষ্ট লুকাইয়া রাখিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইল। প্রকৃতি আবার নব ভূষণে ভূষিতা হইলেন। সজ্জনসিংহের বাটির অভ্যন্তর কর্ম্মচারীতে পূর্ণ হইল। বহির্ভাগ ভিক্ষুকে পূর্ণ হইল। ভিক্ষুকেরা নিয়মিত ভিক্ষা লইয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেল।

প্রদ্যোত প্রাতেই আসিয়া নিজকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, কিন্তু এখনও প্রভুকে পত্র দেখান হয় নাই, সেই জন্য তিনি কিছু চঞ্চল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সজ্জনসিংহ গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রদ্যোত, পত্র লেখা হয়েছে?"

প্রদ্যোত ভয়ে ভয়ে পত্রখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "প্রদ্যোত আমি তোমার হস্তাক্ষর চিনি, নইলে এ পত্র যে তুমি লিখেছ আমি বিশ্বাস কর্‌তেম না। পত্রখানি কি সমস্তই তোমার রচনা!"

প্রদ্যোত। "মহাশয়, আমি অতি সামান্যই সংস্কৃত জানি, পত্রখানি আমার রচনা নয়, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই পত্রখানি লিখেছে। সে বলেছে, যদি আমি প্রতিদিন দুই দণ্ড ক'রে তার সঙ্গে পড়্‌তে পারি, তা'হলে আমিও সংস্কৃত শিখ্‌তে পারি, কিন্তু পড়্‌বো কখন?"

সজ্জন। "দেখ প্রদ্যোত, তুমি এক কাজ কর্‌তে পার? প্রতিদিন একপ্রহরের পর প্রাতঃকালের কার্য্য শেষ হ'লে

আনাহার ক'রে বাটিতে যেতে পার। সেখানে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অতিবাহিত করে আবার বৈকালের কাজ কর্‌তে এখানে আস্‌তে পার। তা'হলে বোধ হয়, তোমার শিক্ষার সুবিধা হতে পারে। তোমার ভ্রাতার বয়স কত?"

প্রদ্যোত। "সে আমার চেয়ে এক বৎসরের ছোট।"

সজ্জন। "ভাল, কাল বৈকালে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। সে লেখে কেমন?"

প্রদ্যোত। "আর সকল বিষয়ে সে ভাল।"

সজ্জন। "তবে তুমি এক কাজ ক'রো,—তুমি যেমন তার কাছে সংস্কৃত শিখ্‌বে, তারেও তুমি একটু একটু লিখ্‌তে শিখ্‌য়ো; কিন্তু কাল তাকে সঙ্গে করে আন্‌তে ভুলো না। কিন্তু বোধ হচ্ছে তার ভাল কাপড় চোপড় নাই, সে জন্য, সে আস্‌তে লজ্জা বোধ কর্‌তে পারে।—সে কি জগতের চেয়ে বড় বেশী বড় দেখ্‌তে?"

প্রদ্যোত। "না, বরং একটু ছোট, একটু কাহিল, তারে দেখ্‌লে খুব ছেলে মানুষ বলেই বোধ হয়।"

সজ্জনসিংহ এই পর্য্যন্ত বলিয়া, কতকগুলি পত্র পাঠ কর্‌তে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় জয়সিংহ সেই গৃহে প্রবিষ্ট হ'য়ে, বল্‌লেন, "মহাশয়, যবদ্বীপে যে ক'খানি জলযান যা'বার কথা, সে গুলি সজ্জিত হ'য়েছে।"

সজ্জন। "সঙ্গে কে যাবে স্থির করেছ?"

জয়। "আপনি যাকে আদেশ কর্‌বেন, সেই যাবে।"

সজ্জনসিংহ ঈষৎ হাসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়, তুমি?"

জয়। "আপনার আদেশ হলে, আমি যেতে অপ্রস্তুত নই।"

সজ্জন। "তোমার পরিজনগণের রক্ষক কে থাক্‌বে?"

জয়। "রক্ষক ভগবান!"

সজ্জন। "ভাল, আমি যথাসাধ্য, তাঁদের তত্ত্বাবধান করবো। দেখ, জয়, যা'কে বিশ্বাস করে সর্ব্বস্ব স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি, এমন বিশ্বাসী লোক না হ'লে সাত খানি তরির অধিনায়কত্ব কাকে দিতে পারি? বলধর এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন; তিনিই আমার পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। তিনি তিনবার আমার অষ্টবিংশতিখানি তরি নিয়ে যবদ্বীপ, সুমত্রাদ্বীপ ও ইন্দুদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। তারপর, রত্নসিংহ ও ধনেন্দ্রসিংহ, এরা দুজনেই এখন সমুদ্রে; রত্নসিংহের সংবাদ আজ পেয়েছি,—তিনি যবদ্বীপ থেকে, দ্রব্যাদি ক্রয় করে ইন্দুদ্বীপে যাবার জন্য বেরিয়েছেন। ধনেন্দ্রের কোন সংবাদ নাই। এখন তোমাকে বই আর কাকে এ গুরুতর কার্য্যের ভার দিই বল? তবে তুমি এখন যাও,—বাড়ীতে বলে কয়ে এস। শুভলগ্ন ত অপরাহ্নে স্থির হয়েছে?"

জয়। "আজ্ঞা হাঁ। তবে এখন আমি চল্লেম।"

জয়সিংহ চলিয়া গেলেন। সজ্জনসিংহ প্রদ্যোতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রদ্যোত, তোমার কি সমুদ্রে যেতে সাহস হয়?"

প্রদ্যোত। "আমার বড়ই ইচ্ছা যে জলপথে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করি।"

সজ্জন। "ভাল আর একটু বড় হও। ভাল কথা মনে হয়েছে,—তুমি একবার দপ্তরখানা হ'তে কাল যে বালকটি এসেছে,—কি নাম ভাল, তার? সুবোধ না?—হাঁ—তাকে ডেকে আন দেখি।"

প্রদ্যোত চলিয়া গেল। সজ্জন ভাবিতে লাগিলেন, "ছেলেটা নিতান্ত বুড়ে এখানে ত কোন কাজ হবে না। দেখি যদি জয়সিংহের সঙ্গে যেতে চায়,—জল পথে ভ্রমণ কর্‌লে একটু সাহসী হ'তে পারবে। আর প্রদ্যোতকে জয়সিংহের কার্য্যে নিযুক্ত করবো কি?—ছেলে মানুষ—কিন্তু আর কাকেই বা বিশ্বাস করে অত লোকের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করি? ছেলেটি চালাক—বিশ্বাসী—দেখি—দিন কয়েক, কি রকম কাজ করতে পারে। যদি পারে, ত এ মাসের পর থেকে ঐ পদে পাকা করে দিব।"

এমন সময়ে প্রদ্যোত সুবোধকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সুবোধের চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ।

সজ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুবোধ ঘুমুচ্ছিলে কি?"

সুবোধ কোন উত্তর করিল না।

মৌন সম্মতি লক্ষণ মনে করিয়া, সজ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল সুবোধ, আজ জয়সিংহ যবদ্বীপে যাচ্ছে, তুমি কি জলপথে যেতে সাহস কর? তা'হলে তোমার মাসে কুড়ি টাকা করে মাইনে হ'তে পারে।"

সুবোধ টাকার কথা শুনিয়াই বলিল "কেন পার্‌বো না, মশাই?"

সজ্জন। "তোমার মার মত হবে?"

সুবোধ। "কেন হবে না, মশাই?"

সজ্জন। "তা হলেই ভাল। তবে তুমি এক কাজ কর—তোমাকে ছ-মাসের মাইনে আগায় দিচ্ছি তোমার মাকে দিয়ে এসো, আর তাঁকে বলো, তিনি, তাঁর টাকার প্রয়োজন হ'লেই এসে আমার কাছ থেকে নিয়ে যান। তোমার অবশিষ্ট বেতন সেথান থেকে ফিরে এলে নিও। আর সেথানে অর্থের প্রয়োজন হলে জয়সিংহের কাছে পাবে।"

সুবোধের বড়ই আনন্দ! সে সজ্জনসিংহের নিকট হ'তে চল্লিশটি টাকা নিয়ে বাটীর দিকে প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চল পাঠক, একবার সুবোধের অনুগমন করি,—দেখি সে কি বলিয়া মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় লয়?

সুবোধ নগরোপান্তে একখানি জীর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা বসিয়া চরকায় সূতা প্রস্তত করিতেছিল। সুবোধ তার পাশে গিয়া বসিল। বসিয়া বলিল, "দেখ, মা, আমি কত বড় কাজের লোক,—আজ থেকে আমার কুড়ি টাকা করে মাইনে হলো। কর্ত্তা আমাকে সাতখানা জাহাজের কর্ত্তা করে জগন্নাথ ক্ষেত্তরে পাঠাচ্চে।"

বৃদ্ধা। "তবে, বাবা, আমায় নিয়ে যাবি ত?"

সুবোধ। "দূর, বুড়ি! তোর কি কিছু বুদ্ধি শুদ্ধি নেই? এ ভাদ্র মাস—এখন রথ না দোল? কি দেখতে যাবি? আমি মাসখানেকের মধ্যেই ফিরে এসে তোকে দোলের সময় নিয়ে যাব। তুই পাঁচটা টাকা নে। এ হ'লেই বোধ হয় তোর একমাস চল্‌বে, যদি না কুলোয় কর্ত্তার কাছ থেকে, আর দু-এক টাকা চেয়ে আনিস্। আমি আর দেরি কর্‌তে পারি নে।" এই বলিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

বৃদ্ধা মনে মনে বলিল, "মাস খানেকের জন্য তা আসুক। তবে যদি আমি এর মধ্যে মরি? মরি হাড় জুড়োবে,—তবে আমার সুবোধ বড় মানুষ হবে তা আর দেখ্‌তে পাব না।" এই বলিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল।

* * * * *

এ দিকে সুবোধ দ্রুতপদে নগরের অপর প্রান্তস্থিত আর একটি জীর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিল।

গৃহ মধ্যে অনুমান ত্রিংশদ্বর্ষীয়া একটি স্ত্রীলোক রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। সে সুবোধকে দেখিয়াই বলিল, "গোড়ারমুখো! দুপুর বেলা কোত্থেকে?"

সুবোধ। "আর ভাই, আমার সুখের খবর তোমায় না দিয়ে ত একদণ্ড স্থির থাক্‌তে পারিনে। আমার চাকরী হয়েছে! তবে একটু দূরদেশে যেতে হচ্ছে। তা দু-দশ দিনের জন্য বই ত নয়। তুমি এক কাজ কর,—এই দশটা টাকা আপাতক নাও, আমাদের সরগীর আড্ডা জান ত? সেখেনে গিয়ে থেকো, আমি শীগ্‌গিরই সেখানে যাব।"

স্ত্রীলোক। "এখন যাচ্ছিস কোথা?"

সুবোধ। "এর পর বল্‌বো,—এখন এই টাকা নে।" এই বলিয়া দশটা টাকা তাহার সম্মুখে রাখিল এবং বলিল, "আমায় চারটি ভাত দিতে পারিস্?"

স্ত্রীলোক। "চারটি পান্তা আছে,—তেঁতুল দিয়ে খাস্‌তো বল।"

সুবোধ সম্মত হইল। স্ত্রীলোকটি পান্তা বাড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সুতরাং আমরাও বিদায় হই আসুন

(ক্রমশঃ)

ব্যবসায়ী *।

ব্যবসায়ী কথাটি বড় মধুর। চারিটি বর্ণ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, ভাবুকের প্রাণে ভাবনার স্রোত বহিতে থাকে। বুঝি প্রাণে মনে কথা হয়—"কত শত দেশ বাণিজ্যের বলে জগতে প্রখ্যাত হইতেছে, আমরাই কি কেবল অন্নদামঙ্গলে—

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস
তাহার অর্দ্ধেক চাস"

পড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকিব, এবং—

"রাজসেবা কত খচ-মচ।"

জানিয়াও কেবল তাহাই আশ্রয় করিয়া থাকিব?—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।"

ইত্যাদি শ্লোক কি কেবল আমাদের বক্তৃতারই সম্বল?"

যে দেশে দু'কোদাল মাটি তুলিয়া দু'মুটা ধান ছড়াইলে ছ'মাসের আহারের সংস্থান হয়, এমন দেশে আমাদের বাস!—তবুও যে আমরা দুঃখভোগ করি সে কি আমাদের নিজের দোষ নয়?

আজ কাল আমাদের দেশে অনেকেই স্বাধীনভাবে

* বিলাত প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দ্বিতীয় ভাগ, ৬ষ্ঠ,৭ম,৮ম,৯ম,১০ম, ১১শ,ও ১২শ সংখ্যা।

জীবিকার্জ্জন করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু কার্য্যে সে কাজ করিতে কয়জনকে দেখা যায়? আমাদের দেশে শিক্ষক অনেক, ছাত্র নাই।

"যেমন বর্ণজ্ঞান না হইলে কখনই পত্রাদি লেখা যায় না, তেম্নি শিক্ষানবিস হইয়া কোন ব্যবসায়া শিক্ষা না করিলে কোন ব্যবসায় চালান যাইতে পারে না।"*

অবলম্বন অনেক আছে, কিন্তু কিরূপে অবলম্বন করিতে হইবে না জানা থাকিলে অবলম্বন থাকা না থাকা দুইই সমান।

সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া স্থির কর কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে?—সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, সেই পথের জন্য প্রস্তুত হও, তবে ত তোমার দ্বারা সংসারের কাজ হইবে। নইলে আজীবন তুমি যদি 'হা অন্ন! যো অন্ন!' করিয়াই ফিরিবে, তবে অন্য কাজ করিবে কি?

জীবিকার যে পথ প্রশস্ত সেই পথ অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হওয়াই শ্রেয়। কৃষি বল, বাণিজ্য বল, যাহা সুবিধার বিবেচনা করিবে তাহাই করিতে পার—কিন্তু চেষ্টা চাই।

"চেষ্টার অসাধ্য কাজ কি আছে? যত্ন করিতে হইবে, কোমর বাঁধিয়া অধ্যবসায়ের সহিত লাগিতে হইবে—তবেই * * উন্নতি হইবে—দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে—লক্ষ্মীলাভ—হইবে ভাণ্ডার পুরিবে। নতুবা বিলাসিতার অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া—গৃহে বসিয়া শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিব—অতীত স্মৃতির রোমন্থন করিব—আর ভাবিব * * * উন্নতি করিতেছি'; কিন্তু ইহাতে প্রকৃত পক্ষে দেশের অধোগতির পথ আরো পরিষ্কার হইবে।" *

"শিক্ষিতদিগের উপরেই দেশের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে," এ কথা অযথার্থ নয়। কিন্তু যাঁহারা দেশের লক্ষ্যস্থল, তাহারা দেশকে লক্ষ্যস্থল দিতে সহজে প্রস্তুত নন। কেহ গাহিলেন—

"দেশী অস্ত্র বস্ত্র বিকায় না কো আর।"

কিন্তু বিকায় না কেন? আমরা কিনি না বলিয়াই ত?

"যদি শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বিদেশীয় বস্ত্র (অস্ত্র) পরিত্যাগ করিয়া দেশী বস্ত্র (অস্ত্র) ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন," তবে তাঁতি কর্ম্মকার আর হার করে না—"সুতা জাঁতা ঠেলেই" তাদের অন্ন মেলে।

"শিল্পাদি ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেক বাধা রহিয়াছে।" কিন্তু সে সমুদায় বাধা তাঁহারা চেষ্টা করিলেই দূর করিতে পারেন। "প্রথমতঃ ব্যবসায় জ্ঞান নাই।" চেষ্টা করিলেই সে জ্ঞান লাভ হইতে পারে।" "দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়োপযোগী মূলধন নাই।" কিন্তু অর্থ সঞ্চয় কঠিন কাজ নহে (সকলের পক্ষে নাই হউক)। "তৃতীয়তঃ ব্যবসায়ে ক্লেশ স্বীকার করিবার ইচ্ছা নাই।" যাহার ইচ্ছা নাই তাহা দ্বারা কোন কাজই হয় না, সুতরাং এই প্রতিবন্ধকটিই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক।

ব্যবসায়ীর উল্লিখিত এক একটি বিষয় অবলম্বনে বুঝি এক একজনের জীবিকা অর্জ্জিত হইতে পারে।

আহা! কবে সেই দিন আসিবে যে দিন ব্যবসায়ীকে দেখে সকলের ব্যবসায়ে মন লগ্ন হবে?

ব্যবসায়ীর একটি প্রধান অভাব আছে। স্থানে স্থানে প্রতিকৃতি দিয়া বুঝাইলে প্রবন্ধ সুগম হয়। "বৈশাখ মাস হইতে ব্যবসায়ী সচিত্র ও বৃহদাকারে প্রকাশিত হইবে," শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম, এবং সেই সুবেশে ব্যবসায়ীকে দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম!

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য।

* ব্যবসায়ী ২য় ভাগ, ৭।৮ সংখ্যা, ১৩ পৃঃ।

* ব্যবসায়ী ২য় ভাগ, ৯ম সংখ্যা, ১১।১২ পৃঃ।

চিত্রবিদ্যা।

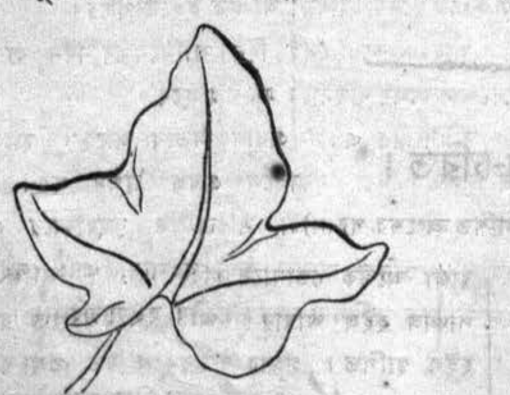
(১৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

ব্লক করিয়া ড্রয়িং করা সুবিধাজনক হইলেও, কেহ কেহ প্রথম প্রথম ব্লক করিতে কষ্ট অনুভব করেন। তাঁহাদিগকে দুই চারি আলেখ্য, তাঁহারা যেরূপে কাপী করিতে পারেন, সেইরূপেই কাপী করিতে দেওয়া ভাল; তৎপরে তাঁহারা ব্লক করিবার সুবিধা আপনিই বুঝিতে পারিবেন।

ড্রয়িং ছোট হইতে বড়, বা বড় হইতে ছোট করিতে হইলে ব্লক করিয়া অঙ্কিত করা একটি সহজ উপায়। আরও উপায় আছে, তাহা স্থানান্তরে উল্লিখিত হইবে।

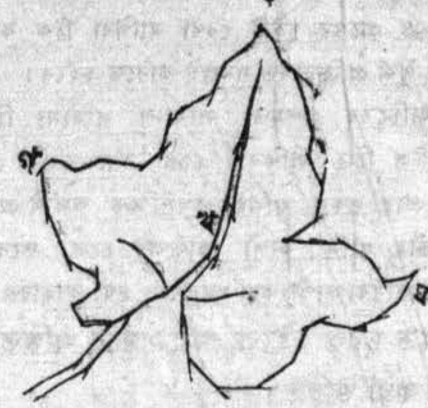
ব্লক করিবার সংকেত এই—

প্রথমতঃ যেরূপ আকারের বক্র রেখা থাকুক না কেন, সরলরেখা দ্বারা অংশগুলি যথা স্থানে ন্যস্ত কর। পরে সেই পূর্ব্বাঙ্কিত রেখাগুলি যেন উঠিয়া গিয়াছে এইরূপে মুছিয়া তাহারই উপর উপযুক্ত বক্রতা দিয়া দ্রব্যটি ঠিক কর।



অষ্টম চিত্র।

মনে কর অষ্টম চিত্রে অঙ্কিত পত্রটি ব্লক করিতে হইবে। প্রথমতঃ নবম চিত্রের মত করিয়া সরলরেখা দ্বারা ক-চিহ্নিত স্থান হইতে অঙ্কিত করিতে থাক। অঙ্কিত করিবার সময় অগ্রে খ-চিহ্নিত শিরাটি ব্লক করিয়া, গ-চিহ্নিত দিকের অংশগুলি আঁকিয়া ঘ-চিহ্নিত দিকটি আঁক। সমগ্র চিত্রটি নবম চিত্রের মত ব্লক হইলে, ব্লকটির উপর বার কয়েক আল্‌গা করিয়া রবর ঘসিলেই ব্লকটি খুব হাল্কা হইয়া যাইবে,—হঠাৎ দেখিলে কাগজে কিছু আছে বলিয়া বোধ হইবে না। তখন অষ্টম চিত্র দৃষ্টে সূক্ষ্মমুখ পেন্‌সিলের দ্বারা সেই ক্ষীণ দাগের উপর চিত্রের অতি সামান্য আকার গুলিও যথাযথ অঙ্কিত করা কঠিন হইবে না।



নবম চিত্র।

চিত্রে যেখানে সূক্ষ্ম বা স্থূল রেখা থাকে সেখানে সেইরূপ রেখা দেওয়া উচিত।

বড় বড় আদর্শও এইরূপে কাপী করিতে হয়।

ব্লক করিবার সময় হইতে নির্ভুল করিতে চেষ্টা করিলে তবে সমাপ্তি সময়ে চিত্রটি নির্দ্দোষ হওয়া সম্ভব। ব্লকের সময় যে ভুল থাকিয়া যাইবে তাহা পরে সংশোধন করা কঠিন হইবে।

চিত্রটি ব্লক হইলে পর, রেখা দ্বারা সমাপ্ত করিবার সময়, পেন্‌সিল দ্বারা আঁকিবার পূর্ব্বে একবার পেন্‌সিলটি কাগজে স্পর্শ না করিয়া দেখিবে কোথা হইতে পেন্‌সিল টানিলে রেখাটি ঠিক হইবে; তৎপরে সাহসের সহিত রেখা টানিবে যেন ভয়ে ভয়ে টানিয়া রেখাটি আঁকা বাঁকা করিয়া ফেলিও না।

শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা করিতে হইলে, কিছুকাল আদর্শের সহিত সমান করিয়া আঁকা উচিত, কেন না তাহা হইলে নিজের ভুল নিজে ধরা সহজ হয়।*

---

* শিল্পপুষ্পাঞ্জলির ১১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

যদিও মাপিয়া লওয়া ভাল নয়, তথাপি প্রথম শিক্ষার্থীরা না মাপিয়া আঁকা কঠিন বুঝিলে, প্রথম প্রথম যত ইচ্ছা মাপিতে পারেন, পরে মাপা অভ্যাস যত শীঘ্র কমাইতে পারা যায় ততই ভাল।

যদি তোমার ড্রয়িং শুদ্ধ করিয়া লইবার লোক থাকে তাহা হইলে, ছোটকে বড় এবং বড়কে ছোট করিয়া অঙ্কিত করা খুব ভাল। এরূপ করিয়া আঁকিতে হইলে, প্রথম কেবল দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থের দুইটি রেখা মাপিয়া ঠিক করা উচিত, তৎপরে পূর্ব্ব প্রক্রিয়ামত সমস্তই করিতে হইবে।

সীমাচিত্রের প্রথমতঃ সামান্য সামান্য চিত্র করিয়া পরে জটিল চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিলাতী আদর্শ প্রায় সকল গুলিই ক্রমসজ্জিত অর্থাৎ প্রথম খানির পর দ্বিতীয় খানি কাপী করিলেই চলে, তবে কাহারও কাহারও অধিক কাপী করা আবশ্যক হয়, কাহারও হয় না।

হাত দুরস্ত হইলে, অল্প সময়ে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করা উচিত।

যে সকল কাপী একবার কাপী করা হইয়াছে তাহা স্মৃতি হইতে (আদর্শ না দেখিয়া) আঁকিবার চেষ্টা করা খুব ভাল।

কাপী দেখিয়া একেবারে কালি কলমে আঁকাও বিশেষ উপকারী।

অদ্য এই স্থলে একটি সুসংবাদ দিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। আমাদের একজন গ্রাহক এই চিত্র বিদ্যা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজে কতকটা ড্রয়িং শিক্ষার ইচ্ছায়, চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আমাদের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম চিত্র কাপী করিয়াছেন, তন্মধ্যে ষষ্ঠটি ছোট বড় করিয়া চারিবার কাপি করিয়াছেন, লিখিয়াছেন, এবং বিলাতী আদর্শ কোথায় পাওয়া যায় ও দাম কত জিজ্ঞাসা করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তর পাইয়া আমাদেরই দ্বারা কাসলের ফ্রোরাল ড্রয়িংএর আদর্শ ক্রয় করিয়া কাপী করিতেছেন।

আমরা সীমাচিত্র এখানেই শেষ করিলাম। হস্ত, পদ, মুখ, মানুষ, জীবাদিরও সীমাচিত্র হয়, কিন্তু সে সকল অল্প পরিমাণে ছায়া আলোকের জ্ঞান জন্মিলে, চেষ্টা করাই ভাল, এজন্য এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া, প্রথমে ছায়ালোক তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিব।

(ক্রমশঃ)

পাণ্ডব-চরিত।

(১৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

অহিচ্ছত্রা রাজসভা।

সিংহাসনে রাজবেশে দ্রোণ আসীন, পশ্চাতে যুধিষ্ঠির ছত্র ধরিয়া দণ্ডায়মান, দুইপার্শ্বে ভীমার্জ্জুন চামর ব্যজন করিতেছে, দুইপার্শ্বে কুরুবালকগণ ও দক্ষিণপার্শ্বে কুরুবীরগণ দণ্ডায়মান।

সম্মুখে দ্রুপদ।

দ্রোণ।—মহারাজ পাঞ্চাল-ঈশ্বর! সবার সমক্ষে আজি করিনু স্বীকার,—শ্রেষ্ঠ-শিষ্য অর্জ্জুনের বলে অর্জ্জিত পাঞ্চাল-রাজ্য অর্দ্ধেক তোমারে করিনু অর্পণ। আজি হ'তে উত্তর পাঞ্চাল হইল আমার। অহিচ্ছত্র নগরীতে রাজধানী মোর হইল স্থাপিত। গঙ্গার উত্তরকূলে যত প্রজা বসে পাঞ্চালের মাঝে, সবে মোরে দিবে কর। গঙ্গার দক্ষিণে অধিকার তব, আজি হ'তে। রাজ্যেশ্বর তুমি ছিলে যবে, বাল্যসখ্য করনি স্মরণ,—এবে আমি রাজ্যপতি,—কর সখ্য, দ্রুপদ রাজন! ভুল পরাজয় অপমান।

দ্রুপদ।—পরাজিত আমি,—অবশ্য করিতে সন্ধি বাধ্য এবে। তব কথা মত, অর্দ্ধরাজ্য হ'লো তব,…আপত্তি করিতে মোর নাহিক শকতি।

দ্রোণ।—অর্জ্জুন! প্রিয়শিষ্য, এস মোর সম্মুখে এখন। বৎসরে! করিলে অশেষ উপকার,—বাল্য সখা সনে মিলাইলে। প্রতিদান নহ কিছু—(সিংহাসন উপরিস্থিত তূণ হইতে

একটি দিব্য শর লইয়া)—এই যে দেখিছ অস্ত্র, মুখে যার ঝলকে অনল,—ব্রহ্মশিরা নাম এর। গুরু মোর অগ্নিবেশ মুনি, তপোবলে এই অস্ত্র করেছিলা লাভ।—করিতে পৃথিবী দগ্ধ সমর্থ এ শর! ক্ষীণবীর্য্য মনুষ্যের প্রতি না এড় এ শর কভু।—অস্ত্র ব্যবহার বুঝিয়াছ তুমি। এই হেতু করিয়া বিশ্বাস দিলাম এ অস্ত্র তব ক'রে।—কিন্তু মোরে, পুনরায় দক্ষিণা করিতে হ'বে দান।

অর্জ্জুন।—(অস্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক)—কি দক্ষিণা দিব, গুরো! করহ আদেশ।

দ্রোণ।—বৎসরে! আজি নাহি চাই সে দক্ষিণা। 'উপযুক্ত কালে দিবে বলি' কর অঙ্গীকার।

অর্জ্জুন।—করিলাম অঙ্গীকার,—দিব সুনিশ্চিত,—কিবা দিতে হবে বল মোরে।

দ্রোণ।—নাহি তোর সম বীর এ বিশ্বমাঝারে,—ইচ্ছা তোরি সনে রণে যুঝিবরে একদিন। যোগ বলে জানিয়াছি তোমারি বিপক্ষ পক্ষে যুঝিতে হইবে মোরে কোন দিন; সেই কালে মোর সনে প্রতিযোদ্ধা হয়ে যুঝিবারে করহ প্রতিজ্ঞা।

অর্জ্জুন।—করিনু প্রতিজ্ঞা,—যদি কভু, গুরুদেব! বিপক্ষের পক্ষে থাকি যুঝ মোর সনে,—অগ্রে মোর দেহে কর যদি অস্ত্রাঘাত, যুঝিব নিশ্চয়।

পঞ্চদশ দৃশ্য।

রাজপথ।

দ্রুপদের প্রবেশ।

দ্রুপদ।—ওঃ! নিদারুণ অপমান! পদতলে হইনু দলিত! দ্রোণ!—সখা! তুমি নহ মোর আজো। সখা বলে করিনি স্বীকার আমি—নিশ্চয় লজ্জিব সন্ধি। অপমান! মৃত্যুর অধিক অপমান!—দ্রোণ! প্রাণ তব নাহি নিলে মনের যাতনা হবে না নির্ব্বাণ।—কিন্তু, বৃদ্ধ আমি, সামর্থ নাহিক দেহে, কেমনে হইব সিদ্ধকাম?—(চিন্তা)—তপোবল শ্রেষ্ঠ বল—দ্রোণঘাতী পুত্র লভিব নিশ্চয় তপোতেজে—যাবনা এখন গৃহে—যাব বনে—তপঃতেজে তেজীয়ান তপস্বীর লইব আশ্রয়—দেখি, মনের অনল নিভে কি না নিভে মোর!

[প্রস্থান।

ষোড়শ দৃশ্য।

মন্ত্রণা গৃহ।

ধৃতরাষ্ট্র ও কণিক।

ধৃতরাষ্ট্র।—দ্বিজবর! জ্ঞাতির উন্নতি সহেনা সহেনা প্রাণে আর! কি কর্ত্তব্য, বল এবে মোর?

কণিক।—মহারাজ! নিরন্তর দণ্ড বা পৌরুষে কার্য্য নাহি হয়। আত্মচ্ছিদ্র করিয়া গোপন, বিপক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ কর সদা। "শত্রুর না রাখ শেষ", এই মত উপদেশ দিলা গুরু মোরে। অগ্নিকণা, উপেক্ষা করিলে বর্দ্ধিত হইয়া শেষে বিশ্বনাশে সমর্থ হইবে। বলাপেক্ষা ছলে হয় কার্য্যসিদ্ধি অনায়াসে; এই হেতু, শত্রু সহিত কর ছল সর্ব্বক্ষণ। অগ্ন্যাধান, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ভাক্ যোগীবেশ করিয়া ধারণ, বিশ্বাস করিয়া উৎপাদন—নাশ শত্রু। নষ্ট হইবার আগে, শত্রু যেন না পারে বুঝিতে কৌশল তোমার। অধিক কি কব? আত্মজ—কি সখা—ভ্রাতা—পিতা, কিম্বা কুলগুরু যদি শত্রুবৎ করে আচরণ—বিনাশ করহ তারে না করি বিচার। অন্তরে রাখিবে ক্রোধ—প্রকাশ্যে না করিবে প্রকাশ। অন্তরের রোষ অন্তরেতে চাপি—সদাই সহাস্য আস্যে করি সম্ভাষণ, শত্রুর বিশ্বাস করি উৎপাদন, পরে অবসর বুঝি বিনাশ করিবে তারে। যাহারে বিনাশ করা উচিত বুঝিবে, গুপ্তভাবে গৃহে অগ্নি দিয়া বিনাশ করিবে তারে। নির্দ্ধন, নাস্তিক আর চৌরগণে কভু রাজ্যমাঝে থাকিতে না দিবে। জগতে বিশ্বাসী কেহ নাই—এই হেতু মনের নিগূঢ় কথা যত, কভু না বলিবে কারে।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন।—(স্বগত) "যাহারে বিনাশ করা উচিত বুঝিবে, গুপ্তভাবে গৃহে অগ্নি দিয়া বিনাশ করিবে তারে," মাতুলও ত এই মন্ত্র দিলা মোর কাণে।

কণিক।—মহারাজ! কার্য্যান্তরে চলিনু এখন। পুত্রসনে করহ, কিবা কার্য্য কি অকার্য্য তব, জ্যেষ্ঠ পুত্র তব উপস্থিত।

[প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র।—কেরে? বৎস, দুর্য্যোধন?—কি মানসে এসে, নীরবে দাঁড়ায়ে আছ?

দুর্য্যোধন।—এই মাত্র বলিলা তোমারে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ—কণিক ব্রাহ্মণ, "যাহারে বিনাশ করা উচিত বুঝিবে, গুপ্তভাবে গৃহে অগ্নি দিয়া বিনাশ করিবে তারে।" মাতুলও আমারে ঐ পরামর্শ দিলা আজি। পিতঃ! প্রাতঃকালে সভামাঝে, বিশিষ্ট প্রকৃতিপুঞ্জ আজি পিতামহ সমীপে আসিয়া করিল



যোগাসীন বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

প্রস্তাব যুধিষ্ঠিরে দিতে রাজপদ! পিতামহ, রাজ্যভোগ পরাঙ্মুখ—রাজ্যে তাঁর নাহি অভিলাষ। পিতৃহীন পাণ্ডুপুত্রগণে প্রাণসম ভাবেন সতত। অমত এমতে নাহি তাঁর কাজে কাজে, কিন্তু, পিতঃ! ভাবিয়া দেখহ মনে—জন্মান্ধতা দোষে নাহি পেলে রাজ্য তুমি। পাণ্ডু হ'লো রাজা। এবে তার পুত্র পেলে রাজ্যভার, দুখভার চিরতরে, সম্বল হইবে, আমা সবাকার। পাণ্ডুবংশে রাজ্য র'য়ে যাবে। মোরা—রাজ্যহীন হয়ে চিরদিন কাটাব জীবন।—তাই বলি—যদি কৌশলে এখন, পাণ্ডবগণেরে কিছুদিন তরে, স্থানান্তরে পার পাঠাইতে, তাহা হ'লে—অর্থহীনে দিয়ে ধন—মানীজনে সম্মানিত করে, প্রজাপুঞ্জে করি বশ, যদি একবার পারি রাজা হ'তে, নাহি ডরি আর পাণ্ডবেরে।

ধৃতরাষ্ট্র।—কিন্তু, পুত্র! সে কার্য্য অসাধ্য অতি। যারে ভালবাসে প্রজাগণ—তাঁর নির্ব্বাসন, কখন সহজ নয়!—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বিদুর কখন সম্মত না হবে পাণ্ডবের নির্ব্বাসনে।

দুর্য্যোধন।—পিতঃ! কৌশলে এ কাজ করিতে হইবে; অনুচর মোর দুইজন; সভামাঝে যবে রহিবে পাণ্ডবগণ, সেইকালে, প্রশংসা বচনে, বারণাবতের শোভা করিবে বর্ণন। তুমি তখন কৌশলে পাণ্ডবগণে, দেখিতে সে স্থান, করো অনুরোধ—স্বেচ্ছায় পাণ্ডবগণ গেলে তথা, কেহ ব্যথা না পাইবে মনে।

ধৃতরাষ্ট্র।—কিন্তু রাজ্যেশ্বর তুমি হইবে কেমনে?—প্রজাগণে বশ করা নহেক কঠিন, জানি তাহা। কিন্তু—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বিদুরে সম্মত করিবে কেমনে?

দুর্য্যোধন।—পিতামহ নহে পক্ষপাতী—প্রজাগণ যদি মোরে রাজা চায়—অসম্মত না হবেন তিনি—অশ্বথামা চিরপক্ষপাতী মোর—কাজে কাজে দ্রোণ, কৃপ, মোর পক্ষপাতী হইবে নিশ্চয়।—তবে বিদুরের কথা—কিন্তু একা ভিক্ষাজীবী কি শত্রুতা করিবে আমার?—পিতঃ! দেহ অনুমতি।—পেলে তব অনুমতি মাতুল কৌশলজাল করিবে বিস্তার।

ধৃতরাষ্ট্র।—বৎস, দুর্য্যোধন! তুমি রাজ্যেশ্বর হবে, এতে মোর অনিচ্ছা কি কভু?—কিন্তু, সাবধানে ক'রো কাজ।

দুর্য্যোধন।—(স্বগত)—সাবধানে,—কত সাবধানে করিতেছি কাজ, মন বই মোর কেহ নাহি জানে। কণিকের বাক্য "মনের নিগূঢ় কথা যত, কভু না বলিবে কারে।" মনের বাসনা মোর—পাণ্ডব-বিনাশ—এ কথা জগতে কেহ নাহি জানে—পিতাকেও বলিনি সে কথা—মাতুলও না জানে—নাহি জানে সখা কর্ণ—শুধু জানিবেক আর এক জন—যে সে কর্ম্ম করিবেক সম্পাদন।—(প্রকাশ্যে)—পিতঃ যাই তবে এবে মাতুলের সনে করিগে মন্ত্রণা।

[প্রস্থান।

সপ্তদশ দৃশ্য।

উদ্যান মধ্যে বিদুরের কুটির।

বিদুর যোগাসীন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—পাপী ভাবে পাপ করিব গোপনে, কিন্তু—গোপনে কি কার্য্য হয়?—আমার নয়ন নাহি মানে আবরণ। সকলের হৃদয়ের অন্তস্থলে বাস মোর—হৃদয়ের গূঢ় কথা মোর কাছে নহে অবিদিত।—কার্য্যফলও আমি দি। যে জন প্রকৃত ভক্ত মোর, জানে এ রহস্য গূঢ়।—ভক্তে ভক্ত বলে জানি—কিন্তু নাহি জানে।—যে জানে সে নাহি ভুলে। যে না জানে—সেজন এ কথা জেনেও না জানে। এই যে আসনে বসি বিদুর ধীমান ধ্যানযোগে জ্ঞান যোগ করি, আমায় ভাবিছে হেথা—জানে এই ধর্ম্ম শীল, কে যে আমি—জানে, সদা আমারে আশ্রয় করি থাকিলে, কখন বিপদে পড়িতে নাহি হ'বে।—আমারে বিশ্বাস যে পারে করিতে—সে জন কখন নাহি ডরে কারে। বিশ্বাস আমারে করে ভীম সকলের চেয়ে—আমি বই তার চিন্তার বিষয় কিছু নাই। জানে মনে সে যা বলে, আমিই বলাই তারে—কাজে কাজে প্রতিজ্ঞা তাঁহার পুরাইতে বাধ্য আমি। আমার ইচ্ছায় নির্ভর যাহার—ভাল তার আমিই করিব। ভাব তুমি স্ত্রী পুত্রের তরে,—কি সাধ্য তোমার, সুখে তুমি রাখ তা সবারে? যদি কর্ম্ম ফলে কর্ম্মভোগ, তা সবার ভাগ্যে লিখে থাকি। আমার উপর করহ নির্ভর, যাহে ভাল হয় করিব তাহাই।—(অগ্রসর হইয়া)—বিদুর! দেখ চেয়ে—

বিদুর।—(প্রণত হইয়া)—দয়াময়! হৃদয়ের বাহিরে কি হেতু?

শ্রীকৃষ্ণ।—বিদুর, দুর্য্যোধন করি'ছে মন্ত্রণা বিনাশিতে পাণ্ডবগণেরে। পুরোচন *, আদেশে তাহার, গিয়াছে বারণাবতে। জতুময়ীপুরী এক করিছে নির্ম্মাণ,—পাণ্ডবগণেরে

* দুর্য্যোধনের একজন বিশ্বস্ত পার্ষদ (যবন জাতীয়)।

দগ্ধ করিবার তরে। বিদুর! সহায় বিহীন পাণ্ডবেরা শক্রপুরে থাকে আর ইচ্ছা নহে মোর। যদিও রক্ষক আমি—তবু দুর্য্যোধন পদে পদে দিতেছে যন্ত্রণা। পাণ্ডবগণেরে রক্ষা করিয়া কৌশলে, দেহ পাঠাইয়া গঙ্গা পারে অরণ্য মাঝারে—

বিদুর।—তুমিই করিবে রক্ষা,—আমার কি সাধ্য দয়াময়?—

শ্রীকৃষ্ণ।—তবু উপলক্ষ হও তুমি, এ রক্ষণ কাজে।

বিদুর।—যা করাবে করিব হে তাই।

শ্রীকৃষ্ণ।—চল এবে, কুটিরেতে গিয়ে তব করিব বিশ্রাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টাদশ দৃশ্য।

রাজসভা।

ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ, শকুনি প্রভৃতির সহিত দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ, ও মন্ত্রীদল।

১ মন্ত্রী।—মহারাজ! বহুদিন পরে হেরিলাম শ্রীচরণ।

ধৃতরাষ্ট্র।—এতদিন ছিলে না কি হেতা?

১ মন্ত্রী।—করাদায় তরে গেছিনু বারণাবতে।

ধৃতরাষ্ট্র।—সে নগর দেখিলে কেমন?

১ মন্ত্রী।—অতি রমণীয় স্থান! যে জন থাকিতে চক্ষু না দেখিল সে অপূর্ব্ব পুরী, বিফল জনম তার!

ধৃতরাষ্ট্র।—আমার ত নাহি চক্ষু, কিন্তু পুত্রগণ নাহি দেখে কেন সে নগর?—বৎস দুর্য্যোধন! ইচ্ছা যদি হয়, যাও কয় ভাই মিলে।

দুর্য্যোধন।—পিতঃ শুনিয়া মন্ত্রীর কথা, দেখিবার হতেছে বাসনা। কিন্তু কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত এখন আমি, কিছুদিন পরে করিব গমন।

ভীম।—(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—দাদা, আমার অন্য কার্য্য নাই, কেন না বারণাবতে যাইব আমরা?

ধৃতরাষ্ট্র। যেতে ইচ্ছা হ'য়ে থাকে করহ গমন, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে লয়ে কিছুদিন তরে,—আনন্দে বারণাবতে করহ বিহার। মন্ত্রীগণ! উদ্যোগ করহ গমনে, ডাকহ দৈবজ্ঞগণে, শুভদিন করুক নির্ণয়।

১ মন্ত্রী।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

(মধ্যাহ্ন ঘোষণা)

মন্ত্রী।—সভাভঙ্গ হ'ক তবে এবে।

(সভাভঙ্গ)

ঊনবিংশ দৃশ্য।

উদ্যান।

বিদুর ও একজন বৈষ্ণব।

বিদুর।—হরিদাস! ছয়জন সুখে যেতে পারে, এমন তরণী একখানি করি স্থির, রাখ গঙ্গাপারে,—তোমারে বাহিতে হবে তরি।

হরিদাস।—কভু নাহি জানি কেমনে বাহিতে হয় তরি।

বিদুর।—হরি কর্ণধার ভবার্ণবে, তাঁর দাস হয়ে তুমি, হরিদাস, আজো নাহি জান কেমনে বাহিতে হয়?—হরি হরি বলে ফেলিবে ক্ষেপণী—আপনি চলিবে তরি গম্য পথে—দেখিলে তুফান না হইবে ভীত প্রাণ। প্রাণারাম হরি, আপনি লইবে তরি পর পারে। আরও এক কাজ করিতে হইবে ব'লে দিব পরে। এবে তরি কর অন্বেষণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিংশ দৃশ্য।

কক্ষ।

যুধিষ্ঠির ও কুন্তী।

কুন্তী।—যাইবি বারণাবতে? আমিও যাইব সাথে,—তোরা গেলে কি সুখে থাকিব হস্তিনায়?

যুধিষ্ঠির।—আমারও ত তাই ইচ্ছা। যেথা যাব রব মাতৃ কোলে। মা ছাড়া হইলে সন্তান কি পারে গো বাঁচিতে? সকলি হ'য়েছে স্থির। সকলের কাছে হয়েছি বিদায়—শুধু খুল্লতাত সনে এখনো হয়নি দেখা—

বিদুর ও হরিদাসের প্রবেশ।

বিদুর।—যুধিষ্ঠির! এই হরিদাস, শ্রেষ্ঠতম বন্ধু মম। তোমরা বারণাবতে গেলে, পাবে এঁর দেখা তথা। যা কিছু হইবে প্রয়োজন, বলো এঁরে—পাবে সেই ক্ষণে।

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।—ভাই, দুর্য্যোধন! সকলি কি হয়েছে প্রস্তুত?

দুর্য্যোধন।—প্রস্তুত হ'য়েছে সবি; সবে আছে তব তরে অপেক্ষা করিয়া।

বিদুর।—যাও তবে, ধর্ম্মশীল! যা'বার সময় গুটি দুই কথা বলি। যেথা থাক,—রেথ ইহা মনে। বিপদ সঙ্কুল মানবজীবন—মানবের শত্রু পদে পদে—এই হেতু উচিত সর্ব্বদা এরূপ প্রস্তুত থাকা,—বিপদ হইলে তথনি উদ্ধার হ'তে পার। —হুতাশন নারে দগ্ধিবারে ভূবিবরবাসী জনে,—শত্রুর কৌশল নহে লৌহ বিনির্ম্মিত—কিন্তু শরীর করিতে নাশ বড় পটু।—অধীর হইলে পরে বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটে। যে রাথে সকল দিকে দৃষ্টি, তার ইষ্ট করতল মাঝে। ভ্রমণেই পথ চেনা যায়—নিশিতে তারার বাতি, দেথাইয়া দেয় কোন দিকে গম্য পথ—জিতেন্দ্রিয় জন কভু নাহি অবসন্ন হয়। আর কি বলিব, বৎস, এই ক'টি কথা রেথ সদা মনে।

যুধিষ্ঠির।—চিরদিন গাঁথা রবে মনে।

বিদুর।—যাই এবে—হরির চরণ পুজিতে হইবে।

[সকলের প্রস্থান।

একবিংশ দৃশ্য।

বারণাবত নগরের প্রান্তভাগে উদ্যান বেষ্টিত জতুগৃহ।

পুরোচন।

পুরোচন।—মহারাজ দুর্য্যোধন বিশ্বাস করিয়া মোরে যে কার্য্যের ভার করিলা অর্পণ—গোপনে গোপনে সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, আমি। সিন্ধুনদ পর পার হ'তে কর্ম্মকর করিয়া সংগ্রহ ঐ গৃহ করেছি প্রস্তুত। কর্ম্মকরগণ গেছে চলি নিজদেশে উপযুক্ত অর্থে তুষ্ট হয়ে। কেহ নাহি জানে, কিসে গৃহ হইল নির্ম্মিত?—সবে জানে আসিবে পাণ্ডবগণ ত্বরা এ বারণাবতে,—তাঁহাদের বাসের কারণ রাজাদেশে ঐ গৃহ হ'য়েছে নির্ম্মিত। কিন্তু—গূঢ় তত্ত্ব কেহ নাহি জানে। দূত আসি বলিল আমারে, এথনি পাণ্ডবগণ আসিবে এ পুরে। নগরেতে করেছি ঘোষণা প্রজাগণে আসিবারে অভ্যর্থনা তরে,—যেন শত্রুভাব কেহ না জানিতে পারে।

নগরবাসীগণের ক্রমে প্রবেশ ও রাজপথ জনতায় পূর্ণ হওয়া।

পুরোচন।—রাজপুত্রগণে দেথিবারে আসিয়াছে সবে,—কিন্তু এরূপ করিয়া দাঁড়াইলে কেমনে আসিবে রথ?—মধ্যে পথ রাথি দাঁড়াও সকলে।

(সকলে দুইসারি হইয়া মধ্যে পথ প্রদান।)

পুরোচন।—বাদ্যকারগণ! বাজাও গম্ভীরে সুমধুর বাদ্য-যন্ত্র;—রথের নির্ঘোষ শুনিতেছি দূরে।

(সুমধুর বাদ্যরোল।)

পুরোচন।—ধর্ম্মপুত্র! যুবরাজ আসিছেন দেথিবারে তোমা সবাকারে।

রথারোহণে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীদেবীর প্রবেশ।

(সকলের রথ হইতে অবতরণ।)

পুরোচন।—শুন, যুবরাজ! ভ্রাতৃগণ সনে দুর্য্যোধন নিজে আসিবেন হেতা বলি, পাঠাইলা মোরে, উপযুক্ত বাসস্থান করিতে নির্ম্মাণ। ঐ যে প্রাসাদ দেথিছ অদূরে, তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত হ'য়েছে। আসিবার কথা তাঁরও,—কেন নাহি আসিলেন হেথা তব সনে?

যুধিষ্ঠির।—কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত আছেন বলি।

পুরোচন।—তবে আপনিও পুরে আসি করুন বিশ্রাম। পরে নগর দর্শনে যাইবেন, বিশ্রাম করিয়া।

যুধিষ্ঠির।—যাহা ভাল বুঝ, মন্ত্রি, সেই মত করিব নিশ্চয়। চল তবে।

পুরবাসীগণের জয় ঘোষণা।

মাতার সহিত পাণ্ডবগণের পুরোচন সঙ্গে প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাবিংশ দৃশ্য।

জতুগৃহের একটি কক্ষ।

যুধিষ্ঠির ও কুন্তী।

কুন্তী।—যুধিষ্ঠির! কোন কথা জিজ্ঞাসিব তোরে,—যদি ক্ষতি নাহি থাকে, প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দেহ মোরে।

যুধিষ্ঠির। কি সে কথা? বল মাতঃ, বলিব এথনি।

কুন্তী।—আসিবার কালে বিদুর যে কথা বলিলেন তোরে, বুঝিতে নারিনু আমি—শুধু উপদেশ নয়, নিশ্চয় নিগূঢ় অর্থ আছে কিছু হেন বোধ হয়।

যুধিষ্ঠির।—যাহা মনে করিয়াছ মাগো—কিছুই সন্দেহ নাহি তাহে—খুল্লতাত যা বলিলা, প্রত্যেক অক্ষর তার নিগূঢ়ার্থে পরিপূর্ণ। দুর্য্যোধন ছিল সন্নিকটে তাই বলিলেন ঐ মত। এই যে ভবনে আছি মোরা, এই গৃহ আমাদেরি দাহনের তরে হইয়াছে বিনির্ম্মিত; অগ্নি লৌহময়

নয় কিন্তু শরীর করিতে নাশ পারে ভাল মতে। বিবরে থাকিলে লুক্কায়িত, অগ্নির নাহিক শক্তি দগ্ধ করিবার।

কুন্তী।—তবে কেন হেথা থাকি মোরা,—অন্য স্থানে করিলে গমন কিবা ক্ষতি?

যুধিষ্ঠির।—কিন্তু খুল্লতাত বলেছেন—অধীর হইলে বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটে। যদি যাই অন্য ঠাঁই, জ্ঞাতি শত্রু রবে পাছু পাছু। রাখিয়া সকল দিকে দৃষ্টি এই স্থানে থাকাই বিহিত,—হইবে নিশ্চিত ইষ্টলাভ। ভ্রমণে চিনিব পথ এথাকার—পরে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, নিশিযোগে করি পলায়ন, অরণ্যে আশ্রয় লব,—উপযুক্ত সময়েতে হইবে মঙ্গল।

কুন্তী।—যাহা ভাল বুঝ কর তাই।—কিন্তু ভীমসেন কোথা?

ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—এই যে জননী আমি?—দাদা গৃহভিত্তি মাঝে, বসাগন্ধ, জতুগন্ধ, ধূনাগন্ধ কেন বল দেখি?

যুধিষ্ঠির।—ও কথা বলোনা আর ভাই।

হরিদাসের সহিত অর্জ্জুনের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।—আসুন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।

হরিদাস।—বৈষ্ণবের দাস আমি, রাজা!

যুধিষ্ঠির।—রাজা সম্বোধন করিলেন কি হেতু আমারে?

হরিদাস।—কিছুদিন পরে মহারাজ বলিবে তোমারে সবে। এবে কি কার্য্য করিব বল?

যুধিষ্ঠির।—আমাদের থাকিবার তরে সুড়ঙ্গ করিয়া দেহ। আনিয়া বিশ্বাসী লোক, গোপনে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হ'বে।

হরিদাস।—(স্বীয় ভিক্ষাঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ্র সাবল বাহির করিয়া)—কেহ গিয়া থাক দ্বারদেশে, যেন পুরোচন কিম্বা তার লোক নাহি আসে এই দিকে।

[ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান।

হরিদাস।—(নিজ ঝুলিটির মধ্য হইতে আরও কতকগুলি ঝুলি বাহির করিয়া)—রাজা! খনন করিয়া যে মাটি তুলিব আমি, ঝুলিতে করিয়া মোর রাখ এই গৃহ মাঝে অতি সাব-ধানে, সময়ে সকলি স্থানান্তরে লব আমি। (মেজের এক-খানি চতুষ্কোণ পাথর তুলিয়া) ইহারই নিম্নদেশে করিব সুড়ঙ্গ যাহে অনায়াসে রাত্রে সবে পারিবে থাকিতে, দিনে এ প্রস্তরে চাপিয়া রাখিলে, কেহ নাহি পারিবে জানিতে।

মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ ও ক্রমে ক্রমে ঝুলিতে করিয়া দশঝুলি মৃত্তিকা উত্তোলন ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক উপরে তুলিয়া লওয়া।

হরিদাস।—(উপরে উঠিয়া)—এই ত সুড়ঙ্গ হলো—দেখ নীচে নামি, হইল কেমন?

যুধিষ্ঠিরের নিম্নে অবতরণ।

যুধিষ্ঠির।—(ভিতর হইতে)—হ'য়েছে উত্তম! (উপরে উঠিয়া)—কিন্তু মৃত্তিকা না লহ স্থানান্তরে,—থাকুক সকলি গৃহ মাঝে।

হরিদাস।—যথা অভিরুচি তব।—পুরোচন করিয়াছে স্থির, কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী দিনে, হইলে গভীরা নিশি, গৃহদ্বারে করি অগ্নিদান নাশিবেক সবাকার প্রাণ। জানি ইহা—যেই মত যুক্তি হয়—কর মতিমান। প্রতিদিন ভিক্ষা ছলে আসিব এখানে, যে দিন যা হবে প্রয়োজন বলিবে আমারে।—চলিনু এখন।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির।—দিবাভাগে মোরা মৃগয়ার ছলে করিয়া ভ্রমণ, চিনি লব পথঘাট। থেক তুমি সাবধানে গৃহে। বনব্রত নিয়মেতে যাপ কাল,—বাটী যেন লোকে পূর্ণ রয়।

কুন্তী।—যাহা ভাল বুঝ সেই মত কর আয়োজন। যাই আমি পূজি গিয়া ইষ্টদেবে।

[প্রস্থান।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

যুধিষ্ঠির ও হরিদাস।

যুধিষ্ঠির।—দেখিতে দেখিতে বহুদিন গত হয়ে গেল, আর নহে উচিত ও জতুগৃহে অবস্থান করা, করেছি মনন গৃহে অগ্নি দিয়ে রাত্রিকালে পলাইব মাতা আর ভ্রাতৃগণে লয়ে। পুরোচনে, পারিবে কি কোন রূপে করিবারে স্থানান্তর?

হরিদাস।—না দেখি উপায় কিছু, জাতিতে যবন, নিমন্ত্রণ মম কদাচ না করিবে গ্রহণ।

যুধিষ্ঠির।—যে কোন উপায়ে হোক, স্থানান্তর করা তারে

অতি সুবিহিত; রজনীতে কোন ব্যপদেশে লয়ো তারে স্থানান্তরে।

হরিদাস।—ভাল কথা মনে হ'লো,—নগর ভিতরে—রত্নদত্ত বণিকের ঘরে, হবে আজি রজনীতে নৃত্যগীত,—সেই ব্যপদেশে লইব তাহারে স্থানান্তরে। দ্বিপ্রহর রজনীতে গৃহে অগ্নি দিয়া এস এই স্থানে সবে। থাকিবে তরণী তাহে আরোহণ করি'—গঙ্গা পারে, ঐ যে নিবিড় বন রয়েছে দেখিছ—ওরি মাঝে করো পলায়ন। কোন ভয় না রহিবে। হরির কৃপায় নিরাপদে কাটাবে জীবন।

যুধিষ্ঠির।—করিব তাহাই—চল এবে গৃহে যাই—মাতা আজি ব্রত উদ্যাপিয়া, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণে করায়ে ভোজন, হবেন কৃতার্থ, মনে করেছেন স্থির।—ঐ না আসিছে পুরোচন? এইবার কর নিমন্ত্রণ।

পুরোচনের প্রবেশ।

হরিদাস।—মহাশয়! রত্নদত্ত বণিকের গৃহে হবে নৃত্য গীত মহোৎসব, রজনীতে দেখিবারে নিমন্ত্রণ তব।

পুরোচন।—অবশ্য যাইব তথা। যুবরাজ, তোমারও কি নিমন্ত্রণ হয়েছে তথায়?

যুধিষ্ঠির।—না—

পুরোচন।—(স্বগত)—তবে পূর্ণ হবে মনোরথ।—(প্রকাশে)—ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ এসেছে সকলে, যুবরাজ কালব্যাজ হেথা না হয় উচিত তব।

যুধিষ্ঠির।—চলিনু এখনি—চলুন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ—

[হরিদাস ও যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

পুরোচন।—নিমন্ত্রণ—নৃত্যগীত মহোৎসবে নিমন্ত্রণ?—নিমন্ত্রণ রক্ষিবার নহেক সময় এই। দুর্য্যোধন লিখিয়াছে পত্র মোরে—"বহুদিন হইল অতীত, আজো শত্রু না হোলো নিহত? অচিরে বধিতে পার যদি, সিন্ধুপারে গান্ধার সীমায় রাজ্যখণ্ড অর্পিব তোমারে।"—পাণ্ডব বিনাশ কার্য্য মুষ্টির ভিতরে মোর,—পাণ্ডবেরা হইলে নিদ্রিত অগ্নি দিব প্রাসাদের দ্বারে—আর কারে ডর—হব রাজ্যেশ্বর—ঘুচে যাবে দাস্যবৃত্তি চিরকাল তরে।—না—বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন, এই বেলা করিগে উদ্যোগ।

[প্রস্থান।

চতুর্বিংশ দৃশ্য।

ভাণ্ডার।

কুন্তী।

কুন্তী।—হলো ব্রত উদ্যাপন। পুত্রদের মঙ্গলের তরে এ ব্রত আমার। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ পরিতুষ্ট সবে করিয়া আহার। নরনারীগণ সবে করিয়া ভোজন করিল গমন, আপন আপন গৃহে। পুত্রগণ করিয়া ভোজন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইছে। ভৃত্যগণ কেহ করিছে ভোজন, কাহারও বা হয়ে গেছে শেষ। পুরোচন তরে খাদ্য দ্রব্য দিয়াছি পাঠায়ে। এই বার করিগে শয়ন। ক্রমে রাত্রি বাড়িতেছে।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য।—মা! একজন নিষাদ রমণী পঞ্চপুত্র সনে, ক্ষুধায় কাতর উপস্থিত হয়েছে দুয়ারে।

কুন্তী।—আন তারে এই খানে—করাও ভোজন।

ভৃত্য।—মা! আনিব এখনি,—কিন্তু সবে মোরা যাব, দেখিবারে নৃত্যগীত রত্নদত্ত বণিকের গৃহে। ভোজন তাহারে পরিতোষে করাও, মা, তুমি।

[প্রস্থান।

কুন্তী।—পঞ্চপুত্র সনে নারী দুয়ারে দুয়ারে ফেরে। আমিও ত পঞ্চপুত্রে পুত্রবতী,—কে জানে বিধির লীলা, হয় ত এমন দিন আসিতেও পারে, ইহার মতন ফিরিতে হইবে মোরে,—তবে আছে যতক্ষণ, দুঃখীর দুঃখের শান্তি করি।

পঞ্চপুত্র সনে নিষাদীর প্রবেশ।

কুন্তী।—বাছা! ক্ষুধায় কাতর তুমি পুত্রগণ সনে, এতক্ষণ কোথা ছিলে? খাদ্যদ্রব্য সব প্রায় গেছে ফুরাইয়ে,—যাহা আছে যত পার খাও, যত পার লও। এই গৃহে যাহা আছে দিলাম তোমারে।

নিষাদী।—বড় খিদে পেয়েছে, মা! যত পারি খাই ছয় জনে—তার পর নিয়ে যাব।

কুন্তী।—আমি যাই—আসিব এখনি।

[প্রস্থান।

নিষাদী।—ওরে ভুঁদে, রকে গিয়ে, খাই গিয়ে চল, বামুনের বাড়ী।

ভুঁদে।—ওরে মা, মদ কি আছেরে তোর কাছে?

নিষাদী।—আছে—আছে—চ—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চবিংশ দৃশ্য।

কক্ষ।

পুরোচন।

পুরোচন।—বড়ই আরামে হ'য়েছে আহার,—শয়ন করিয়া একটু বিশ্রাম করি, তারপর স্বকার্য্য সাধিব,—দিব গৃহে অগ্নি,—(শয়ন)—গৃহে অগ্নি দিয়ে দেখিব যখন নিবান অসাধ্য আর, তখন নগর মাঝে গিয়ে ডাকিব সকলে, অকস্মাৎ লাগিয়াছে গৃহে অগ্নি; এস সবে বাঁচাও পাণ্ডবগণে। ততক্ষণে পাণ্ডবেরা ভস্মসাৎ হবে। তার পর, কাল প্রাতে হস্তিনায় গিয়ে দুর্য্যোধন কাছে পাব পুরস্কার—রাজ্যভার সিন্ধুপারে।—আজ দাস, কাল রাজ্যেশ্বর—ক্রমে যে আসিছে নিদ্রা—ভাল এক দণ্ড ঘুমাইব—(চক্ষু মুদ্রিত ও নাসিকাধ্বনি)

ষড়বিংশ দৃশ্য।

কক্ষ।

পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী।

যুধিষ্ঠির।—আর নহে উচিত বিলম্ব করা; ভৃত্যগণে সব করেছি আদেশ, রত্নদত্ত গৃহে নৃত্যগীত দেখিবারে। বাটীতে নাহিক কেহ—উপযুক্ত এই ত সময়।

কুন্তী।—কিন্তু, জনেক নিষাদী পঞ্চপুত্র সনে ভাণ্ডারে যে, করিছে ভোজন?

যুধিষ্ঠির।—যাও ভীম, খাদ্যদ্রব্যসহ যেতে বল তারে স্থানান্তরে।

[ভীমের প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির।—গৃহে অগ্নি দিয়ে যেতে হবে গঙ্গাপারে। খুল্লতাত পাঠাইয়া দেছেন তরণী।

কুন্তী।—বিদুর! তুমিই হিতৈষী মম শুধু, এই ধরামাঝে।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—নাহিক ভাণ্ডারে কেহ, অতি অল্প খাদ্য আছে তথা।

কুন্তী।—তবে চলে গেছে তারা। বলেছিনু "যত পার খাও, যত পার লয়ে যাও।" বুঝি বাড়ী গিয়ে করিছে আহার।

যুধিষ্ঠির।—তবে আর বিলম্বেতে কিবা প্রয়োজন? চল সবে হই অগ্রসর। ভীম! তুমি এস, গৃহে অগ্নি দিয়া ভাল মতে।

ভীম।—হেন অগ্নি দিব, নির্ব্বাণ না হবে কোন মতে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তবিংশ দৃশ্য।

ভাণ্ডার।

নিষাদী ও তৎপুত্রগণের প্রবেশ।

ভুঁদে।—মা! যা! সব ফুরিয়েছে—আমি শুই।

নিষাদী।—আরও একটু মদ—(মদ্যপান ও শয়ন)

গৃহ প্রজ্জ্বলিত হইল।

ভুঁদে।—মা—আ—গু—ন—

নিষাদী।—বাঃ! কেমন—আলো—

পট পরিবর্ত্তন।

জতুগৃহ ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে; নগর হইতে নগরবাসীগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে ও নিবাইবার চেষ্টা করিতেছে।

অষ্টাবিংশ দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

জলে তরী ও তদুপরি হরিদাস।

হরিদাস।—ঐ ত জ্বলিছে জতুগৃহ—এখনি পাণ্ডবগণ জননীর সনে আসিবে হেথায়। হরি! সহায় হইয়া রক্ষা কর পাণ্ডবগণেরে সদা।

পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীর প্রবেশ।

হরিদাস।—কে আসে?

যুধিষ্ঠির।—কে?—হরিদাস!—তুমি র'য়েছ যাদের আশে তারা আসে।

হরিদাস।—এস তবে কর আরোহণ।

সকলের তরিতে আরোহণ ও হরিগুণগান করিতে করিতে তরি বাহিয়া হরিদাসের প্রস্থান।

ইতি শ্রীপাণ্ডব-চরিতে জতুগৃহ দাহ নামক প্রথম প্রকরণ সম্পূর্ণ।

তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

THE ELECTRIC TELEGRAPH.

(১৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

আমরা মূল প্রস্তাব উপলক্ষে, ভূমিকা স্বরূপ, এতদূর বলিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষতঃ রাসায়নিক আকর্ষণ সম্বন্ধে কিছু অধিক করিয়া বলিতে হইয়াছে। তাহাতে শ্রমবিমুখ আয়েসী পাঠকের ধৈর্য্যলোপ হইবার সম্ভাবনা। সেই আশঙ্কা করিয়াই আমরা পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি যে ঐ অংশটুকু বাদ দিয়া গেলেও মূল বিষয় বোধের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তবে উহার যে অনর্থক অবতারণা হয় নাই, তাহা অতঃপরবর্ত্তী প্রস্তাবাংশের মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ করিলেই উপলব্ধি হইবে। অতঃপর প্রথমেই ব্যাটারীর আলোচনা করিতে হইবে, এবং তন্মধ্যেই রাসায়নিক আকর্ষণের প্রয়োগ উপলক্ষিত হইবে। কি কি উপকরণে ও তৎসমস্তের কিরূপ সমাবেশে ব্যাটারী প্রস্তুত করিতে হয়, তদ্বিষয় অবগত হইবার জন্য রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য প্রণালী বুঝিবার তত প্রয়োজন নাই। কিন্তু ব্যাটারীর কার্য্য প্রণালী বা মূল তত্ব, অর্থাৎ ব্যাটারীর মধ্যে কিরূপ প্রক্রিয়া হইতে তাড়িত-বলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্বিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে রাসায়নিক কার্য্যের স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। ব্যাটারী তাড়িত-বল উদ্ভাবনার একটী উপায় বা যন্ত্র স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। এই তাড়িত-বল ও রাসায়নিক ক্রিয়া এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর এরূপ অব্যবহিত ঘনিষ্ঠ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ যে উহাদের কোন্‌টী কারণ ও কোন্‌টীই বা কার্য্য, অর্থাৎ রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য হইতে তাড়িত-বলের উৎপত্তি, কিম্বা তাড়িত-বলই রাসায়নিক কার্য্যের মূল, অথবা তাড়িত-বল ও রাসায়নিক কার্য্য এতদুভয় একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ, তাহা আজ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই। সেস্থলে তদুভয়েরই সম্যক আলোচনা করা আবশ্যক। তন্নিমিত্ত রাসায়নিক আকর্ষণ কাহাকে বলে, অন্যান্য আকর্ষণ হইতে উহার কিরূপ প্রভেদ, উহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ, প্রভৃতি কতিপয় স্থূল তত্ত্বের বিবরণ সঙ্ক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে ঐ আকর্ষণের কার্য্য সম্বন্ধে একরূপ যে স্থূল ভাব সংগৃহীত হইবে, তাহাতে ব্যাটারীতে তাড়িত বলের উৎপত্তি ও গতিবিধি প্রণালী স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এক্ষণে আর একটী কথা বলিয়াই মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। রসায়ন-বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ পরীক্ষার বিষয় হইলেও উহা আমাদিগের মূল আলোচ্য নহে বলিয়া এ প্রবন্ধে তদ্বিষয়ের যতটুকু সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তদানুসঙ্গিক যন্ত্রযোগে পরীক্ষা প্রকরণাদির প্রবর্ত্তনা করা যায় নাই।

ব্যাটারী।

প্রথমেই বলা গিয়াছে যে ব্যাটারী তাড়িতবার্ত্তাবহ যন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। ব্যাটারীর ভিতর তাড়িতবলের উৎপত্তি, এবং ঐ তাড়িত-বলই উক্ত যন্ত্রের কার্য্যকারীতার মূল। তন্নিমিত্ত ব্যাটারীকে তাড়িত-বল উদ্ভাবন করিবার একটী স্বতন্ত্র যন্ত্র বলিলেও হয়। সমগ্র টেলিগ্রাফ যন্ত্রটী যেমন তিনটী মাত্র প্রধান অঙ্গ বিশিষ্ট, ব্যাটারীরও আবার সেইরূপ তিনটী প্রত্যঙ্গ আছেঃ—

১ম।—একটী কাচ নির্ম্মিত, চিনে, অথবা মাটীর পাত্র।

২য়।—দুইখানি দুই প্রকার ধাতুর ফলক বা পাত।

৩য়।—কোনরূপ লবণ (Salt) অথবা অম্ল বা দ্রাবক (Acid) মিশ্রিত জল।

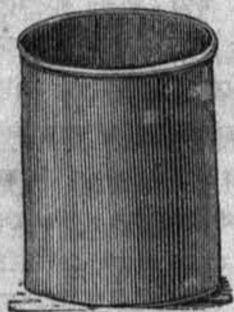
এই তিনটী উপকরণের * সংযোগে, অর্থাৎ একটী আধার স্বরূপ পাত্র, দুইখানি দুই প্রকার ধাতুর পাত এবং কিয়ৎ-পরিমাণ দ্রাবক মিশ্রিত জলের একত্র সমাবেশে এক একটী ব্যাটারী সংগঠিত হয়। কার্য্য বিশেষের জন্য এমন অনেক গুলি ব্যাটারীকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া একটী বৃহৎ বলশালী ব্যাটারী রচনা করিতে হয়। সেস্থলে সুতরাং ততগুলি পাত্র, ততযোড়া ধাতব ফলক এবং ততগুণ দ্রাবক মিশ্রিত জলের আবশ্যক হইয়া থাকে। তদ্বিষয় পশ্চাৎ সবিস্তরে জানা যাইবে।

একটী মাত্র ব্যাটারী প্রস্তুত করিতে হইলে, ঐ তিনটী উপাদানের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের নিয়ম নাই। পরীক্ষকের

* এস্থলে সাধারণতঃ প্রচলিত ব্যাটারীর উপকরণই নির্দ্দিষ্ট হইল। এতদ্ব্যতীত অন্যবিধ উপাদানেও ব্যাটারী রচিত হয়। তদ্বিষয় পরে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে।

সুবিধার জন্য, অর্থাৎ ঐ উপকরণ তিনটীর প্রত্যেকে কি মাপের হওয়া উচিত, তার জন্য তাঁহাকে মনে মনে না হাতড়াইতে হয়, শুদ্ধ তন্নিমিত্ত এস্থলে তাহাদের একটা করিয়া পরিমাণ ধরিয়া দেওয়া গেল। ঐ পরিমাণের কম—বেশী হইলেও ব্যাটারীর কার্য্যকারীতার অন্যথা হইবে না।

প্রথমতঃ উপকরণগুলি আহরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রথম উপকরণ-পাত্রটী, দেশী কুমারবাড়ী হইতে, ফরমাইস দিয়া, মাটীর প্রস্তুত করাইয়া লইলে চলিবে। পার্শ্ববর্ত্তী প্রথম চিত্রানুরূপ পাত্রের গঠন সুবিধাজনক। ঐরূপ তিন চারিটী পাত্র গড়াইয়া লইবে। ফরমাইস দিবার সময় কুমারকে বলিয়া দিবে, পাত্রগুলির কাঁচা গড়ন শেষ হইলে পর তাহাদের ভিতর বাহির সর্ব্বাঙ্গে যেন উত্তম রূপে পোঁচ মাটীর লেপ দিয়া তাহার পরে পোড়ান হয়। ঐ লেপে পালিস (Glazing)-এর কার্য্য করিবে,—পাত্রের গাত্রস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্র সমস্ত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাহাতে, পরে তন্মধ্য দিয়া দ্রাবক সংমিশ্রিত জলের কিয়ৎ পরিমাণ আর চুয়াইয়া পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে না। এবং এক একটী পাত্র যেন উর্দ্ধে ৮ ইঞ্চি ও ১০ ইঞ্চি মোটা হয়। *


১ম চিত্র।

পাত্রগুলি সংগৃহীত হইলে পর, যে কয়টি পাত্র তত জোড়া দুই রকম ধাতুর পাত আবশ্যক। প্রত্যেক জোড়ায় একখানি করিয়া দস্তা ও একখানি করিয়া তামার পাত হইলে অল্প ব্যয়ে ও অনায়াসে হইবে। সচরাচর বাজারে দস্তা ও তামার বিবিধ পরিমাণ মোটা চাদর পাওয়া যায়। ৯ ইঞ্চি লম্বা, ৩,৪ ইঞ্চি চওড়া ও অন্ততঃ এক ইঞ্চের ৮ ভাগের এক ভাগ পরিমিত পুরু, এই মাপের কয়খানি দস্তার ফলক এবং ঐ পরিমাণ লম্বা চওড়া, কেবল তত পুরু আবশ্যক নাই, কয়খানি পাতলা তামার পাত কাটাইয়া লইবে।

তৃতীয় উপকরণটির স্থলে ৩ ছটাক পরিমাণ গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric Acid Fort) সংগ্রহ করিবে। বিলাতী ঔষধ বিক্রেতার দোকান মাত্রে এই দ্রাবক ১ ছটাক দুই আনা মূল্যে পাওয়া যায়।

উপকরণগুলি সংগৃহীত হইলে পর প্রথমতঃ মাটির পাত্রগুলির একটি লইয়া তার দশ আনা আন্দাজ জল পূর্ণ করিয়া ঐ জলে অল্প গন্ধক দ্রাবক ঢালিয়া দিবে। এই দ্রাবক সাবধানে ব্যবহার করিবে। হাতে অথবা শরীরের কোন স্থানে কিম্বা বস্ত্রাদিতে না লাগে। শতকরা ১০ ভাগ দ্রাবক দিলেই যথেষ্ট হইবে, অর্থাৎ জল ৫ ছটাক হইলে তাহাতে অর্দ্ধ ছটাক দ্রাবক দিতে হইবে। তাহার পর একখানি দস্তা ফলককে ঐ জল মধ্যে মগ্ন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ফলকখানি ডুবাইবার অগ্রে তাহার গাত্রোপরি একটা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লইতে হইবে। ব্যাটারীতে খাঁটি দস্তা ফলকের প্রয়োজন; কিন্তু ঐ ফলকখানি খাঁটি দস্তার নহে। খাঁটি দস্তা বাজারে খাঁটি লোকের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য। যেরূপ দস্তার চাদর সচরাচর বাজারে পাওয়া যায়, তাহাতে লৌহ, টিন, প্রভৃতি কতিপয় অপর ধাতু মিশ্রিত (ভ্যাজাল) থাকে। খাঁটি দস্তা দুষ্প্রাপ্য ও অধিক দামী বলিয়া ব্যাটারীর জন্য তাহার পাত সংগ্রহ করা বড় সহজ ও সুলভ নহে। সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত মিশ্রিত দস্তার ফলকখানিরই উপর নিম্ন লিখিত মত পারদ ধরাইয়া লইলেই উহা ব্যাটারীর উপযোগী হইবে—খাঁটি দস্তার কার্য্য করিবে।

প্রথমতঃ দস্তাফলকখানিকে উত্তমরূপে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। তাহার পর, একটা কাচের, চীনে, মাটির অথবা পাথরের পাত্র লইয়া তন্মধ্যে ঐ ফলককে শুয়াইয়া রাখিয়া দিয়া, এই পরিমাণে জল ঢালিবে যাহাতে ফলকখানি সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যায়—তাহার একটুও জলের বাহিরে না জাগিয়া থাকে। তখন ঐ জলে ছটাক খানেক আন্দাজ গন্ধক দ্রাবক ঢালিয়া দিবে। অল্পক্ষণ পরেই ফলকখানিকে তুলিয়া লইবে। ঐ দ্রাবক মিশ্রিত জলের আর প্রয়োজন হইবে না। ফলকখানিকে কেবল একবার অল্পক্ষণের জন্য দ্রাবক সংযুক্ত জলে ডুবাইয়া লইবার প্রয়োজন মাত্র। সংগৃহীত মাটির পাত্র কয়টির একটীতেও এই কার্য্যটি সাধিত হইতে পারে। কেবল ঐ পাত্র বড় বলিয়া তন্মধ্যে অধিক পরিমাণে জল ঢালিলে তবে ফলকখানি মগ্ন হইবে; আর, ফলককে তন্মধ্যে শুয়াইয়া রাখিবারও যো নাই। সুতরাং দ্রাবকটিও অধিক পরিমাণে আবশ্যক হইবে। তন্নিমিত্ত ফলকখানির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমিত মাত্র একটা পাত্র দেখিয়া লইলেই

* কুম্ভকার দ্বারা পাত্র প্রস্তুত করাইয়া লওয়া না ঘটিয়া উঠে তবে 'রাণিগঞ্জ পটারি ওয়ার্কস্ কোম্পানি' ব্যাটারীর উপযোগী যে নানাবিধ মাটির পাত্র প্রস্তুত করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে, তাহার কতিপয় ক্রয় করিয়া লইলে হইবে। আরও, বহুবাজারে বাবুলাল খোট্টা নামক জনৈক পাইকারের দোকানে বহুবিধ পুরাতন ব্যাটারী ও ব্যাটারীর পাত্র আরও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়।

চলিবে। তাহাতে অধিক দ্রাবক নষ্ট হইবে না। দস্তা ফলকখানিকে অম্লাক্ত জল মধ্য হইতে তুলিয়া লইয়াই তাহার এক পৃষ্ঠদেশে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সর্ব্ব গাত্রের উপর অল্প করিয়া পারা ছড়াইয়া দিয়া একটী কর্কের ছিপি, এক খণ্ড শোলা অথবা একটি ন্যাকড়ার পুঁটুলী দ্বারা তাহাকে ঐ পারদ সহযোগে কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। পারাকে হাতে স্পর্শ না করিয়া, একখণ্ড কাগজ, তালপাতা, কোন ধাতুর পাত অথবা ঐরূপ কোন পাত্র দ্বারা অল্প করিয়া তুলিয়া লইয়া ফলক-গাত্রের উপর বিস্তৃত করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত ঘর্ষণী শোলা কি ন্যাকড়ার পুঁটুলীকে ঐ দ্রাবক মিশ্রিত জলে অল্প ভিজাইয়া লইয়া তদ্দ্বারাই ক্রমে অল্প অল্প করিয়া পারা তুলিয়া লইয়া ফলক গাত্রে ঘষিতে থাকিবে। ফলকের দুই পিঠ ও পার্শ্বগুলি সমস্ত ঐরূপে ঘর্ষিত হইলে পর, তদুপরি পারদের একটি অতি সূক্ষ্ম স্তর বিন্যস্ত হইয়া যাইবে। তাহাতে উহা পারদ (বা বিনির্ম্মিত রৌপ্য) বলিয়া বোধ হইবে। এই প্রকরণকে ইংরাজীতে 'এমাল-গ্যামেট্' করা বলে, এবং এইরূপে পারা ধরান ফলককে 'এমাল্গ্যামেটেড্' ফলক কহে। বাঙ্গালা প্রতিবাক্যের অভাবে আমরা এরূপ ফলককে পারদ-মণ্ডিত ফলক বলিয়া উল্লেখ করিব।

এক্ষণে পূর্ব্বে যে মাটির পাত্রটিকে দ্রাবক মিশ্রিত জল পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, তন্মধ্যে ঐ পারদ-মণ্ডিত ফলকখানিকে দ্বিতীয় চিত্রবৎ মগ্ন করিয়া দাও। অল্পক্ষণ মধ্যেই দেখিবে ফলকের জলমগ্ন অংশটুকু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদে আবৃত হইয়া যাইবে।



২য় চিত্র *।

ঐ বুদ্‌বুদগুলি কি, এবং কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে হইলে রাসায়নিক কার্য্যের তত্ত্ব স্মরণ করিতে হইবে। তদ্বিষয়ের আলোচনায় বলা গিয়াছে যে অম্লজানের সহিত ধাতু মাত্রের প্রবল রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে! আবার সকল ধাতুর অপেক্ষা দস্তার সহিত উহার অধিকতম সম্বন্ধ। তাহাতেই দস্তাফলক জলমগ্ন হইবা মাত্র, জল মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হয়, অর্থাৎ দস্তা সংস্পর্শে জল বিশ্লিষ্ট হয়—জলের উপাদান (যে দুই মূল পদার্থের যোগে উৎপন্ন) অম্লজান ও উদজান পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এস্থলে আরও, রাসায়নিক কার্য্য মাত্র যে দুই প্রকারে সংঘটিত হয়, তাহার দ্বিতীয় অর্থাৎ 'প্রতিনিধি' বা 'স্থান-চ্যুতি' প্রকরণটীও স্মরণ করিতে হইবে। যে রাসায়নিক আকর্ষণবলে অম্লজান ও উদজান পরস্পর সংযুক্ত হইয়া জল হয়, তদপেক্ষা অম্লজানের সহিত দস্তার অধিকতর রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে। সুতরাং দস্তা জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্রই তাহার উদজানাংশ টানিয়া লয়,—অম্লজান তাহার সহযোগী উদজান উপাদানকে ছাড়িয়া দিয়া দস্তার সহিত গিয়া মিলিত হয়। তাহাতেই ঐ দস্তা ও অম্লজানের পরস্পর যোগে ফলক গাত্রের উপর একটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশিষ্ট রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে দস্তাফলক পাত্রের সমস্ত জলকে একেবারে বিশ্লিষ্ট করে না, অথবা সমস্ত দস্তাফলকখানি বিশ্লিষ্ট অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া অভিনব পদার্থে রূপান্তরিত হয় না। পাত্রস্থ অম্লাক্ত জলের কেবল যে অংশটুকু দস্তা-ফলকের অব্যবহিত গাত্র সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং দস্তারও উপরি গাত্রের কেবল যে অংশটুকু মাত্র জলকে স্পর্শ করিয়া থাকে, কেবল মাত্র ঐ দুই অংশের মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য হয়। তাহার ফলে দস্তাফলকের উপরি গাত্রের একটি পাতলা স্তর একটি নূতন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। ঐ পদার্থকে অক্‌জাইড্ অব্ জিঙ্ক কহে। যেমন লৌহের সহিত অম্লজানের যোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় অক্‌জাইড্ অব্ আইরন্ বা সাম্লকর লৌহ কহে এবং চলিত ভাষায় মরিচা বলে, সেই রূপ সাম্লকর দস্তাকে দস্তার মরিচা বলা যাইতে পারে। একখণ্ড লৌহ দীর্ঘকাল আদ্রবায়ু সংযোগে পড়িয়া থাকিলে তাতে যেমন মরিচা ধরে, অর্থাৎ তার গাত্রের উপরকার স্তরটী অম্লজান সহযোগে মরিচার আবরণে পরিণত হয়, সেইরূপ দস্তাগাত্রের উপরিস্তর জলের অম্লজান সহযোগে দস্তা-মরিচা হইয়া দাঁড়ায়।

দস্তাফলকের উপরি গাত্রস্তর এই রূপে দস্তা-মরিচায় পরিণত হইলে পর, ঐ পরিমাণ অম্লজানের সহিত যে টুকু উদজান জলে মিলিত হইয়া ছিল, সেই উদজান টুকু তখন অম্লজান হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়া নিজ বুদ্‌বুদাকারে ঐ দস্তাফলক গাত্রোপরি প্রকাশমান হয়। তবেই বুঝা যাইতেছে যে গাত্র মধ্যে দস্তাফলক ও জলের পরস্পর রাসায়নিক কার্য্য

* পাত্রের ভিতর পর্য্যন্ত দেখাইবার জন্য কাচ সদৃশ অঙ্কিত হইল।

ফলে ফলকের জল মধ্যস্থ অংশের উপরি গাত্রের সূক্ষ্ম অণু সমূহ একটি পাৎলা দস্তা-মরিচার আবরণে পরিণত হয়, আর বিশ্লিষ্ট উদজানাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের আকারে ঐ অক্‌জাইড্‌-আবরণকে ঢাকিয়া ফেলে। এইটী আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার জন্য ফলক গাত্রসংলগ্ন জলাংশের একটী বিন্দু বা ফোঁটা ধরিয়া লইয়া, তাহার সহিত দস্তার রাসায়নিক কার্য্য বুঝিয়া দেখ,—এক ফোঁটা জল দস্তার যত টুকুকে ঢাকিয়া থাকে ঐ দস্তাংশ ও ঐ ফোঁটার অম্লজানের মাত্রা, এই দুয়ে রাসায়নিক আকর্ষণ বলে সংযুক্ত হইয়া দস্তা-মরিচা হয়, এবং ঐ ফোঁটার উদজানের ভাগটুকু তখন মুক্ত হইয়া পড়িয়া ঐ টুকু দস্তা মরিচার উপর থাকিয়া যায়। এইরূপে যদ্যপি দস্তাফলক গাত্রসংলগ্ন সমস্ত জলাংশ টুকু ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বিশ্লিষ্ট হয়, তবে এক একটু করিয়া দস্তার জল মধ্যস্থ অংশের সমস্ত গাত্রই অক্‌জাইড্‌ অব্‌ জিঙ্কের পাৎলা স্তর হইয়া দাঁড়াইবে—ফলক গাত্রোপরি যেন একখানি পাৎলা সর পড়িয়া যাইবে, এবং বিশ্লিষ্ট উদজানের অংশ এক একটী করিয়া বুদ্‌বুদের আকারে দস্তার ঐ অংশের গাত্রকে ঢাকিয়া ফেলিবে। পাত্রের অভ্যন্তরে রাসায়নিক কার্য্য এই পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াই নিরস্ত হইবে। পারদ-মণ্ডিত ফলকখানি দীর্ঘকাল পাত্রের অম্লাক্ত জলমগ্ন হইয়া থাকিলেও তন্মধ্যে আর রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হইবে না। সুতরাং দস্তা ঐ ভাবেই উদজান বুদ্‌বুদাবৃত হইয়া থাকিবে। ফলকখানি যদ্যপি পারদ-মণ্ডিত না হইয়া খাঁটি দস্তাময় হইত তাহা হইলেও এই পরীক্ষার সমান ফল দেখা যাইত। কিন্তু উহা মিশ্র দস্তা বিনির্ম্মিত হইলে কিরূপ ফল হইত, তাহা পরে দেখা যাইবে।

এক্ষণে শেষোক্ত পরীক্ষাটি একটু বিস্তারিত ভাবে সাধন করিয়া দেখ, —তাহার সহিত একখানি তাম্রফলক যোগ করিয়া দাও। তৃতীয় চিত্রের 'ক' চিহ্নিত পাত্র মধ্যে পারদ-মণ্ডিত দস্তা-ফলকের সহিত একখানি তাম্র ফলকও অম্লাক্ত জল মধ্যে ডুবাইয়া রাখ। যতক্ষণ ফলদ্বয়কে পরস্পরের সংস্পর্শে না আনিয়া পৃথগ্‌ভাবে রাখিবে ততক্ষণ পাত্রমধ্যে কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করিবে না,—দস্তাফলকের নিমজ্জিত অংশ যেমন পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বুদ্‌বুদে আবৃত হইয়াছিল, তদ্রূপই থাকিবে।



৩য় চিত্র।

এইক্ষণে তাম্রফলকের উর্দ্ধপ্রান্তভাগ ধরিয়া তাহার জল-মধ্যস্থ প্রান্তদেশকে ক্রমে দস্তাফলকের অতি নিকটে সরাইয়া রাখ, তাহাতেও জলমধ্যে কোনই পরিবর্ত্তন দেখিবে না। কিন্তু উহাকে দস্তার দিকে আর অল্প সরাইয়া দিলেই দুইখানি ফলক যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইবে, অমনি দেখিবে পাত্রমধ্যে খরতর কার্য্য আরম্ভ হইবে,—বুদ্‌বুদ্‌গুলি দস্তাগাত্র ছাড়িয়া তাম্রফলক গাত্রে গিয়া লাগিবে, ও তৎপরক্ষণেই দ্রুতবেগে জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে। আরও, তাম্রফলকের সন্নিহিত চতুর্দিকের জল বুদ্‌বুদময় হইয়া পড়িবে,—যেন ফুটিতেছে বলিয়া বোধ হইবে, এবং তাহার পিঠে পিঠে তাম্রফলক গাত্র হইতে ক্রমাগত বুদ্‌বুদরাশি জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে থাকিবে। দস্তাফলকের উপর বা তাহার সন্নিহিত জলে বুদ্‌বুদের লেশও নাই দেখিবে। এতদ্দৃষ্টে বিবেচনা হইবে যেন তাম্র ফলকেরই সহিত অম্লাক্ত জলের কোনরূপ কার্য্য হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। এক্ষণে এই প্রক্রিয়াটির গুড় তত্ত্ব বুঝিয়া দেখা যাক্‌। পাত্র মধ্যে তাম্রফলকের সমাবেশেই ঐ ক্রিয়ার বিকাশ। উহাও রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্ব পরীক্ষায় শুদ্ধ দস্তাফলক সহযোগে জলের যেরূপ রাসায়নিক কার্য্য একবার মাত্র সংঘটিত হইয়া নিবৃত্ত ছিল, সেই রাসায়নিক ক্রিয়াই এই পরীক্ষাটিতে বন্দ না থাকিয়া একাদিক্রমে চলিতে থাকে। তাম্রফলক পাত্রস্থ দ্রাবক সংমিশ্রিত জলমগ্ন হইয়া, যেমন দস্তাফলক সংলগ্ন হয়, অমনি দস্তাফলক গাত্র-সংলগ্ন উদজান বুদ্‌বুদগুলিকে নিজ গাত্রোপরি আকর্ষণ করিয়া লয়। তাহাতেই আর একটি রাসায়নিক ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়,—বুদ্‌বুদরাশি দস্তাগাত্র ছাড়িয়া দিবামাত্রে, ফলকের নূতন উপরিগাত্র অম্লাক্ত জল সংস্পর্শে আইসে। ফলকের উপরিতন স্তর অক্‌জাইড্‌ অব্‌ জিঙ্কে পরিণত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে; এক্ষণে সেই অক্‌জাইড্‌ বা মরিচা-স্তর দ্রাবক মিশ্রিত জল সংলগ্ন হয়, অর্থাৎ দ্রাবক সংযুক্ত জল ঐ মরিচা-স্তরকে স্পর্শ করে। যতক্ষণ উদজান বুদ্‌বুদ স্তর উহাকে ঢাকিয়া রাখিয়া থাকে, ততক্ষণ অম্লাক্ত জল উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরে তাম্রফলক আসিয়া যখন উহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে তখন ঐ বুদ্‌বুদরাশি স্থানান্তরিত হইবা মাত্রই ঐ অক্‌জাইড্‌ অব্‌ জিঙ্কের স্তর ও অম্লাক্ত জল পরস্পরের সংস্পর্শে আইসে; আসিলেই দুয়ের মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হয়, কারণ অক্‌জাইড্‌ অব্‌ জিঙ্কের সহিত গন্ধক দ্রাবকের প্রবল রাসা-

য়নিক সম্বন্ধ আছে। ঐ রাসায়নিক কার্য্য কি প্রকার তাহা এখন দেখা যাক।—তাহার ফলে ঐ অক্‌জাইড অব্ জিঙ্কের স্তর গলিয়া যায়। দ্রাবক সহযোগে ধাতু যে তরল ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, তাহাকে চলিত ভাষায় গলিয়া যাওয়া কহে। প্রকৃতপক্ষে ধাতুর ঐরূপ ভাবান্তর রাসায়নিক আকর্ষণের ফল মাত্র। অক্‌জাইড্ অব্ জিঙ্ক যে গন্ধক দ্রাবক সংস্পর্শে গলিয়া যায়, তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই ;—গন্ধক দ্রাবক তিনটি উপাদানের যোগে উৎপন্ন—গন্ধক, উদজান ও অম্লজান ; গন্ধকের সহিত অক্‌জাইড্ অব্ জিঙ্কের প্রবল রাসায়নিক সম্বন্ধ, তাহার প্রভাবে ঐ অক্‌জাইড্ দস্তাগাত্র ছাড়িয়া দিয়া গন্ধক দ্রাবকের গন্ধকের সহিত মিলিত হয়। রাসায়নিক কার্য্য পরমাণুতে পরমাণুতে সংঘটিত হয়, এবং গন্ধক-দ্রাবকে গন্ধক তরল অবস্থায় থাকে বলিয়া অক্‌জাইডও ঐ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়া তবে উহার সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে সংযুক্ত হয়। তাহার ফলে একটি নূতন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। উহাকে গন্ধকীয় দস্তা (Sulphate of Zinc) কহে। এইরূপে দস্তাফলকের উপরিস্থ অক্‌জাইড-স্তরটি গন্ধক দ্রাবকের যে পরিমাণ গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হইয়া সল্‌ফেট্ হয়, সেই পরিমাণ গন্ধকের সহিত যেটুকু উদজান ও অম্লজানের অংশ থাকে, সে দুইটি তখন কোথায় যায় ?—অম্লজান দস্তাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে সংযুক্ত হয় ও অবশিষ্ট উদজানাংশ তাম্রফলকগাত্র-সংলগ্ন পূর্ব্বোক্ত জলের মুক্ত উদজান-বুদ্‌বুদ সমূহে গিয়া মিশিয়া তাহাদের আয়তন বৃদ্ধি করে। তখন বর্দ্ধিতায়তন উদজান বাষ্পময় বুদ্‌বুদগুলি তাম্রগাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া পাত্রস্থ জলের উপরিভাগে উঠিতে থাকে ; তাহার কারণ এই,—পৃথিবীস্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় যাবতীয় পদার্থ মধ্যে উদজান লঘুতম ; সেইজন্য উহা জলের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া ভাসিয়া উঠে, অধিকন্তু জল ছাড়িয়া উঠিয়া বায়ুরও মধ্য দিয়া উর্দ্ধগামী হয়।

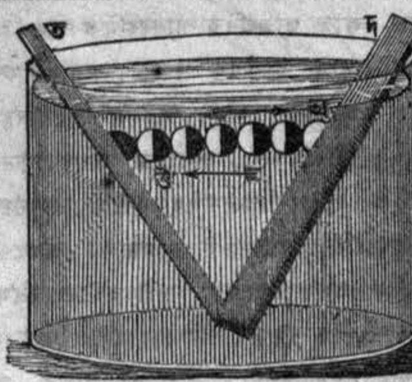
দস্তাফলক-গাত্রের পূর্ব্বোক্ত অক্‌জাইড্ অব্ জিঙ্কের স্তর যখন ফলকগাত্র ছাড়িয়া গন্ধক দ্রাবকের গন্ধকের সহিত মিলিত হইয়া সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক হয়, তখন দস্তাফলকের নূতন গাত্র জল-সংলগ্ন হয় ; সুতরাং তন্মধ্যে পুনরায় পূর্ব্বমত রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হয়। এইরূপে ক্রমাগতই রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে,—প্রথমে অক্‌জাইড্ অব্ জিঙ্ক বা দস্তা-মরিচা উৎপন্ন হয়, তারপর সেই মরিচাস্তর দ্রাবক সহযোগে গলিয়া গিয়া দ্রব সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্কএ পরিণত হয়। তাহাতেই প্রত্যেকবারে দস্তাফলকের উপরি গাত্রের একটি করিয়া স্তর কিয়ৎপরিমাণ জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে, ও পরিণামে গলিয়া যায়। এইরূপে ক্রমিক বারি বিশ্লেষণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদজান বাষ্প নিঃসরণ হইতে থাকে। এবম্বিধ রাসায়নিক কার্য্যে প্রত্যেক বার দস্তাফলকের নিমজ্জিত অংশের কিয়দংশ, পাত্রস্থ জলের কিয়ৎপরিমাণ এবং মিশ্রিত অম্লেরও কতকাংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্ষয়িত অংশের রূপান্তর হয় মাত্র। আর যে পর্য্যন্ত পাত্রস্থ জল, অম্ল ও দস্তার মধ্যে কোনটা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত না হইবে ততক্ষণ পাত্রমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মত রাসায়নিক কার্য্য চলিতে থাকিবে। যদি বল পাত্র মধ্যে এবম্বিধ রাসায়নিক কার্য্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি ? তাহা এইরূপে নিঃসন্দেহে জানা যাইতে পারে,—ঐ রাসায়নিক কার্য্য কিছু কাল ধরিয়া চলিতে দিলে যখন দস্তা-ফলকখানি সমস্ত গলিয়া যাইবে, তখন পাত্র মধ্যে যে দ্রব সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক সংমিশ্রিত জল মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ঐ দ্রাবণের একটু মাত্র লইয়া রীতিমত পরিক্ষা দ্বারা অবধারিত হইতে পারে ; অথবা সহজেই এইরূপে জানা যায়,—উত্তাপ দ্বারা ঐ দ্রাবণের জলীয় অংশ বাষ্পাকারে তিরোহিত করিয়া দিলে লবণের ন্যায় দানার আকারে একপ্রকার কঠিন পদার্থ জমাট বাঁধিয়া প্রকাশ পাইবে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ঐ গুলি সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক।

এক্ষণে পাত্র মধ্যে দ্রাবক-মিশ্রিত জল ও দস্তা ফলক মধ্যে পরস্পর কিরূপ রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হয় তাহা একপ্রকার বুঝা গেল ; আরও দেখা গেল যে তাম্রফলকখানির উপর কোন রাসায়নিক কার্য্য হয় না ; কিন্তু তাহা না হইলেও পাত্র মধ্যে রাসায়নিক কার্য্যোদ্ভাবন জন্য উহার একান্ত আবশ্যক, এমন কি তাম্রফলকেরই জন্য দস্তা ও জলের নিরবচ্ছিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া চলিয়া থাকে।

তাম্রফলক ব্যতীত, প্রথম পরীক্ষাতেই দেখা গিয়াছে, দস্তাফলক-গাত্র ও তৎসংলগ্ন জলে; পরস্পর একবারমাত্র রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হয় ; এবং তাহার ফলে দস্তার জল মধ্যস্থ উপরিতন গাত্র অক্‌জাইড্ অব্ জিঙ্কে পরিণত হয় ; আর বিশ্লিষ্ট উদজান উপাদান বুদ্‌বুদাকারে ঐ অক্‌জাইডের স্তরকে ঢাকিয়া বসে,—দ্রাবকের কার্য্য হইতে উহাকে রক্ষা করে। পরে তাম্রফলকখানি জল প্রবিষ্ট হইয়া কি করিল ? শুদ্ধ জল প্রবিষ্ট হইলেও হইবে না,—দস্তা-ফলককে স্পর্শ করিয়া থাকিতে হইবে ; তাহা হইলে তখন পাত্র মধ্যে

কিরূপ রাসায়নিক কার্য্যের উদ্রেক হয়? প্রথমতঃ উহা দস্তা-মরিচার রক্ষাকারী উদজান বাষ্পময় বুদ্‌বুদ্ রাশিকে নিজ গাত্রোপরি আকর্ষণ করিয়া লয়; অম্নি গন্ধক-দ্রাবক দস্তা-মরিচার গাত্র সংলগ্ন হইয়া পড়ে ও তাকে গলাইয়া ফেলে, অর্থাৎ উহা দ্রাবকের গন্ধকাংশের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে সংযুক্ত হয়, হইয়া দ্রব সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক হয়। ওদিকে দস্তা-ফলক-গাত্রের মরিচা-স্তর যেমন গলিয়া যায়, অমনি ফলকের নূতন গাত্র জল সংলগ্ন হইয়া পড়ে; তখন পুনরায় পূর্ব্বমত রাসায়নিক কার্য্যের স্থত্রপাত হয়। এইরূপে তাম্র-ফলকখানি, বিশ্লিষ্ট উদজানময় বুদ্‌বুদরাশিকে দস্তাফলক গাত্রে বসিতে দেয় না। তাহাতেই একাদিক্রমে রাসায়নিক কার্য্য চলিয়া থাকে। অধিকন্তু তাম্র-ফলকের সাহায্যে রাসায়নিক কার্য্যের প্রভূত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অধিকতর পরিমাণে অক্‌জাইড্ ও উদজান উদ্ভূত হয়,—দস্তা-ফলক প্রথমতঃ জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া একদফা অক্‌জাইড্ হয়, আবার যখন গন্ধক দ্রাবক বিশ্লিষ্ট হয় ও তাহার গন্ধকাংশ অক্‌জাইড্ অব্ জিঙ্কের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহারও অম্লজান আবার দস্তাফলকের সহিত সংযুক্ত হইয়া আর এক দফা অক্‌জাইড হয়; সুতরাং দস্তা দ্বিগুণ রাসায়নিক কার্য্য সাধন করে। উদজানও তাহাতে দ্বিগুণ উদ্ভূত হয়,—প্রথমতঃ বিশ্লিষ্ট জলাংশের উদজানাংশ ও পরে বিশ্লিষ্ট দ্রাবকাংশের উদজানাংশ।

এস্থলে দুইটি বিষয় জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। প্রথমতঃ, যদ্যপি সমগ্র রাসায়নিক কার্য্য দস্তা-ফলকেরই উপর হয়, তাম্রফলকখানি কেবল সহকারী স্বরূপ মাত্র, তবে উদজানময় বুদ্‌বুদরাশি দস্তার সন্নিহিত প্রকাশমান না হইয়া তাম্রফলকের উপর ও নিকটে কেন ও কিরূপেইবা দেখা দেয়? তাম্র-ফলক বুদ্‌বুদ্‌গুলিকে নিজ গাত্রে টানিয়া লয় বলিয়া যেন উহারা তাহার নিকটে যায়, কিন্তু দস্তা-গাত্র হইতে তবে নিরবচ্ছিন্ন বুদ্‌বুদ স্রোত তাম্র গাত্রাভিমুখে চলিতে দেখা যায় না কেন? তদ্বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে একটী চিত্রের আবশ্যক। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল। মনে কর ৪র্থ চিত্রানুরূপ একটী পাত্রে 'ত' ও 'দ' চিহ্নিত একখানি তাম্র ও একখানি দস্তা এই দুই খানি দ্বিবিধ ধাতুর ফলক দ্রাবক সংমিশ্রিত জলে নিমজ্জিত আছে। ফলকদ্বয় পরস্পর গাত্র সংলগ্ন হইবামাত্রই পূর্ব্বোল্লিখিত মত রাসায়নিক ক্রিয়া একাদিক্রমে চলিতে থাকিবে। ঐ রাসায়নিক কার্য্যের প্রভাবে ফলকদ্বয় মধ্যস্থিত জলকণা পরম্পরা বিশ্লিষ্ট হয়।



৪র্থ চিত্র।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে দস্তা ফলক এককালে সমস্ত জলকে বিশ্লিষ্ট করে না; প্রথমতঃ কেবলমাত্র ফলক-গাত্রের অব্যবহিত উপরে, তাহার সংস্পর্শে যে জলভাগ থাকে সেই টুকু মাত্রই বিশ্লিষ্ট হয়। ঐ জলাংশের প্রত্যেক মৌলিক অণুগুলি সর্ব্বতোভাবে বিশ্লিষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক মৌলিক অণুর উপাদান অম্লজান ও উদজান পরস্পর পৃথক হইয়া পড়ে। তাহার পর কি হয়, তাহা আর এ স্থলে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। দস্তাগাত্র-সংলগ্ন জলের মৌলিকাণুগুলি যখন সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে তাম্র-ফলক পর্য্যন্ত জল কণারাশি পর পর আংশিক বা কিয়ৎপরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। এইটিই বুঝাবার জন্য চিত্রে দস্তা হইতে তাম্র ফলক পর্য্যন্ত বিস্তৃত জলকণা পরম্পরার একটি মাত্র নিরবচ্ছিন্ন পংক্তি, সারি বা লাইন ধরিয়া লইয়া দেখান গেল। বুঝিবার সুবিধার জন্যই ঐরূপ একটি মাত্র জলকণার লাইন ধরিয়া লওয়া গেল, এবং এক একটি কণা বৃহদাকার বৃত্তাকারে অঙ্কিত হইল। ঐগুলিকে জলের এক একটি মৌলিকাণু বলিয়া বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ জলের দুইটি উপাদান—উদজান ও অম্লজানের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর (দুই ভাগ বা দুই পরমাণু অম্লজান ও একভাগ বা এক পরমাণু উদজানের) পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে উহাদের এক একটি উৎপন্ন। ঐ মৌলিকাণুগুলি অদৃশ্য; উহাদের অনেকগুলি একত্রে সংযুক্ত হইয়া স্থূলরূপ ধরিলে তবে উহারা দৃষ্টিগোচর হয়। এস্থলে মনে কর উহাদের চিত্রিত আকারে দেখা যাইতেছে। এক্ষণে তন্মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য প্রকরণটী বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ দস্তা-ফলকের গাত্রসংলগ্ন মৌলিকাণুটি সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্লিষ্ট হয়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে, তাম্র-ফলক পর্য্যন্ত পর পর, বাকী সমস্ত মৌলিক অণুগুলিরও উপাদান দুইটি কতক পরিমাণে বিশ্লিষ্ট বা পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইয়া পড়ে। অম্ল-

জানের সহিত দস্তার স্বাভাবিক রাসায়নিক সম্বন্ধ থাকায়, এবং তাম্র উদজানকে আকর্ষণ করে (রাসায়নিক সম্বন্ধে নহে) বলিয়া প্রত্যেক মৌলিকাণুর বিশ্লিষ্ট অম্লজানাংশ দস্তা ফলকের অভিমুখে ও উদজানের অংশ তাম্র-ফলকাভিমুখে বিন্যস্ত হয়। চিত্রে শ্বেতবর্ণাঙ্কিত বৃত্তার্দ্ধ অম্লজানাংশ ও কৃষ্টবর্ণাঙ্কিত বৃত্তার্দ্ধ উদজানাংশ। এক্ষণে দস্তা-ফলক-গাত্র-সংলগ্ন প্রথম মৌলিক অণুটী হইতে ক্রমে তাম্র-ফলক পর্য্যন্ত পর পর সমস্ত মৌলিকাণুগুলির বিশ্লেষণ কার্য্য কিরূপে সংঘটিত হয় দেখা যাক্। দস্তা-ফলক গাত্রস্পৃষ্ট প্রথম মৌলিক অণুটি সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হইয়াই উহার অম্লজানের ভাগ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দস্তার অণুর সহিত মিলিত হইয়া এক মৌলিকাণু অক্‌জাইড্ অব্ জিঙ্ক হইয়া দস্তা-গাত্রের ঐখানেই থাকিয়া যায়, এবং উদজানের ভাগটুকু মুক্ত হইয়া পড়িয়া দ্বিতীয় মৌলিকাণুর অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হয়। তখন দ্বিতীয়টী আসিয়া দস্তা-গাত্র সংলগ্ন হয়, এবং প্রথমটীর ন্যায় ওটিও বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে ও উহার অম্লজান দস্তার সহিত, আর উদজান তৃতীয় মৌলিক অণুর অম্লজানাংশের সহিত রাসায়নিক সংযোগ বলে পরস্পর সংযুক্ত হয়। তখন আবার তৃতীয় মৌলিক অণুটী দস্তার গাত্রে আসিয়া সংলগ্ন হয়; আবার ঐরূপ রাসায়নিক কার্য্য চলে। এইরূপে মৌলিকাণু পরম্পরা বিশ্লিষ্ট হইতে থাকিলে তাহারা চিত্রবৎ অবস্থিত হইবে, অর্থাৎ দস্তা হইতে তাম্র পর্য্যন্ত মৌলিকাণুর লাইনটির প্রত্যেকের উপাদান দুইটী পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া, দস্তারদিকে চিত্রবৎ অম্লজানের পরমাণু পরম্পরা ও তাম্রের অভিমুখে উদজান পরমাণু পরম্পরার স্রোত চলিতে থাকে। চিত্রে 'অ' ও 'উ' চিহ্নিত শরাগ্র দুইটি ঐ দিক নির্দ্দেশ করিতেছে। এইরূপে দস্তা হইতে তাম্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত জলের মৌলিকাণু মধ্যে ক্রমাগত বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ কার্য্য সংঘটিত হইয়া পরিণামে অম্লজানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুগুলি দস্তার সহিত মিলিত হইয়া দস্তা-মরিচারূপে ফলকগাত্র ঢাকিয়া ফেলে এবং উদজানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুগুলি তাম্রগাত্রে গিয়া উপস্থিত হয়। পরমাণু অদৃশ্য, সুতরাং রাসায়নিক কার্য্যও দেখিতে পাওয়া যায় না; ক্রমে যখন উপর্য্যুপরি এক একটি করিয়া অনেক জলস্তর বিশ্লিষ্ট হয়, তখন অল্প অল্প করিয়া উদজান বাষ্প তাম্র-ফলক গাত্রে গিয়া শেষে স্থূল রূপ ধারণ করে; আরও, বিশ্লিষ্ট গন্ধক-দ্রাবকেরও উদজানাংশ তাম্রগাত্রে গিয়া বিশ্লিষ্ট জলের উদজানাংশের সহিত গিয়া যোগ দেয়; তখন উদজানের আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া স্থূল বুদ্‌বুদাকারে তাম্র-ফলকেরই গাত্রোপরি ও তাহারই সন্নিহিত প্রকাশমান হয়। প্রকৃত পক্ষে, উহারা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে দস্তাগাত্র হইতে অলক্ষিত ভাবে তাম্র সন্নিহিত হইতে থাকে, তাহাতেই উহাদের গমনকালে দেখা যায় না। এস্থলে তাম্র-ফলকখানি সম্বন্ধে আরও একটি কথা বুঝিতে হইবে। উহা পাত্র মধ্যে উদজান বাষ্পকে রাসায়নিক সম্বন্ধে আকর্ষণ করে না,—উদজানের সহিত উহার কোনই রাসায়নিক কার্য্য নাই; তবে উহা কি বলে উদজানকে আকর্ষণ করে, উদজানইবা কি জন্য দস্তা ছাড়িয়া দিয়া উহার নিকট যায়? ইহার তাৎপর্য্য কিছু পরেই জানা যাইবে।

আরও একটী বিষয় বুঝিতে হইবে,—দস্তা-ফলক ও অম্লাক্ত জলের পরস্পর পূর্ব্বোক্তরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটন কালীন দস্তাফলক-গাত্র যে অক্‌জাইড্-স্তরে পরিণত হয়, তদুপরি পারদ-স্তর তখন কোথায় যায়? পারদ-স্তর যেখানের সেইখানেই থাকে, অর্থাৎ উহা দস্তার গাত্র বিচ্ছিন্ন হয় না, উহার মধ্য দিয়া, উহাকে ভেদ করিয়া অম্লাক্ত জলের পরমাণু সমূহ দস্তাগাত্রে গিয়া রাসায়নিক কার্য্য সাধন করে। প্রত্যেক রাসায়নিক কার্য্য ফলে এক একটি করিয়া দস্তা-স্তর যেমন গলিয়া যায়, দস্তাও সুতরাং সেই পরিমাণে কমিতে থাকে, পারদ-স্তরও তাহার গাত্রোপরি বসিয়া থাকে। পাত্রমধ্যে অধিকক্ষণ রাসায়নিক কার্য্য চলিয়া যখন দস্তা-ফলক অত্যন্ত পাৎলা হইয়া পড়ে, তখনও দেখিবে তাহারই উপর পারদ-স্তর পূর্ব্ববৎই সমভাবে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। উহার কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে না। পদার্থের পরমাণু সমূহ আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। রাসায়নিক আকর্ষণ কেবল পরমাণুতে পরমাণুতেই সংঘটিত হয়। সুতরাং পারদ-স্তরের মধ্যে যে সূক্ষ্মতম ছিদ্র (সচ্ছিদ্রতা পদার্থ মাত্রের নিত্য প্রাকৃতিক ধর্ম্ম) আছে তন্মধ্য দিয়াই রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। এ বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। ইহা প্রত্যক্ষ করিবার বিষয় নহে, কারণ এতদকার্য্যের উপকরণ গুলিই অদৃশ্য, সুতরাং এতদ্বিষয় কেবল মনে মনেই ধারণা করিয়া লইতে হইবে। যত বুঝিয়া দেখিবে ততই স্পষ্ট হইবে। এ বিষয় এত সহজ নহে যে একবার মাত্র পাঠে ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে। বারম্বার পাঠ ও চিন্তা দ্বারাই সুস্পষ্ট হইতে পারে।

এস্থলে পাত্র মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে। এই টুকু স্পষ্ট করিবার জন্যই

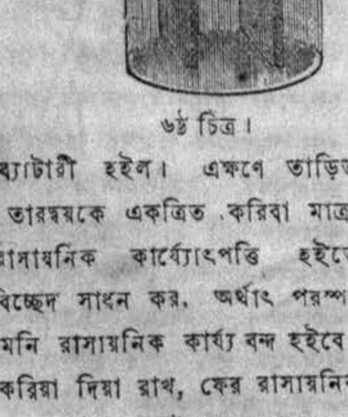
প্রথমে রাসায়নিক আকর্ষণ সম্বন্ধে কিছু অধিক করিয়া বলিতে হইয়াছে। পাত্র মধ্যে ঐ রাসায়নিক কার্য্যোদ্ভাবন জন্যই দ্রাবক সংমিশ্রিত জল ও দুইটী ধাতুর একত্র সমাবেশ; এবং ঐ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেই তাড়িত-বলের উৎপত্তি।

এক্ষণে তাড়িত-বল কোথায় দেখা যাক। ব্যাটারীর তিনটী প্রধান অঙ্গ,—পাত্র, দুইখানি দুই প্রকার ধাতুর পাত ও অম্ল সংমিশ্রিত জল, এই তিনটী উপকরণের একত্র সমাবেশ হইল, এবং তাহার ফলে যেরূপ রাসায়নিক ক্রিয়ার বিকাশ তাহাও দেখা গেল, তবে তাড়িত-বলের উৎপত্তি কোথায় হইল? এক্ষণে তাহাই দেখাইব।



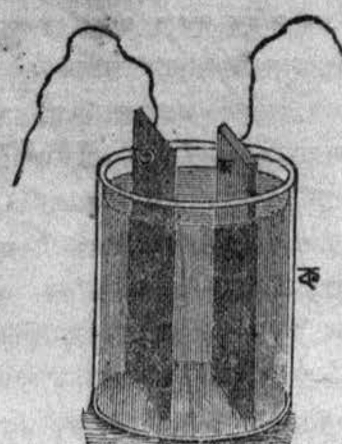
৫ম চিত্র।

৫ম চিত্রবৎ পাত্রস্থ ফলকদ্বয়ের নিম্নদেশ বা পাত্রের ভিতরকার প্রান্ত-দেশের পরিবর্ত্তে তদুভয়ের উর্দ্ধ প্রান্তদ্বয় সংলগ্ন করিয়া রাখ; তদবস্থায়ও দেখিবে পাত্রমধ্যে পূর্ব্ববৎই রাসায়নিক কার্য্য চলিবে। তাহার পর ফলকদ্বয়কে পরস্পর পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিয়া একগাছি ধাতব তার লইয়া তাহাকে উহাদের উর্দ্ধপ্রান্ত দেশোপরি ৬ষ্ঠ চিত্রবৎ স্থাপন কর; তাহাতেও দেখিবে পূর্ব্ববৎই রাসায়নিক ক্রিয়ার উদ্ভব হইবে। অথবা ফলক দুইখানির একদিককার দুই প্রান্তে দুইগাছি ধাতব তার সংলগ্ন করিয়া দিয়া, তাহাদের অপর প্রান্ত ভাগ ৭ম চিত্রবৎ পাত্রমধ্যে মগ্ন করিয়া রাখ। এখন পূর্ণাঙ্গ ব্যাটারী হইল। এক্ষণে তাড়িত কোথায় দেখা যাক। তারদ্বয়কে একত্রিত করিবা মাত্র, তাহাতেও পূর্ব্ববৎ রাসায়নিক কার্য্যোৎপত্তি হইতে দেখিবে। তারদ্বয়ের বিচ্ছেদ সাধন কর, অর্থাৎ পরস্পর পৃথক করিয়া ফেল, অমনি রাসায়নিক কার্য্য বন্দ হইবে। পুনরায় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দিয়া রাখ, ফের রাসায়নিক ক্রিয়ার বিকাশ দেখিবে। তবেই কোন উপায়ে ফলকদ্বয়কে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া না দিলে রাসায়নিক কার্য্যোদ্ভব



৬ষ্ঠ চিত্র।

হইবে না; তাহা বলিয়া যা তা দিয়া সংযুক্ত করিলে হইবে না। কোন রূপ ধাতব সংযোগ চাই। এ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখ। পুনরায় সংযোজক তার গাছিকে পরস্পর পৃথক করিয়া ফেল, এবং এই বার তার দুইটির প্রান্তদ্বয়ে এক ফালি কাগজ, একপাব কঞ্চি, একটুকু পাঁকাটি, খানিক কাঠ, দড়ি, পশম, ফ্ল্যানেল অথবা একখণ্ড গালার বাতি বাঁধিয়া দিয়া দেখ। ঐ সকল দ্রব্যের এক একটি পর পর লইয়া তাহার একদিকে ঐ তারদ্বয়ের একটির কতকটা জড়াইয়া দাও, আর অন্য দিকে অপর তারটি জড়াইয়া দাও। তাহাতে পাত্রের তাম্র ও দস্তা ফলক সংলগ্ন তার দুইগাছি পরস্পর আর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অথাৎ সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে না থাকিয়া সংযুক্ত হওয়াতে ফলকদ্বয়ও পরস্পর সংযুক্ত হইল বলিতে হইবে, তন্মধ্যে আর ফাঁক রহিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এরূপ অবস্থায় পাত্র মধ্যে আর পূর্ব্বমত মূলেই রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হইবে না। তখন তার প্রান্তদ্বয় সংযুক্ত পূর্ব্বোক্ত বস্তুগুলি স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ক্রমে পর পর একখানি করিয়া পিত্তল, তামা, লোহ, সোণা, রূপা প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর খণ্ড বা তার লইয়া ঐ তার প্রান্তদ্বয়ে বাঁধিয়া দিয়া দেখ,—প্রত্যেক ধাতুর সংযোজনায় পূর্ব্ব মত পাত্রমধ্যে রাসায়নিক কার্য্যোৎপত্তি হইবে। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পাত্রমধ্যে রাসায়নিক কার্য্যোৎপত্তির জন্য ধাতবফলকদ্বয় মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ধাতব সংযোগ স্থাপন করা আবশ্যক; অর্থাৎ ফলক দুইখানি যখন পাত্র মধ্যে অম্লাক্ত জলে নিমজ্জিত থাকিবে, তখন তাহাদের পরস্পর সংলগ্ন করিতে অথবা কোন ধাতুর দ্বারা তাহাদের উভয়কে সংযোগ করিতে হইবে। এই সংযোগ-প্রকরণ অন্যবিধ অপেক্ষা দুইগাছি ধাতব তার দুইখানি ফলকের উর্দ্ধ প্রান্তদ্বয়ে ঝাল দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেওয়াই নিয়ম আছে, কারণ তাহাতে তাড়িত বলকে যেন ধরিয়া অনেক কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়।



৭ম চিত্র।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোক-চিত্র।

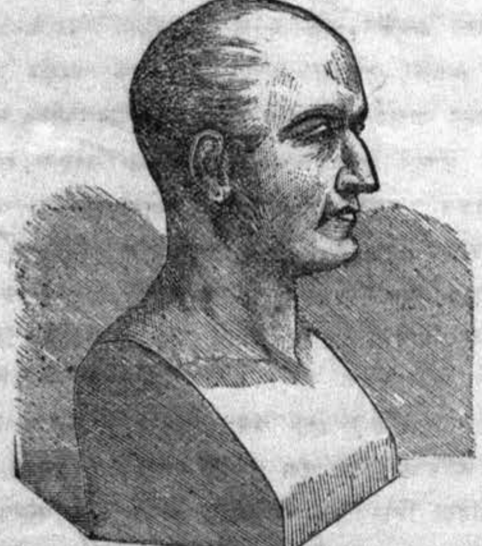
অথবা

সূর্য্য-রশ্মি সহকারে পদার্থের অনুরূপ চিত্র গ্রহণ প্রকরণ।

(বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমন্বিত)

THEORY AND PRACTICE
OF
THE PHOTOGRAPHIC ART.

" Blest be the art that can immortalise,
The art that baffles time's tyrannic claim
To quench it !——"



জোসেফ নিয়েপসি।



ডগার।

এই প্রবন্ধে আমরা ক্রমান্বয়ে ফটগ্রাফির বিজ্ঞানাংশ বা হেতু-বিজ্ঞান হইতে উহার শিল্পভাগ বা প্রক্রিয়া-প্রণালী পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিব। সূর্য্যালোকের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা যে উপায়ে পদার্থের প্রতিকৃতি গ্রহণ করা যায় তাহার নাম ফটগ্রাফি (Photography) বা আলোক-চিত্র। কি কি উপকরণে ও কি কৌশলে আলোক সহকারে পদার্থের অনুরূপ চিত্র গ্রহণ করা যায়, তাহা আলোক-চিত্র বা ফটগ্রাফির শিল্পাংশ মাত্র। শিল্পমাত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাংশ আছে। উহাকে হেতুবিজ্ঞানাংশ কহে। যে যে উপাদানের সাহায্যে ও যে উপায়ে আলোক-চিত্র-শিল্প সম্পন্ন হয়, সেই উপাদান সমূহের প্রত্যেকের প্রকৃতি বা গুণাগুণ এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও কার্য্যপ্রণালীর নিয়মাদি ফটগ্রাফির হেতুবিজ্ঞানাংশ পাঠে অবগত হওয়া যায়। আলোক বা দৃষ্টি-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান এই শিল্পের ভিত্তিমূল স্বরূপ। সুতরাং আলোক-চিত্র গ্রহণ প্রকরণ বুঝিতে দৃষ্টিবিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের যে তত্ত্বগুলির বিষয় জানা আবশ্যক শুদ্ধ সেই গুলিরই একরূপ মোটামুটি বিবরণ এ স্থলে প্রদান করিব।

আলোক।—আলোকের নিদান অনেক বস্তু আছে। সূর্য্য, তেজঃ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি মূল হইতে আলোক প্রকাশ হয়। উহাদের আলোকবিশিষ্ট বা আলোকময় পদার্থ কহে। সে সকলের আলোচনা করার আমাদের এ স্থলে প্রয়োজন নাই; সূর্য্যালোকই কেবল ফটগ্রাফির প্রধানতম সহায়, সুতরাং এস্থলে তাহারই বিষয় কিছু দেখা যাউক। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ বহুকাল ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া আলোকের প্রকৃতি—উহা কি পদার্থ,—আদৌ পদার্থই কি না, তাহা ঠিক করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তোষজনক শেষ মীমাংসা হয় নাই। আলোকটা যে কি, সে বিষয়ে পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যাহা বুঝিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকও বড় অধিক কিছুই বুঝিতে বা বুঝাইতে সক্ষম হন নাই। তবে লাভের মধ্যে এই হইয়াছে যে আলোকের প্রকৃতির আলোচনা বিশেষরূপে হওয়াতে তাহার কতকগুলি মহোপকারী তত্ত্ব বা নিয়ম বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেই নিয়মগুলি অবধারিত না হইলে আজ দৃষ্টি-বিজ্ঞান প্রসূত বহুতর অত্যাবশ্যক ও আনন্দপ্রদ যন্ত্রাদি আমাদের করায়ত্ত হইত না। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, চশমা প্রভৃতি অনেকগুলি উপকারী যন্ত্র তাহার ফল। তাহারই মধ্যে ফটগ্রাফ-যন্ত্র। আলোকের সেই আবিষ্কৃত নিয়মগুলি এ স্থলে এক একটা করিয়া সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিয়া তার পর প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাইবে। আলোক সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মতের বিষয় একটু বলি,—জানিয়া রাখা ভাল। ফ্রাঙ্কলিনের মত এই,—কোন অজ্ঞাত কারণে সূর্য্য একটী তীব্র জ্যোতির্ম্ময় বৃহদাকার গোলক স্বরূপ হইয়াছে। এখন যেমন দুই পদার্থের পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা এককালে তেজঃ ও আলোকের উৎপত্তি করা যায়,—চকমকির পাথর ও ইস্পাতের পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা, ছুরি কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্রে শাণ দিবার সময় পাথরের সংঘর্ষণে, এতৎসমস্ত হইতে যেমন দ্রুতবেগে অগ্নিকণা অর্থাৎ উহাদের রেণু অগ্নিময় হইয়া নির্গত হইতে থাকে; আতসবাজিতে আগুন দিলে বারুদ যেমন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণারূপে অতি বেগে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ সূর্য্যের গাত্র হইতে (যেন তেন প্রকারেণ—সেও অজ্ঞাত) ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল পরমাণুরাশি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া অতিবেগে বায়ু মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষু স্পর্শ করিয়া দর্শন জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। অতএব ফ্রাঙ্কলিনের মতে আলোক অতীব সূক্ষ্মতম পদার্থ-পরমাণুময়। ঐ পরমাণুগুলিকে দেখা যায় না, উহাদের ভারিত্ব নাই, ও উহারা অননুমেয় গতিবেগ বিশিষ্ট। ইহাকেই আলোক সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিনের কর্পস্কিউলর্ মত (Corpuscular Theory) জড়াত্মক মত কহে। এই মতে যেসকল পদার্থ হইতে আলোক নির্গত হয়, সে সমস্ত হইতে এই রূপেই হইয়া থাকে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে এই মতে আলোক, আলোকময় পদার্থ গাত্র বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্মতম অংশরাশি মাত্র। কিন্তু তাহা হইলে সূর্য্য যে এতকাল ধরিয়া আলোক বিতরণ করিয়া আসিতেছে তাহাতে অবশ্যই তার জড়-দেহের কতক অংশ কমিয়াছে, এবং কালে ঐরূপে আলোক দিতে দিতে একেবারে সমূলেও বিনাশপ্রাপ্ত হইতেই হইবে, সে বিষয়ের মীমাংসা কে করে? কিন্তু ফ্রাঙ্কলিনের এই মত যখন প্রথম প্রকটিত হয় তখন তাৎকালীন যাবতীয় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ দলে দলে প্রায় সকলেই তাহার সমর্থন করিয়া তন্মতাবলম্বী হন। ক্রমে ঐ মতও তিরোহিত হইল, এবং তাহার স্থানে হাইজেন নামক একজন বিশিষ্ট ফরাসীস বৈজ্ঞানিকবরের মত প্রতিষ্ঠাভাজন হইল। সেই মতই আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে। সুতরাং তারও বিষয় একটু বলিতেছি,—যেমন শব্দ ও তেজঃ বা তাপ, তাহাদের উৎপত্তি স্থান হইতে পরিচালিত হইয়া স্থানান্তরে আমাদিগের ইন্দ্রিয় গোচর হইবার জন্য একটি পরিচালক মধ্যবর্ত্তী পদার্থের মধ্য দিয়া আইসে, আলোকেরও তদ্রূপ একটি পরিচালক মধ্যবর্ত্তী পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দুইটি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। স্থির জলে একটি ঢিল ফেলিলে যেখানে সেটি পড়ে, জলের সেই স্থান হইতে যেমন তরঙ্গ উঠিয়া ক্রমে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এই রূপে জল ক্রমাগত তরঙ্গায়িত হইয়া শেষে জলের সীমান্তক তীর পর্য্যন্ত গিয়া লাগে। আবার জলের মধ্যে এক স্থানে যদ্যপি শব্দ করা যায়,—দুই হাত বুড়াইয়া তালি দেওয়া যায় বা দুই হাতে পরস্পর আঘাত করা যায়, এবং আর একজন যদ্যপি তথা হইতে দূরে সেই জল মধ্যে ডুব দিয়া শুনে; তবে সেই আঘাতের শব্দ সে ব্যক্তি স্পষ্ট শুনিতে পাইবে। সে স্থলে জলনিমজ্জিত ব্যক্তির ঐ শব্দ জ্ঞান কি রূপে জন্মায়? ঢিল ফেলিলে যেমন জলের তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, জলের ভিতর আঘাত জন্মাইলে তাহাতেও সেইরূপ তরঙ্গলমালা উৎপন্ন হয়; তরঙ্গ পরম্পরা অতীব সূক্ষ্ম। সেই তরঙ্গমালা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া গিয়া নিমজ্জিত

ব্যক্তির কর্ণের ভিতরকার সূক্ষ্ম চর্ম্মপরদা—কর্ণপটাহে গিয়া লাগে, তাহাতে ঐ পর্দ্দারও আন্দোলন বা পরিকম্পন উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ উহা দ্রুতবেগে কাঁপিতে থাকে। তখন সেই পটাহ স্পর্শ করিয়া যে দৃষ্টিজ্ঞানোৎপাদক শিরা (Optic Nerve) মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে সেই শিরা দ্বারা ঐ পরিকম্পন মস্তিষ্কে নীত হয়। তবে তখন শব্দ জ্ঞানের উদয় হয়। এ স্থলে জল যেমন শব্দ বহন করে, বায়ুতেও ঠিক ঐ প্রকারে শব্দ বাহিত হয়। সেতারের তারে টঙ্কার মারিলে, ঘণ্টা ধ্বনিত করিলে, কথা কহিলে, ফলে যে কোন রূপে শব্দ করিলে,তাহাতে শব্দোৎপাদক পদার্থের জড়কণা সমূহ দ্রুতবেগে কাঁপিতে থাকে, সেই আণবিক পরিকম্পন বায়ুতেও পরিচালিত হয়, অর্থাৎ বায়ুর যে অংশটুকু সেই পরিকম্পিত পদার্থ গাত্রস্পর্শ করিয়া থাকে, সেই টুকুও কাঁপিতে থাকে, ক্রমে তুচঃপার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র বাতাসই ক্রমে তরঙ্গায়িত হয়। শব্দের তীব্রতা বা আধিক্য অনুসারে অল্প বা অধিক দূর পর্য্যন্ত বায়ু ঐ রূপে তরঙ্গায়িত হইয়া থাকে। সেই বায়ুতরঙ্গ কর্ণপটাহে আঘাত করিলে আমাদিগের শব্দ জ্ঞান জন্মে। তাপ বা তেজের জ্ঞানোৎপত্তিও অবিকল ঐ রূপে হইয়া থাকে, অর্থাৎ তেজ বা তাপাধার পদার্থের সূক্ষ্ম অণু সমূহ দ্রুত আন্দোলিত হইলে তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বায়ুও দ্রুত তরঙ্গায়িত হইয়া আমাদিগের ত্বগিন্দ্রিয়কে আঘাত করিলে উষ্ণতার অনুভূতি জন্মায়। তবেই শব্দ ও তেজের পরিচালন যেমন মধ্যবর্ত্তী পরিচালক পদার্থ দ্বারা সংঘটিত হয়, সেইরূপ আলোকেরও পরিচালনার জন্য পদার্থবিৎগণ একটি মধ্যবর্ত্তী পরিচালক পদার্থ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ঐ পদার্থকে ঈথর বলে। ঐ পদার্থ জল ও বায়ু অপেক্ষা অনেকাংশে তরল ও অতীব সূক্ষ্ম। উহা বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, পৃথিবী প্রভৃতি সৃষ্টি মাত্রই ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অন্ততঃ যতদূর মানব দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে। আরও ভূমণ্ডলের যাবতীয় পদার্থ মধ্যেও রহিয়াছে। পদার্থ মাত্র সছিদ্র সেই সূক্ষ্ম ছিদ্র মধ্যে পদার্থের পরমাণু বেষ্টন করিয়া ঐ পদার্থ অবস্থিত। জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সমস্তের অণু সমূহ দ্রুত আন্দোলিত হয়, তাহাতে ঐ ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম তরল পদার্থও তরঙ্গায়িত হইয়া সেই তরঙ্গ সমূহ জীবের অক্ষিচর্ম্ম স্পর্শ করে। তখন অক্ষিচর্ম্মও পরিকম্পিত হইয়া, তৎসংলগ্ন অক্ষি-শিরা সেই পরিকম্পন বহন করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়, তাহাতেই আমাদিগের দৃষ্টিজ্ঞান উৎপদিত হয়। জল আন্দোলিত হইলে ঢেউয়ের উৎপত্তি, বায়ুর আন্দোলনে শব্দের ঢেউ এবং ঐ কাল্পনিক বিশ্বব্যাপী ঈথরের আন্দোলনে আলোকের ঢেউয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাকেই আলোকের (Undulatory Theory) পরিদোলকীয় মত কহে। আধুনিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রধানতম বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই মতাবলম্বী। কালে এ মতও তিরোহিত হইয়া নূতন মতের আবির্ভাব হইতেও পারে। যতদিন কোন বিষয়ের যথার্থ প্রকৃতি অবধারিত না হয়, ততদিনই সে সম্বন্ধে নানাবিধ মত চলিয়া থাকে। আলোকের দ্বিবিধ মতের একটু আভাস দিলাম। মতোদ্ভাবক মহোদয়গণ অনেকদিন হইল গত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বিষয় যেমন সকলেই কিছু জানিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সৃষ্ট ঐ দুইটি মতের বিষয়ও অল্প জানিয়া রাখাতে ক্ষতি কি?

এক্ষণে আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে মত যাহাই হউক তাহা লইয়া তত মাতা বকাইবার প্রয়োজন নাই।

দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর যে শক্তির কার্য্য প্রভাবে আমরা বহির্বস্তু দেখিতে পাই তাহাকে আলোক কহে। সূর্য্য সর্ব্বপ্রধান আলোকাধার এবং সূর্য্যালোকই ফটগ্রাফি শিল্পের নিদান। সূর্য্য যে কি প্রকারে আলোকিত হইল তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারে না। ঐ আলোক যে জড় পদার্থ তাহার কোনই প্রমাণ নাই। কেবল দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারাই আমরা উহার সত্তা অনুভব করি। আলোকের সমাগমে আমাদের দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হয়। উহার অপগমেই অন্ধকার। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাই না। ঠিক যেমন তাপ বা তেজঃ অভাবে শৈত্যের আবির্ভাব, শৈত্য কোনরূপ স্বতন্ত্র সামগ্রী বা শক্তি নহে, তদ্রূপ অন্ধকারও স্বতন্ত্র পদার্থ বা শক্তি নহে।

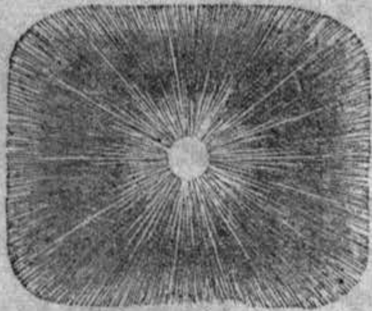
আলোকের যে কতিপয় প্রধানতম নিয়ম অবধারিত হইয়াছে সেইগুলিই বুঝিয়া দেখা অতি আবশ্যক। সে গুলির জ্ঞানলাভ অগ্রে না করিলে, দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র মাত্রই স্পষ্ট বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

আলোক-তত্ত্বের যে নিয়মগুলি নির্ণীত হইয়াছে তন্মধ্যে এই প্রবন্ধ বুঝিতে যে কয়টী জানা আবশ্যক এ স্থলে কেবল সেই গুলিরই স্থূল আলোচনা করা যাইবে।

আলোকের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম এই যে উহা আমাদিগের দৃষ্টিজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়; একটী সর্ব্বতোভাবে অন্ধকার গৃহ মধ্যস্থ দ্রব্যাদির কিছুমাত্রই দৃষ্টিগোচর হয় না। গৃহের টেবিল, চেয়ার, বাক্স, সিন্দুক, খাট, ঘটি, বাটি, প্রভৃতি

যাবতীয় গৃহসজ্জার কিছুই আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু ঐ গৃহমধ্যে একটী প্রদীপ, বাতি বা কোনরূপ আলোক লইয়া যাইবামাত্রই সেই সকল পদার্থ অ-নি দৃষ্টিগোচর হইবে। এটী খুব সহজ কথা। পড়িলেই হয়ত অনেকেই বলিবেন এ কথা কে না জানে? সত্য, কিন্তু ইহার ভিতর একটুকু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে সেই টুকু পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ বহুল পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শন দ্বারা স্থির করিয়াছেন; সেই টুকু এ স্থলে বুঝিতে হইবে। গৃহস্থিত পদার্থ সমূহের উপর আলোক পতিত হইলে ত আমরা তৎসমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ দর্শন কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়? আলোক-রশ্মি সমূহ প্রথমতঃ পদার্থের উপর পতিত হয়, তার পর সেই রশ্মিগুলি সেই সকল পদার্থের উপরি-গাত্র হইতে আমাদিগের চক্ষুতে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ তাহারা পদার্থোপরি পতিত হইয়া তথা হইতে দর্শকের চক্ষুতে ঠিকরে আইসে, তখন আমরা সেই সকল পদার্থ দেখিতে পাই অর্থাৎ সেই সকল পদার্থের দৃষ্টি জ্ঞান জন্মে। ইহাকেই বৈজ্ঞানিক ভাষায় আলোক-প্রতিফলন (Reflection) কহে। প্রথমতঃ আলোকের এই প্রতিফলন ধর্ম্মটী কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তাহার অগ্রে আলোকের আর কতিপয় সামান্য ধর্ম্ম বা নিয়ম অবগত হওয়া আবশ্যক।

সূর্য্যালোকে জড়জগৎ আলোকিত হইলে পর তবে উহা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়।



১ম চিত্র।

আলোক বিস্তার।—আলোক বিশিষ্ট পদার্থের গাত্র হইতে আলোক সর্ব্বদিকে গমন করে। কারণ উহার যে দিকেই অবস্থিতি করা যাউক না সকল দিক হইতেই উহাকে দেখা যায়। যেমন কদমফুলের উপর তাহার কেশরগুলি এমন দিক্ নাই যে সে দিকাভিমুখী একটীও নহে। ১ম প্রতিকৃতি দেখ। উহাকে আলোক বিকীর্ণ কহে।

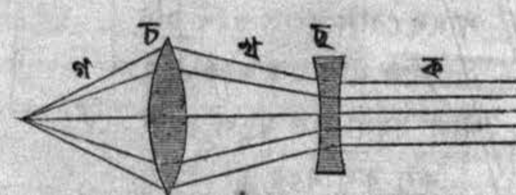
আলোক রশ্মি।—আলোকিত পদার্থ হইতে যে রেখা-ক্রমে আলোক বিকীর্ণ হয়, তাহার এক একটিকে আলোক রশ্মি কহে। এমন বহুসংখ্যক রশ্মি একত্রে বিকীর্ণ হইলে তাহাকে রশ্মিপুঞ্জ কহে। চক্ষু মিট্ মিট্ করিয়া বা অর্দ্ধ মুদিত করিয়া আলোক প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঝাঁটার মত যে বহুসংখ্যক আলোক-রেখা দেখা যায় তাহার এক একটী রশ্মি, আর সমগ্র রশ্মি-ঝাঁটা গাছটী একটী রশ্মিপুঞ্জ।

সমান্তর রশ্মি।—যখন কতিপয় রশ্মি কোন বস্তুর উপর এরূপ ভাবে পতিত হয় যে তাহাদের পরস্পর মধ্যে দূরত্ব সর্ব্বত্রেই সমান তাহাদের সমান্তর রশ্মি কহে।

বিন্দুমুখী রশ্মি।—যে রশ্মি সমূহ ক্রমে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া শেষে একটি বিন্দুতে গিয়া মিলিত হয় তৎসমস্তকে বিন্দুমুখী রশ্মি কহে।

ক্রমান্তরমুখী রশ্মি।—যে সকল রশ্মি কোন আলোকময় পদার্থ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে পরস্পর হইতে অন্তর বা দূরবর্ত্তী হইতে থাকে তাহাদের ক্রমান্তরমুখী রশ্মি কহে।

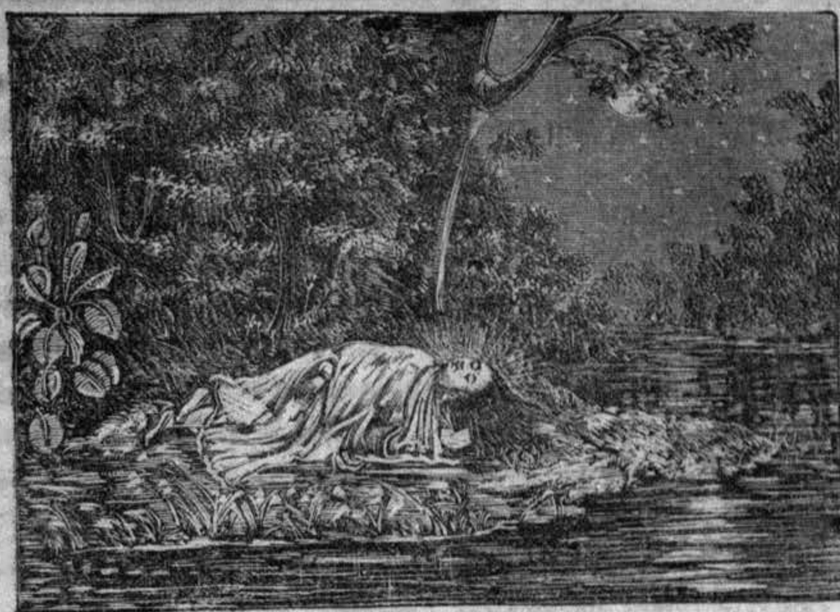
নিম্নবর্ত্তী ২য় চিত্রে উক্ত ত্রিবিধ রশ্মির প্রতিরূপ প্রদত্ত হইল।



২য় চিত্র।

মনে কর কোন আলোকময় পদার্থ হইতে 'ক' চিহ্নিত কতিপয় রশ্মি সমান্তর ভাবে বিকীর্ণ হইতেছে। তখন উহাদের মধ্যে 'ছ' চিহ্নিত একটি দুইদিক গভীর কাচ চিত্রবৎ ধারণ করিলে ঐ কাচের গুণে রশ্মিগুলি উহার মধ্যদিয়া অপরদিকে 'খ' চিহ্নিত রেখাগুলির ভাবে বক্র হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে, অর্থাৎ পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া বিকীর্ণ হইবে, তখন আবার যদ্যপি 'চ' চিহ্নিত দুইদিক ন্যুব্জাকৃতি একটি কাচোপরি উহাদের ধরা যায়, তবে উহারা উহার ভিতর দিয়া উহারই গুণে অপরদিকে 'গ' চিহ্নিত রেখা সমূহের ভাবে বক্র হইয়া পড়িয়া পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া শেষে একটি বিন্দুতে গিয়া মিলিত হইবে। এ স্থলে 'ক' গুলি সমান্তর 'খ' ক্রমান্তরমুখী, এবং 'গ' বিন্দুমুখী রশ্মির দৃষ্টান্ত। ঐ দ্বিবিধ কাচের ওরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।



রাধিকার মূর্চ্ছা।

১

সায়ম বেলি রকত বরণ রবি
ডুবল নীল নভ মাঝ ;
নীল যমুনা-জল মৃদুল মৃদুল বহে,
কুলু কুলু মধুর আওয়াজ।
ফুল্ল কমল দল মুদল আঁখি,
অলিকুল আকুল ভেল ;
ঝিল্লি ঝিঁঝায়ত তরু'পরি লুকি',
চন্দ্রমা দরশন দেল।
হীরক টুকুরা ভরল আকাশ,
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি উজল ভাতি।
সোহি চন্দ্রমা, হীরক টুকুরা
চমকি' চকায়ল যমুনা-ছাতি।

২

ফুল-কুল-সৌরভ লুটই লুটই,
শীতল পওন খেলত ছুটই
যমুনা-জল'পরি ধীরে ;
ঐছন মধুরিম সায়ম বেলি,
শ্যাম-বিধুরা রাধা আওই একলি,
পঁহুছল যমুনা-তীরে।
কনক-বিজলী আজু ঝামর দেহা,
কমল বদন মাঝ কালিমা-লেহা,
ঝর ঝর আঁখি-নীর ঝুরে ;
সঁওরি পূরব কথা উদাস পরাণী,
আঁখি-জল মুছহি সজল-নয়ানী,
থির দিঠি রহল দূরে।

৩

যমুনা-তীর'পরি কেলিকদম্ব,
যমুনা-জল'পরি ভাসহি বিম্ব ;
সো তরুবর-তল আয়ল রাই,
'হরি! হরি!' বোলি' পড়ল মূরছাই ;
কনক-লতা জনু তরুবর ছোড়ি'
উলট পলট হোই পড়ল মুচড়ি' ;
একজন সখী অব নাহি রাধা সঙ্গে,
কোজন ইহ ঘোর মূরছা ভাঙে ?
নিঠুর বিধি ভেল রাধাকো বাম,
ততোধিক নিঠুর সুকঠিন শ্যাম।

৪

যো দিন চলি' গেল শ্যাম মথুরা,
সো দিন তক গোরী ভেইল বিধুরা।
শাশ-ননদী-ডর ঘরপর ভারি,
তেঁই তাঁহা নাহি রহে ইহ বরনারী।
একলি আয়ল তটিনী-তটি,
হরি হরি বোলহি পড়ল লুটি'।
গম্ভীর মূরছা, ক্ষীণ নিশাস,
বাহির নিশ্চল, অন্ত উছাস।
লটপট তনুয়া ধুলি-ধূসরা,
উড়য়তি ধীরি ধীরি নেত আঁচরা।
ফুয়ল কবরী খোলি' পড়ই,
ফুরু ফুরু আপন মনহি উড়ই।
কোজন আওব অব রাই পাশ?
কোজন করব মূরছা বিনাশ?

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বিদ্যুৎ ও বজ্র।



ফ্রাঙ্কলিন্ ও তাঁহার তাড়িতাকর্ষক ঘুড়ী।

শিষ্য।—বিদ্যুৎ কাহাকে বলে?

গুরু।—কোন মেঘের সঞ্চিত তাড়িত মেঘান্তরে গমন অথবা পৃথিবীস্থ কোন পদার্থোপরি পতনকালীন যে প্রখর জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয় তাহাকে বিদ্যুৎ কহে।

শিষ্য।—তাড়িত কি, তাহা অগ্রে বুঝিব।

গুরু।—বারান্তরে তাড়িতের সবিশেষ বিবরণ প্রয়োজন মত পরীক্ষা সহকারে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিব। অদ্য সংক্ষেপে কিছু বলিয়া কেবল উহার আভাস মাত্র দিব। তেজ বা তাপের ন্যায় তাড়িতও শক্তি বিশেষ। পদার্থ মাত্রেই এই শক্তি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সচরাচর স্বভাবতঃ আমরা উহার বিকাশ দেখি না। কতিপয় উপায় বা বিশেষ কার্য্য প্রকরণ দ্বারা সকল পদার্থ হইতেই তাড়িত বল বাহির করা যায়; তখন উহার যে সকল কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতেই উহাকে একটি স্বতন্ত্র শক্তি বিশেষ বলিতে হয়। পরিজ্ঞাত অন্য কোন শক্তির সেরূপ কার্য্য দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বহুতর পরীক্ষা করিয়া তাড়িত-বলের কার্য্য সমূহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেইগুলিকে সহজে ও স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য তাড়িতকে একপ্রকার অতীব সূক্ষ্ম, গুরুত্বগুণ শূন্য,

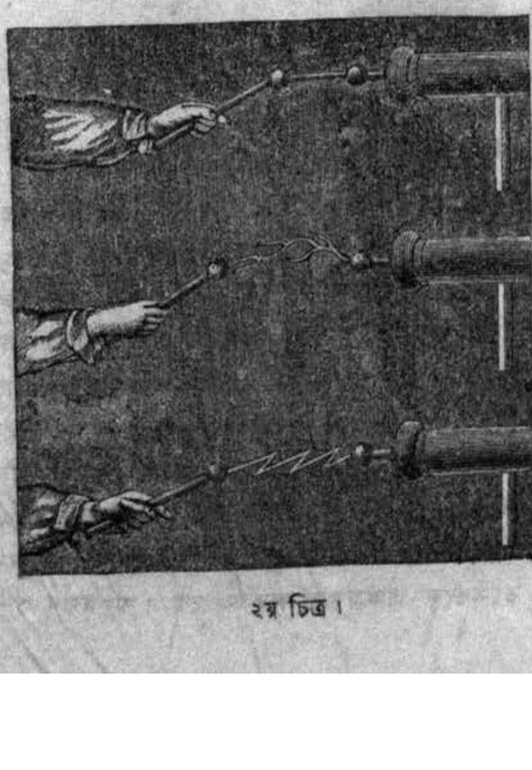
অতুলনীয় তরল পদার্থ স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। উহাকে তরল পদার্থই বল আর শক্তি বিশেষই বল, উহা সকল পদার্থের অর্থাৎ জড় মাত্রের মধ্যে পরমাণু বেষ্টন করিয়া আছে। পদার্থে পদার্থে ঘর্ষণ করিয়া, রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা, আরও কতিপয় উপায়ে সকল পদার্থ হইতেই তাড়িত-বল উদ্ভূত করা যায়, তখন উহা প্রখর আলো স্বরূপে প্রকাশ হয়, আরও উহার কতকগুলি কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বহু-কালের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফল স্বরূপ অধুনা এরূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা তাড়িত-বল ইচ্ছানুরূপ পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, আবার কৌশল বিশেষ অবলম্বন করিয়া সেই উৎপন্ন তাড়িত-বলকে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার কার্য্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। অদ্য কেবল ঘর্ষণোত্তেজিত তাড়িতের বিষয় কিছু বলিয়া বিদ্যুতের সহিত তাহার সাদৃশ্য, বস্তুতঃ উহারা যে একই পদার্থ, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

শিষ্য।—বিদ্যুৎ যে ঐ তাড়িত-বল, অর্থাৎ তাড়িত-বল ও বিদ্যুৎ যে একই পদার্থ তাহা কিরূপে স্থির হইল?

গুরু।—তাড়িত-যন্ত্রোৎপন্ন তাড়িত-বলের আকৃতি ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাদের একই পদার্থ বলিয়া বোধ হয়।

শিষ্য।—আকৃতির সাদৃশ্য কিরূপ?

গুরু।—একটি চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিব।



১ম

২য়

৩য়

২য় চিত্র।

যে তাড়িত-যন্ত্রটি চালাইলে চিত্রবৎ বিদ্যুতের ন্যায় আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা অতি সামান্য; তাহার তিনটি মাত্র প্রধান অঙ্গ,—একটি বড় কাচের স্তম্ভ অথবা চাক্তি, একটি চামড়া অথবা রেশমের গদি, ও একটি পিত্তলের চোঙ্গা। এই তিনটি অঙ্গ এরূপে সন্নিবেশিত থাকে যে একটি হাতল ধরিয়া পাক দিলে ঐ কাচ-স্তম্ভ বা চাক্তি ও গদি পরস্পর ঘর্ষিত হইতে থাকে, তাহাতে তন্নিকটস্থ ধাতব চোঙ্গাটিতে তাড়িত-বল সঞ্চিত হইতে থাকে। ঐ চোঙ্গাটিকে তাড়িত-যন্ত্রের মূল-পরিচালক কহে। উহাতে যখন অধিক পরিমাণে তাড়িত-বল জন্মে তখন তাহার নিকট কোন ধাতবদণ্ড ধরিলে তাড়িত-বল অগ্নিশিখাবৎ প্রকাশ হয়।

শিষ্য।—প্রকৃতিগত একতা কিরূপ?

গুরু।—উহাদের দুয়ের একই প্রকৃতি। তাড়িত-বলের ক্ষণ-স্থায়ীত্ব অর্থাৎ প্রকাশ হইয়াই বিলুপ্ত হয়, দাহিকা-শক্তি, আস্ফোটন বা শব্দজনকতা প্রভৃতি গুণ দুয়েতেই বর্ত্তমান। দুয়েরই দীপিকা শক্তি, বক্রগতি, দ্রুতবেগ, ও আস্ফোটন আছে; দুইটি শক্তিই ধাতুদ্রবকারী ও দাহ্য পদার্থ প্রজ্জ্বলনকারী; দুইটিই গন্ধকীয় ঘ্রাণ বিশিষ্ট; দুইটিই ধাতু দ্বারা পরিচালিত হয় অর্থাৎ ধাতু মধ্যদিয়া গমন করে। উভয়ের আলোকের বর্ণ একই; এবং উভয়ই তাহাদের গতির বাধা সম্পাদক পদার্থ মাত্রকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। এই ধর্ম্ম গুলি সমস্তই বিদ্যুৎকে না ধরিয়া রাখিয়া অনায়াসেই নির্ণীত হইতে পারে। এতাদৃশ প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দর্শন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে যে প্রকৃতি দেবীর হস্তে যেমন বিদ্যুৎ ও বজ্র, মানুষের হস্তে তদ্রূপ তাড়িত। তাড়িত যন্ত্র সহকারে আমরা যে সমস্ত বিস্ময়কর কার্য্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম তৎসমুদয় ভীষণ বজ্রের সামান্যতঃ অনুকরণ।

শিষ্য।—বড় বড় তাড়িত যন্ত্র ব্যতীত অন্য উপায়ে কি তাড়িতের ঐ গুণাবলির কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যায় না?

গুরু।—ঘর্ষণোত্তেজিত তাড়িত অতি সহজে ও সামান্য ব্যয়ে উৎপন্ন করা যায়, এবং উহার সঙ্গে উহার প্রায় সকল গুণগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। তাহাতে এককালে যথেষ্ট আমোদ ও জ্ঞান লাভ হইতে পারে।

শিষ্য।—সেই উপায় আমাকে বলিয়া দিলে আমি সুবিধামত স্বহস্তে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

গুরু।—একটি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ও একগাছি রুলের ন্যায় মোটা লাক্ষাদণ্ড বা গালার বাতি অথবা একটী কাচ চোঙ্গা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলেই চলিবে। যন্ত্রের মধ্যে ঐ। বড়বাজারে আরমাণি গিরজার কাছে কাগজ কলম প্রভৃতি ষ্টেসনারির দোকানে ঐরূপ গালার বাতি আট পয়সায় একটী করিয়া পাওয়া যায়; আর কাচচোঙ্গার অভাবে, একটা লম্বা সরুগোছের হইলেও (পাইভরের ইউডিকলনের) শিশিতে চলে। লাক্ষাদণ্ডটি লইয়া একখণ্ড ফ্যানেল দ্বারা উহাকে উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিলে তন্মধ্যে তাড়িত উত্তেজিত হয়; তাহার এই কার্য্যগুলি প্রত্যক্ষ করিলেই জানিতে পারিবে ঃ—

১। ঘর্ষিত লাক্ষাদণ্ডকে, কাগজকুচি, পালক প্রভৃতি ক্ষুদ্র, হাল্‌কা বস্তুর নিকট ধরিলে তাহাদের আকর্ষণ করিয়া নিজ গাত্রোপরি লইয়া যায়।

২। আবার ঐ লাক্ষাদণ্ডকে ঘর্ষণ কর। প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ব্বে উত্তমরূপে ঘষিতে হইবে। ঘষিয়া তোমার চক্ষের সম্মুখে, খুব নিকটে অথচ স্পর্শ না করিয়া ধর,—যেন তোমার মুখের উপর একখানি মাকড়শার জাল বিস্তৃত হইল বলিয়া বোধ হইবে।

৩। ঘর্ষিত লাক্ষাদণ্ডকে নাকের গোড়ায় লইয়া যাও,—ঈষৎ গন্ধকের গন্ধ পাইবে।

৪। মাতার চুলের উপর ধর,—চুলগুলি, শুষ্ক হইলে, সমস্ত লম্বভাবে (খাড়া হইয়া) দাঁড়াইবে।

৫। অন্ধকার ঘরে দণ্ডটি দ্রুতবেগে ঘর্ষণ করিলে, পট্ পট্ শব্দ শুনিবে, ও তার সঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখিবে। সেই স্ফুলিঙ্গ শরীরের কোন স্থানে লাগিলে সূচ ফোটার ন্যায় আঘাত বোধ হইবে।

শিষ্য।—ঐ আলো, শব্দ, গন্ধ ও আঘাত বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতেরা কি তাড়িতকে বিদ্যুৎ ও বজ্র সম বোধ করেন?

গুরু।—বোধ করেন কেন,—তাড়িত ও বিদ্যুৎ যে একই শক্তি তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। একটা সামান্য গালার বাতি ঘষিয়া তাড়িতের যে গুণগুলি প্রত্যক্ষ করিবে, ঐ গুলিই বড় বড় বহুমূল্য তাড়িত-যন্ত্রে অধিক পরিমাণে প্রকাশ হইতে দেখিবে। গালার বাতির ঘর্ষণে আলো-কণা মাত্র নির্গত হয়, আর তাড়িত-যন্ত্রে ঐ আলো যেরূপ প্রকাশ হয়, তাহা চিত্রে দেখিয়াছ। গালার বাতির ঘর্ষণে "পট্ পট্," তাড়িত যন্ত্রে "চড় চড়," আর প্রকৃতির বজ্রে "কড় কড়"—এই প্রভেদ—কমবেশি মাত্র। পদার্থটা একই। এমন কি মেঘ হইতে বিদ্যুৎকে অনেকে পৃথিবীতে টানিয়া নামাইয়া আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

শিষ্য।—সে কি কথা?

গুরু।—হাঁ—বাল্যকাল হইতে বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নাম শুনিয়া আসিতেছ, তাঁহার বিষয়ও কিছু পড়িয়া থাকিবে। সেই মহাত্মাই প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রথম মেঘ হইতে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে লইয়া আইসেন।

শিষ্য।—তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু।—ভালই—আমি তাঁর ঐ পরীক্ষাটির বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি, মনোযোগ করিয়া শুন।

মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিনের হপ্‌কিন্‌সন্ নামক একজন বন্ধু ছিলেন। যে যেমন লোক তার বন্ধুও তেমনি। হপকিন্‌সন্‌ও কিছু সামান্য লোক ছিলেন না। তিনিও একজন বিখ্যাত বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাহাঁর জীবনের অধিকাংশই তাড়িত বিষয়ক নানাবিধ পরীক্ষা করিয়াই অতিবাহিত করেন। কোন সময়ে তিনি একটি ফাঁপা ধাতুময় গোলক প্রস্তুত করিয়া তাহাকে তাড়িত পূর্ণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন।

শিষ্য।—বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু।—একটি মাঝারি বেলের আকার একটি টিনের ফাঁপা গোলক প্রস্তুত করেন। তা'রপর তা'কে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখিয়া দেন; অর্থাৎ কাচ, গালা, রবর, গাটাপার্চা প্রভৃতি যে পদার্থগুলি তাড়িতের অপরিচালক এমন কোন একটি পদার্থের উপর ঐ গোলককে রাখেন। তা'রপর একটি লাক্ষাদণ্ড বা গালার বাতি লইয়া তা'কে ফ্লানেল দিয়া উত্তম রূপে ঘর্ষণ করিয়া ঐ গোলক গাত্রে উত্তম করিয়া স্পর্শ করিয়া বা বুলাইয়া লন। আবার ঐ লাক্ষাদণ্ডকে ঘষিয়া পুনরায় ঐ গোলক গাত্রে পূর্ব্ববৎ বুলাইয়া লন, এইরূপে কতিপয় বার করিতে করিতে ধাতব গোলক তাড়িত পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাকেই কোন পদার্থকে তাড়িত পূর্ণ বা তাড়িতোত্তেজিত বা তাড়িত যুক্ত করা কহে।

শিষ্য।—ঐরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ত হয়?

গুরু।—হাঁ—ঐ তাড়িতোত্তেজিত গোলকের নিকট যদ্যপি

অঙ্গুলি অথবা কোন ধাতুময় পদার্থ ধর, তাহা হইলে উহার সঞ্চিত তাড়িত স্ফুলিঙ্গ রূপে প্রকাশ হইয়া ধৃত পদার্থে প্রবেশ করিবে। হপ্‌কিন্‌সন্‌ও সেই পরীক্ষা করিতেছিলেন; তাহারপর তিনি প্রকারান্তরে ঐ পরীক্ষাটি সাধন করিতে গেলেন, অর্থাৎ গোলক গাত্রের সমগ্র তাড়িতকে এককালে একস্থানে আনিয়া জমা করিয়া বড় রকমের স্ফুলিঙ্গ রূপে প্রকাশিত করিবার জন্য গোলক গাত্রে একটি স্থচ বিদ্ধ করিয়া রাখিলেন। স্থচটির সছিদ্র প্রান্তভাগ গোলক গাত্রে কোনরূপে বিদ্ধ করিয়া দিলেন আর সূক্ষ্মাগ্র প্রান্তটি তাঁহার সম্মুখ করিয়া রহিল। তখন ঐ গোলককে ঐরূপাবস্থায় যতই তাড়িত যুক্ত করেন এবং স্থচের অগ্রভাগের নিকট ও ক্রমে গোলক গাত্রের সর্ব্বস্থানেরই নিকট অঙ্গুলি ও ধাতুদণ্ড ধারণ করেন, তাহাতে তাড়িতের কোনই লক্ষণ দেখিলেন না। পূর্ব্বে যে স্ফুলিঙ্গগুলি প্রকাশ হইতেছিল, তাহাও এখন আর হয় না। তাহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষাটি সাধন করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তাহার কারণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বন্ধু ফ্রাঙ্কলিনের নিকট ঐ পরীক্ষার ফল ব্যক্ত করেন।

ফ্রাঙ্কলিন শুনিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সেই পরীক্ষাটিই তিনি স্বয়ং বারম্বার সাধন করিয়া দেখেন। কিন্তু তিনিও সেই একইরূপ ফল প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাড়িতোত্তেজিত ধাতব গোলক-গাত্র বিদ্ধ স্থচ হইতে মূলে তাড়িত উদ্ভূত হইতে দেখিলেন না। অসাধারণ লোকের সকলই অসাধারণ। অন্য লোক হইলে বিরক্ত হইয়া ঐ পরীক্ষাটি ঐ খানেই শেষ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন, কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন কি করিলেন? তিনি ঐরূপে তাড়িত প্রকাশিত করিতে না পারিয়া, অথচ তাহার কোন কারণ স্থির করিতেও না পারিয়া পরীক্ষাটি প্রকারান্তরে সাধন করিবার কল্পনা করিলেন; ভাবিলেন, বোধ হয় স্থচটি গোলক গাত্র সঞ্চিত তাড়িতকে অলক্ষিত ভাবে বাহির করিয়া দেয়; সূক্ষ্মাগ্রের সহিত তাড়িতের কি ঐরূপ কোন সম্বন্ধ আছে? স্থচকে গোলকগাত্র হইতে তুলিয়া লইয়া তাহার নিকটে ধরিয়া রাখিয়া গোলককে তাড়িতোত্তেজিত করিয়া দেখিলে হয়। তাহাই করিলেন,—দেখিলেন,—স্থচ সন্নিধানে গোলককে তাড়িতপূর্ণ করা যায় না। তবেই ত স্থচের তাড়িত আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে। এই ভাবিয়া তিনি অনেক রকমে পরীক্ষাটি করেন। শেষে একটি সূক্ষ্মাগ্র ধাতব দণ্ড লইয়া ঐ গোলক সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। অবশেষে সেই সকল পরীক্ষার ফল স্বরূপ স্থির করিলেন যে কোন পদার্থকে তাড়িতোত্তেজিত করিয়া রাখিয়া অর্থাৎ বৃহদাকার তাড়িত-যন্ত্র দ্বারাই হউক অথবা সামান্য গালা বা কাচ দণ্ড দ্বারাই হউক কোন পদার্থকে তাড়িত-পূর্ণ করিয়া তাহার নিকটে ভূসংস্পৃষ্ট কোন সূক্ষ্মাগ্র ধাতব দণ্ড রাখিলে তদ্দ্বারা ঐ পদার্থস্থ তাড়িত অতি শীঘ্রই ও অলক্ষিতভাবে অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গরূপে প্রকাশ না হইয়া পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইয়া যাইবে। এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই। বড়লোকের বুদ্ধির স্থিতিস্থাপকতা কতদূর দেখ! ঐ বিষয়ের চিন্তাটি প্রসারিত করিয়া কোথায় সংলগ্ন করিলেন দেখ! তাড়িত ও সূক্ষ্মাগ্র পরিচালকের পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া ও তদ্বিষয়ের অনেক আন্দোলনের পর ভাবিলেন, বিদ্যুৎ যখন অনেক রকমে তাড়িতের সমতুল্য, তখন সূক্ষ্ম অগ্র বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ ধাতবদণ্ড ভূপৃষ্ঠ হইতে মেঘের নিকট পর্য্যন্ত তুলিয়া রাখিতে পারিলে তদ্দ্বারা মেঘের বিদ্যুৎ বা তাড়িত ত নিঃশব্দে ও নিরাপদে পৃথিবীতে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে? বুদ্ধিশালীর চিন্তার লম্ফের দৌড়টা কত দেখ! তখন সুদীর্ঘ ধাতব দণ্ড কোথায় পাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। ওরূপ একটি প্রস্তুত করাইতে গেলে অনেক খরচ। তবে অত্যুচ্চ প্রাসাদ বা স্তম্ভোপরি একটি দণ্ড স্থাপন করিতে পারিলে অনেকটা দৈর্ঘ্য কমান যায়। সেই সময়ে ফিলাডেলফিয়াতে একটি অতি উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইতেছিল। তাহার শেষ পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন স্থির করিলেন; ইত্যবসরে তাঁহার পরীক্ষার সবিশেষ বিবরণ সম্বলিত ফল সমূহ প্রকাশ করিলেন, আর তাহার সঙ্গে এরূপ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিলেন যে যাঁহার সুবিধা হইবে তিনি যেন উক্ত পরীক্ষার অনুষ্ঠান করিয়া দেখেন। তদ্বিষয় প্রচারিত হইলে পর তাহার উপর নির্ভর করিয়া মুসে ডালিবার্ড ও মুসে ডেলর নামক দুইজন ফরাসী মেঘ হইতে তাড়িত আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে দুইটি স্বতন্ত্র স্থানে দুইটি যন্ত্র স্থাপন করেন। যন্ত্র আর কিছুই নহে কেবল দুইটি সুদীর্ঘ ধাতুময় দণ্ড—অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। ডালিবর্ড ফ্রান্স হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে মালিনাভিল্‌ নামে একটি পল্লিগ্রাম মধ্যে ৭০ ফিট উচ্চ সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট একটি লৌহ-দণ্ড স্থাপন করেন। ঐ দণ্ডই সর্ব্ব প্রথম মেঘ হইতে তাড়িত আকর্ষণ করে।

এরূপ বিশেষ বিবরণ তোমার বিরক্তিজনক বোধ

হইয়া থাকে বল, এই খানেই সংক্ষিপ্তসার করিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করি।

শিষ্য।—বিস্তৃত বিবরণেও এ সকল বিষয় কষ্টে বুঝা যায়, কিন্তু বুঝিলে তাহাতে যথেষ্ট আমোদ আছে।

গুরু।—ঠিক বলিয়াছ। তবে তাহার পর শুন;—সেই সময়ে ডালিবর্ড মার্লি হইতে কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করেন, এবং ঐ দণ্ডের তত্ত্বাবধানের ভার কইফর নামক তথাকার একজন সূত্রধরের উপর অর্পণ করিয়া যান। ১০ই মে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে দিবা ২।৩টার মধ্যে এক বজ্রধ্বনি শুনিয়া কইফর দ্রুতবেগে দণ্ডের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। এবং ডালিবর্ডের পূর্ব্ব উপদেশানুসারে একটি লিডেন বোতল দণ্ডের সন্নিকটে ধরেন। ধরিবামাত্র দেখিলেন একটি উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তীব্রশব্দের সহিত দণ্ড হইতে বাহির হইয়া বোতল মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

শিষ্য।—লিডেন বোতল আবার কি?

গুরু।—একটি চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি।



৩য় চিত্র।

'ক' একটি লিডেন বোতলের প্রতিরূপ। প্রশস্ত মুখ বিশিষ্ট একটি কাচের বোতল, তাহার ভিতর বাহির দুই দিকেরই গাত্র তলদেশ হইতে গলার একটু নিচু পর্য্যন্ত আঠা দ্বারা রাংতায় মোড়া। কর্ক বা শোলার ছিপি দ্বারা মুখ বন্দ করা। ঐ ছিপির মধ্যদিয়া 'গ' চিহ্নিত একটি ধাতুময় তার বা শিক পরান। ঐ তারের একপ্রান্তভাগ বড়শীর মত বাঁকান, তাহাতে একগাছি শিকল ঝোলান; আর ঐ দিকটিই বোতলের ভিতরদিকে তলা স্পর্শ করিয়া থাকে। এবং তাহার অপর প্রান্তে একটি ধাতব বর্ত্তুল পরান। ঐটি কাঠের প্রস্তুত করিয়া রাংতা দিয়া মুড়িয়া লইলেও হয়। ঐ দিক্‌টি বোতলের বাহিরে থাকে। ইহাকেই লিডেন বোতল কহে। তাড়িত পুরিয়া রাখিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন। চিত্রে সেই প্রকরণ দেখাইতেছে। তাড়িত যন্ত্রের মূল পরিচালকের নিকট বোতলের বর্ত্তুলটি স্থাপন করিতে হয় ও বোতলের বহির্গাত্রের রাংতার সহিত কোনরূপ পরিচালক দ্বারা ভূপৃষ্ঠকে সংলগ্ন করিয়া রাখিতে হয়। হাতে করিয়া চিত্রবৎ ধরিলেও হয়। যন্ত্রোৎপন্ন তাড়িত বিদ্যুৎ দ্রুত বাহির হইয়া বোতল মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। ক্রমে বোতলের যতখানি রাংতায় মোড়া ততটুকুর উপর তাড়িত জমিতে থাকে। শেষে বোতলটি তাড়িত পূর্ণ হইলে, মূল পরিচালকের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া রাখিতে হয়। তখন ঐ তাড়িত বাহির করিবার জন্য একহাতে বোতলের বাহির গাত্রের রাংতা মোড়া ভাগ ধরিয়া অপর হাতের অঙ্গুলি বোতল সন্নিবিষ্ট ধাতব শলাকাসংলগ্ন বর্ত্তুলের নিকট ধরিলে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ রূপে প্রকাশ হইবে। অঙ্গুলি না ধরিয়া ঐ হাতে বর্ত্তুল স্পর্শ করিলে সংক্ষোভ (Shock) পাওয়া যাইবে। ঐ বোতল সহকারে আরও অনেক পরীক্ষা আছে, এবং অন্য উপায়েও উহার তাড়িত বাহির করা যায়। সে সকল বিষয় ও উহার মূল তত্ত্ব বারান্তরে বলিব।

কইফর দ্বিতীয়বার উক্তরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন। ঐ দণ্ড হইতে যে স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় তাহার বিবরণে লিখিত আছে যে তৎসমস্ত নীলবর্ণ, দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ, ও গন্ধকীয় ঘ্রাণযুক্ত। ৪ মিনিটের মধ্যে ৬ বার বড় বড় স্ফুলিঙ্গ লওয়া গিয়াছিল। পরীক্ষা করিতে করিতে একবার হাতে তীব্র আঘাত লাগে আর সেই স্থানে প্রবল মুষ্ট্যাঘাতের কালিমা চিহ্ন রহিয়া যায়।

শিষ্য।—আর ডেলর যে দণ্ড স্থাপন করেন সেটির কি হইল?

গুরু।—পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার ৮ দিবস পরে ডেলর প্যারিস মধ্যে ৩০ ফিট উচ্চ এক দণ্ড তুলেন, তাহা হইতে তিনিও ঐ রূপই স্ফুলিঙ্গ বাহির করেন। ঐ পরীক্ষা ফ্রান্সের সম্রাটকে দেখান হয়।

শিষ্য।—আচ্ছা যদ্যপি উহাদিগের দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম মেঘ হইতে তাড়িতাকর্ষণ কার্য্য সাধিত হইয়াছিল তবে ফ্রাঙ্কলিনের নামে ঐ আবিষ্ক্রিয়াটি প্রচলিত কেন?

গুরু।—কারণ ঐ পরীক্ষার মতলব সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই মনে উদয় হয়। এবং তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে অপরে পরীক্ষাটি সাধন করেন। পরে ফ্রাঙ্কলিন নিজেও মেঘ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শিষ্য।—তিনি কিরূপে করেন তদ্বিষয় বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু।—বলিতেছি শুন—ডালিবর্ড ও ডেলর যখন ফ্রান্সে পূর্ব্বোক্তরূপে পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন ফ্রাঙ্কলিন ফিলাডেলফিয়াতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবিত পরীক্ষা যে ইতিমধ্যে ফ্রান্সে কার্য্যে পরিণত হয়, সে সংবাদ তিনি কিছুই পান নাই। বিদ্যুৎ ও তাড়িত যে একই পদার্থ তদ্বিষয় তিনি ক্রমিক মনে মনে তোলা পাড়া করিয়া পরীক্ষা সিদ্ধ করিতে এরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে ফিলাডেলফিয়ার পূর্ব্বোক্ত মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, উপায়ান্তর দ্বারা তদ্বিষয় পরীক্ষা করিবেন স্থির করিলেন। এ বিষয় তাঁহার মনকে এরূপ অধিকার করিয়াছিল, আর সে বিষয়ের পরীক্ষা সাধন জন্য এমন ব্যগ্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন যে শেষে উপায়ও বাহির হইয়া পড়িল। কথায় আছে চাপ পড়িলেই উপায় বাহির হয়। একদিন তাঁহার পুত্রকে ঘুড়ী উড়াইতে দেখিয়া হঠাৎ মনে উদয় হইল যে বালকের সামান্য ঘুড়ী দ্বারা ঐ কার্য্য সাধন করা যায়। ঘুড়ী উড়াইয়া তদ্দারা মেঘ হইতে বিদ্যুৎ বা তাড়িতকে পরিচালিত করিয়া ভূপৃষ্ঠে আনা যাইতে পারে। মার্লিতে পূর্ব্বোল্লিখিত পরীক্ষার একমাস পরে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে একদিন তিনি উক্ত পরীক্ষা করণে প্রবৃত্ত হয়েন। পরীক্ষা নিঃস্ফল হইলে পর পাছে অপদস্থ ও হাস্যাস্পদ হন সেই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে একখানি ঘুড়ীর সহিত সঙ্গে লইয়া, যেন তাহারই সাহায্যের জন্য গ্রামের প্রান্তভাগে একটি নির্জ্জন মাঠে গমন করিলেন। ঐ ঘুড়ীখানি সাধারণ ঘুড়ী হইতে এই বিভিন্ন ছিল যে কাগজের হইলে পাছে বৃষ্টির দ্বারা কোন হানি হয় সেই জন্য একখানি রেশমী রুমাল দ্বারা উহা নির্ম্মিত হয়। এবং তাহার শিরোদেশে একখণ্ড সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র ধাতব তার সংলগ্ন থাকে। সামান্য সূতাদ্বারাই উড়ান হয়। উড়াইয়া প্রথমে সূতার অপর প্রান্তে একটি লোহার চাবি বাঁধিয়া দিয়া, চাবিতে আবার খানিকটা রেশমী সূতা বাঁধিয়া সেই সূতা তিনি একটা গাছের গুঁড়ীতে বাঁধিয়া দেন। এই রূপে ঘুড়ীখানি উড়াইয়া তিনি অনেকক্ষণ অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহার ফল প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক একবার উপরে মেঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একখানি গাঢ় মেঘ ঘুড়ীর উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। কিন্তু তাহাতে তাড়িতের কোনই লক্ষণ না দেখিয়া তিনি হতাশ হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সামান্য এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। তখন হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন যে সূতার কতকগুলি সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ রোঁয়া বা আঁশ লম্বভাবে বা খাড়া হইয়া পরস্পর পৃথক হইয়া দাঁড়াইল। একগাছি সূতাকে তাড়িত যন্ত্রের মূল পরিচালকে বাঁধিয়া দিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া যন্ত্র চালাইলে অথবা যন্ত্রাভাবে, একটি গালা বা কাচের দণ্ডে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া যেখানে বাঁধা থাকিবে সেইখান পর্য্যন্ত সূতা ঘেঁষে দণ্ডঘর্ষণ করিলে লম্বিত সূতার আঁশগুলি ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। তাহার কারণ পরে বলিব। এখন সে বিষয় বুঝাইতে গেলে অনেক কথায় মূল বিষয় চাপা পড়িবে। তাহার পর, ফ্রাঙ্কলিন ঐ চাবিটির নিকট নখ ধারণ করিয়া দেখিলেন চাবি হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া অঙ্গুলিতে প্রবেশ করিল, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য সংক্ষোভ বা আঘাত "(Shock) পাইলেন। তখন তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

শিষ্য।—প্রথমে সূতায় তাড়িতের কোনই লক্ষণ দেখিলেন না, পরে সূতা জলে ভিজিলে কেন তাড়িত দেখা দিল? তাহার কারণ কি?

গুরু।—শুষ্ক সূতা প্রায় রেশমের ন্যায় তাড়িতের অপরিচালক। এ বিষয়ও পরে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিব।

শিষ্য।—তা'র পর ফ্রাঙ্কলিন কি করিলেন?

গুরু।—ঐ পরীক্ষাটিই নানা রকমে সাধন করিলেন। প্রথম চিত্রখানিতে দেখ সূতাটি গাছে বাঁধা ও তিনি চাবিটি সূতার নিকট ধরিয়া স্ফুলিঙ্গ বাহির করিতেছেন। তাঁহার ছোট পুত্রটি কাছে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে সূতা উত্তমরূপে ভিজিয়া উৎকৃষ্ট পরিচালক হইয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি বহুসংখ্যক স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করিলেন। আরও একটি বড় লিডেন বোতলকে সম্পূর্ণ রূপে তাড়িত পূর্ণ করিয়া লইলেন। তখন আনন্দময়চিত্তে গদগদ স্বরে প্রিয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, বাপু! এই

মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হইলেও জগতে আমার যে চিরযশঃ থাকিয়া যাইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই মহতী আবিষ্ক্রিয়ার পর ফ্রাঙ্কলিন নিজ প্রাসাদ উপরে এক সুদীর্ঘ লৌহ-দণ্ড স্থাপন করেন। তাহার মূলদেশ তাঁহার পাঠগৃহ মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে। তাড়িত যন্ত্রযোগে যতপ্রকার পরীক্ষা সাধিত হইতে পারে তৎসমস্তই তিনি ঐ দণ্ড দ্বারা বিদ্যুৎ টানিয়া আনিয়া সংসাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাড়িত ও বিদ্যুৎ যে একই পদার্থ তাহা তিনি নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ করেন। যখন দণ্ডটি তাড়িতোত্তেজিত হইত অর্থাৎ তন্মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইয়া নামিত তাহা জানিতে পারিবার জন্য তিনি কএকটি সামান্য ঘণ্টা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডসংলগ্ন করিয়া রাখেন। তাড়িতোত্তেজিত হইলে ঐ ঘণ্টাগুলি তাড়িত আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপণ ধর্ম্ম বলে আপনা আপনিই ধ্বনিত হইত। তাহা শুনিয়া তিনি ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিতেন। কখন কখন সেই শব্দ এত প্রবল হইত যে সমস্ত বাটীমধ্যে শুনা যাইত।

শিষ্য।—তাড়িতের আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপণ ধর্ম্ম কিরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু।—তদ্বিষয় পরে বুঝাইয়া দিব।

ফ্রাঙ্কলিন তাহার পর বজ্রপাত হইতে বাটী সংরক্ষণ জন্য ধাতব দণ্ডের ব্যবহার যাহাতে সাধারণতঃ প্রচলিত হয় তন্নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হয়েন। সকলকেই সেই রূপ পরামর্শ দেন। উচ্চ প্রাসাদ, মন্দিরাদি ও জাহাজের মাস্তুলে ঐ রূপ দণ্ড ব্যবহার করিতে বলেন। তিনি এই রূপ বুঝিয়াছিলেন যে সূক্ষ্মাগ্র ধাতব দণ্ডের যখন তাড়িত আকর্ষণ করিবার এরূপ ক্ষমতা সপ্রমাণ হইল তখন ঐ রূপ দণ্ড যদ্যপি এরূপ ভাবে বাটী সংলগ্ন করিয়া স্থাপন করা যায় যে দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্রভাগ বাটীর উচ্চতা কিছু পরিমাণে অতিক্রম করিয়া বা বাটীর উচ্চতা ছাড়াইয়া থাকে, এবং তাহার অপর শেষাংশ ভূমিতে পুতিয়া রাখা যায় তবে বাটীর সমীপাগত বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ হইতে বিদ্যুৎরাশি ঐ দণ্ড দ্বারা নিঃশব্দে ও নিরাপদে পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইয়া যাইবে। তাহাতে হঠাৎ বিদ্যুৎপাত হইতে বাটীর কোন আশঙ্কা থাকিবে না। আর দণ্ডের উপর বজ্রপাত হইলেও তাড়িত নিরাপদে পৃথিবীতে পরিচালিত হইয়া যাইবে।

শিষ্য।—এই বিদ্যুদ্দণ্ডের পরীক্ষা ত সহজ—অনায়াসে করিয়া দেখিলে হয়?—কেবল একটি বৃহৎ দণ্ডের ব্যয় মাত্র?

গুরু।—হাঁ, কিন্তু ও পরীক্ষাটি করিতে আমি পরামর্শ দিব না। কারণ তাহাতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। তাহার বিষয়ও একটু বলিতেছি।

ফ্রাঙ্কলিনের পর অনেক তাড়িত বৈজ্ঞানিকগণ ঐ পরীক্ষা করিতে গিয়া অনবধানতা বা কোন রূপ ব্যতিক্রম বশতঃ প্রবল আঘাত পাইয়াছিলেন, কাহারও বা জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে রোমশ নামক একব্যক্তি ৭ ফিট উর্দ্ধে ও ৩ ফিট প্রস্থে একখানি বৃহৎ ঘুড়ী প্রস্তুত করিয়া উড়াইয়া তদ্দ্বারা মেঘ হইতে যত অধিক পরিমাণে নিরবচ্ছিন্ন তাড়িত স্রোত প্রকাশিত করেন সেই রূপ অন্য কেহই কখনও পারেন নাই। উক্ত ঘুড়ীখানি তিনি শোণ দিয়া মোড়া একগাছি সুদীর্ঘ ধাতব তার দ্বারা উড়ান। ঐ তারের একপ্রান্ত ঘুড়ীতে বাঁধা থাকে ও অপর প্রান্তদেশ একটি টীনের নলের এক শেষভাগে সংলগ্ন করিয়া দেন। নলটির অপর দিকে একগাছি রেশমের সূতা বাঁধিয়া দিয়া সূতার অপর শেষভাগ একস্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া দেন। ঘুড়ীখানি ৬০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। টিনের চোঙ্গা হইতে ১০ ফিট দীর্ঘ ও এক ইঞ্চ প্রস্থ বহুসংখ্যক তাড়িতাগ্নি-স্রোত নির্গত হয়। তাহার মধ্যে একটি স্ফুলিঙ্গ তীব্র শব্দের সহিত বাহির হইয়া ভূমধ্যে একটি গর্ত্ত করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। আর একটি বড় রকমের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া তাঁহাকে এমন আঘাত করে যে তিনি ভীত হইয়া ঐখানেই এরূপ পরীক্ষা জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপ পরীক্ষার একটি শোচনীয় ঘটনার বিষয় বলি শুন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ অগষ্ট তারিখে সেণ্টপিটরস্‌বর্গ নিবাসী অধ্যাপক রিচমান এই রূপ বিদ্যুদ্দণ্ডের পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ বিদ্যুতের আঘাতে পরলোক গমন করেন। ঐ দিবসে সলকউ নামক একজনকে তাঁহার সহকারী স্বরূপ লইয়া তিনি দণ্ডের উপর বিদ্যুতের কল পরীক্ষা করিতেছিলেন। ফ্রাঙ্কলিনের দণ্ডের ন্যায় তাঁহারটির মূলদেশও তাঁহার গৃহমধ্যে টেবিলের উপর সন্নিবিষ্ট ছিল। অধ্যাপক ঐ দণ্ড হইতে প্রায় এক ফুট অন্তরে মস্তক নত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একটি মুষ্টি পরিমিত অগ্নি-গোলা ঐ দণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার মাতার ভিতরে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

THE ELECTRIC TELEGRAPH.

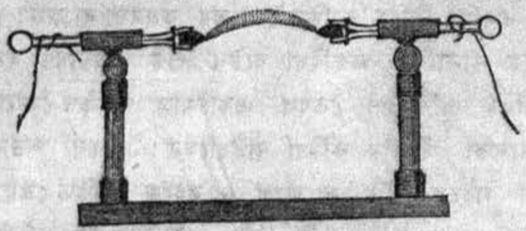
(২০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

পাত্রমধ্যে অম্লাক্ত জল নিমজ্জিত ধাতব ফলক দুইখানিকে যখন তার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিবামাত্রই পাত্রমধ্যে রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, ঐ সংযোজক তারের মধ্য দিয়া কোনরূপ পদার্থই হউক অথবা শক্তিই হউক সঞ্চালিত হইয়া থাকে। তাহাও যদ্যপি না হয় তবে অন্ততঃ এ কথা বলিতে হইবে যে ঐ তারের প্রকৃতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, অর্থাৎ উহার জড় পরমাণুগুলির একপ্রকার গুণান্তর হইয়া দাঁড়ায়। তাহা যদ্যপি না হইবে তবে ঐ তারমধ্যে ফাঁক থাকিলে, অর্থাৎ উহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, অথবা ধাতু প্রভৃতি কতিপয় পদার্থ ছাড়া, কাঠ, রেশম, গালা প্রভৃতি পদার্থ দিয়া সংযুক্ত করিলে পাত্রমধ্যে তৎক্ষণাৎ রাসায়নিক কার্য্য তিরোহিত হইবে কেন? এই বিষয় বিবেচনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে পাত্রমধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি পরমাশ্চর্য্য বল বা শক্তির উদয় হইয়া থাকে। রাসায়নিক কার্য্য যতক্ষণ চলিবে ততক্ষণ তাহার সহিত ঐ শক্তিটিও বিদ্যমান থাকিবে। দস্তা-ফলকের গাত্রের উপর রাসায়নিক কার্য্যের সহিত ঐ শক্তি উৎপন্ন হয়। ফলকদ্বয়ের মধ্যে সংযোজক তার যতই দীর্ঘ হউক না, রাসায়নিক ক্রিয়া জনিত ঐ বল তন্মধ্য দিয়া ক্রমিক সঞ্চালিত হইতে থাকিবে। ঐ শক্তিটি চক্ষে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, ফলতঃ আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। তাহা না হইলেও পাত্রমধ্যে এরূপ শক্তির বিদ্যমানতা অথবা উহা যে ফলক সংলগ্ন তার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হয় তাহা অন্যবিধ নানা উপায়ে স্থির করা যায়। ঐ শক্তির এরূপ অনেক কার্য্য আছে যে, সেগুলি প্রত্যক্ষ করিলে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ মাত্র থাকে না। এ স্থলে কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা তাহাই দেখাইব।

১ম পরীক্ষা।—৭ম চিত্রানুরূপ ব্যাটারী-পাত্রে আর সমস্ত ঠিক্ রাখিয়া কেবল যদি তাম্র ও দস্তা ফলক দুইখানিকে একগাছি চুলের ন্যায় সরু ধাতব তার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করা যায়, অথবা ঐরূপ সরু দুইগাছি তার দুইখানি ফলকের উর্দ্ধপ্রান্তদ্বয়ে সংলগ্ন করিয়া দিয়া তাহার পর তার দুইটিকে পরস্পর সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে ঐ সংযোজক তার তৎক্ষণাৎ লোহিতোত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। তাহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে কোন গুপ্ত বল বা শক্তি ঐ তার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। তাহা না বলিয়া যদ্যপি বল যে ঐ তারেরই কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলেও সে একই কথা। যে শক্তি দ্বারা ব্যাটারীর সংযোজক তারের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাকেই তাড়িত বল কহে। কেবল বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধার জন্যই তার মধ্যে ঐ বল প্রবাহিত হয় বলিয়া বিবেচনা করা যায়। তদ্বিষয় আরও পরে বলিব। এক্ষণে আরও কতিপয় পরীক্ষার উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে ব্যাটারীর উৎপন্ন তাড়িত বল সংযোজক তার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। তাহারও অগ্রে পূর্ব্ব পরীক্ষাটিতে তার লোহিতোত্তপ্ত হইবার কারণ কি বুঝিতে হইবে। পাত্রমধ্যে রাসায়নিক কার্য্য হইতে যে তাড়িত বলের উৎপত্তি হয় তাহার পরিমাণ এত অধিক যে সূক্ষ্ম তার মধ্য দিয়া অলক্ষিত ভাবে যায় না, মোটা তার হইলে তাহাই হইত। তেজঃ বা দাহিকা শক্তি তাড়িতের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। তাড়িতের পরিমাণ অনুসারে যদ্যপি উহার পরিচালক তার স্থূলাকার হয়, তবেই উহা অলক্ষিত ভাবে তন্মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইবে, নতুবা তাড়িত-বল অধিক ও সরু তার হইলে, সেই তাড়িত বলের প্রভাবে ঐ তার উত্তপ্ত হইয়া লালবর্ণ হইয়া উঠিবে। এমন কি ঐ বল আরও অধিক হইলে তারকে গলাইয়া পর্য্যন্ত ফেলিবে।

২য় পরীক্ষা।—একটি মাত্র ব্যাটারীতে যে পরিমাণ তাড়িত বল উৎপন্ন হয় তাহা ঐ পাত্রস্থ অম্লাক্ত জল ও ধাতব ফলক দুইখানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যতখানি ও যে তেজের অম্লাক্ত জল, ও যেরূপ লম্বা চওড়া দুইখানি ফলক হইবে তাহাদের একত্র সমাবেশে সেই পরিমাণেই তাড়িত বল উদ্ভূত হইবে। সুতরাং যদ্যপি বহুসংখ্যক ব্যাটারী একত্রে সংযুক্ত করা যায় (তাহার প্রকরণ ও বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে) তবে তাহার তাড়িত-বলের সমষ্টি এত অধিক হইবে যে বিশেষ বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিয়া সেই তাড়িত বলের নিম্ন লিখিত কার্য্যগুলি প্রত্যক্ষ করা যায়;—

মিশ্র ব্যাটারীর (বহুসংখ্যক ব্যাটারী একত্রে সংযুক্ত হইলে তাহাকে মিশ্র ব্যাটারী কহে) সংযোজক তার প্রান্তদ্বয় ৮ম চিত্রবৎ যন্ত্রে সংলগ্ন করিয়া দিলে, তাড়িত-বল, চিত্রবৎ



৮ম চিত্র।

অগ্নিশিখার আকারে প্রকাশ হইবে। ঐ অগ্নিকে পদার্থই বল আর শক্তিই বল, উহাকে তাড়িতের রূপ বলিলেও বলা যায়। উহাই তাড়িতালোকের মূল।

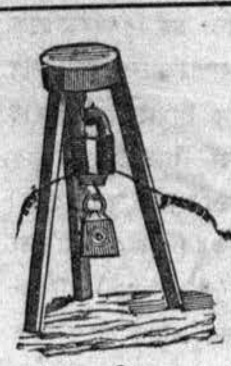
৩য় পরীক্ষা।—পূর্ব্বোক্তরূপ মিশ্র ব্যাটারীর দুই প্রান্ত সংলগ্ন দুইগাছি তার দুই হাতে ধরিলে প্রবল সংক্ষোভ বা আঘাত (Shock) প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেন হাতের শিরাগুলি ছিঁড়িয়া যাইতে থাকে। ছাড়িয়া দাও তৎক্ষণাৎ সে তীব্র আঘাতের কিছুমাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না।

৪র্থ পরীক্ষা।—ব্যাটারীর তার প্রান্তদ্বয়, ইথর, সুরাসার (Alcohol), দীপক (Phosphorus), বারুদ প্রভৃতি পদার্থ মধ্যদিয়া সঞ্চালিত করিয়া দিলে ঐ গুলি তৎক্ষণাৎ জলিয়া উঠিবে।

৫ম পরীক্ষা।—বলশালী ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয় জল মধ্যে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দিলে ঐ জল ফুটিতে থাকিবে।

৬ষ্ঠ পরীক্ষা।—একখণ্ড ফাঁপা পাঁকাটির গাত্রে খানিকটা তামার তার স্ক্রু প্যাচের মত জড়াইয়া উহার দুই শেষ ভাগে ব্যাটারীর দুই ফলক সংযুক্ত তারদ্বয়ে সংলগ্ন করিয়া দিলে, এবং ঐ পাঁকাটির ভিতর একটি সামান্য সূচ কিছুক্ষণ রাখিয়া দিয়া বাহির করিয়া লইলে দেখিবে সূচটি চুম্বক হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—উহা অপর সূচ বা ক্ষুদ্র ইস্পাত ও লৌহকে আকর্ষণ করিবে, অথবা উহার মাঝামাঝি সূতা বাঁধিয়া দিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে উহার একপ্রান্ত উত্তরদিক্ নির্দ্দেশ করিয়া স্থির হইবে।

৭ম পরীক্ষা।—৯ম চিত্রবৎ একটি অশ্বপাদুকাকার বা ইংরাজী U-ইউ অক্ষরাকার লৌহখণ্ডে ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয় সংলগ্ন তারকে চিত্রবৎ স্ক্রুপ্যাঁচের মত জড়াইয়া দিবামাত্রই ঐ বক্র লৌহখণ্ড চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। একখানি লোহা বা ইস্পাত চিত্রবৎ উহার দুই প্রান্তের নিকট ধরিবামাত্র তদ্দ্বারা



৯ম চিত্র।

আকৃষ্ট হইয়া উহার গাত্র সংলগ্ন হইয়া থাকিবে। জড়িত তারকে যেইমাত্র ব্যাটারী বিযুক্ত করিবে অমনি ঐ লৌহের চুম্বক ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া যাইবে। যেমন বলশালী ব্যাটারী হইবে সেইরূপ বড় লৌহ সেই পরিমাণে চুম্বক হইয়া দাঁড়াইবে। বৃহদাকার ব্যাটারী সহযোগে এরূপ তাড়িত চুম্বক দ্বারা দেড় মণ পর্য্যন্ত দ্রব্য তোলা দেখা গিয়াছে।

আবার চুম্বকের সহিত তাড়িত বলের চমৎকার সম্বন্ধ আছে। সেইটিই অবলম্বন করিয়া তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার বিষয় যথাস্থানে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা কয়টিতে জানা গেল যে ব্যাটারীর ফলকদ্বয় সংলগ্ন তার দুইগাছি পরস্পর সংলগ্ন করিলে অথবা তাহাদের প্রান্তদ্বয়ের সংস্পর্শে কোন পরিচালক পদার্থ (ধাতু, জল, জীবদেহ, অঙ্গার প্রভৃতি) রাখিলে, উহারা উত্তপ্ত হইয়া লাল হইয়া উঠে; প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে অতি প্রখর আলোক প্রকাশ হয়; প্রান্তদ্বয় জীব শরীরে আঘাত প্রদান করে, দাহ্য পদার্থকে প্রজ্বলিত করে ও লৌহে চুম্বক ধর্ম্ম দেয়। এখন বিবেচনা করিতে হইবে, ঐ সকল কার্য্য কে করে? সংযোজক তার দুইটি কি? তাহাদের ব্যাটারী হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়া একত্রে সংলগ্ন করিলে কি ঐ সকল কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যায়? কিছু মাত্রই নহে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, যে শক্তির স্বধর্ম্মে পূর্ব্বোক্তরূপ অতি বিস্ময়-জনক কার্য্য সমূহ সম্পন্ন হয় সেই পরমাশ্চর্য্য বল ব্যাটারী মধ্যে উৎপন্ন হইয়া সংযোজক তার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে।

আধুনিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণের মতে ব্যাটারী মধ্যে বিশ্লেষণ পরায়ণ দস্তা-ফলক গাত্রে বারিবিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গেই তাড়িতবলের উৎপত্তি হয়। নিমজ্জিত ফলক দুই-খানির মধ্যস্থিত জলের পরমাণু পরস্পরা যেমন ক্রমে বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে ও তাহার সঙ্গে দস্তাফলক হইতে তাম্রফলকাভি-মুখে অবিশ্রান্ত উদজান বাষ্পস্রোতঃ ও তাম্রফলক গাত্র হইতে দস্তাফলকের দিকে অম্লজান স্রোতঃ, এই দুইটি দ্বিবিধ বাষ্প-স্রোতঃ দুই বিপরীত দিকে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই দুই বাষ্পস্রোতের সঙ্গে দস্তার অভিমুখে একবিধ ও

তাম্রফলকের দিকে অন্যবিধ তাড়িতস্রোতঃ দুই বিপরীতদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই দুইটি বাষ্পস্রোতের গতিবিধি ৪র্থ চিত্র সহকারে স্পষ্ট করিয়া বুঝান গিয়াছে। তাহার সঙ্গে তদ্বিষয়ের যে বিবরণ প্রদান করা গিয়াছে সেই টুকু আর একবার পাঠ করিয়া লইলেই এ বিষয় আরও স্পষ্ট হইবে। উদজান বাষ্পস্রোতের সহিত তাম্রফলকের দিকে যে তাড়িত-স্রোতঃ বহিতে থাকে তাহাকে যোগ (Positive) তাড়িত-স্রোতঃ কহে এবং অম্লজান বাষ্পস্রোতের সহিত যে তাড়িত স্রোতঃ দস্তাফলকাভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাহাকে বিয়োগ (Negative) তাড়িতস্রোতঃ কহে। ঐ দুইটি দুই প্রকার তাড়িত স্রোতঃ প্রথমতঃ জল মধ্যদিয়া, তা'রপর দুইখানি ধাতব ফলক মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া শেষে ফলকদ্বয় সংলগ্ন তারদ্বয়ের মধ্যদিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া একটানা স্রোতে পরিণত হয়। যোগ তাড়িত দস্তাফলক গাত্রে উৎপন্ন হইয়া জল মধ্যদিয়া তাম্রফলকে যায়, পরে ঐ ফলক সংলগ্ন তারের ভিতর দিয়া গিয়া দস্তাফলক সংলগ্ন তারে প্রবেশ করে, সেই তার দ্বারা শেষে দস্তাফলক গাত্রে গিয়া পুনঃ প্রবিষ্ট হয়,—যেখানে উৎপত্তি সেইখানেই আবার নিবৃত্তি। ঐ রূপে বিয়োগ তাড়িত অম্লজানের সঙ্গে তাম্রফলক গাত্র হইতে জল মধ্যদিয়া বিপরীত দিকে দস্তাফলকে, তন্মধ্যদিয়া সংযোজক তারে, শেষে পুনরায় ঐ তাম্রফলকেই গিয়া প্রবিষ্ট হয়।

ইহাকেই পূর্ণ তাড়িত স্রোতঃ কহে। ব্যাটারীর সংযোজক তারদ্বয়কে একত্রিত করাকে অথবা ব্যাটারীর তাড়িত-বলকে কোন যন্ত্রে কিম্বা কোন পদার্থে প্রয়োগ করিবার সময় সংযোজক তার দুইটিকে কোনরূপ ধাতুময় পদার্থ দ্বারা সংলগ্ন করাকে তাড়িতস্রোতঃ পূর্ণ করা কহে। এবং সংযোজক তারদ্বয়কে পরস্পর বিযুক্ত বা পৃথক করিয়া ফেলাকে তাড়িতস্রোতঃ ভঙ্গ করা কহে। ব্যাটারী-তার প্রান্ত দুইটি পরস্পর সংলগ্ন থাকিলে তন্মধ্যে একাদিক্রমে তাড়িত-প্রবাহ আবর্ত্তন করিতে থাকে। ব্যাটারী জনিত তাড়িতবলের গতিবিধি ও কার্য্যফল দেখিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ স্রোতের অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাটারী মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য হইতে তাড়িত স্রোতের উৎপত্তি অথবা ব্যাটারীর উপাদানগত তাড়িত ধর্ম্ম প্রভাবেই রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হয় তদ্বিষয় এখনও স্থির হয় নাই। দুইটি স্রোতঃ দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে, এরূপ অনুমান করিয়া লইবার অন্য বিশেষ কারণ আছে। ঘর্ষণোত্তেজিত তাড়িত তত্ত্বের মর্ম্ম অবগত না হইলে সেটি বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। এবং সে বিষয় এস্থলে বুঝাইতে গেলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আকার ধারণ করিবে। অধিকন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ দুই স্রোতের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা একপ্রকার বিলুপ্তই হইয়াছে। কারণ এবম্বিধ দ্বিবিধ তাড়িত স্রোতের কল্পনায় ব্যাটারী-কার্য্য বর্ণনায় নানাবিধ অসুবিধা ঘটে। শুদ্ধ তন্নিবারণ জন্যই পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ কেবল একটিমাত্র তাড়িত-স্রোতের বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এরূপ অনুমান করিয়া লইলে অতি সংক্ষেপে ও সহজে তাড়িত স্রোতের গতিবিধি ও কার্য্য প্রণালী বুঝান যায়—অনেক জটিলতা নিবারণ হয়—ব্যাখ্যা সরল হইয়া পড়ে, অথচ একস্রোতঃ ধরিয়া লইলে যেমন, দুইটি স্রোতঃ ধরিয়া লইলেও ঠিক সেই রূপই সমস্ত তাড়িতস্রোত-কার্য্য বুঝা যাইবে,—ফলে কোনই বিভিন্নতা উপলক্ষিত হইবে না। প্রতি পদে দুইটা স্রোতঃ ধরিয়া সকল তাড়িত-কার্য্য বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে অনেক অসুবিধা হয়,—ভজকটতে পড়িতে হয়,—অনেক জঙ্গল কেটে বুঝিবার রাস্তা পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়, অথচ একটি মাত্র স্রোতের কল্পনায় যখন সমস্তই তাড়িত কার্য্য সরলভাবে বুঝা যায়, তাহার সহিত তাড়িততত্ত্বের কোন সত্যের কোনই বিরোধ ঘটে না, তখন দুইটা স্রোতঃ ধরিয়া লইয়া জটিলতা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই বুঝিয়াই পণ্ডিতগণ এক স্রোতেরই উল্লেখ করেন। এক স্রোতের গতিবিধি এই রূপ ধরা যায়,—দস্তা বা বিশ্লেষণ পরায়ণ ফলক-গাত্র হইতে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া অম্লাক্ত জলমধ্য দিয়া অপর ফলকখানিতে, তথা হইতে তাহার সহিত সংলগ্ন তার মধ্য দিয়া, তাহার পর দস্তাফলক সংলগ্ন তারে, শেষে পুনঃ দস্তাফলকেই গিয়া প্রবেশ করে। এই রূপে ফলকদ্বয় সংলগ্ন তার দুইটিকে একত্রিত করিয়া দিবামাত্রই নিরবচ্ছিন্ন তাড়িতস্রোতঃ চক্র প্রবাহিত হইতে থাকিবে। আবার তার প্রান্তদ্বয়কে পরস্পর পৃথক করিবামাত্রই স্রোতঃ ভঙ্গ বা তিরোহিত হইবে। ইহাকেই ব্যাটারীর তাড়িতস্রোত পূর্ণ করা ও ভঙ্গ করা কহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দস্তা-ফলক গাত্রে তাড়িত স্রোতের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐ ফলকখানিকে ব্যাটারীর উৎপাদক ফলক বা সকর্ম্মক ফলক বলে; এবং অপর ফলকখানি ঐ উৎপন্ন তাড়িতবলকে যেন ধরিয়া তৎসংলগ্ন তারে সঞ্চালিত করিয়া দেয় বলিয়া উহাকে সঞ্চয়ী বা পরিচালক ফলক কহে। উহাদের আরও দুইটি নাম আছে,—উৎপাদক বা সকর্ম্মক (Generating or

Active) ফলককে যোগ (Positive) ফলক, ও সঞ্চয়ী বা পরিচালক (Collecting or Conducting) ফলকখানি হইতে তাড়িত স্রোতঃ বহির্গত হইয়া যোজক তারে গিয়া প্রবিষ্ট হয়] বলিয়া উহাকে বিয়োগ (Negative) ফলক কহে। তাম্রফলক হইতে তাড়িত ব্যাটারী বহির্গত হয়—যেন বাদ যায় বা বিমুক্ত হয় বলিয়া উহা বিয়োগ ফলক, ও দস্তা-ফলকে গিয়া প্রবেশ করে—যেন জমা বা সংযুক্ত হয় বলিয়া ঐখানি যোগফলক। আবার সংযোজক তার দুইটির দুইটি প্রান্তের দুইটি নাম আছে—যোগ-ফলক সংলগ্ন তার প্রান্তকে বিয়োগ প্রান্ত কহে, কারণ তাড়িত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকর্ম্মক ফলকে পুনঃ প্রবেশ করে, এবং বিয়োগ-ফলক সংলগ্ন তার-প্রান্তকে যোগ প্রান্ত বলে, কেন না ঐ প্রান্ত দিয়া নিক্রান্ত হইয়া অপর তার-প্রান্ত বা বিয়োগ প্রান্তে প্রবেশ করে। ব্যাটারীর ফলক দুইখানিরও তৎসংলগ্ন তার দুইটির প্রান্তদ্বয়ের এই নাম লইয়া গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য কোন্‌টির কি নাম, উত্তম রূপে বুঝিয়া স্মরণ করিয়া রাখা আবশ্যক। যেহেতু পরে টেলিগ্রাফ যন্ত্র বর্ণনা কালীন উপাদানগুলি কেবল ঐ নামেই উল্লিখিত হইবে। সুতরাং কাহার কোন্ নাম কণ্ঠস্থ না করিলে সে বর্ণনাও বুঝিয়া উঠা কঠিন হইবে, নতুবা পদে পদে এই স্থানটি দেখিয়া লইতে হইবে।

নিম্নবর্ত্তী চিত্রে ব্যাটারী মধ্যে তাড়িত স্রোতের গতি পথ শরাগ্র দ্বারা চিহ্নিত দেখিবে; এবং ফলক দুইখানি ও সংযোজক তার-প্রান্তদ্বয়ের নামকরণ গণিতের যোগ ও বিয়োগ চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত দেখিবে। তাড়িত স্রোত দস্তাগাত্রে উৎপন্ন হইয়া শরাগ্র অভিমুখে তাম্র ফলকের ভিতর যায়, তথা হইতে 'ক' 'খ' চিহ্নিত সংযোজক তার মধ্যে, শেষে পুনরায় দস্তাফলকে গিয়া প্রবেশ করিয়া স্রোতঃ চক্র পূর্ণ করে। ৪টি শরাগ্র দ্বারা ঐ পথের দিক নির্দ্দিষ্ট হইল। 'ক' 'খ' চিহ্নিত সংযোজক তারটি একত্রিত বা পরস্পর সংলগ্ন না থাকিয়া যদ্যপি 'গ' 'ঘ' চিহ্নিত মত পৃথক অবস্থায় থাকে তবে সে স্থলে তাড়িত স্রোতঃ ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিতে হইবে। পুনরায় 'ক' 'খ'এর ন্যায় সংযোজক তার নিরবচ্ছিন্ন করিয়া দিলেই স্রোতঃ চক্র পূর্ণ করা বলে। ঐ সংযোজক তার 'ক' 'খ'য়ের মত নিরবচ্ছিন্ন একগাছি



১০ম চিত্র।

তার দিয়া রচিত হয় না, 'গ''ঘ'য়ের মত দুইটি তার পৃথক ভাবে ফলকদ্বয়ে সংলগ্ন থাকে। তাড়িতস্রোতকে যেন ধরিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্যই ফলকদ্বয়ে ঐ রূপ দুইটি তার সন্নিবিষ্ট থাকে। যখন তাড়িত স্রোতাবর্ত্তন পূর্ণ বা নিরবচ্ছিন্ন করিবার আবশ্যক হয় তখন তার দুইটিকে পরস্পর একত্রিত বা সংলগ্ন করিয়া দিলেই হয়; অথবা যদি কোন যন্ত্রে তাড়িত-বল প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ দুইটি পৃথক সংযোজক তারকে যদি যন্ত্রের এমন দুই স্থানে সংলগ্ন করা যায় যে তন্মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন বা একাদিক্রমে কোন রূপ ধাতু-সংযোগ আছে, তাহা হইলেও স্রোত চক্র পূর্ণ হইবে। তৎপ্রকরণ পরে দেখা যাইবে।

ঐ চিত্রখানিতে নামকরণটিও বুঝিয়া লও। এস্থলে দস্তাফলকখানি উৎপাদক, সকর্ম্মক বা যোগ ফলক; এবং গণিতের (+) যোগ চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত। তাম্রফলকখানি সঞ্চয়ী, পরিচালক বা বিয়োগ ফলক,ও (—)বিয়োগ চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত। তাম্রফলকের ঊর্দ্ধ প্রান্ত বা তৎসংলগ্ন তার খণ্ডের প্রান্ত (দুই একই কথা) বিয়োগ প্রান্ত—বিয়োগ (—) চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত। এবং দস্তাফলকের ঊর্দ্ধপ্রান্ত বা তৎসংলগ্ন তার-খণ্ডের প্রান্ত (ঐ দুইও একই কথা) যোগ প্রান্ত—যোগ চিহ্ন (+) দ্বারা অঙ্কিত। তবেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে যোগ ফলকের প্রান্ত 'বিয়োগ' ও বিয়োগ ফলকের প্রান্ত 'যোগ' প্রান্ত। এইটি উত্তমরূপে স্মরণ করিয়া রাখিবে। কারণ পরে ঐ নামগুলির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে হইবে।

ব্যাটারী জনিত তাড়িত বলের স্বরূপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তবে উহার কার্য্য প্রকরণাদি সমস্ত বিবেচনা করিয়া উহাকে সূক্ষ্মতম, ভারিত্ব বা গুরুত্ব গুণ শূন্য ও অদ্ভুত দ্রুতগামী তরল পদার্থ স্বরূপ অনুমান করা যায়; তাহার কোনই প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। সুতরাং তাড়িত-বল যে পদার্থ স্বরূপ বা জড়দেহ বিশিষ্ট তাহা অনুমান মূলক মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও উহা যুক্তিসঙ্গত বটে। ব্যাটারীর সংযোজক তার বহুদূর, এমন কি পৃথিবীকে বেষ্টন করাইয়া আনিয়া প্রান্তদ্বয় সহকারে পূর্ব্বোক্ত কয়টি পরীক্ষা সাধিত হইতে পারে। ব্যাটারী রহিল এক স্থানে, আর তাহার প্রান্তদ্বয় সংলগ্ন তার দুইটি শতযোজন দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাখিয়া তথায় সেই তার-প্রান্তদ্বয়ে ঐ সকল অদ্ভুত শক্তির কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যায়।

[ক্রমশঃ।

আলোক-চিত্র।

(PHOTOGRAPHY.)

(২০৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

সর্ব্বতোভাবে স্বচ্ছ পদার্থই নাই। আবার এমন অনেক পদার্থ আছে যে, তাহাদের মধ্য দিয়া আলোক গমন করিতে পারে না। তাহারাই অস্বচ্ছ পদার্থ। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে অস্বচ্ছ পদার্থও পৃথিবীতে নাই। যে মধ্যস্তর আগাগোড়া সমান অর্থাৎ যাহার সর্ব্ব স্থানই এক রকম গাঢ় বা ঘন—যাহার কোন স্থান পুরু ও কোন স্থান বা পাতলা এরূপ নহে এবং যাহার সর্ব্ব স্থানেরই রাসায়নিক সংযোগ একবিধ অর্থাৎ যাহার সমস্ত অংশ একইবিধ আদি বা মূল উপাদান ভূতের যোগে উৎপন্ন, তাহাকে সমসাস্তর স্তর কহে।

আলোক-প্রতিফলন।—স্বচ্ছ ও অর্দ্ধস্বচ্ছ পদার্থ সমূহের মধ্য দিয়া অর্থাৎ তাহাদের ভেদ করিয়া আলোক গমন করে। অস্বচ্ছ পদার্থ সকলের উপর আলোক পতিত হইয়া তাহাদের ভিতর দিয়া না যাইতে পারিয়া প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ যে দিক হইতে আসিয়া পতিত হয়, সেই দিকেই প্রতি-বিকীর্ণ হয় বা ফিরিয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে স্বচ্ছ পদার্থ নাই। বায়ু, জল, কাচ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ পদার্থ হইলেও, তাহাদের উপর যে সকল আলোকরশ্মি পতিত হয় তৎসমস্তই উহাদের ভেদ করিয়া বহির্গত হয় না। ঐ সকল পতিত রশ্মির কতকগুলি প্রতি-ফলিত হয়। কম বেশি সকল পদার্থ হইতেই আলোক প্রতিফলিত হয়। সমগ্র সৌরকর পৃথিবীতে কথনই পতিত হয় না। যদি পড়িত, তাহা হইলে সূর্য্যকে আমরা ঘোর তিমিরাবৃত শূন্যরূপ পশ্চাৎ-পটের উপর যেন প্রভূত প্রথর তেজোময় চিত্র স্বরূপ দেখিতাম। তথন সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমাদের অসাধ্য, অন্ততঃ অত্যন্ত কষ্টকর হইত। তাহার আলোক ও তেজঃ আমাদের সহ্য হইত না। কিন্তু তাহা না হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সৌরকর, বায়ুমণ্ডল, মেঘ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ অন্তরীক্ষে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে তাহার কতক অংশ ঐ সকল পদার্থ হইতে প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় উর্দ্ধদিকেই বিকীর্ণ হয়। তাহাতে সূর্য্যের সমগ্র আলোক ও তেজঃ বরাবর একটানে পৃথিবীতে আসিয়া পঁহুছে না, তাহার কতকাংশ প্রতিফলিত হইয়া অন্তরীক্ষেই প্রতিগমন করে, সুতরাং পৃথিবী সম্বন্ধে সেই গুলি নষ্ট হয় বলিলেও হয়। কিন্তু ঐ প্রতিফলিত রশ্মিগুলির কতক আলো ও তেজঃ আবার প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতেই আইসে। এ বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝিতে হইলে প্রথম চিত্রানুরূপ একটি আলোকময় পদার্থের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখিলে হয়। মনে কর, তদ্রূপ কিরণ বিশিষ্ট একটি আলোকময় গোলোক একটি গৃহের মধ্যস্থলে শূন্যে সূতা দ্বারা ঝুলান আছে। উহার আলোকে সমস্ত গৃহটির সর্ব্বত্র সমভাবে আলোকিত। এখন যদ্যপি ঐ আলোক-গোলকের নিম্নদেশে, ঘরের দুই দেয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া, একথানি মধ্যম গোছ স্থূল চাদর চাঁদোয়ার ন্যায় খাটাইয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ সূর্য্যানুরূপ আলোক-গোলক-বিকীর্ণ আলোক-রশ্মি সমূহ ঐ চাদরের উপর পতিত হইবে। চাদরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলির মধ্যদিয়া কতক রশ্মি ঘরের মেজের উপর আসিয়া পড়িবে, আর কতক, সূতা সমূহের উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া উর্দ্ধদিকে বিকীর্ণ হইবে। তাহাতে ঘরের কড়ি বরগাগুলি প্রতিফলিত আলোকে অধিকতর আলোকিত হইবে, আর মেজে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প আলোকিত হইবে। পুনরায় ঐ রূপে ঐ গোলকের উপরিদেশে চাদরথানি বিস্তৃত রাখিলে ঠিক বিপরীত ফল হইবে, অর্থাৎ মেজে অধিকতর ও কড়ি বরগা অল্প আলোকিত হইবে। অন্তরীক্ষে মেঘাদি সূর্য্য সম্বন্ধে ঐ বিস্তৃত চাদর স্বরূপ। এই হেতু সৌরকর অনেকাংশে কোমল প্রকৃতিক হইয়াছে। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় আকাশ অপেক্ষাকৃত মেঘশূন্য হইলে সূর্য্যরশ্মি অল্পই প্রতিফলিত হইতে পায়, সুতরাং আলোক ও তেজঃ তখন অত্যন্ত প্রখর হইয়া থাকে, তাহাতেই তখন আমরা অত্যন্ত গরম বোধ করি। কিন্তু ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব মহিমা! অসহ্য গ্রীষ্মের সমাগম হইলে, তৎপরক্ষণেই মেঘের সঞ্চার হয়, এবং প্রতিফলন গুণে সৌরকরের কতক তেজোক্ষয় হইয়া থাকে।

আলোকময় পদার্থের রশ্মি সমূহ আমাদের চক্ষে আসিয়া পতিত হইলে আমরা সেই আলোকময় পদার্থের দর্শন জ্ঞানলাভ করি, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবার ঐ প্রতিফলিত আলোক সহকারে আমরা অন্যান্য বস্তু সকলও দেখিতে পাই। সূর্য্য-রশ্মি সরল রেখা ক্রমে বা সোজাসুজি আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে, তাহাতে সূর্য্যকে অব্যবহিত বা সাক্ষাৎ ভাবে দেখি। এই রূপে আলোকময় পদার্থ মাত্রই আমাদের নয়নগোচর হয়। আবার সূর্য্যালোক বা রৌদ্র যে সকল পদার্থের উপর পতিত হয়, তাহাদেরও আমরা দেখিতে পাই; আরও, রৌদ্রউদ্দীপ্ত পদার্থ সকলের গাত্র

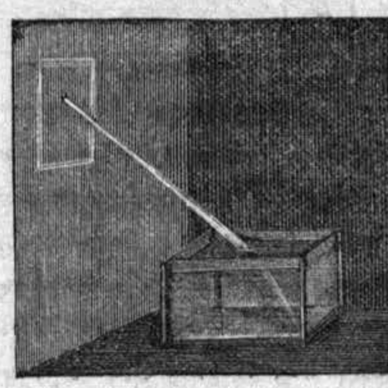
হইতে রৌদ্রালোক প্রতিফলিত হইয়া ছায়ায় অবস্থিত বস্তু সমূহের উপর পতিত হয়, তখন সেই প্রতিফলিত আলোক আবার সেই সকল বস্তু হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষে আসিয়া যখন পড়ে, তখন তৎসমস্ত বস্তুও আমরা দেখিয়া থাকি। এই রূপে গৃহাভ্যন্তরস্থিত সামগ্রী প্রভৃতি যে সকল পদার্থ রৌদ্রোদ্দীপ্ত নহে সেই সকল পদার্থ বায়ু, মেঘ, ভূপৃষ্ঠ প্রভৃতির প্রতিফলিত আলোক দ্বারাই আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। এই রূপ আলোককে সূর্য্যের বিক্ষিপ্ত (Diffused) আলোক কহে।

আলোকের এই প্রতিফলন ধর্ম্ম নিবন্ধন চন্দ্রাদি গ্রহ নক্ষত্র সমূহ সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আরও, সূর্য্য যখন অস্ত যায় ও সর্ব্বতোভাবে অদৃশ্য হয়, তখনও আকাশস্থ মেঘমালায় প্রতিফলিত সূর্য্যালোক সহকারে পৃথিবী কথঞ্চিৎ আলোকিত থাকে।

প্রতিফলনের আর একটি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এই যে, কোন বস্তুগাত্র হইতে আলোক রশ্মি সমূহ যে ক্ষেত্রে পড়ে, তাহারই উপর ঐ বস্তুর প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে, এবং ঐ ক্ষেত্রে পতিত রশ্মিগুলি যদ্যপি আবার প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষের উপর পতিত হইতে পায়, তবেই সেই প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব আমরা দেখিতে পাইব। ঐ ক্ষেত্র মসৃণ ও উজ্জ্বল না হইয়া যদ্যপি বন্ধুর ও অনুজ্জ্বল হয়, তবে তদুপরি সে প্রতিবিম্ব লুপ্তই থাকিয়া যায়, আমরা দেখিতে পাই না, কারণ, বন্ধুর ক্ষেত্রে পতিত রশ্মি সমূহের অধিকাংশই চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, অল্পসংখ্যকই আমাদের চক্ষে প্রতিফলিত হয়। পদার্থের উপরি গাত্র যেমন মসৃণ অথবা বন্ধুর হইবে, তাহার প্রতিফলন গুণও তদনুসারে বেশী অথবা কম হইবে। দর্পণ সম্মুখে দাঁড়াইলে আপন প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব দেখি কেন? আমাদের দেহোপরির আলোক-কিরণ সমূহ দর্পণে পতিত হইয়া অধিকাংশই আবার আমাদের চক্ষে প্রতিফলিত হয়। দর্পণ সদৃশ মসৃণ ও উজ্জ্বল উপরিভাগ বিশিষ্ট অন্য পদার্থ নাই। সুতরাং আলোক প্রতিফলন ধর্ম্মের নিয়মগুলি দর্পণ সহকারেই সাধিত হইয়া থাকে।

আলোক-বক্রীভবন।—আলোক-রশ্মি সমসাস্তর স্বচ্ছ মধ্যস্তরের ভিতর দিয়া সরলভাবে অর্থাৎ না বাঁকিয়া চুরিয়া, সোজাসুজি গমন করে। বায়ু, জল, কাচ প্রভৃতি এক একটি সমসাস্তর পদার্থ। কোন আলোকিত পদার্থের রশ্মি সমূহ যদি বরাবর একই সমসাস্তর পদার্থ মধ্যদিয়া সরল ভাবে দর্শকের চক্ষে পতিত হয়, তাহা হইলে দর্শক, ঐ পদার্থকে উহা ঠিক যেখানে আছে সেইখানেই দেখিবে ও তাহার যেমন আকৃতি তেমনিই দেখিবে। আবার আলোক-গতির এই আর একটি অতি চমৎকার নিয়ম বাহির হইয়াছে যে, অসমসাস্তর বা কমবেশী ঘন মধ্যস্তরের ভিতর দিয়া রশ্মি সমূহ বক্র ভাবে গমন করে। বায়ু হইতে কাচের মধ্য দিয়া, কাচ হইতে বায়ুর ভিতর দিয়া, বায়ু হইতে জলের ভিতর দিয়া, জল হইতে বায়ুর ভিতর দিয়া আসিতে গেলে রশ্মিপুঞ্জ সরলভাবে আসিবে না,—যেখানে দ্বিবিধ মধ্যস্তর মিলিত হইয়াছে সেইখানেই রশ্মি বাঁকিয়া পড়িবে। আলোক-গতির এই নিয়মটি কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

একটি অন্ধকার গৃহমধ্যে ৩য় চিত্রানুরূপ একটি জলপাত্র



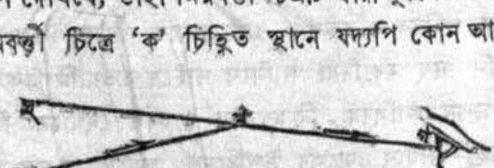
৩য় চিত্র।

রাখিয়া দিয়া গৃহের একদিকের একটি জানালায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দিয়া তন্মধ্যদিয়া একটি রশ্মিপুঞ্জ আসিতে দাও। পাত্রটি এরূপভাবে রাখিতে হইবে যে ঐ রশ্মিপুঞ্জ আসিয়া তন্মধ্যে পড়ে। তখন উহা পাত্রের যে স্থানে পতিত হইবে সেইটি কোন রূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। পরে ঐ পাত্রে জল ঢালিয়া দাও; তখন দেখিবে রশ্মিপুঞ্জ আর সেই চিহ্নিত বিন্দুতে না পড়িয়া চিত্রবৎ তাহার পশ্চাতে আসিয়া পড়িবে। কেন? রশ্মি, পাত্রস্থ জলের উপর পর্য্যন্ত যতখানি বায়ু মধ্যদিয়া আসিতে পাইবে ততখানি ঠিক সরলরেখা ক্রমে আসিবে, কিন্তু বায়ু ও জল যেখানে মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ জলের উপরিদেশ হইতে উহার ভিতর বক্র হইয়া প্রবেশ করিবে অর্থাৎ ঐখানে বক্রীভূত হইয়া তাহার পর জলের ভিতর যতখানি যাইবে ততখানি সরল ভাবেই যাইবে। চিত্রটি দেখ। আবার ঐ রশ্মি যদি ঐ জলের বাহিরে অপরদিকে বায়ুতে বহির্গত হয় তবে পুনরায় বক্রীভূত হইয়া বাহির হইবে। এই রূপে একপ্রকার মধ্যস্তর হইতে

অন্যবিধ মধ্যস্তরে প্রবেশ অথবা বহির্গমন কালে আলোক রশ্মি বক্রীভূত হয়। সর্ব্বতোভাবে শূন্যস্থানে (Vacuum) অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বায়ুবিরহিত শূন্য মধ্যেই রশ্মির গতি সম্পূর্ণরূপে সরলভাবে বা সরল রেখা পথে হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন জড়মাত্রই রশ্মিকে কমবেশী বাঁকাইয়া ফেলে। অস্বচ্ছ পদার্থোপরি রশ্মির বক্রীভবন বা প্রত্যাবর্ত্তনকে প্রতিফলন (Reflection) কহে, ও স্বচ্ছ অথবা অৰ্দ্ধস্বচ্ছ পদার্থ মধ্যে উহার বক্রগতিকে বক্রীভবন (Refraction) কহে। বায়ু, জল, সুরা, তৈল, ভিন্ন ভিন্ন কাচ প্রভৃতি যে পদার্থ যেমন কমবেশী ঘন সেই সেই পদার্থের তদনুসারে আলোক রশ্মিকে অল্প বা অধিক বাঁকাইবার ক্ষমতা বা ধর্ম্ম আছে। কোন আলোকিত পদার্থের রশ্মি সমূহ সরল রেখায় আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়িলে ত আমরা ঐ পদার্থকে সাক্ষাৎ ভাবে, উহার প্রকৃত স্থানে ও প্রকৃত অবয়বেই দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ রশ্মিগুলি যদ্যপি সরলভাবে আসিতে না পাইয়া কোন মধ্যস্তরে প্রতিফলিত বা বক্রীভূত হইয়া আমাদের চক্ষে আসিয়া পতিত হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ পদার্থকে আর উহার প্রকৃত স্থানে দেখিব না ও উহার প্রকৃত অবয়বেও দেখিব না। তবেই বক্রীভবন গুণে দৃষ্ট পদার্থের স্থানান্তরতা ও ভাবান্তরতা ঘটে। এখন এই নিয়মটির তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য কতিপয় সচিত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই হইবে।

আলোক-রশ্মির পূর্ব্বোক্ত অতি আশ্চর্য্য নিয়ম যে আলোকময় পদার্থ হইতে রশ্মি একটি একটানা সরল রেখা পথে না আসিয়া যদ্যপি মধ্যে প্রতিফলিত অথবা বক্রীভূত হইয়া চক্ষে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই চক্ষু ঐ আলোকিত পদার্থকে তাহার প্রকৃত স্থানে না দেখিয়া যেথানে বাঁকিয়া পড়ে সেই স্থান হইতে কিছু অন্তরে তাহার প্রতিরূপ দেখিবে, তাহা নিম্নবর্ত্তী চিত্রটি দ্বারা বুঝান গেল।

নিম্নবর্ত্তী চিত্রে 'ক' চিহ্নিত স্থানে যদ্যপি কোন আলো-



৪র্থ চিত্র।

কিত পদার্থ রাখিয়া দেওয়া যায়, আর উহার আলোক যদ্যপি 'ক' 'খ' চিহ্নিত সরল পথে 'খ' পর্য্যন্ত গিয়া ঐখানে বাঁকিয়া পড়ে, তাহার পর ঐ স্থান হইতে সরলভাবে 'গ' চক্ষে গিয়া পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ চক্ষু 'ক'কে আর 'ক' স্থানে না দেখিয়া 'ঘ' স্থানে দেখিবে, অর্থাৎ যে বিন্দু হইতে রশ্মি বক্র হইয়া চক্ষে পতিত হয়, তথা হইতে ঐ সরল রেখা পথকে,—এস্থানে 'গ' 'খ'কে, যদ্যপি বিস্তৃত করা বা বাড়ান যায়—যেমন 'গ' 'ঘ', তবে ঐ সরল রেখাতেই 'ঘ' স্থানে 'ক'কে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখন দেখিতে হইবে 'ক' 'খ', 'খ' স্থানে কি কি উপায়ে বক্র হইতে পারে। উহা দুই অবস্থাতে, ১ম প্রতিফলিত, ২য় বক্রীভূত হইয়া বাঁকিয়া যাইবে। 'খ' স্থানে যদি একখানি প্রতিফলক ক্ষেত্র বা দর্পণ 'খ' 'গ' এর দৈর্ঘ্যে ও তাহার সহিত লম্বভাবে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে 'ক' 'খ' রশ্মি ঐ দর্পণে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া 'খ' 'গ' পথে 'গ' চক্ষে গিয়া পড়িবে; তখন ঐ চক্ষু 'ক'কে, ঐ দর্পণ ভিতর দিয়া তাহার পশ্চাৎভাগে 'খ' 'ঘ' পরিমিত দূরে 'ঘ' স্থানে দেখিবে।

এক্ষণে 'ক' চিহ্নিত আলোকিত পদার্থ হইতে রশ্মিপুঞ্জ 'খ' চিহ্নিত স্থানে কিরূপে বক্রীভূত হইয়া 'গ' চিহ্নিত চক্ষে গিয়া পতিত হইতে পারে তাহার একটি উদাহরণ দেখাইব।

মনে কর, চিত্রানুরূপ একটি মাটীর, চিনে বা কোন রূপ অস্বচ্ছ



৫ম চিত্র।

পদার্থ নির্ম্মিত পাত্র লইয়া তাহাকে একটি সমতলক্ষেত্র—ঘরের মেজে বা টেবিলের উপর রাখিলে; আর তন্মধ্যে তাহার তলদেশে একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল বস্তু, অল্প মোম দিয়া বাটির সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখিলে;—পরে পাত্র মধ্যে জল ঢালিলে ওটি সরিয়া না যায়। এই রূপে বস্তুটি পাত্রের তলায় রাখিয়া দিয়া পাত্র হইতে ক্রমে অল্প করিয়া পিছু হাটিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে থাক; ক্রমে যখন পাত্র হইতে ঠিক এতদূরে যাইবে যে তথা হইতে ঈষন্মাত্র অগ্রসর হইলেই দ্রব্যটি দৃষ্টিগোচর হয়, ও পশ্চাৎপদ হইলে অদৃশ্য হয়। সেই স্থানটি হইতে দ্রব্যটিকে দেখিতে পাইতেছ না। উহার আলোক-রশ্মি চক্ষে গিয়া পতিত না হইলে ত উহাকে দেখা যাইবে না। দিবাভাগে এই পরীক্ষা করিলে সূর্য্যালোকে, আর রাত্রিযোগে করিলে দীপালোকে বস্তুটি আলোকিত হইবে।

উহার উপর সেই পতিত আলোক চক্ষে প্রতিফলিত না হইতে পাইলে উহাকে দেখা যাইবে না, ইহা দৃষ্টি বিজ্ঞানের মূল সূত্র। এ বিষয় প্রথমেই কতক বুঝান গেছে। আলোক চতুর্দ্দিকেই বিকীর্ণ হয়। পাত্র মধ্যস্থ বস্তুটির উপর পতিত আলোক রশ্মির কতকাংশ পাত্রের উপরিতন পরিধি বা মুখের ফাঁক যতখানি' ততখানির মধ্য দিয়া কোন প্রতিবন্ধক না পাইয়া প্রতিফলিত হয়, সুতরাং সেই রশ্মি সমূহের গতিপথে চক্ষু রাখিলেই বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হইবে। উহার অবশিষ্ট রশ্মিগুলি তিনদিকে পাত্রের গাত্রদেশে প্রতিবন্ধক পায়, সুতরাং সে গুলি আর পাত্রের গাত্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে পারে না। এখন ঐ স্থানে দাঁড়াইলে উহার একটিও রশ্মি চক্ষে আসিয়া পড়ে না, সুতরাং উহার কোন অংশ দেখাও যায় না। আর অল্প অগ্রসর হইলেই কিন্তু উহার কতিপয় রশ্মি চক্ষে পড়িবে। তখন সুতরাং উহার একটু মাত্র দেখা যাইবে। আরও একটু অগ্রসর হইলে উহার আরও খানিক দৃষ্টিগোচর হইবে। শেষে আর একটু সরিয়া দাঁড়াইলেই ঐ বস্তুটির সমস্তটাই দেখা যাইবে। ইহা অতি সহজ কথা। এখন ঐ স্থানেই দাঁড়াইয়া আর একজনকে পাত্রমধ্যে জল ঢালিয়া দিতে বল, আর তোমার দৃষ্টি যেন বরাবর একস্থানেই ঐ পাত্রের দিকে স্থির থাকে। ক্রমে দেখিবে ঐ বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে। শেষে আরও জল ঢালিলে উহার সবটাই দেখা দিবে। জল ঢালিয়া দিলে পাত্র মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিল? পাত্র সেই একই স্থানে রহিয়াছে একটুও সরে নাই, তাহার ভিতরে ঐ বস্তুটিও যেখানে অগ্রে ছিল সেইখানেই রহিয়াছে—মোম দিয়া আবদ্ধ, আর চক্ষুও সেই স্থান হইতে অল্পমাত্রও স্থানান্তরিত হয় নাই। তবে এই সমস্ত অবস্থা পূর্ব্ববৎই থাকিয়া, তাহার কোন অন্তর না হইয়াও কিরূপে এখন ঐ দ্রব্য দেখা গেল? বেশীর মধ্যে পাত্রে জলের সমাবেশ হইয়াছে। তাহাতে কি হইল?—তাহাতেই অদৃষ্ট বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হইল। কিরূপে?—উহার আলোক রশ্মির বক্রীভবনে। এইটিই এখন স্পষ্ট বুঝিতে হইবে। ঐ বস্তুগাত্র হইতে যে রশ্মিপুঞ্জগুলি তোমার দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহার একটিও তোমার চক্ষের উপর পতিত হয় না। তাহার সকল গুলিই তোমার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু পাত্র মধ্যে জল ঢালিলে ঐ রশ্মিগুলিই জলের ভিতর দিয়া বাহির হইবার সময় বক্র হইয়া যায় অর্থাৎ যেন দুমড়ে, মুচড়ে বা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতেই তথা হইতে জলের বাহিরের রশ্মিভাগ চক্ষে আসিয়া পড়ে, সুতরাং ঐ বস্তুটিকে তখন দিখিতে পাইবে। ঐ পদার্থের ঐ রশ্মি সমূহকে দৃষ্টি নিস্পাদক রশ্মি কহে। ঐ গুলি প্রথমতঃ সরলভাবে পাত্র বহির্গত হইবার সময়ে মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত অথবা মাথাতে গিয়া পড়িত, চক্ষে পড়িত না, তাহাতেই ঐ বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হইত না, এক্ষণে জলের ভিতর হইতে বাহির হইবার সময়ে বক্র হইয়া যায়, তাহাতেই চক্ষে আসিয়া পড়ে, সুতরাং তখন ঐ বস্তুর দৃষ্টি লাভ করা যায়। কিন্তু উহার প্রকৃত স্থানে অর্থাৎ উহা পাত্র মধ্যে ঠিক যেখানে আছে সেইখানেই দেখা যাইবে না, উহার কিছু উপরিদেশে চিত্রবৎ স্থানে উহাকে দেখিতে পাইবে। ঐ স্থানটি ঠিক কোথায় অবস্থিত? বক্রীভূত রশ্মিকে উহার পাত্র মধ্যস্থিত দিকে চিত্রবৎ বিন্দুময় সরল রেখায় বিস্তৃত করিয়া বা বাড়াইয়া দিলে সেই রেখায় ঐ স্থানটি অবস্থিত হইবে। এ বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝিতে হইলে পাত্রাভ্যন্তরস্থ বস্তুটির দৃষ্টি নিস্পাদক রশ্মি পুঞ্জকে একটি সরল-কাটি স্বরূপ ধরিয়া লইয়া দেখিলেই হইবে। মনে কর যদ্যপি একটি সরু কাটি ঐ বস্তুটি সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া দর্শকের দিকে সরলভাবে সংস্থাপন করা যায় তবে উহা পাত্রের কিনারার উপর দিয়া দর্শকের চক্ষু ছাড়াইয়া কপালে গিয়া লাগিবে। কিন্তু ঐ কাটিকে যদি পাত্রস্থ জলের উপরিদেশে মুচ্ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার ঐ ঐ ভগ্ন স্থান হইতে বায়ু মধ্যস্থ অংশের প্রান্তদেশ চক্ষে গিয়া সংলগ্ন হইবে। পাত্রস্থ বস্তুটির আলোক রশ্মিপুঞ্জও ঠিক ঐ রূপই বুঝিতে হইবে।

এখন ৪র্থ চিত্র দ্বারা রশ্মি বক্রীভবনের যে নিয়মটির বিষয় বলা গিয়াছে তাহার সহিত এই পরীক্ষাটি মিলাইয়া লও। কোন আলোকিত পদার্থের রশ্মি সমূহ সরলভাবে অর্থাৎ সোজাসুজি সরলরেখা পথে আমাদের চক্ষে আসিয়া পতিত হইলে সেই পদার্থকে আমরা তাহার প্রকৃত স্থানেই দেখিতে পাই, অর্থাৎ যেখানে থাকে সেইখানেই তাহাকে দেখি, কিন্তু রশ্মি সমূহ প্রতিফলন অথবা বক্রীভবন গুণে অর্থাৎ কোন প্রতিফলক ক্ষেত্রোপরি পড়িয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিম্বা আমাদের চক্ষু ও ঐ আলোকিত পদার্থ মধ্যে কোন ঘন মধ্যস্তর ব্যবধান থাকিলে, তাহার ভিতর দিয়া আসিয়া বাহির হইবার সময়ে বক্র হইয়া আমাদের চক্ষে পড়িলে সেই পদার্থ যেখানে থাকে সেখানে আর তাহাকে দেখিব না—বক্রীভবন বিন্দু হইতে যে সরল পথে রশ্মি চক্ষে পতিত হয়, সেই সরলরেখাকে বক্রীভবন বিন্দু হইতে কিছুদূর বাড়াইয়া টানিলে তাহারই গাত্রের একস্থানে ঐ পদার্থকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। [ক্রমশঃ।

বিদ্যুৎ ও বজ্র।

(২১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

শিষ্য।—কোন তাড়িতপূর্ণ পদার্থের নিকট সূক্ষ্ম অগ্র বিশিষ্ট ধাতব দণ্ড ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলে যখন তদ্বারা ঐ পদার্থের তাড়িত নিঃশব্দে ও অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইয়া যায়, তখন ফ্রাঙ্কলিনাদি বৈজ্ঞানিকগণের ঐ সকল পরীক্ষাতে মেঘের তাড়িত দণ্ড মধ্যদিয়া ভূপৃষ্ঠে পরিচালিত না হইয়া বড় বড় স্ফুলিঙ্গ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল কিরূপে, বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু।—সে বিষয় বুঝাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এক্ষণে বলিব। ঐ সূক্ষ্মাগ্র ধাতব দণ্ডগুলি মাটিতে প্রোথিত ছিল না। মাটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবেই স্থাপিত হইত। তাহা অতি সহজেই হইতে পারে। দুইটি মোটা, কাঠের খুঁটি—আধ মানুষ পরিমিত, খানিকটা তাহার আল্কা-তরা, তার অথবা পিচ দিয়া আবৃত ও সেই টুকু মাটিতে পোতা। শুষ্ক কাঠ তাড়িতের অপরিচালক, মাটিতে ঐ রূপে পুতিলে ঐ খুঁটিগুলি আর মাটির রসে ভিজিয়া উঠিবে না। তখন ঐ দুই খুঁটির গায়ে এড়োভাবে আর দুইটি কাঠের দণ্ড, শুষ্ক শণ বা রেশমের দড়ি দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধা। সেই কাঠামতে বা কাঠের ফ্রেমে ঐ ধাতব দণ্ডটি বাঁধা থাকিলে আর ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন হইবে না। আর ঐ কাঠামটা বৃষ্টির জলে না ভিজিয়া যায় তজ্জন্য উহার উপর কোন রূপ ছাউনি দিয়া সুরক্ষিত।

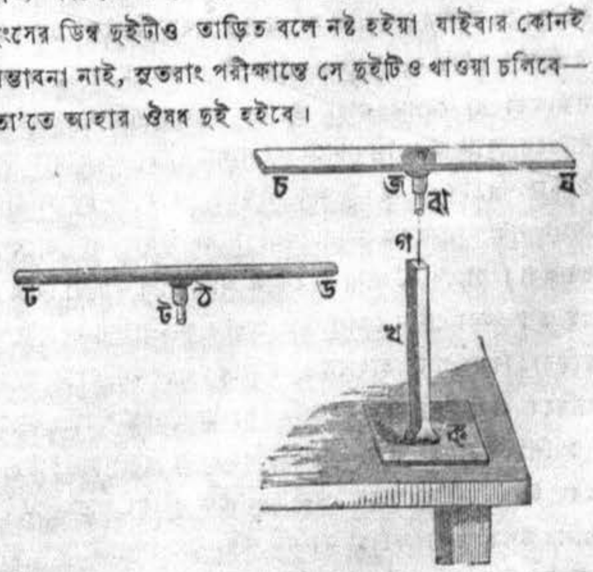
শিষ্য।—অনেক গুলি বিষয় পরে বুঝাইয়া দিবেন বলিয়া রাখিয়াদিয়াছেন। সেই গুলি এখন বুঝিতে ইচ্ছা করি।

গুরু।—হাঁ—আমার মনে আছে। এখন সেইগুলি এক একটি করিয়া বলিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাড়িতের স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে যে দুইটি মত প্রচলিত আছে তাহার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বুঝাইব। কোন বিষয়ের মাঝখান হইতে বুঝিতে গেলেই এই রূপ হয়—গোড়া পর্য্যন্ত টান পড়ে। এখন কয়েকটি অতি সামান্য পরীক্ষা দ্বারা এককালে তাড়িত বলের স্বরূপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের মত ও ঐ বলের প্রধান কার্য্য গুলি বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

তাড়িত শক্তির এই কয়টি প্রধান ধর্ম্ম,—আকর্ষণ, প্রতি-ক্ষেপণ, পরিচালন ও সংক্রামণ। একটি মাত্র যন্ত্র সহকারে কতিপয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঐ কয়টি গুণের কার্য্য দেখিতে পাইবে ও স্পষ্ট বুঝিতেও পারিবে। যন্ত্রটি রচনা করিতে কয়েকটি উপকরণ আবশ্যক। সে গুলি অনায়াসে ও অতি সামান্য ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে পার। এক্ষণে চিত্র দ্বারা তোমাকে সমস্ত বুঝাইতেছি, তোমার সুবিধা মত সেই রূপ পরীক্ষা স্বহস্তে সাধন করিয়া দেখিও।

একখানি সরু কাচের ফালি, একটি সরু গালার বাতি, একটু সরু পাঁকাটি, একটি কাঠের পায়া, দুইটি হাঁসের ডিম, দুইটি লম্বা পায়াযুক্ত কাচের গ্লাস, একটি মোটা রকমের গালার বাতি ও একটি কাচের চোঙ্গা—অভাবে লম্বা গোছের শিশি।

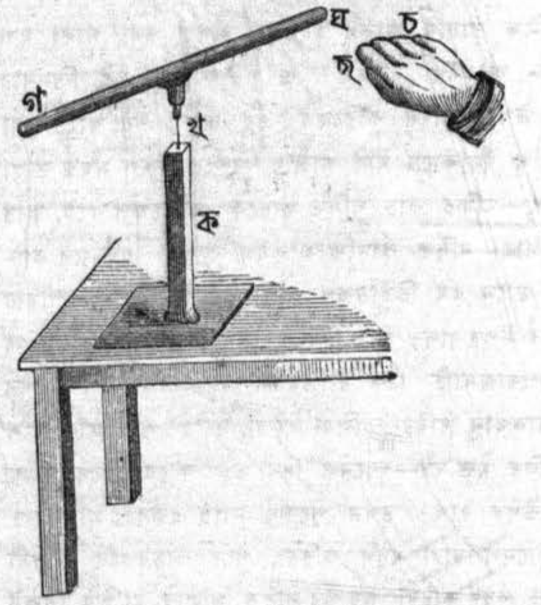
রাধাবাজারে, সোয়ালো লেনে, কাচের দোকানে, একটি পয়সা দিয়া দুই চারিখানি আধহাত আন্দাজ লম্বা ও এক আঙ্গুল চওড়া কাচফালি কাটাইয়া আনিবে। একটি সরু ও একটি মোটা গালার বাতি—বড়বাজারের যেখানে পাওয়া যায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাচের গ্লাস দুইটি বাড়ীতে না থাকে বাজার হইতে ক্রয় করিবে, আর হাঁসের ডিম কোথায় পাইবে, বোধ হয় বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। পরীক্ষার শেষে, গালাগুলি চিঠিপত্র জোড়া, পোষ্টেল প্যাক্ করা প্রভৃতি অনেক কাজে লাগিবে; গ্লাস দুইটি অন্য কাজের জন্য থাকিয়া যাইবে, নষ্ট হইবে না; আর হংসের ডিম্ব দুইটীও তাড়িত বলে নষ্ট হইয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, সুতরাং পরীক্ষান্তে সে দুইটিও খাওয়া চলিবে—তা'তে আহার ঔষধ দুই হইবে।



৪র্থ চিত্র।

চিত্রে যে সামান্য যন্ত্রটি দেখিতেছ, উহা অতি সহজে ও যৎসামান্য ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। এবং উহা এত প্রয়োজনীয় যে তদ্দ্বারা তাড়িতের প্রধানতম ধর্ম্মের কার্য্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। উহার রচনা প্রকরণ বলিতেছি,—'ক' একখানি পুরু কাষ্টখণ্ড, তাহার মধ্যদেশে 'খ' একটি মোটা কাষ্টদণ্ড বা গালারবাতি লম্ব ভাবে সংলগ্ন। তাহার উপরি প্রান্তদেশে 'গ' একটি ছোট সূক্ষ্মাগ্র লৌহ শলাকা প্রোথিত; এই রূপে একটি আধার স্বরূপ পায়া হইল। 'ঘ' 'চ' আধ হাত লম্বা ও এক আঙ্গুল চওড়া একটি কাচ-ফালি,—উহার ঠিক্ মাঝখানের একপার্শ্বে বা ধারদিকে এমন একটি কৌশলময় সংযোজনা সন্নিবিষ্ট যে তদ্দ্বারা ফালিটিকে ঐ পায়ার সূক্ষ্মাগ্রের উপর চিত্রবৎ রাখিলে উহার প্রস্থ লম্বভাবে থাকিবে, উহার কোনদিক অবনত হইয়া বা ঝুঁকিয়া থাকিবে না,এবং পায়ার সূক্ষ্মাগ্র অবলম্বন করিয়া এত শিথিলভাবে বসিবে যে অল্পমাত্র বল সহকারে ঘুরিতে পারিবে। ফালির মধ্যে ঐ সংযোজনাটি একটু বুদ্ধি ব্যয় করিয়া নানা রকমে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। বন্দুকের একটি সরু ক্যাপ্ লইয়া তা'র রুদ্ধদিকে—যাহার উপর ঘোড়া পড়ে—ঐ কাচফালির পরিমাণ চওড়া ও দুই আঙ্গুল লম্বা এমন একটু টিনের পাত সমতল ভাবে ঝাল দিয়া জুড়িয়া দিবে, তাহাতে ক্যাপটী ঐ সরু ক্ষুদ্র টীনফালির সহিত লম্বভাবে থাকিবে। তখন কাচফালিকে একপার্শ্বে বা ধারদিকে দৈর্ঘ্যের লম্বালম্বি দাঁড় করাইয়া রাখিয়া তাহার আধাআধি মাপিয়া লইয়া ঠিক মধ্যদেশ কোনরূপে চিহ্নিত করিবে; তখন সেই চিহ্নের উপর ক্যাপ্‌টিকে এরূপে রাখিবে যে তাহার রুদ্ধপ্রান্ত সংলগ্ন ক্ষুদ্র টীনফালি টুকুর দুই অর্দ্ধ ঐ চিহ্নের দুইদিকে, ফালির ধারের উপর সংলগ্ন হয়; তখন সরু সূতা বা রেশম দ্বারা উহাকে ফালির সহিত জড়াইয়া বাঁধিলে, ক্যাপটি ফালির ধারে দৃঢ় সংলগ্ন হইবে। তাহার পর ঐ ক্যাপের ভিতর একটু সরু শাঁকাটি, তার ভিতর আবার একটু সরু পালকের ফাঁপা গোড়া বা কুইলভাগ প্রবেশ করাইয়া দিয়া,মোম, গালা বা কোন আঠা দ্বারা জুড়িয়া দিবে। এই রূপ অন্য কোন কৌশলময় প্রত্যঙ্গ কাচফালির মধ্যদেশে জুড়িয়া দিতে পার তাহাতেও চলিবে। কেবল এইটি স্মরণ রাখিবে যেন তদ্দ্বারা কাচফালি পায়ার সূক্ষ্মাগ্র শলার উপর খুব শিথিলভাবে বসে, কোন দিকে না হেলিয়া থাকে, এবং ঈষৎ বল সহকারে যেন চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে; এই গুলির উপর লক্ষ্য করিয়া ফালির মধ্য সংযোজনাটি 'জ' 'ঝ' প্রস্তুত করিতে হইবে। ফলে উহা নানা রকমে প্রস্তুত হইতে পারে। সুবিধাজনক একটি উদ্ভাবন করিয়া লইবে। ঐ চিত্রে 'ড' 'ঢ' একটি সরু গালার কাটি বা বাতি; ওটিরও মাঝে ঐ রূপ একটি অঙ্গ 'ট' 'ঠ' সন্নিবেশিত করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে যন্ত্রটি এইরূপে প্রস্তুত হইলে পর, পূর্ব্বোক্ত উপকরণ গুলি তাহার নিকটে রাখিয়া দিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিবে।

কাচ-ফালিকে বাম হাতে মাঝখানে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া উহার মধ্য হইতে এক আধ ভাগ 'ছ' 'চ' বা 'ছ' 'ঘ' দক্ষিণ হাতে খানিক রেশমী বস্ত্র (চেলির কাপড় অথবা চেলির রুমাল) দ্বারা উত্তমরূপে খানিকক্ষণ ধরিয়া ঘর্ষণ কর; ঘর্ষণ শেষে সেই ভাগকে আর স্পর্শ করিও না; অমনি চিত্রবৎ ফালিটিকে পায়ার সূক্ষ্মাগ্রের উপর স্থাপন কর। যে অর্দ্ধ ভাগটি ঘষিবে তা'র উপর লক্ষ্য রাখিবে। অপর আধ অংশটি ঘর্ষিত হয় নাই; তা'র সহিত গোলমাল না হয়। এখন ঐ ঘষাদিকের খুব নিকটে, অথচ স্পর্শ না করিয়া ডান হাতের প্রথম অঙ্গুলি



৫ম চিত্র।

চিত্রবৎ মুড়িয়া ধর; অমনি ফালিটি তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অল্প অগ্রসর হইবে, তুমিও ক্রমে অঙ্গুলিটি পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া লইতে থাকিবে। ফালিও আঙ্গুল অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবে। তাহাতে স্থির হইবে যে, ঘর্ষিত ফালিটি তাড়িতোত্তেজিত হইয়াছে। অঙ্গুলি দিয়া পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যই ঐ। তখন কাচ-দণ্ড বা শিশিকে রেশমী বস্ত্র দ্বারা ভাল করিয়া ঘষিয়া লইয়া ফালির ঐ ঘষা দিকেরই নিকট ধর; ফালি প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া পেছুদিকে ঘুরিয়া যাইবে; তুমিও ঘষা কাচদণ্ডকে তা'র পেছু পেছু লইয়া যাও,—ঘষা কাচফালি ও

যেন তা'র সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য পশ্চাৎদিকে ক্রমিক সরিয়া ঘুরিতে থাকিবে। এই পরীক্ষাটি দুই তিনবার সাধন কর; প্রতিবারে কাচফালির অর্দ্ধেক ঘষ; পর পর দুই আধ অংশই ঘষ; পায়ার উপর রাখ, ও প্রতিবারে কাচদণ্ডকেও ঘষ আর ঘষা আধফালির কাছে ধর; প্রতিবারেই দেখিবে, ঘষা ফালি ঘষা দণ্ড হইতে পেছুদিকে সরিয়া যায় বা বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রতিক্ষিপ্ত হয়। এখন কাচ দণ্ডটি রাখিয়া দিয়া মোটা গালাদণ্ডটি লইয়া, একখণ্ড ফ্লানেল দিয়া উত্তম রূপে ঘষিয়া, কাচফালির নিকট ধরিয়া দেখ; তা'র যে আধখানির নিকট ধরিবে, তা'কেও পূর্ব্বে ভাল করিয়া রেশমী বস্ত্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ ঘষিয়া লইবে। তাহাতে দেখিবে ঘষা কাচফালি ঘষা গালার কাছে অগ্রসর হইবে; গালাদণ্ডকে পেছুদিকে ক্রমে সরাইয়া আনিতে থাক,—ঘষা কাচফালিও তা'কে অনুসরণ করিয়া এগুতে থাকিবে বা বৈজ্ঞানিক ভাষায় আকৃষ্ট হইবে, অথবা ঘষা গালা ঘষা কাচকে আকর্ষণ করিবে। এ পরীক্ষাটিও দুই তিনবার উপরি উপরি সাধন করিবে। এই রূপে, ঘষা কাচে ঘষা কাচে, ও ঘষাকাচে ঘষা গালায় পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখিলে,—ঘর্ষিত কাচ ঘর্ষিত কাচকে প্রতিক্ষেপ করে, আর ঘর্ষিত গালা ঘর্ষিত কাচকে আকর্ষণ করে। এইবারে কাচফালির স্থানে ৫ম চিত্রানুরূপ গালা-বাতিটি চিত্রবৎ পায়ার সূচ্যগ্রের উপর রাখ; হাত দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখ উহার মধ্য সংযোজনাটি ঠিক রীতিমত আছে কি না। এখন তা'র মাঝখান ধরিয়া তুলিয়া লইয়া, তা'রও এক আধ অংশ কাচফালির মত ঘষ--ফ্লানেল দিয়া ভাল ক'রে ঘষিবে, ঘষিয়া পায়ার উপর রাখ; তখন পূর্ব্বের ন্যায় একবার লাক্ষাদণ্ডটিকে ফ্লানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া, পরে কাচদণ্ডকে রেশমী বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া পর পর ঘর্ষিত গালার বাতির নিকট ধরিয়া দেখ। দেখিবে,—ঘষা গালা ঘষা গালাকে প্রতিক্ষেপ করে, ও ঘষা কাচ ঘষা গালাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু কাচই বল আর গালাই বল, উহাদের কোনটিই ঘর্ষিত না হইলে আর ঐ আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপণের কার্য্য দেখিবে না। তবেই বুঝিতে হইবে, এবং পূর্ব্বেও কয়েকটি পরীক্ষায় দেখাইয়াছি যে পদার্থ ঘর্ষিত হইলে তাহাতে তাড়িত বলের উৎপত্তি হয়, সেই তাড়িত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রূপে আস্ফোটনের সহিত প্রকাশ হয়, জীব শরীরে আঘাত করে প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য করে। এখন এই পরীক্ষাতে সেই তাড়িতেরই এই ধর্ম্ম স্পষ্টভাবে স্থির হইল যে, কাচের তাড়িত কাচের তাড়িতকে প্রতিক্ষেপ করে ও গালার তাড়িতকে আকর্ষণ করে এবং গালার তাড়িত গালার তাড়িতকে প্রতিক্ষেপ করে ও কাচের তাড়িতকে আকর্ষণ করে। এইটি স্মরণ করিয়া রাখিও। এখন এই যন্ত্রযোগে যত পদার্থ ঘষিয়া পরীক্ষা করিবে, দেখিবে যে তা'দের কতকগুলি ঘষা কাচকে প্রতিক্ষেপ করে ও ঘষা গালাকে আকর্ষণ করে, এবং বাকীগুলি ঘষা কাচকে আকর্ষণ করে ও ঘষা গালাকে প্রতিক্ষেপ করে। তবেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যে সকল পদার্থ ঘষিলে ঘষাকাচকে প্রতিক্ষেপ করে ও ঘষা গালাকে আকর্ষণ করে তা'দের তাড়িত কাচের তাড়িতের সমান, আর যা'রা ঘষা কাচকে আকর্ষণ করে ও ঘষা গালাকে প্রতিক্ষেপ করে তা'দের তাড়িত গালার তাড়িতের সহিত সমান। এই রূপে পৃথিবীর যাবতীয় জড় পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিলে কেবল ঐ দুই শ্রেণীতেই সমস্ত ভাগ হইয়া যাইবে, অর্থাৎ একদল কাচ-তাড়িত জাতীয় আর একদল লাক্ষা-তাড়িত জাতীয়। এই সকল দেখিয়া, আরও কত রকমে পরীক্ষা করিয়া পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে তাড়িত দুই প্রকার,—১ম, কাচ ঘষিলে তা'তে যে তাড়িত উত্তেজিত হয়, এবং ২য়, গালা ঘষিলে তা'তে যে তাড়িত উত্তেজিত হয়। প্রথমটিকে কাচজ ও দ্বিতীয়কে লাক্ষাজ তাড়িত কহে। উহাদের আরও দুইটি নাম আছে, যোগ ও বিয়োগ; কাচজ বা যোগ তাড়িত ও লাক্ষাজ বা বিয়োগ তাড়িত। এই দ্বিবিধ তাড়িত ব্যতীত অন্য রকম তাড়িত আর নাই। কাচজ বা যোগ তাড়িত গণিতের যোগ (+) চিহ্ন ও বিয়োগ তাড়িত বিয়োগ (—) চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্ব পরীক্ষায় এই দ্বিবিধ তাড়িতের এই নিয়ম স্থির হইতেছে যে ১ম, কাচজ তাড়িত কাচজ তাড়িতকে প্রতিক্ষেপ করে ও লাক্ষাজ তাড়িত লাক্ষাজ তাড়িতকে প্রতিক্ষেপ করে; এই নিয়মটি এক কথায় এই বলিলেও হয়—এক রকমের, সবর্ণ বা সমধর্ম্মী তাড়িত পরস্পর প্রতিক্ষেপ করে বা প্রতিক্ষেপণশীল। ২য়, কাচজ তাড়িত লাক্ষাজ তাড়িতকে আকর্ষণ করে; ও লাক্ষাজ তাড়িত কাচজ তাড়িতকে আকর্ষণ করে; এই নিয়মটিও এক কথায় এই বলা যায় যে ভিন্ন রকমের, অসমবর্ণ, বিধর্ম্মী বা দ্বিবিধ তাড়িত পরস্পর আকর্ষণ করে বা আকর্ষণ পরায়ণ। ঘর্ষণোত্তেজিত তাড়িতের এই দুইটি প্রধান ধর্ম্ম বা গুণ। ইহার কার্য্য পূর্ব্ব পরীক্ষায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছ। ইহা কখনও ভুলিও না।

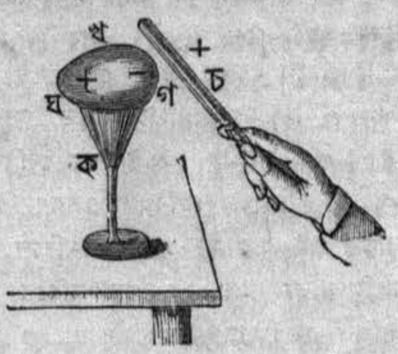
তুমি যে এতক্ষণ চুপ করিয়া আছ, বুঝিতে পারিতেছ ত, না কঠিন বোধ হইতেছে ?

শিষ্য।—শক্ত বোধ হইলে বলিতাম, পরীক্ষাগুলি খুব সহজ, সঙ্গে সঙ্গে বেশ বুঝিয়া যাইতেছি।

গুরু।—তাড়িত বিষয়টি বড় কূট, কিন্তু সহজ পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করিলে অতি সহজ বোধ হয়। শুদ্ধ বর্ণনায় যেমন নীরস তেমনি দুরূহ বোধ হইবে। কেবল সেই জন্যই অনেকে বিজ্ঞানকে বাঘ মনে করেন, কাছে এগুতে ভয় পান।

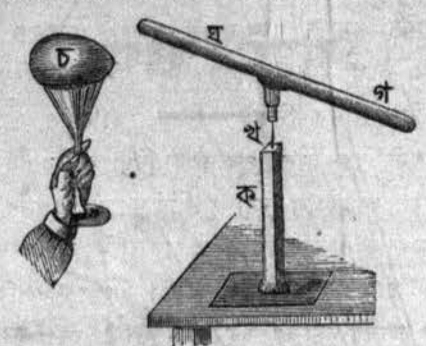
শিষ্য।—হাঁসের ডিমে কি হ'বে ?

গুরু।—এই বারে তদ্দ্বারা তাড়িতের পরিচালন ও সংক্রামণ গুণ দুইটি বুঝাইয়া পরে তাড়িত-মতটি বুঝাইব।



৬ষ্ঠ চিত্র।

৬ষ্ঠ চিত্রে 'ক'য়ের ন্যায় একটি লম্বা (স্যাম্পেন) গ্লাসের উপর 'খ' চিহ্নিত একটি হাঁসের ডিম লম্বালম্বি শুয়াইয়া রাখিবে, না পিচ্‌লে পড়ে যায় তা'র জন্য গ্লাসের দুইধারে ডিমের সঙ্গে একটু করিয়া মোম টিপিয়া দিবে। তা'র পর 'ক' ধরিয়া গ্লাস শুদ্ধ ডিমটিকে ৪র্থ চিত্রের 'ঘ''চ' চিহ্নিত কাচফালির নিকট ধরিয়া দেখ—'ঘ''চ'য়ের কোনই পরিবর্ত্তন দেখিবে না—যেমন স্থির সেই ভাবেই থাকিবে। তখন সডিম গ্লাসকে রাখিয়া দাও, 'ঘ' 'চ'কে নামাইয়া রাখ ও তা'র স্থানে 'ড''ঢ' চিহ্নিত গালার বাতিটি 'থ 'গ' পায়ার উপর 'ট''ঠ' অবলম্বন করিয়া রাখ। তখন গ্লাস ধরিয়া ফের ডিমকে 'ড''ঢ'য়েরও নিকট ধরিয়া দেখ। তাহাতেও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখিবে না। এক্ষণে সডিম গ্লাসটি রাখিয়া দাও; 'চ' কাচদণ্ডটি রেশমী বস্ত্র দ্বারা ভাল করিয়া ঘষিয়া ডিমের খুব নিকটে, অথচ স্পর্শ না করিয়া চিত্রবৎ ধর; অল্পক্ষণ ধরিয়া থাকিয়াই সরাইয়া লও, তখন ফের সডিম গ্লাসকে ৪র্থ চিত্রের, পর পর কাচফালি ও গালার বাতির নিকট ধরিয়া দেখ; কিছুই দেখিবে না, সেই পূর্ব্বমত স্থির—অচল। ফের সডিম্ব গ্লাসকে রাখিয়া দাও, ফের কাচদণ্ড ঘষ, আর ডিমের নিকট পূর্ব্বমত ধর, কিন্তু এবার আর এক কাজ কর—একহাতে যখন ঘষা কাচদণ্ড ধরিয়া থাকিবে, তখন অপর হাতে একটি মাত্র আঙ্গুল দিয়া ডিমের 'ঘ' চিহ্নিত অন্য ভাগ অল্পক্ষণ স্পর্শ করিয়া থাকিয়াই আঙ্গুল সরাইয়া লও, এবং তখন 'চ'কেও রাখিয়া দিয়া 'ক' ধরিয়া ডিমকে এইবার ৭ম চিত্রবৎ গালার বাতির নিকট ধর,—বাতি



৭ম চিত্র।

তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া অগ্রসর হইবে; ৪র্থ চিত্রবৎ কাচফালির নিকট ধর—তাহাকেও ঐরূপে আকৃষ্ট হইতে দেখিবে। ইহাতেই বিবেচনা হইতেছে যে ডিমটি এবার অবশ্য তাড়িত যুক্ত হয়, তা' না হ'লে ঘষা বস্তুর ন্যায় উহা অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করিবে কেন ? ভাল, যদি তাহাই হয়, তবে তা'র তাড়িত কোন প্রকার—কাচজ ও লাক্ষাজ তাড়িতের কোনটি, তাহাও ত অনায়াসেই স্থির করা যায় ? কিরূপে দেখ,—৪র্থ চিত্রবৎ কাচফালির—মনে কর 'চ''ছ' দিকটি ঘষিলে—রেশমী বস্ত্র দিয়া—যেন মনে থাকে, আর ডিমের কাছেও পূর্ব্বের ন্যায় ঘষা কাচদণ্ড ধরিয়া থাকিয়া, ও অপর হস্তে উহার অপর দিক্ স্পর্শ করিয়া। তখন ডিমকে 'ক' ধরিয়া পূর্ব্ববৎ 'চ''ছ' য়ের নিকট ধরিয়া দেখ দেখি কি হয়,—কাচফালি আকৃষ্ট হইয়া ডিমের দিকে সরিয়া আসিবে; ডিমকে পেছুদিকে আনিতে থাক,—কাচও তার পেছু পেছু এগুতে থাকিবে। তবেইত ডিমের তাড়িত কোন প্রকার এখন অনায়াসেই বলা যায়, অসমধর্ম্মী দুই তাড়িত পরস্পর আকর্ষণ করে, সুতরাং ডিমের তাড়িত লাক্ষাজ বা বিয়োগ, তাতে আর ভুল নাই। এইটিই আরও এক রকমে পরীক্ষা করিয়া লও। মনে কর, ডিমের কাছে কাচদণ্ডের পরিবর্ত্তে লাক্ষাদণ্ড ঘষিয়া রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তা'র অপরদিকে আঙ্গুল দিয়া তা'র পর ঐ ঘষা কাচফালির নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে দেখিবে, কাচফালি প্রতিক্ষিপ্ত হইবে। [ক্রমশঃ।

পাণ্ডব-চরিত। *

মহাভারতীয় দৃশ্যাবলী।

(১৯৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

দ্বিতীয় প্রকরণ।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—নিবিড় অরণ্য।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ।—চরাচর মোর চক্রে ঘুরিতেছে সদা—যাহে জীব চিরসুখে রবে—ধরাধাম সুখময় হবে—সেই মত কার্য্য মোর চির-অভীপ্সিত—সৃষ্টি-মাঝে মনুষ্যনিকর, বিবেকাদি মহা-ধনে ধনী—সে সব ধনের রক্ষাভার, চিরন্যস্ত তাদের উপর—পশুবৃত্তি সব জীবে আছে—কিন্তু, যে মানব, ভবমাঝে বিবেকের শুনিয়া মন্ত্রণা, অন্য সব বৃত্তিগুলি আয়ত্ত করিয়া, করে কাজ—মঙ্গল-আকর ভাবি মোরে, বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, অমঙ্গল তার ভাগ্যে না ঘটে কখন;—অনলে অনিলে জলে স্থলে,—ভীষণ কান্তারে,—অকূল বিপদার্ণবে,—আমি তার কর্ণধার।—তার মন ভয়শূন্য সদা—কোন বাধা না মানে কখন।—বিশ্বাসী ভক্তের কাছে বাঁধা আমি সদা।—কিন্তু মূঢ় বুদ্ধিহীন যেই ভব মাঝে—নিজ মঙ্গলের তরে—সুখলাভ আশে বিস্তারে কৌশল জাল—নিশ্চয় সে জন নিজ জালে বদ্ধ হয়—যথা কোষকীট নিজ সৃষ্ট কোষমাঝে বন্দী হয় নিজে। রে মানব! দুরাশার প্রবল বাতাসে না ঢালিও অঙ্গ কভু—যাহা ভাল তব পক্ষে জানি আমি ভাল—সেই মত করিব ঘটন—কিন্তু, তুমি যদি, ভাল নাহি ভাবি তাহা—নিজ ইষ্ট তরে, অন্য পথে যেতে চাও;—মম ইচ্ছা ফেলে রেখে—স্ব ইচ্ছায় মাত—তা হলে নিশ্চয় এ উভয় ইচ্ছা সংঘর্ষণে কুফল ব্যতীত কভু সুফল না হবে।—অহো মূঢ় দুর্য্যোধন রাজ্যলাভ-আশে, পাণ্ডবের নাশে ব্যস্ত সদা—পাণ্ডবেরে পিতৃ-রাজ্যে করিবে বঞ্চিত!—মোর ইচ্ছা, নিশ্চয় পাণ্ডব রাজ্যেশ্বর হবে—পিতৃরাজ্য পাবে—ধর্ম্মের মহিমা বিশ্বে করিবে প্রকাশ। ইচ্ছা সংঘর্ষণ এইবার—আমার ইচ্ছার জয় হইবে নিশ্চয়—কিন্তু, এই সংঘর্ষণে কি ভীষণ বিপ্লব ঘটিবে—জানি আমি—কিছুদিন বই দেখিবে জগত। আমি রাখি যারে, কে পারে নাশিতে তারে?—যারে মারি—ত্রিভুবন একত্রিত হলে রক্ষা নাহি তার!—দুরাচার দুর্য্যোধন নাশিবারে ভীমে করিল বিষান্ন দান—রাখিলাম তায়।—দ্বিতীয় কৌশল জতুগৃহ—পাণ্ডবের কি হইল তাহে?—জতুগৃহ, দগ্ধ পাংশুরাশি এবে—মোর চক্রজালে পাণ্ডবের পলায়ন না জানিল কেহ!—সত্য বটে দুর্য্যোধন হলো রাজ্যেশ্বর—কিন্তু কদিনের তরে?—কি ফল ফলিবে, এই রাজ্যলাভে, আমি জানি আর জানে যেই ভক্ত মোর। মূঢ় ভাবে, পাপের হইল জয়! ভবিষ্যৎ না দেখে ভাবিয়া!—নাহি জানে দুইদিন পরে হইবেক ভীষণ পতন!—কিছুদিন পাণ্ডবে এখন রাখিব অজ্ঞাতভাবে—অসহায়ে শত্রুপুরী মাঝে রাখা আর ভাল নয়—শুধু তাহে পাইবে যন্ত্রণা মোর প্রাণের পাণ্ডব!—তার চেয়ে শান্তি-নিকেতন অরণ্য মাঝারে—শান্তির মূরতি ভিক্ষুকের বেশে—দেশে দেশে ধর্ম্ম-চিত্র দেখায়ে দেখায়ে—সহায় করিয়া লাভ—পিতৃরাজ্য পাবে পুনরায়—ঐ যে আসিছে সবে—হই অন্তর্দ্ধান—উপযুক্ত সময়েতে হইবে মিলন। [অন্তর্দ্ধান।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও হরিদাসের সহিত কুন্তীর প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।—ভাই বৃকোদর, আর না পারি চলিতে। দেখ সবে নিদ্রায় কাতর—এই স্থানে করিব বিশ্রাম।

* যখন পাণ্ডব-চরিত প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন বলিয়াছিলাম, ইহা নাটক নয়, এখনও সেই কথাই বলিতেছি। কিন্তু পাণ্ডব-চরিতের কিয়দংশ প্রকাশিত হইলে কোন অবৈতনিক নাট্য সমাজের সভ্য আমাকে ইহার ভবিষ্যত প্রকরণ গুলি অঙ্ক প্রত্যঙ্কাদি বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন সেই প্রথা মন্দ বলিয়া বোধ না হওয়ায় অবলম্বিত হইল।

ভীম।—যথা অভিরুচি তব। নাহি কোন ভয়,—হরি দয়াময়, রক্ষক মোদের সদা—যাঁহার কৃপায়—বিষায়ে বাঁচিল প্রাণ, জতুগৃহে হইনু উদ্ধার—কৃপা তার, পাণ্ডবের প্রতি চিরদিন—তাঁহারি কৃপায় নাহি কোন ভয়—রক্ষা আমি করিব সবারে। বিশ্রাম করহ সবে, ইচ্ছা হয় নিদ্রা যাও—রহিনু প্রহরী।

হরিদাস।—ধর্ম্মরাজ! নির্ব্বিঘ্নে আইলে বনে হরির কৃপায়—এ সংবাদ দিতে যাব, হস্তিনাতে বিদুরের পাশে—কাজে কাজে করহ বিদায়।

যুধিষ্ঠির।—হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! বিদায় করিতে তোমা নাহি চায় মন—কিন্তু খুল্লতাত উৎকণ্ঠিত—কাজেই তোমাকে থাকিতেও বলিতে না পারি—কি আর বলিব—যাহা ভাল বুঝ কর তাই।

হরিদাস।—ধর্ম্মরাজ! আসিবার কালে বিদুর আমারে—দিয়াছিলা কয়খানি গৈরিক বসন—কিন্তু, রাজবেশ পরিহরি, কেমনে, ভিকারীবেশ করিতে ধারণ বলিব হে? এ নয়ন অন্য বেশে তোমা দেখিতে না চায় কভু।

যুধিষ্ঠির।—হরিদাস! খুল্লতাত জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, তাই তিনি তব সনে দিয়াছেন গৈরিক বসন।—শত্রু ভয়ে যাই পলাইয়া; এ সময়, বহুমূল্য পরিচ্ছদ বিপদ আকর!—দাও হে গৈরিক বাস।

হরিদাস।—আহা কেমনে এ দরিদ্রের ভূষা দিব আমি?—না—না—পারিব না!—থাক্ এই খানে, ইচ্ছা হয় লয়ো, মহারাজ!—কিন্তু আমি তব রাজবেশ দেখিতে দেখিতে যাই ফিরে হস্তিনায়—অন্যবেশে দেখিলে তোমায়—প্রাণ মোর নাহি রবে দেহে।

[রোদন করিতে করিতে ও পশ্চাতে দেখিতে দেখিতে প্রস্থান।

ভীম।—দাদা! পোরো না ভিকারী বেশ! বড় ব্যথা বাজিবে মরমে।

যুধিষ্ঠির।—ভাই রে! হরিলীলা বড়ই মধুর। ভিকারীরে হরি বড় ভালবাসে! এস সবে শ্রীহরির প্রেমের ভিখারী সেজে হরি হরি বলে কাটাই জীবন! ভাই রে, হরি আছে যার হৃদে রাজ্যে তার কিবা প্রয়োজন? চল সবে, স্নান করি, পরিগে ভিকারী বেশ!

ভীম।—যাও দাদা! কর গিয়ে স্নান, আমিও যাইব। তব ইচ্ছা অবহেল্য নয়। কিন্তু আছে মোর অন্য প্রয়োজন! বিলম্বে যাইব সরোবরে।——

[ভীম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাজবেশ পরিহার!—দুর্য্যোধন ভয়ে?—বড় মর্ম্মান্তিক কথা!—কিবা ভয় দুর্য্যোধনে—এক মুষ্ট্যাঘাতে পারি না কি বধিতে তাহারে?—হরি কি সহায় নন্ মোর?—তবে কেন করি দেরি?—না না—আর্য্য যুধিষ্ঠির আজ্ঞা নাহি দিলে, কোন কার্য্য কভু না করিব!—শ্রীহরির আজ্ঞা আর্য্য যুধিষ্ঠির-মুখে হয় বহির্গত—তবে কি করি এখন! যাই, বনে বনে করি ফল অন্বেষণ, ক্ষুধার্ত্ত সকলে এবে—বিশেষতঃ মাতা উপবাসী! হলে স্নান—আহারের হবে প্রয়োজন। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বনান্তর।

মদন ও রতি।

রতি।—একি, প্রাণেশ্বর! কেন এলে এ কাননে? মানবের সমাগম নহে ত সম্ভব এই বনে! তবে, বল কি কারণে ফুল-ধনু সনে এলে হেথা বৃথা দিতে ব্যথা, মোর মনে! শ্বাপদ-সঙ্কুল এ যে নিবিড় কানন!

মদন।—প্রাণেশ্বরি! কষ্ট স্মরি' না হও ব্যাকুল। অতি অসম্ভব কাণ্ড ঘটাবার তরে হেথা আগমন মোর। খাদ্য খাদকেতে আজি হবে পরিণয়!

রতি।—অতি অসম্ভব কথা!

মদন।—এ বিশ্ব সংসারে কিছু অসম্ভব নহে। আজি যাহা ভাব অসম্ভব, কালি তাহা দেখিবে সম্ভব। জানত হে এ কাননে নিশাচর হিড়িম্বের বাস?

রতি।—শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ছিল এ কানন মাঝে জনপদ,—হিড়িম্ব রাক্ষস—ভক্ষি' দেশবাসী জনে, সে নগর কাননেতে কৈল পরিণত। ভগ্নী সনে করে বাস এই ত কাননে। ইচ্ছা তার মনে নিজ বন্ধুসনে, বিবাহিতা করিতে তাহারে। কিন্তু সে কামিনী মনোমত জন বিনা অন্যে না বরিবে।

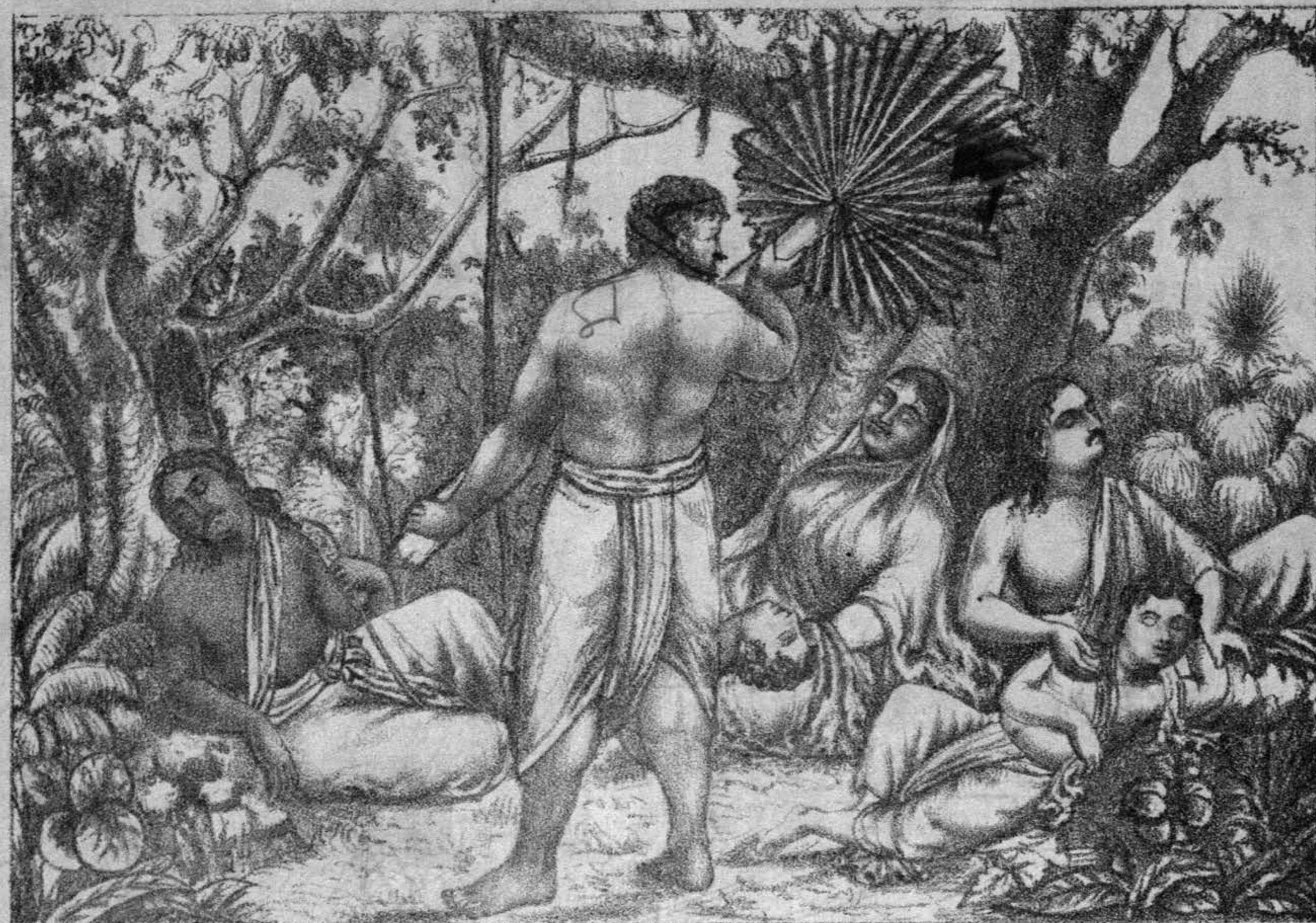
মদন।—আজি তারে বিবাহিতা করিব নরের সনে?

রতি।—কি আশ্চর্য্য!

মদন।—কিছুই আশ্চর্য্য নহে প্রিয়ে—ভগবান আদেশিলা এই মত মোরে। হের ঐ আসে তার বর। রহি এস অলক্ষে মিশায়ে। [অন্তর্দ্ধান।

গৈরিক উত্তরীয়ে ফল ও ব্যজনাকারে কর্ত্তিত তালপত্র হস্তে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—হ'ল ফল আহরণ। করিয়াছি ব্যজন প্রস্তুত। আহা! কোথা হস্তিনায় সিংহাসন-পাশে দাঁড়াইয়া রতন-



নিদ্রিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণকে ভীমের ব্যজন।

মণ্ডিত ব্যজনেতে, বায়ু সঞ্চালিত করিব আর্য্যের অঙ্গে, তা না হয়ে নিবিড় কাননে, বৃক্ষপত্র লয়ে গৈরিক আবৃত দেহে——অহো বড় কষ্ট! ব্যর্থ ভীম নাম!—না না কি হবে করিলে দুঃখ? হরির বাসনা যেই মত, সেই মত ঘটিবে নিশ্চয়, যাই এবে তাড়াতাড়ি করি স্নান—না না—অগ্রে ক্ষুধাতুর জ্যেষ্ঠে করাই ভোজন। উপবাসক্লিষ্টা মাতা আছে অনাহারে, করাই পারণ তাঁরে—ক্ষুধাতুর ভ্রাতৃগণে করাই ভোজন—তার পরে স্নানাহার! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—অরণ্য বৃক্ষতল।

যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কুন্তী।

কুন্তী।—কৈ যুধিষ্ঠির! কৈ এখন ত নাহি এলো ভীম? কোথা গেল ভীম মোর?—কখন আসিবে? চল সবে করি অন্বেষণ—

ফলাদি লইয়া ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—ওহো! বড় কষ্ট! মহারাজ! ওহো! আর না পারি দেখিতে। তব অঙ্গে গৈরিক বসন! জলন্ত অনল সম দহিল নয়ন—নেত্রপথে হৃদয়ের তলদেশে পশি করিল হৃদয় দগ্ধ—ওহো! এ অনল, এখন কি হেতু? নাহি দগ্ধ করে দুর্য্যোধনে? মহারাজ! কোথা রাজা হবে তুমি হস্তিনা নগরে, সেবিব চরণপদ্ম! সার্থক হইব শ্রীঅঙ্গে ব্যজন করি রতন-ব্যজনে—তা না হয়ে—ওহো—আর্জ হৃদয় বিদরে হেরিয়ে শ্রীঅঙ্গে ঘর্ম্মধারা!—ভাই রে অর্জ্জুন! নীরবে কি হেতু আছ বসে মৌন হয়ে? এস ভাই লও ফল, জননীরে করাও ভোজন। উপবাসী মাতা আছে কালি হতে—এ কি! সহদেব নকুলের সনে নিদ্রিত ধূলায় পড়ি কনক পুতুল ধূলি মাখা—দাদা আর সহ্য নাহি হয়—দেহ অনুমতি মুষ্ট্যাঘাতে কুরুকুল করিগে নির্ম্মূল।

যুধিষ্ঠির।—ভাই বৃকোদর, কেন কর অকারণে রোষ?

ভীম।—অকারণে?—দাদা না বল এমন কথা, রাজঅঙ্গে গৈরিক বসন—এর চেয়ে আরও কি কারণ চাও জাতি শত্রু বধে?

যুধিষ্ঠির। ভাই রে! অদৃষ্টের বশে সকলি ঘটিছে বিশ্বে, শ্রীহরির ইচ্ছা এই মত—কেন দুঃখ কর ভাই—বন্ধুজনে করিয়া বিনাশ—কিবা ফল বৃথা রাজ্যধনে?

ভীম।—কেবা বন্ধু?—দুর্য্যোধন?—মহারাজ! এক হরি বই জগতে না দেখি বন্ধু আর—আকুল পরাণ সদা তাঁর তরে! দুর্য্যোধন! থাক বেঁচে আরও কিছুদিন—ধর্ম্মরাজ এখনো সদয় তোর প্রতি—কিন্তু একদিন লব তোর প্রাণ নিশ্চয়! নিশ্চয়! ধর্ম্মরাজে ভিকারী সাজায়ে—যমালয়ে লুকালেও নাহি পাবি ত্রাণ, যাবে প্রাণ তোর, মোর হাতে নাহিক সংশয়!—(মাতার নিকট ফলগুলি রাখিয়া) জননী গো! ব্রত উপবাসে রয়েছ কাতরা অতি—কর মা পারণ!

কুন্তী।—বাছারে! দেরে ফল ভ্রাতৃগণে তোর, করুক আহার নিজে—তারপর যদি থাকে করিব ভোজন।

ভীম।—মা! ফলে পূর্ণ এ কানন—আমাদের তরে নাহি হবে অনটন—কিন্তু তুমি আছ উপবাসী।

কুন্তী।—(ফলগুলি ভাগ করিয়া) নেরে সবে। (সকলকে দিয়া নিজে গ্রহণ)।

চতুর্থ দৃশ্য।—বনান্তর।

হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা।

হিড়িম্ব।—দেখ্ হিড়িমি, আজ বড্ড মজা হবে, পাঁচটা মানুষ এই বনে এয়েছে আমি সচক্ষে দেখিচি তারা জলে নেমে নাচ্চে।

হিড়িম্বা।—তুই তাদের মারলিনি কেন?

হিড়িম্ব।—তারা, যে জলে নাইচে সে জলে নামা কি আমার কর্ম্ম। তারা বোধ হয় এতক্ষণে নেয়ে খেয়ে কোন গাছ তলায় ঘুমুচ্চে—তুই যা তাদের কটার ঘাড় ভেঙে আন, আমি একটু জিরুই।

হিড়িম্বা।—আমি এখন কোথায় তাদের খুজ্‌তে যাব?

হিড়িম্ব।—যা না, এ বন সে বন করে দেখ্ না?—কোথায় আর যাবে——

হিড়িম্বা।—তবে যাই দেখিগে—— [প্রস্থান।

হিড়িম্ব।—আমিও যাই ঐ বড় ঝাউ গাছটার ওপর থেকে দেখিগে—হিড়িমি কোন দিকে যায়,—ও যদি তাদের পাঁচজনকে একা মাস্তে না পারে শেষ আমায় যেতে হবে।

[বৃক্ষে আরোহণ।

পট পরিবর্ত্তন।

কানন বৃক্ষমূল।

যুধিষ্ঠিরাদি সকলে নিদ্রিত।

ভীম সকলকে ব্যজন করিতেছেন।

ভীম।—হরি দয়াময়, দয়ার আলয় তুমি। কিন্তু লীলাময় তব লীলা বোঝা, মানবের সাধ্যের অতীত! কোথা কাল!

কোথা আজ। কাল রাজা আজিকে ভিখারী! কিন্তু দয়াময়, কষ্ট তাহে নাহি কিছু মোর!—কিন্তু রাজার এ বেশ যে হে দেখিতে না পারি—হরি! চিরদিন যাবে কি এমনি—পাণ্ডুপুত্রগণ ভিখারির বেশে ছদ্মবেশে দেশে দেশে করিবে ভ্রমণ! —তব ইচ্ছা তুমি জান লীলাময়!

(দৈববাণী) ভক্তরে কেন হও বিষাদে আকুল, আমি যে তোদের চিরসখা!—কি ভয় তোদের বল, ভিখারীর বেশ নহে তুচ্ছ—এই বেশে একদিন সেজেছিনু আমি ইন্দ্রে দিতে ত্রিদিব বিভব—এই বেশে বহুকাল আমি করেছি দারুণ তপ—এই বেশে পুন পিতৃসত্য পালিবার তরে ভ্রমিয়াছি দণ্ডকের বনে—এই বেশ বড় প্রিয় মোর—তাই সদা যোগী ঋষিগণ—মোরে পাইবার তরে এই বেশে করে ধ্যান দিবা বিভাবরী—কিন্তু শুধু বেশে কিছু নাহি হয় তাই বলি—যে বেশে যেখানে থাক—মন যেন থাকে এই মত!

ভীম।—দয়াময়! মন নহে মোর! দিয়াছি তোমার পদে—দেহ ও তোমার! যেমন চালাবে দয়াময় সেই মত চলিব ফিরিব—যেই দিন ত্যজিবে আমারে সেই দিন দেহ ত্যজি নিশ্চল হইব। দয়াময় প্রণমি চরণে—দেহ বল বুদ্ধি সবি তুমি। তবে কেন করহে আকুল তুচ্ছ শোকে, বুঝিতে না পারি?—না না কোথা শোক? কিসের বা শোক?—ধর্ম্মময় ধর্ম্মরাজ ঐ বৃক্ষমূলে ধর্ম্মদণ্ডে শাসিছেন বিশ্ব সব। প্রজা আজ্ঞাকারী। তবে কেন আমি হইব আকুল!—কুল যে অকুলে হরি ভব কর্ণধার। (ব্যজন)।

দূরে হিড়িম্বার প্রবেশ পশ্চাতে মদন ও রতি।

মদন।—(শরত্যাগ)—

হিড়িম্বা।—আহা একি অপরূপ রূপ—যেন মদমত্ত করি কানন ভিতরে ভ্রমিছে রে! আহা ভুলে গেল মন—প্রাণ মন হইল উদাসী—ইচ্ছা হলো দাসী হয়ে চিরদিন বিক্রীতা হইয়া থাকি কমল চরণে!—কিন্তু রাক্ষসীর বেশে গেলে প্রাণেশ্বর পাছে ভীত হয়ে যান পলাইয়ে—তাহলে ত মনোসাধ না পুরিবে মোর, ধরি তবে কমনীয় বপু——

(সহসা সুন্দরী যুবতীমূর্ত্তি ধারণ)

যাই এবে অগ্রসর হয়ে। —প্রাণেশ্বর! প্রণমি চরণে!

ভীম।—কেবা তুমি?—কোন্ মায়া বলে আসিলে এখানে?—'প্রাণেশ্বর' সম্বোধন কি হেতু আমারে?

হিড়িম্বা।—(লজ্জানম্র) দেহ প্রাণ মন চিরতরে দিনু ঢালি চরণে তোমার!

ভীম।—কে তুমি রমনী?—মোরে দেহ পরিচয়! কোন্ দেশে বাস তব? জনহীন এক অরণ্য—এখানে বা আইলে কেমনে?—সত্য করি বলহ সকলি!

হিড়িম্বা।—করহ অভয় দান!

ভীম।—নাহি ভয়, বল সত্য ভাষা। যদি সত্য কথা বল, ভীম বর্ত্তমানে কেহ তব অমঙ্গল নারিবে করিতে।

হিড়িম্বা।—মহাত্মন্! রাক্ষসের কুলে জন্ম মোর! ভ্রাতা মোর হিড়িম্ব রাক্ষস! এই বন তার অধিকার। অতি দুরাচার সেই, এখনি আসিয়া, নিশ্চয় বধিবে তোমাদের প্রাণ। এই বেলা চল মোর সাথে গিরিদুর্গে লইবে আশ্রয়।

ভীম।—শুন নিশাচরি, ভ্রাতৃগণ মোর ঘুমে অচেতন, নিদ্রা যায় মাতা ধরাতলে পড়ি। এ সবারে অসহায় রেখে—কেমনে যাইব আমি তোমার সহিত?—অতি অনুচিত তাহা।

হিড়িম্বা।—নাহি বলি ফেলে যেতে। জাগাও সবারে, সবারে লইয়া চল যাই পলাইয়া।

ভীম।—শুন নিশাচরি, নিদ্রিতে নাহিক জাগাইতে, বিশেষতঃ পর্য্যটন ক্লেশে ক্লান্ত সবে, এ সময়ে সামান্য রাক্ষস ভয়ে, কাহারেও নাহি জাগাইব, এই ত্রিভুবনে হেন জন নাহি জানি যার ডরে লুকায়ে রহিব। যে অতুল বলে বলী আমি, তার কাছে রাক্ষসের বল তুচ্ছ অতি। ইচ্ছা হয় থাক, কিম্বা যাও নাহি ক্ষতি তাহে কিছু।

হিড়িম্ব।—(লজ্জানম্রস্বরে)—যখন এ দেহ মন বিকায়েছি পদে, তখন আবার কি লয়ে যাইব?

ভীম।—থাক তবে, মাতা ভ্রাতা হইলে জাগ্রত, আদেশ লইয়ে দুজনার, যেবা হয় করিব বিহিত।

হিড়িম্ব।—(বৃক্ষ হইতে নামিতে নামিতে)—ওঃ! আমায় ফাঁকি!—মানুষের সঙ্গে পালাবে?—রাক্ষসকুল-কলঙ্কিনী! আমি সব শুনিচি—র'স যাচ্ছি।

হিড়িম্বা।—মহাত্মন! ঐ দেখুন দুরাত্মা হিড়িম্ব আসচে।

ভীম।—আসুক ভয় কি? এখনি উচিত ফল প্রাপ্ত হবে।

হিড়িম্ব।—হিড়িমি!—থাক্, আগে মানুষ কটাকে মারি তার পর তোকেও মার্‌বো!

ভীম।—ওরে রাক্ষস!—কেন মিছে গর্জ্জন ক'রে নিদ্রিতগণকে জাগ্রত করিস্, আয় বাহুতে বল থাকে যুদ্ধ কর।

হিড়িম্ব।—আয় দেখি!

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।



ভারতেশ্বরী। Empress Victoria.



প্রিন্স আলবার্ট। Prince Albert.

পাণ্ডবগণের নিদ্রাভঙ্গ।

কুন্তী।—ওকি, ওকি!—কার সনে যুদ্ধ করে ভীম? কে মা তুমি স্বর্গ বিদ্যাধরি?

হিড়িম্বা।—মা গো! বিদ্যাধরী নহি আমি—সামান্যা কামিনী। পুত্রে তব বরেছি, মা, আমি। এবে তিনি হের ঐ যুঝিছেন রাক্ষস ঈশ্বর হিড়িম্বের সনে।

কুন্তী।—যুধিষ্ঠির, চল অগ্রসর হয়ে।

যুধিষ্ঠির।—চল মা জননি।

সকলের প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

কলিকাতার ইতিহাস।

(১৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মেট্‌কাফ হল নির্ম্মাণ—মেটকাফের স্থলে লর্ড অকলাণ্ড—অকলাণ্ডের সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনা —ব্ল্যাক অ্যাক্ট—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যপ্রাপ্তি—মহারাণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী—মেকানিক্স ইনষ্টিটিউসন—ডাক্তার ফ্রেডরিক করবিন্—মেকানিক্স ইনষ্টিটিউসনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—তত্ত্ববোধিনী সভা—মতিলাল শীলের দাতব্য বিদ্যামন্দির—জর্জ টমসন—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের মূল স্থাপন—অকলাণ্ডের ভারত ত্যাগ।

মেটকাফ হল সি, কে, রবিন্সন্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে, বরণ কোম্পানীর দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, এগ্রি-হর্টিকল্‌চু-রাল সোসাইটি এবং পাবলিক্ লাইব্রেরীর অর্থ হইতেও ইহার নির্ম্মাণে অনেক সহায়তা হয়। ইহা যদিও ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত বটে, কিন্তু ইহার প্রবেশদ্বার হেয়ার ষ্ট্রীটে। এইখানেই মহাত্মা মেট্‌কাফের আবক্ষ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

যাহাই হউক এই মহাত্মা বড় অধিক দিন ভারতবর্ষের উপকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না। যাহার অদৃষ্ট তিমিরাবৃত, তাহার সৌভাগ্য দামিনীচমকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। খ্রীঃ ১৮৩৬ অব্দের অবসান হইতে না হইতেই লর্ড অকলাণ্ড গবর্ণর জেনেরল পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ সমরানলে দগ্ধ হইয়াছিল।

ইঁহারই সময়ে—

১। অযোধ্যার রাজ্যাধিকার লইয়া গোলযোগ ঘটে।

২। সাতারার রাজার বিদ্রোহও একটি প্রধান ঘটনা।

৩। আফগানস্থানে যুদ্ধ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

৪। অহিফেন ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য চীন রাজের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ব্ল্যাক অ্যাক্ট লইয়া আন্দোলন এই সময়ের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা।

এই সময়েই—(খ্রীঃ ১৮৩৭ অব্দ) মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার অধিবাসীগণ মহারাণীকে আপনাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক অভিনন্দন অর্পণ করেন।

যাঁহার শাসনে ভারত নানারূপ ভোগ করি-তেছে, যাঁহার শাসনে থাকিয়া আমরা সুখী, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এস্থলে, বোধ হয়, অপ্রা-সঙ্গিক হইবে না।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তৃতীয় জর্জের পঞ্চম সন্তান এড-ওয়ার্ড-(Edward Duke of Kent)-এর কন্যা। ইঁহার মাতার নাম ভিক্টোরিয়া মেরিয়া লুইসা অব্ সাক্সি কোবর্গ সালফিল্ড। ইঁহার জন্মের আট মাস পরেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইনি অতি অল্প বয়সেই নিজের প্রতিভা বলে বৈদে-শিক ভাষা পর্য্যন্ত অভ্যাস করিতে সমর্থ হন। খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে স্থির হয় যে তিনিই ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের রাজ্ঞীপদ প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পরে, খ্রীঃ১৮৩৭ অব্দের ৩০শে জুন, রাজ্ঞীর খুল্লতাত রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হয়। সেই সময়ে ইনি অষ্টাদশ বর্ষমাত্র বয়ঃক্রমে ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞীপদ প্রাপ্ত হন। খ্রীঃ ১৮৪০ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারিতে, প্রিন্স

আলবার্ট ফ্রান্সিস্ আগষ্টস্ চার্লস্ এমান্থয়েল,ডিউক অব্ সাক্সি, প্রিন্স অব্ সাক্সি-কোবর্গ ও গথার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

খ্রীঃ ১৮৪০ অব্দে মহারাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ১৮৪১ অব্দে জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্ম হয়। খ্রীঃ ১৮৬১ অব্দে মহারাজ্ঞী বিধবা হন। তাঁহার রাজত্ব কাল নানা ঘটনা জালে জড়িত। তাঁহার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ প্রভৃতির কথা আমরা স্থানান্তরে উল্লেখ করিব।

এই সময়ে ভারত রাজ্যের সহিত মহারাণীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্বন্ধ ছিল না।

খ্রীঃ ১৮৩৯ অব্দের প্রারম্ভেই কলিকাতায় একটি মেকানিক্স্ ইন্‌ষ্টিটিউসন স্থাপনের কল্পনা হয়। ডাক্তর ফ্রেড্রিক করবিন্ প্রভৃতি এই বিদ্যামন্দির স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী।

ফ্রেড্রিক করবিন্ খ্রীঃ ১৭০৯ অব্দে মে মাসে মানচেষ্টর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীঃ ১৮১৩ অব্দে তিনি বঙ্গরাজ্যে চিকিৎসক হইয়া আগমন করেন। খ্রীঃ ১৮১৪ অব্দে তিনি সৈন্য চিকিৎসক হইয়া তরাই পথে নেপাল যাত্রা করেন। সৈন্যগণ তরাই অঞ্চলের ভয়ঙ্কর জ্বরে আক্রান্ত হয়। ইনি তাহাদের চিকিৎসা দ্বারা ঐ জ্বরের স্বরূপাদি বিশেষ রূপ বুঝিয়া খ্রীঃ ১৮১৮ অব্দে "তরাই জ্বরের" লক্ষণ ও চিকিৎসাদি বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি আরও কয়েক খানি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৮৩৪ অব্দে তিনি মেডিকেল জরনালের এডিটর হন, এবং খ্রীঃ ১৮৩৬ অব্দ হইতে ইণ্ডিয়া রিবিউ নামক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্র তিনি খ্রীঃ ১৮৪২ অব্দ পর্য্যন্ত চালাইয়া গ্রাণ্ট সাহেবের হস্তে উহার পরিচালন ভার অর্পণ করেন।

খ্রীঃ ১৮৩৯ অব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবারে টাউনহলে একটি বৃহতী সভা আহূত হয়। তাহা হইতে ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপন প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়।

প্রথমতঃ ডব্‌লইউ ব্রাইন সাহেবের বাটিতে একটি সমিতি আহূত হইয়া এই বিদ্যামন্দির স্থাপনের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে স্থিরীকৃত হয়; তদনুসারে জি, গ্রাণ্ট সাহেব একখানি অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত করেন। তৎপরে উল্লিখিত ২৬শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার অপরাহ্নে একটি মহতী সভা আহূত হয়, সর জন পিটর গ্রাণ্ট ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দিন জি, গ্রাণ্ট ও সি, গ্রাণ্টকে সম্পাদক, সর জন পিটর গ্রাণ্টকে সভাপতি ও রেবরেণ্ড টি বোয়াজ ও ডাঃ এফ্, করবিনকে সহকারী সভাপতি এবং ২৩জন এদেশীয় ও বিদেশীয় সভ্যে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়। ঐ দিনেই প্রায় ৭০০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ যেরূপ দেখা গিয়াছিল তাহাতে উহা স্থায়ী হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। প্রথম প্রথম ইহার কার্য্য টাউনহলেই হইত। কিন্তু ঐ স্থানের দৈনিক ব্যয় অনেক, এজন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাঁ শুসি থিয়েটরের অধ্যক্ষদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, তথায় বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করিলেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য একটি নিজস্ব বাটী নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট হাউসের পূর্ব্ব সম্মুখে একটি পুরাতন গৃহ স্থির হইল ও তাহার সংস্কার আরম্ভ হইল। এ দিকে বিদ্যালয় সাঁ শুসি থিয়েটার হইতে মিঃ ভস্ সাহেবের বাটিতে স্থানান্তরিত হইল। নূতন বাটি নির্ম্মিত হইলে, সি, গ্রাণ্ট একটি ড্রয়িং ক্লাস খুলিলেন, উহা সপ্তাহে দুইদিন মাত্র খোলা হইত। এই বিদ্যামন্দিরে যে সকল বিষয় বক্তৃতা দ্বারা শিখান হইত, তাহার কতক তৎকালিক সাময়িক পত্রে কতক বা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের অধঃপতন আরব্ধ হয়। ক্রমে আর লোক যুটিত না। ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

ঠিক এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হয়। এবং দ্বারকানাথ বিলাতে যাইবার জন্য ইচ্ছুক হন।

খ্রীঃ ১৮৪২ অব্দের ৩রা জুন কলিকাতায় একটি ভয়ানক ঝড় হয়।

এই বৎসরেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ দানশীল ধনী স্বর্গীয় মতিলাল শীলের দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সংপ্রতি উহার একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদিন উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভাড়াটিয়া বাটীতে ছিল।

খ্রীঃ ১৮৪২ অব্দের জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ বিলাত যাত্রা করেন।

দ্বারকানাথ বিলাত গমনে উদ্যত হইলে, তাঁহার দেশীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তাঁহার



স্বর্গীয় মহাত্মা মতিলাল শীল। The Late Baboo Maty Lal Sil.

সঙ্গে, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পরমানন্দ মৈত্র, তিনজন হিন্দু ভৃত্য, একজন মুসলমান খানসামা ও ডাক্তার ম্যাকগোয়ের বিলাত গিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ পথে নানাস্থান দর্শন করিয়া জুন মাসে ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। ১৬ই জুন মহারাণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রিটিস্ দ্বীপের নানাস্থান দর্শন করিয়া ও উপযুক্ত অভ্যর্থনা লাভ করিয়া ১৫ই অক্টোবর লণ্ডন ত্যাগ করেন এবং স্বদেশাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করেন।

খ্রীঃ ১৮৪২ অব্দের শেষে তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার সহিত জর্জ টমসন ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

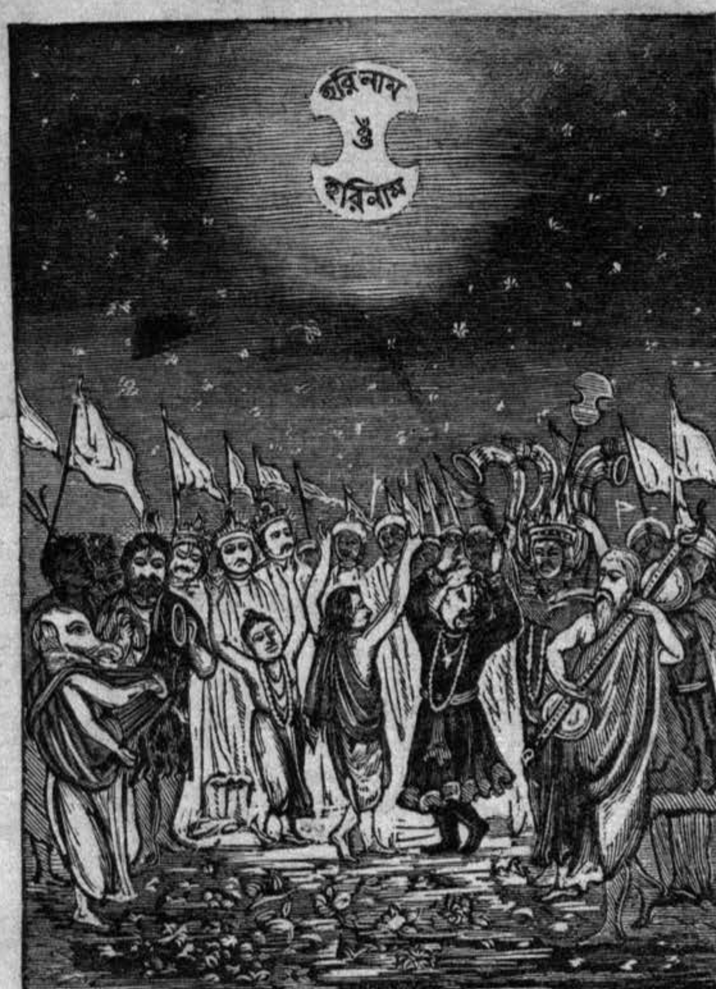
জর্জ টমসন খ্রীঃ ১৮০৪ অব্দের ১৮ই জুন লিবরপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা মাতা লণ্ডনে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের তাদৃশ সঙ্গতি ছিল না, এজন্য তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা প্রায় গৃহেই হইয়াছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়সে তিনি চাকরি করিতে নিযুক্ত হন এবং নানা প্রকার চাকুরি করিয়া খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে বিবাহিত হন। ইনি দাস-ব্যবসায় লোপের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডের নানাস্থানে এই দাস ব্যবসায় লোপের জন্য বক্তৃতা করিয়া লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। খ্রীঃ ১৮৩৪ অব্দে ঐ উপলক্ষেই তিনি সপরিবারে ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সে গমন করেন। সেখানে অনেকে তাঁহার শত্রু হয়। কিন্তু তিনি ভীত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি প্রাণপণে স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টা করিয়া, অনেককে আপনার দলভুক্ত করেন, অবশেষে খ্রীঃ১৮৩৬ অব্দে ইংলণ্ডে পুনরাগমন করেন। তথায় ভারত হিতকর অনেক বিষয়ের আন্দোলন করিয়া, অবশেষে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

ইনি কলিকাতায় আসিয়া তৎকালের যুবক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের মূল স্থাপিত করেন।

খ্রীঃ ১৮৪২ অব্দেই লর্ড অকলাণ্ড ভারত ত্যাগ করেন। তাঁহার ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে লর্ড এলেনবরা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।



হরিনাম।

কোথা সে বৈকুণ্ঠপুরী, জগতের কোন্ দিকে,
জান কেউ সন্ধান তাহার ?
ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে, সপ্ত স্বরগের ঊর্দ্ধে
জ্যোতির্ম্ময় বৈকুণ্ঠ বিহার।
পৃথিবীর এক কোণে দিবানিশি প'ড়ে আছি,
সপ্ত স্বর্গ কেমনে বুঝিব ?
সপ্ত স্বর্গ আগে বুঝে, তবে তো বৈকুণ্ঠ বোঝা,
এ বোঝা কেমনে সরাইব ?

হারে ভাগ্য! হারে আশা! হারে ও জ্ঞানের নেসা!
পৃথিবীর জালে বাঁধা তোরা ;
আমা হেন মানুষের হৃদয় অন্তরে মিশে,
আঁধারে হইলি দিশেহারা!
হারে আমি ক্ষুদ্র জীব! আঁধারে ডুবিয়ে আছি,
ধাঁধার ভুলনে ভুলে যাই ;
কোথা সে বৈকুণ্ঠপুরী, বুঝি বুঝি—বুঝি না যে,
পাই পাই—তবু যে হারাই।

ভয় নাই, ভয় নাই, পেয়েছি পেয়েছি, ভাই,
পেয়েছি রে, পা'বার যা' নয় ;
রেখে দে শাস্ত্রের কথা, ভেঙ্গেছে ধাঁধার বাঁধ,
বৈকুণ্ঠ তো আমার হৃদয়।
যেথা হরিনাম ছাপা পরতে পরতে চাপা,
সেই তো রে হরির আসন ;
যেথা হরিনাম ছাপা, সেথা হরিনাম লীলা,
খেলা করে হরিভক্তগণ।
যেথা হরিনাম ছাপা, সেথায় পার্থিব ভাব
তিলমাত্র—অণুমাত্র নাই ;
কি এক স্বর্গীয় ভাব উথলে উথলে ওঠে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভুলে যাই।
বাহির-হৃদয়ে চাই, হরিনাম-ছাপা পাই,
এই হরিনাম-ছাপা-গুণে
অন্তর-হৃদয়ে মোর, চেয়ে দেখি আঁখি মুদে,
মুগ্ধ হই হরিনাম শুনে।

ওই দেখ, ওই দেখ, অন্তর-হৃদয়ে মোর
বৈকুণ্ঠের জ্যোতির্ম্ময়ী রেখা ;
তা'র অতি ঊর্দ্ধভাগে অনন্ত জ্যোতির যোগে,
হরিযন্ত্রে হরিনাম লেখা।
কোটি কোটি জ্যোতির্ম্ময় ফুল বরিষণ হয়
জ্যোতির্ম্ময় অন্তর-হৃদয়ে ;
জ্যোতির বৈকুণ্ঠপুরী, জ্যোতির্ম্ময় হরিনাম,
জ্যোতির আনন্দ যায় ব'য়ে।
জ্যোতির প্রহ্লাদ, ধ্রুব, জ্যোতির চৈতন্যদেব
জ্যোতির্ম্মুখে হরিনাম গায় ;
জ্যোতির তরঙ্গ মাঝে জ্যোতির ত্রিমূর্ত্তি নাচে,
হরিনামে জ্যোতিরে ভাসায়।
জ্যোতির চতুরানন জ্যোতির্ম্ময় চতুর্ম্মুখে,
জ্যোতির্ম্ময়ী শিঙ্গা বাজাই'ছে ;
জ্যোতির নারদ মুনি জ্যোতির্ম্ময়ী বীণা-মুখে
'ওম্ হরিনাম' বলাই'ছে।

জ্যোতির্ম্ময় ভোলা শিব জ্যোতির্ম্ময় করতালে
তাল দিয়া বাঁকা হ'য়ে দোলে ;
জ্যোতির্ম্ময় গজানন জ্যোতির্ম্ময় চারি হাতে
জ্যোতির্ম্ময় খোলে রব তোলে।

হৃদয়-বৈকুণ্ঠে মোর
কি এক ভাবের ঘোর,
আনন্দে হইনু ভোর, ভুলে গেল প্রাণ ;
ওই শুন, ওই শুন, হরিনাম গান ;—

ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও চৈতন্য।
[কীর্ত্তন-গীতি]
(আস্থায়ী)
হরিনাম গান কর্ মনুয়া মেরো,
ভব-ডর, ভব-জ্বর ঘুচ্ গেই তেরো।
(অন্তরা)
ভুল্ যা রে মেরো মনুয়া।
পাপ নরক কি দুনিয়া,
লোভ লাভ সব ফেঁক দে না,
আপ্না মায়া ছোড়ো।
(শাখান্তরা)
সকলে।—হরিনাম! হরিনাম! ওম্ হরি নাম!
ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও চৈতন্য।
যো জন হরিনাম গাওয়ে,
সো জন হরিপদ পাওয়ে,
আপদ বিপদ খোয়ে,
সুর নর পূজহি তাকো :—
(আভোগ)
তা' সম কঁহি নহি মিলে,
হরিনাম-প্রেম-সলিলে
সো জন নিমগন হোই
করে বৈকুণ্ঠ-বিহারো।
(শাখাভোগ)
সকলে।—হরিনাম! হরিনাম! ওম্ হরিনাম!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত।

বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের একটি প্রদীপ্ত নক্ষত্র অনন্ত কাল-সাগরে চিরকালের জন্য ডুবিল। বঙ্গভাষা আজ পিতৃহীন হইল। "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব দ্বাদশ বৎসরের সম্পাদক—বঙ্গ ভাষার জীবনদাতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন!

যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলাম না, কিন্তু বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের প্রণীত অক্ষয় বাবুর বিচিত্র জীবনী পাঠে আমাদের অনেকাংশে কৌতূহল নিবৃত্ত ও মনের তৃপ্তি সাধিত হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু আমাদের নিকট অক্ষয় বাবুর বস্ওয়েল রূপে পরিচিত হইলেন। বস্তুতঃ এরূপ বস্ওয়েলী জীবনী বাঙ্গালায় আর আছে বলিয়া আমরা জানি না।

মহেন্দ্র বাবুর উক্ত জীবনী খানি সম্মুখে রাখিয়া আমরা এস্থলে এইটুকু সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

১২২৭ সালে নবদ্বীপের নিকট চুপী নামক গ্রামে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত ও মাতার নাম দয়াময়ী। পিতা মাতা উভয়েই দয়ালু, অমায়িক, পরোপকারী, প্রবল বুদ্ধিবিশিষ্ট ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। বাল্যকালে তিনি অতি সুশীল, শান্ত, বিনীত, বুদ্ধিশালী, শিক্ষানুরাগী ও অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি খিদিরপুরে তাঁহার পিতার বাসায় আসিয়া অবস্থিতি করিয়া ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন।

তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যেরূপ শিক্ষা বিরোধী প্রতিকূল ঘটনা-পরম্পরা বর্ত্তমান ছিল, তাঁহার প্রবল জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা, নিরতিশয় উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় ছিল বলিয়া তিনি তৎসমস্ত অনেকাংশে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। দারিদ্র্য, আত্মীয় স্বজনের যত্নের অভাব ও নিরুৎসাহ এবং বিধির বিড়ম্বনা—দারুণ-শিরঃপীড়া, এই কয়টি দুর্দ্দৈবই সমবল সহকারে তাঁহার শিক্ষাকার্য্যের বিরোধী ছিল। তাঁহার ৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে 'হাতেখড়ি' হইলেও নিজগ্রামে গুরুমহাশয়ের অভাবে দুই বৎসর কাল বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। ১১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার নিজের আগ্রহাতিশয় ও যত্নে তিনি ভবানীপুরের "ইউনিয়ন স্কুল" নামক তত্রত্য একমাত্র মিশনরি বিদ্যালয়ে স্ব ইচ্ছায় প্রবেশ করেন। ১৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া গৌরমোহন আঢ্যের 'ওরিয়েণ্টল সেমিনরিতে' ভর্ত্তি হন। ইতিপূর্ব্বে কয় বৎসর একপ্রকার অনর্থক নষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। মোটে ২॥০ বৎসর কাল মাত্র তাঁহার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ঘটিয়াছিল। অসমর্থ্য নিবন্ধন ফ্রি পড়িতেন। পঠদ্দশায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অর্থ চিন্তায় ইহাঁকে অগত্যা স্কুল ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এমনই জ্ঞান-পিপাসা যে এখন হইতে তিনি অধিকতর যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বিদ্যালাভ করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া লোকের বিদ্যা সাঙ্গ হয়, কিন্তু অক্ষয় বাবু স্কুল ছাড়িয়া প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা আরম্ভ করেন। বিদ্যালয়ে তিনি অল্পমাত্র জ্যামিতি ও সমগ্র পাটীগণিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্কুল হইতে বহির্গত হইয়া ১ বৎসরের মধ্যে ত্রিকোণোমিতি, কনিক্ সেক্সন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গণিত এবং জ্যোতিষ, যন্ত্রবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাগুলি অধিকৃত করেন। এতদ্ব্যতীত ফ্রেনলজি, মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, শারীরবিধান প্রভৃতি বিষয়ক বিবিধ পুস্তক ও ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ক প্রধান প্রধান পুস্তকগুলি গৃহেই অধ্যয়ন করেন।

উপন্যাসপাঠে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ অধ্যয়নে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়া দেশের স্থায়ী উপকার করিতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষারই বিশিষ্ট আলোচনা করেন, এবং তাহাতে সমধিক অধিকার লাভ জন্য সংস্কৃতও শিক্ষা করেন। তিনি কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের নিকট প্রথমতঃ কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। পরে উক্ত কবিবরের 'সংবাদ প্রভাকর' নামক পত্রিকায় গদ্যে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন।

এই সময়ে অর্থঘটিত দুরবস্থা নিবন্ধন তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি স্বাধীন ব্যবসায় অথবা চাকরীতে তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। ব্যবসায় ও চাকরী করাকে তিনি "ইহকালেই নরকভোগ" করা জ্ঞান করিতেন, ঈশ্বর গুপ্তের সহিত শূন্যভাগী হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় তিনি বলেন, "এটি আমার কর্ম্ম নয়। শূন্য-ভাগী হওয়ার কথা দূরে থাকুক, পূর্ণ ভাগী হইতে পারিলেও আমি তাহাতে সম্মত নহি।" অনেক আত্মীয় তাঁহাকে আইন



স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত। The Late Baboo Akhoy Koomar Dutta

শিক্ষা করিতে অনুরোধ করায়, তিনি এই উত্তর দেন, "যে নিয়ম নিত্য নিত্য পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা শিক্ষা করিয়া আমার কি ফল লাভ হইবে? আমি জগতের অপরিবর্ত্তনীয় স্বাভাবিক নিয়ম (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) শিক্ষা করিতে চাই। তদ্দ্বারা আমার নিজের ও অপর সাধারণের হিতসাধন হইতে পারিবে। যাহাতে নিজের জ্ঞানোন্নতি ও সাধারণের হিতসাধন না হয়, এমন কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া ও তাহা লইয়া আমি জীবন অতিবাহিত করিতে পারি না।"

১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, ১৭৬১ শকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সভাশ্রেণীভুক্ত হন, এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জনৈক শিক্ষক রূপে মাসিক প্রথমে ৮৲ পরে ১৪৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে নিযুক্ত থাকেন। ইহার ৩ বৎসর পরে তিনি 'বিদ্যাদর্শন' নামক সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারারম্ভ করেন। এবম্বিধ জ্ঞানগর্ভ ও নীতিপূর্ণ অথচ মনোরঞ্জন প্রবন্ধময় পত্রিকার অভ্যুদয় এই প্রথম হয়। তাহার পর আজ পর্য্যন্ত সেই আদর্শে কত পত্রিকাই প্রকাশিত হইয়া আসিল। পরে ১৭৬৫শকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সম্পাদকতার ভার প্রাপ্ত হন। ধর্ম্ম তত্ত্বের জ্ঞান প্রচারিত করা ঐ পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার যত্ন ও প্রগাঢ় পরিশ্রমে উহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত, দর্শন-শাস্ত্র প্রভৃতি নানা সারগর্ভ বিষয় সন্নিবিষ্ট হইতে থাকে। ঐ পত্রিকা তিনি একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর কাল অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন।

'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদন করিতে করিতে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া রসায়ন-বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্ বিদ্যার অনুশীলন করেন।

১২৫২ সালে তিনি কলিকাতার নর্ম্মাল ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন।

১৮৫৮ শকে ও তার পর বৎসরে পর পর তিনি বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের ১ম ও ২য় ভাগ প্রচারিত করেন। এই দুইখানি পুস্তক জর্জ কুম্ব সাহেবের Constitution of Man নামক গ্রন্থের সারসংকলন অনুবাদ। জগদীশ্বর বাহ্য বস্তু সমূহ ও মানব প্রকৃতির সহিত পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কোন্ গুলির কিরূপ পালনে আমাদের কিরূপ সুখ এবং কোন্ গুলির লঙ্ঘনে কিরূপ অসুখ হয়, তদ্বিষয়ক তত্ত্ব তন্মধ্যে আলোচিত হইয়াছে।

ইহার পরে, ১২৬১ শকে, পর পর ১ম ও ২য় ভাগ চারুপাঠ প্রণয়ন করেন। ১২৬৩ সালে তৃতীয় ভাগ 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থ-বিদ্যা' প্রকাশিত হয়। এই তিনখানি পুস্তক সরল, সারগর্ভ, মনোহর বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ। 'চারুপাঠ' 'ধর্ম্মনীতি' ও 'বাহ্যবস্তু' এই কয়খানিই তত্ত্ববোধিনী গর্ভপ্রসূত।

১৭৭৭ শকের আষাঢ় মাসে তিনি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। এই রোগ উপলক্ষে তাঁহাকে জন্মের মত লেখনী ত্যাগ করিতে হইল। হস্ত নিরস্ত হইল বটে কিন্তু, মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতে লাগিল এবং এরূপ পীড়িতাবস্থাতেই ১৭৯২ শকে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ১ম ভাগ ও ১৮০৪ শকে উহার ২য় ভাগ পরিসমাপ্ত করেন। তিনি যে কিরূপ পীড়িতাবস্থায় এবম্বিধ প্রগাঢ় গবেষণা ও বহু শ্রমসাপেক্ষ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে মন এককালে বিস্ময় ও করুণ রসে মগ্ন হয়।

অক্ষয় বাবু পীড়িত হওয়া অবধি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা ছাড়িয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও কিছু কিছু কাল অবস্থিতি করিতে থাকেন। শেষে বালি গ্রামে একটি বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে কেবল কয়েকটি পরিচারক মাত্র লইয়া বাস করেন। তিনি বহু যত্ন ও ব্যয়ে দেশী বিদেশী, সাধারণ অসাধারণ নানাবিধ বৃক্ষ লতা গুল্মাদি সংগ্রহ করিয়া এই বাটীর অঙ্গনে একটী রমণীয় পুষ্পোদ্যান করিয়া রাখেন। ঐ উদ্যান অবলম্বন করিয়া কালহরণ করিতে থাকেন। তাঁহার জনৈক সহৃদয় বন্ধু ঐ লোক-প্রসিদ্ধ সুচারু উদ্যানের "চারুপাঠ ৪র্থ ভাগ" নাম রাখিয়াছেন। ঐ উদ্যানটিকে উদ্ভিদ্ রাজ্যের সংক্ষিপ্তসার বা উদ্ভিদ্ বিদ্যা শিক্ষার উপযোগী পরীক্ষণ ক্ষেত্র স্বরূপ বলা যায়। সমাজ ও স্বপরিবার হইতে অপসৃত হইয়া ঐ উদ্যান-বাটী মধ্যে নির্জ্জনে জীবন্মৃতাবস্থায় শেষ কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার গৃহ-সজ্জা সামগ্রী সমূহও বিজ্ঞানার্থীগণের প্রীতির আস্পদ। গৃহের চারিদিকে নানাপ্রকার সিন্ধুজাত শঙ্খ, শম্বুক, প্রাণীদেহ, জীবকঙ্কাল, নানাবর্ণের প্রবাল, প্রস্তর এবং প্রস্তরীভূত বহুবিধ উদ্ভিজ্জ ও জীব শরীর(Fossils) প্রভৃতি অসামান্য বস্তু সমুদায় মনোহর ভাবে সজ্জিত। এতদ্ব্যতীত কয়েক প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, বিবিধ ভূচিত্র, দেশীয় ও বিদেশীয় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের প্রতিকৃতিও গৃহ-সজ্জার মধ্যে; এই সমস্ত সামগ্রীর সহিত তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট। এরূপ কৌতুহল-উদ্দীপক ও জ্ঞানদায়ক মনোরম দুর্লভ সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত উদ্যান-বাটি বিরল।

এবম্বিধ গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, তিনি দুইভাগ সুবৃহৎ

উপাসক সম্প্রদায় পরিসমাপ্ত করেন। জীবন্মৃতাবস্থায় এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন অসাধ্যসাধন বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থের ২য় ভাগের উপক্রমণিকার একটুকু এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। তৎপাঠে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয়।

"শরীরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এতদূর চলিল, তাহা কি বলিব? না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থ প্রণয়ন কোন রূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নই। * * অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ়-ভাব-সম্বলিত চিন্তা-প্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিকের স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তা-স্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদায় এবং যাহা কিছু অন্য রূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ মস্তক মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে, যান-বাহন দ্বারা দূরস্থিত বন্ধু বিশেষের সমীপে গমন পূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ করি। অর্দ্ধরাত্রেও নিদ্রাকাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া কতবার কত বিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া, সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবনা থাকিত না। মনোমধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিন্তন ও আন্দোলনেও কষ্ট, নিজে দূরে থাকুক, অন্য দ্বারা তাহা লিপিবদ্ধ করাইতেও কষ্ট, এবং যে পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। এই রূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পংক্তি, কখন দুই চারি পংক্তি, কখন দুই চারিটি বা দুই একটি শব্দমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়।"

বালীর উক্ত বাটীতে নির্জ্জনে অবস্থিতি কালে তাঁহাকে "তত্ত্ববোধিনী সভা" হইতে মাসিক ২৫ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রদান করা হয়। পরে যখন আপন পুস্তক বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ হইতে তাঁহার সকল ব্যয় সংকুলান হইতে লাগিল, তখন তিনি সেই বৃত্তি ত্যাগ করেন।

নিঃস্বার্থ জ্ঞান-চর্চ্চা ও স্বদেশবাসীর মঙ্গল সাধন করিবার জন্যই তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আপনি শিখিব ও সাধারণকে শিক্ষা দিব, ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। "জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত একান্ত-মনে চেষ্টা করা এবং সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকা উচিত," এই কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহার অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। সেই কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতেই তাঁহার সমগ্র রচনাবলী নিঃসৃত হইয়াছে। অর্থ, পদ, মান ও যশের আকাঙ্ক্ষা, স্বজনবর্গের অনুরোধ প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহাকে সেই কর্ত্তব্যজ্ঞানানুমোদিত সদনুষ্ঠান হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধ অকপট মনে ও প্রবল চিন্তাবেগে রচিত, সুতরাং তৎসন্নিবিষ্ট বিষয়গুলি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেই তাঁহার রচনার ওজস্বীতাগুণ। স্বয়ং সত্য-নিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ, দয়ালু ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার রচনাও সরল, মধুর, সারবান, সরস, বিশুদ্ধ ও নীতিপূর্ণ।

প্রকৃতই "তিনি আপন সময়ের এবং আপন দেশেরও অতীত বস্তু।" যখন বঙ্গভাষা অপুষ্ট, ক্ষীণ ও নির্জ্জীব ছিল, ভাষায় বিজ্ঞানাদির অস্তিত্বই ছিল না, সাহিত্য-জগতের এবং সমাজের নৈতিক বায়ু বড়ই দূষিত ছিল, সেই সময়ে অক্ষয় বাবু নির্জ্জীব বঙ্গ-ভাষাকে তেজস্বিনী করিয়াছেন, অনেক নূতন কথা প্রস্তুত করিয়া, নূতন বাক্য বাহির করিয়া ও নূতন ধরণের রচনা প্রণালী আবিষ্কৃত করিয়া ভাষাকে পুষ্ট করিয়াছেন ও স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার পর তাহাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিতও করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভূত সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেশের ধর্ম্মনীতির স্রোত ফিরাইয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক ভাষার জন্ম প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গভাষা গর্ব্ব করিয়া বলিতেই পারেন,—

"কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয় কুমার॥"

অক্ষয় বাবু স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদনে কিরূপে সক্ষম হওয়া যায়, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারই মানব জন্ম সার্থক। এবম্বিধ মহাত্মাই ভাষার গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরব, মনুষ্য নামের গৌরব। এরূপ আদর্শ চরিত্র অনুকরণের যোগ্য।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু উপলক্ষে অক্ষয় বাবু একদিন কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে।" আজ অক্ষয়কুমারকে হারাইয়া আমাদের আর একটি মৃতাশৌচ গণনা করিতে হইল। আমাদের এ মৃতাশৌচও চিরকালই চলিবে।

এক বৃন্তের কুসুম জোড়ার একটি শুকাইলে, এক বোঁটার দুইটি ফলের একটি খসিলে, মাণিক জোড়ের একটি অপহৃত হইলে অবশিষ্টটির আশা যেমন কমিয়া যায় ও তাহার প্রতি যত্ন ও মমতা সমধিক বাড়ে, অক্ষয় বাবুকে হারাইয়া, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মাননীয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে আজ আমাদের সেই দশা,—তাঁহার জন্য আমাদের উদ্বেগ বাড়িল। তাঁহার দীর্ঘজীবন আমরা কায়মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

THE ELECTRIC TELEGRAPH.

(২২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

ব্যাটারী সংলগ্ন তার দুইটি ব্যাটারী হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাখিলেও যখন তাহাদের দুইপ্রান্তে পূর্ব্বোল্লিখিত পরীক্ষা সমূহের কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখা যায়, তখন তাহাতে সুতরাং এই বুঝিতে হইবে যে, ব্যাটারী মধ্যে যে শক্তি বা বলের উৎপত্তি হয়, সেই বল ঐ তারের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইয়া তথায় ঐ সমস্ত কার্য্য করে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এখন দেখিতে হইবে ঐ বলের কিরূপ গুণ থাকিলে তবে উহা ঐ রূপ সমস্ত কার্য্য-করণে সক্ষম হয়?—নিমেষ মধ্যে উহা কোটী কোটী ক্রোশ গমন করিতে পারে? উহার দ্রুতগামীতার বেগ অতি বিস্ময়-কর। উহা অপরিমিত ত্বরিত বেগের উদাহরণস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শব্দ, আলোক ও বন্দুকের গুলি যে এত দ্রুত-গামী, তথাপি উহারা তাড়িতের গতির কাছে হারি মানিয়া যায়। জড়দেহবিশিষ্ট কোন পদার্থ কিরূপে এরূপ গতিযুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনায়ও স্থির করিতে পারি না। আর জড়ময় হইলে ত উহার ভারিত্বও থাকিবে। তাড়িত স্রোত-বাহী তারে তাহারও ত কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। ব্যাটারী সংলগ্ন তার স্বাভাবিক অবস্থায় যত ভারি, তন্মধ্য দিয়া তাড়িতবল প্রবাহিত হইলেও তাহার গুরুত্ব কিঞ্চিন্মাত্রও বাড়ে না। সেই তারকে কাটিয়া ফেলিলে তন্মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাড়িত-বলকে জল ও বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম (সে সূক্ষ্মতার কল্পনাও আমরা মনে করিতে অক্ষম)—এমন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম তরল (অতীব সূক্ষ্ম বা পাতলা হইলেই সুতরাং তরল ভাবাপন্ন হইবে) পদার্থই বলিতে হয়। অনেকে আবার ইহাকে পদার্থগত পরমাণুর অবস্থা বা ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া থাকেন।* ইহার স্বরূপ বা ইহা প্রকৃত কি পদার্থ তৎসম্বন্ধে মত যাহাই হউক, ফলে যে মত ধরিয়া তাড়িতের তাবৎ কার্য্য বুঝান যায়, যদি সমস্ত কার্য্যের কোনটিই ঐ মতের বিরোধী না হয়, তবে বলিতে হইবে যে, সেই মত ঠিক হইলেও হইতে পারে। তন্নিমিত্তই সচরাচর ইহা তাড়িত-তরল বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া থাকে এবং সেই জন্যই ইহার গতিবাচক 'স্রোত' ও 'প্রবাহ' পদদ্বয় ব্যবহৃত হয়। এবম্বিধ ব্যাটারী-জনিত তাড়িতকে গতিশীল তাড়িত কহে।

পাঠক, তাড়িতের স্বরূপ আমরা কি বুঝিব, উনবিংশতি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম তাড়িত-বিজ্ঞানবিশারদ জগদ্বিখ্যাত স্যর হম্‌ফ্রে ডেভির এ সম্বন্ধে কি মত দেখুন;—কোন সময়ে ব্রিটিস বৈজ্ঞানিক সভার এক বিরাট অধিবেশন আহূত হয়। সভাস্থলে তদানীন্তন প্রধানতম খ্যাতনামা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ উপস্থিত হন। সভামধ্যে তাড়িতের স্বরূপ লইয়া ঘোর তর্ক বিতর্ক হইয়া গেলে, শেষে সমবেত সভ্য-মণ্ডলীর অভিমতানুসারে সভাপতি ডেভির তদ্বিষয়ে কি মত জিজ্ঞাসা করা হয়। তদুত্তরে ঐ মহাত্মা বলেন,—"এক সময়ে আমার এরূপ ধারণা ছিল যে, প্রভূত পর্য্যালোচনা করিয়া তাড়িতের বিষয় আমি কিছু বুঝিয়াছি; কিন্তু আমার যত বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর তাড়িত-তত্ত্বের যতই আলোচনা করিতেছি, ততই আমার এই বিশ্বাস বলবৎ হইতেছে যে, তাড়িতের স্বরূপ বা উহা যে কি, তৎ-সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হই নাই,—তদ্বিষয় আমি কিছুমাত্রই জানি না।" যাঁহারা ইহার চূড়ান্ত আলো-চনা করিয়াও কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই, তখন কোন কালে যে স্থির নিশ্চয় হইবে তাহাও বলা যায় না। আমা-দিগের এরূপ ধারণা যে, তাড়িত-বল বা একমাত্র মহা-শক্তিই ঈশ্বরসৃষ্ট-বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল। মনুষ্য তাড়িত বা ঐ মহা-শক্তির স্বরূপ বুঝিতে যখন সক্ষম হইবে, তখন তাহার মনুষ্যত্ব ঘুচিয়া গিয়া দেবত্ব প্রাপ্তি হইবে। প্রিয় পাঠক! হাসিবেন না, ইহা বড় গুরুতর বিষয়। তাড়িত তত্ত্বালো-চনা মনুষ্যকে যে কত উন্নত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা এক্ষণে ঠিক বলা যায় না।

* এই শক্তিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কৈন্দ্রিক-শক্তি (Polar Force) নাম দিয়াছেন। এই মতে তাড়িত-প্রবাহযুক্ত তারের প্রত্যেক পরমাণু দ্বিবিধ (যোগ ও বিয়োগ) শক্তি সমন্বিত হয়। তাহাতেই সমগ্র তারের একদিকে যোগ ও তদ্বিপরীত দিকে বিয়োগ-বল প্রবাহিত হয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা হইলে তাড়িত-শক্তি উত্তেজক মূল ব্যাটারী হইতে বহুদূর বিস্তৃত তারের সমগ্র পরমাণু পরম্পরার কেমন করিয়া এবম্বিধ ত্বরিতবেগে এককালে ধর্ম্মান্তর বা অবস্থান্তর হইয়া দাঁড়ায় তাহা কল্পনার অতীত। সুতরাং বুঝিবার সুবিধার জন্যই ঐ শক্তিকে অতীব সূক্ষ্ম, ভারহীন, অপরিমিত দ্রুতগামী তরল পদার্থ স্বরূপ ধরিয়া লওয়া যায়।

ব্যাটারী সম্বন্ধে যতদূর বলা গেল তাহাতে স্থির হইল যে, আধার পাত্রটি ছাড়াও উহার তিনটি উপকরণ বা উপাদান;—১ম, দুইখানি দুই প্রকার ধাতুর ফলক; ২য়, একটি তরল পদার্থ; ৩য়, সংযোজক তার। এই তিনটি উপাদানের উপযুক্ত সংযোজনায় বলশালী ব্যাটারী প্রস্তুত করিতে হইলে কতিপয় নিয়ম পালন করিতে হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বহুতর পরীক্ষা ও প্রভূত পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সেই নিয়মগুলি অবধারণ করিয়াছেন। ব্যাটারী পাত্রে যে দুইখানি দুই প্রকার ধাতু-ফলক অম্লাক্ত জলমধ্যে নিমজ্জিত রাখিতে হয়, তন্মধ্যে একখানি ফলকের অম্লজান সহিত প্রবল রাসায়নিক আকর্ষণশক্তি আছে এবং অপর খানির সহিত অম্লজানের সংশক্তি এত অল্প যে, তাহা অনুভূত হয় না। অম্লজানের সহিত ফলক দুইখানির রাসায়নিক সম্বন্ধের এবম্বিধ বৈষম্যই ব্যাটারীমাত্রেরই তাড়িতোদ্ভাবনার মূলীভূত কারণ। এই বৈষম্যের ন্যূনাধিক্যানুসারেই উত্তেজিত তাড়িত-বলেরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।—অর্থাৎ একখানি ফলকের সহিত অম্লাক্ত জলের অত্যন্ত বেশী রাসায়নিক সম্বন্ধ, তন্নিমিত্ত পাত্রস্থ অম্লাক্ত বারি বিশ্লিষ্ট করে ও নিজেও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং অপরখানির সহিত অম্লজানের মূলে সম্বন্ধ নাই বলিলেও হয়, সুতরাং মূলে বারি বিশ্লিষ্ট করে না, ও নিজেও ক্ষয় হয় না। তবেই ব্যাটারী রচনা করিতে হইলে এমন দুইটি ধাতু বাছিয়া লইয়া তাহার দুইখানি ফলক প্রস্তুত করাইতে হইবে যে, অম্লাক্ত জল সংস্রবে উহাদের একখানি ক্রমশঃই দ্রব হইতে থাকিবে এবং অপরখানি সমভাবেই থাকিবে, তাহার আদৌ আয়তন ক্ষয় হইবে না। এইরূপ দুইটি ধাতুনির্ম্মিত দুইখানি ফলক অম্লাক্ত জল সংযোগে সর্ব্বাধিক গতিশীল তাড়িত উৎপন্ন করিবে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, দস্তা সকল ধাতু অপেক্ষা অম্লাক্ত জলে অধিকতম দ্রবশীল বা রাসায়নিক বিশ্লেষণপরায়ণ এবং প্লাটিনম্ সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূনতম দ্রবশীল বা রাসায়নিক বিশ্লেষণপরায়ণ। সুতরাং এই দুই ধাতু নির্ম্মিত দুইখানি ফলক সর্ব্বাধিক তাড়িতজনক।

১। প্লাটিনম্।	৫। শীশ।
২। স্বর্ণ।	৬। টিন্।
৩। পারদ।	৭। লৌহ।
৪। তাম্র।	৮। দস্তা।

এই তালিকায় ক্রমশঃ অধিকতর দ্রবশীল ধাতু বিন্যস্ত হইল। তন্মধ্যে যে কোন দুইটির যোগে হউক ব্যাটারী রচিত হইতে পারে। তবে তালিকার মধ্যে দুইটি পরস্পর যত দূরবর্ত্তী দেখিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লইবে, তাহাদের সংযোজনায় ব্যাটারী ততই বলশালী দাঁড়াইবে। দস্তা ও লৌহে যে বল দাঁড়াইবে, দস্তা ও টীনে তদপেক্ষা অধিক, এইরূপে দস্তা ও প্লাটিনমে সর্ব্বাধিক বল দাঁড়াইবে। সচরাচর ব্যাটারীর একখানি ফলক দস্তারই হইয়া থাকে, আর অপর খানি, প্লাটিনম্, লৌহ, রৌপ্য অথবা তাম্রের ব্যবহৃত হয়। ব্যয় সুলভ জন্য প্রায়ই দস্তা ও তাম্রই ব্যবহৃত হয়। ব্যাটারী বিশেষে দ্বিতীয় ফলকখানি ধাতুনির্ম্মিত না হইয়া অঙ্গারের হইতে দেখা যায়। ব্যাটারীতে যদিও দুইখানি ফলকের নিয়োগ আছে, কিন্তু কেবল মাত্র একখানির রাসায়নিক কার্য্য হইতে তাড়িত-বলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তবে অপরখানি কি কেবল সাক্ষীগোপাল স্বরূপ ব্যাটারীপাত্রে বিদ্যমান থাকে? তাহা নহে। তাহার অভাবে প্রথমখানির কার্য্যকারিতাই থাকে না। উহা দস্তাফলকের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া পাত্রমধ্যে রাসায়নিক-কার্য্য ও তাড়িত-বল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করে। আবার সেই উৎপন্ন তাড়িতকে সঞ্চয় করিয়া সংযোজক তারে সঞ্চালিত করিয়া দেয়। সেই জন্য ঐ দ্বিতীয় ফলকখানিও কোন পরিচালক পদার্থ নির্ম্মিত হওয়া চাই। ধাতু ব্যতীত আরও অনেক পরিচালক পদার্থ আছে। তন্মধ্যদিয়া গতিশীল তাড়িত অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। অঙ্গার তাহার মধ্যে একটি; তন্নিমিত্ত কোন কোন ব্যাটারীতে ঐ দ্বিতীয় ফলকখানি সুদগ্ধ মৃদঙ্গার (পাথুরিয়া কয়লা) বা কোক্ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উহা দ্রাবকে মূলে দ্রব হয় না। সেই জন্য প্লাটিনমের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইলে ব্যাটারীর সর্ব্বাধিক বলাধিক্য দাঁড়ায়। তবে অঙ্গারের ফলক প্রস্তুত করা বড়ই ভজকট। তাহাতেই সাধারণতঃ ব্যাটারীতে দস্তা ও তাম্র ফলকেরই নিয়োগ প্রচলিত আছে।

এক্ষণে ব্যাটারীর দ্বিতীয় উপকরণটি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। ফলকদ্বয় ব্যাটারীর প্রধানতম অঙ্গ হইলেও তাহারা তাড়িত-বলোদ্ভাবনার মধ্যবর্ত্তী সহকারী স্বরূপ মাত্র। যেহেতু যে তরল পদার্থ মধ্যে উহারা নিমজ্জিত থাকে, তাহারই রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতে তাড়িত-বলের উৎপত্তি। সুতরাং দ্বিতীয় উপাদান তরল পদার্থই ব্যাটারীর প্রাণস্বরূপ। ঐ তরল পদার্থস্থলে জলই প্রশস্ত। দস্তার সহিত অম্লজান বাষ্পের প্রবল রাসায়নিক সংশক্তি থাকায়, জলের উপাদানদ্বয় অম্লজান ও উদজান পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়। আবার ব্যাটারী মধ্যে দস্তা, তদ্রূপ বিশ্লেষণশক্তি শূন্য কোন পরি-

চালকের সহিত সংলগ্ন থাকিলে, উহার উক্ত বিশ্লেষণী শক্তি সমধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অধিকন্তু জলের বিশ্লিষ্ট উদজান পরমাণু সমূহ ঐ দ্বিতীয় ফলকে আকৃষ্ট হয় এবং সংসঙ্গে উৎপন্ন তাড়িত-বলও তথায় নীত হইয়া থাকে। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, শুদ্ধ জলে ফলকদ্বয় নিমজ্জিত রাখিলেও রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হইবে; তবে জলে দ্রাবক মিশ্রিত করিয়া দিবার প্রয়োজন এই যে, জলাপেক্ষা দ্রাবক তাড়িতের উত্তম পরিচালক; তন্নিমিত্ত অম্লাক্ত জল সহকারে তাড়িতের গতির অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। অধিকন্তু দ্রাবকের অম্লজান সহিতও দস্তার রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হইয়া তাড়িত-বলের আধিক্য হইয়া থাকে।

ব্যাটারীর যোগফলককে পারদ মণ্ডিত করিয়া লইবার প্রয়োজন এক্ষণে বুঝিয়া দেখ।

প্রথম পরীক্ষাটিতে দেখা গিয়াছে যে, শুদ্ধ দস্তা-ফলক দ্রাবক মিশ্রিত জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে, যতক্ষণ দ্রাবক অথবা দস্তা নিঃশেষিত না হইবে, ততক্ষণ তন্মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য চলিতে থাকিবে। তাহাতে দস্তাও ক্রমে গলিতে থাকিবে। কিন্তু দস্তা-ফলককে পারদ-মণ্ডিত করিয়া লইলে, অম্লাক্ত জলে নিমজ্জিত করিবামাত্র কেবল একবার মাত্র রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হইয়া বিশ্লিষ্ট উদজান বুদ্‌বুদ দ্বারা ফলক-গাত্র আবৃত হইয়া যাইবে। তখন রাসায়নিক কার্য্য বন্দ হইবে। ঐ বুদ্‌বুদগুলি ফলককে রাসায়নিক কার্য্য হইতে রক্ষা করে। আর সেই পাত্রে তাম্রফলক মগ্ন করিয়া দিয়া তাহার সহিত ঐ দস্তা-ফলককে সংযুক্ত করিলে পুনঃ রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তাহার সহিত তাড়িত-বলও উৎপন্ন হয়। আবার ফলকদ্বয় বিযুক্ত করিবামাত্র রাসায়নিক কার্য্য স্থগিত থাকে। ইহার কারণ এই যে, দস্তা-ফলক তাম্র-ফলকের সহিত সংযুক্ত হইলে, দস্তা ও জলের পরস্পর রাসায়নিক কার্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দস্তা-ফলক খাঁটি দস্তা নির্ম্মিত হইলে, এই পরীক্ষার ফল সমান দাঁড়াইবে; অর্থাৎ যতক্ষণ ফলক দুইখানি পরস্পর সংযুক্ত থাকিবে, ততক্ষণ মাত্রই রাসায়নিক কার্য্য ও তাড়িত-বলের উদ্রেক হইবে, আবার বিযুক্ত করিয়া দিবামাত্র তদুভয়ই তিরোহিত হইবে। কিন্তু ঐ ব্যাটারীর দস্তা-ফলকখানি মিশ্রিত দস্তা নির্ম্মিত হইলে, ফলকদ্বয় পরস্পর সংযুক্তই থাকুক অথবা বিযুক্তই হউক, রাসায়নিক কার্য্য একাদিক্রমে চলিতে থাকিবে। ফলকদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত থাকিলেও যে রাসায়নিক কার্য্য চলে, তাহার কারণ এই, ভ্যাজালযুক্ত দস্তায় লৌহ, শীশ, টিন্ প্রভৃতি যে সকল অপর ধাতু মিশ্রিত থাকে, তৎসমুদয়ে আর ঐ দস্তা-ফলকের খাঁটি দস্তাংশে পরস্পর অম্লাক্ত জল সংযোগে সমগ্র দস্তা-ফলকের গাত্রোপরি অসংখ্যক ক্ষুদ্র তাড়িত-স্রোত উৎপন্ন হয়। ভ্যাজাল ধাতুগুলি বিয়োগ ফলক আর বিশুদ্ধ দস্তাংশ যোগ ফলক স্বরূপ হইয়া দ্রাবকাক্ত জল সহযোগে যেন অসংখ্য স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাটারী স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাকেই ব্যাটারীর স্থানিক কার্য্য (Local Action) কহে। ব্যাটারীর তাড়িত স্রোত কোন কার্য্যে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন না হইলে, তখন সংযোজক তার দুইটিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও উক্ত স্থানিক কার্য্যোৎপন্ন তাড়িত-স্রোত বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। আরও তাহার সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া বশতঃ দস্তা ও অম্লাক্ত জলেরও কিয়দংশ বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানিক-কার্য্য নিবারণ করিবার জন্যই খাঁটি দস্তার আবশ্যক। কারণ খাঁটি দস্তায় কিছুমাত্র ভ্যাজাল না থাকায় এই রূপ স্থানিক-কার্য্য বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাড়িত-স্রোতের উদ্রেক হইবার কোন কারণ নাই। তখন উহা তাম্রফলক সংযুক্ত না হইলে আর রাসায়নিক কার্য্য বা তাড়িতোৎপন্ন হইবে না। সুতরাং অনাবশ্যক মতে মূলে তাড়িত প্রবাহ নষ্টও হইবে না। খাঁটি দস্তার পরিবর্ত্তে সাধারণ ভ্যাজালযুক্ত দস্তাফলককে পারদ-মণ্ডিত করিয়া লইলে খাঁটির সমতুল্য হইবে। তাহার আবার কারণ বিশেষ জানা নাই, তাহা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। শুদ্ধ এই মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে পারদ-মণ্ডিত হইলে দস্তা-গাত্র অতি মসৃণ, বন্ধুরতা হীন হইয়া দাঁড়ায়; তাহার গাত্রোপরির সূক্ষ্ম ছিদ্র সমূহ বদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে যে কিরূপে স্থানিক-কার্য্য নিবারিত হয় তাহা আজিও স্থির হয় নাই। ফলে তদ্রূপ হয়, এই মাত্রই অবগত হওয়া গিয়াছে।

ব্যাটারী পাত্রে কেবল ধাতু ও অম্লাক্ত জলের পরস্পর রাসায়নিক কার্য্য হইতে তাড়িত-বলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ অনেক রকমে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে রাসায়নিক কার্য্য মাত্রেই তাড়িত-বল উদ্ভাবন করে। তাহার কয়েকটি পরীক্ষা পরে উল্লেখ করিব।

(ক্রমশঃ)

আলোক-চিত্র।

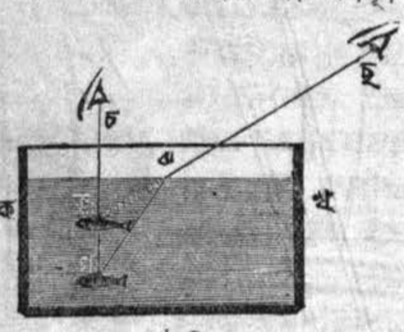
(PHOTOGRAPHY.)

(২২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

আলোক পাতলা স্তর হইতে ঘন স্তরে অথবা ঘন স্তর হইতে পাতলা স্তরে প্রবেশকালে বক্র হইয়া যায়, অর্থাৎ পাতলা ও ঘন এই দ্বিবিধ স্তর যে স্থানে মিলিত হইয়া থাকে ঠিক সেই খানেই আলোক বাঁকিয়া পড়ে। ইহা পূর্ব্বেই কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা একরূপ বুঝান গিয়াছে। কিন্তু পাতলাই হউক অথবা ঘনই, হউক, যে কোন রূপ স্তরের উপর তাহার সহিত লম্বভাবে বা ঠিক সোজাসুজি পতিত হইলে আলোক তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে আদৌ বক্র হইবে না। তীর্য্যক বা হেলানভাবে পড়িলেই বাঁকিয়া যাইবে। পূর্ব্ব পরীক্ষার ৩য় চিত্রের কাচ পাত্রস্থ জলের উপর আলোক-রশ্মিপুঞ্জ একপার্শ্ব হইতে হেলানভাবে পতিত বলিয়া ঐরূপ বক্র হইয়া জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আবার ঐ রশ্মিপুঞ্জ যদি পাত্রের তলদেশ ভেদ করিয়া অপরদিকে বায়ুতে বহির্গত হইতে পায়, তবে উহা পুনরায় বক্র হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইবে। কিন্তু হেলানভাবে না পড়িয়া আলোক যদি ঐ পাত্রস্থ জলের উপর তাহার সহিত লম্বভাবে বা ঠিক সোজা হইয়া পড়ে তাহা হইলে জল মধ্যে প্রবেশকালে উহা আদৌ বাঁকিবে না, ঠিক সরলভাবেই জলপ্রবিষ্ট হইবে। আবার পাত্রের তলদেশ ভেদ করিয়া অপরদিকে বহির্গত হইতেও না বাঁকিয়া সরল ভাবেই বায়ু প্রবিষ্ট হইবে। একটি কাটীকে লম্বভাবে জলের এপার ওপার পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে যেমন হয় ঐ আলোকও ঠিক সেই রূপ সরল পথে গমন করিবে। চিত্রের জল পূর্ণ পাত্রের তলদেশস্থ উজ্জ্বল দ্রব্যটি যদি পাত্রের উপর হইতে ঠিক লম্ব বা সোজাভাবে দেখা যায়, তবে উহাকে উহার প্রকৃত স্থানেই দেখা যাইবে। কেন?—কারণ, ঐ পদার্থের গাত্র হইতে যে রশ্মিসমূহ লম্ব বা ঠিক সোজাভাবে জলমধ্য দিয়া বায়ুতে প্রতিফলিত হয় সে গুলি আদৌ বাঁকে না, সুতরাং জল-পাত্রের উপর তাহার সহিত লম্বভাবে চক্ষু রাখিলে পাত্রস্থ পদার্থের গাত্র হইতে কতিপয় রশ্মিপুঞ্জ ঠিক সরল পথেই প্রতিফলিত হইয়া চক্ষে পড়িয়া ঐ পদার্থের দর্শনজ্ঞান সম্পাদন করিবে।

আলোকের এই রূপ বক্রীভবন বা বক্রগামীতা ধর্ম্ম নিবন্ধন অনেক স্থলে আমাদের দৃষ্টিভ্রম জন্মায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখ;—

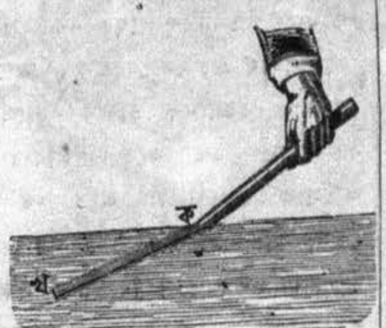
১ম—আমরা যখন জলের ভিতর মাছ দেখিতে পাই, তখন সেই মাছ জল মধ্যে ঠিক যেখানে থাকে সেই স্থানে দেখায় না, তাহার কিছু উপরে দেখায়। কিরূপে দেখ,—পুষ্করিণীর পরিবর্ত্তে মনে কর 'ক' 'খ' চিহ্নিত একটি জলপূর্ণ পাত্র মধ্যে 'গ' একটি মাছ রহিয়াছে। যদি পাত্রের উপর 'চ' স্থানে চক্ষু রাখিয়া লম্বভাবে বা ঠিক সোজাসুজি মাছকে দেখ, তবে উহা যেখানে আছে ঠিক সেই প্রকৃত স্থানেই দেখিবে। কিন্তু লম্বভাবে না দেখিয়া যদি তির্য্যক বা হেলানভাবে (যেমন 'ছ' স্থান হইতে) দেখ, তবে ঐ মাছকে জল মধ্যে 'জ' স্থানে দেখিবে। কেন?—কারণ, ঐ মাছের গাত্র হইতে যে সকল রশ্মিপুঞ্জ 'ছ'এর দিকে প্রতিফলিত হয়, সে গুলি 'ঝ' স্থানে বাঁকিয়া পড়িয়া চক্ষে পতিত হয়। 'জ'-এর স্থান ঠিক কোথায়?—'ঝ' হইতে 'ছ' 'ঝ' সরল রেখা পথকে বিপরীত দিকে খানিক বাড়াইয়া টানিলে সেই বিস্তৃত রেখায়, 'গ'-এর উপরে 'জ'-এর স্থান। ঐ খানে যে মাছ দেখা যায় ঐটি প্রকৃত মাছের ছায়া মাত্র। যাহারা বরশা দ্বারা জল মধ্যে মাছ বিদ্ধ করিয়া মারে, তাহারা বহুদর্শিতা হইতে এই বিষয় জানিয়া, বিদ্ধ করিবার সময়ে, জল মধ্যে মাছকে যেখানে দেখা যায়, তার কিছু নিচু পর্য্যন্ত লক্ষ করিয়া বরশা নিক্ষেপ করে। জল মধ্যে হাত দিয়া মাছ ধরিতে গেলেও দৃশ্যমান মাছের কিছু নিচু পর্য্যন্ত না হাত বাড়াইলে ধরা যাইবে না। এই রূপে জলপূর্ণ পাত্রের তলদেশে যাহা কিছু রাখিয়া দিয়া হেলানভাবে দেখিলে তাহার প্রকৃত স্থানের কিছু উপরে দেখাইবে, যেন পাত্রের তলদেশ শুদ্ধ কিছু উপরে উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। কিছু না রাখিয়া যদি পাত্রের তলদেশ



ষষ্ঠ চিত্র।

মাত্রই দেখ, তবে উহা কিছু উপরে দেখিবে। তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অগভীর বা চটান জলময় খাল, ডোবা, পুষ্করিণী বা কোন রূপ জলপাত্রকে হেলানভাবে দেখিলে, উহা প্রকৃত যত গভীর তদপেক্ষা কিছু কম গভীর বলিয়া বোধ হয়,—যেন তলাশুদ্ধ কিছু উপরে উঠে,—যেন প্রকৃত গভীরতা কিছু পরিমাণে কমিয়া যায়,—প্রকৃত ডুবান-জল একগলা মাত্র বোধ হইয়া থাকে।

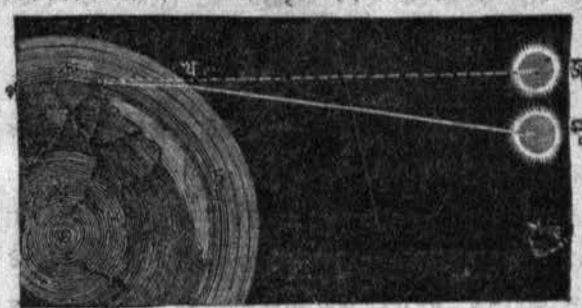
২য়—একগাছি লাঠীর খানিকটা জল মধ্যে হেলানভাবে ডুবাইয়া রাখিয়া একপার্শ্ব হইতে হেলানভাবে দেখিলে, লাঠীটি ভাঙ্গা বলিয়া বোধ হয় (৭ম চিত্র); অর্থাৎ বায়ু ও জলের মিলন স্থানে লাঠীটি যেন মুছড়াইয়া গিয়াছে এরূপ দেখায়। পূর্ব্ব চিত্রে মাছের পরীক্ষাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে ইহার কারণ স্পষ্ট হইবে। মাছ যেমন জল মধ্যে



৭ম চিত্র।

যেখানে থাকে তাহার কিছু উপরে তাহার ছায়ামাত্র দেখা যায়,—প্রকৃত মাছকে, তাহার প্রকৃত স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই রূপ লাঠীর জল মধ্যস্থ অংশটুকু 'ক' হইতে 'খ' পর্য্যন্ত কিছু উপরে দেখায়। তাহাতেই উহা প্রকৃত স্থান হইতে যত টুকু উপরে দেখায়, তত টুকু ভাঙ্গা বলিয়া বোধ হয়। উহার বায়ু মধ্যস্থ অপর অংশ টুকুর সহিত জল মধ্যস্থ অংশ সমসূত্রপাতে বা এক সরল রেখায় দেখায় না, কাজেই ঐ দুই অংশের বা বায়ু ও জলের মিলন বা সন্ধি স্থল 'ক' হইতে লাঠীটি যেন কিছু উপরিদিকে দুম্‌ড়ে পড়িয়াছে বলিয়া ভ্রম জন্মায়। জল মধ্যস্থ লাঠীর ঐ মোচড়ান অংশ প্রকৃত অংশের ছায়া মাত্র।

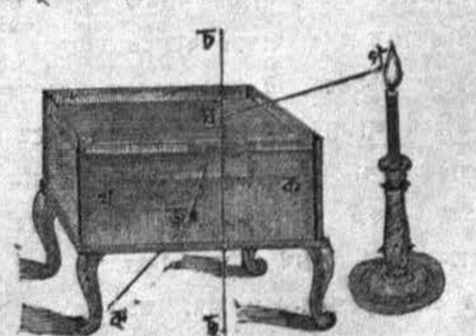
৩য়—সূর্য্য উদয় হইবার কিছু পূর্ব্বে ও অস্ত যাইবার কিছু পর পর্য্যন্তও তাহার প্রতিরূপ আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। আলোকের এই বক্রগামীতাই তাহারও কারণ। পৃথিবী চতুর্দ্দিকে ২২ ক্রোশ উপর পর্য্যন্ত বায়ু মণ্ডলে পরিবৃত। মাধ্যাকর্ষণ গুণে পৃথিবীর ঠিক পৃষ্ঠদেশে বায়ু ঘনতম এবং উপরে ক্রমশঃই পাতলা হইয়া সূক্ষ্মতম হইয়া পড়িয়া শেষ হইয়াছে। সেইখান থেকে আবার ঈথর নামক একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম তরল পদার্থ অসীম আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ ঈথর সর্ব্বোপরিস্থ সূক্ষ্মতম বায়ু অপেক্ষাও পাতলা ও সর্ব্বত্রব্যাপী। সেই পাতলা ঈথর-স্তর মধ্যদিয়া সূর্য্যালোক যখন বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন উহা অল্প বাঁকিয়া যায়, অধিকন্তু ক্রমে যত পৃথিবী পৃষ্ঠের সমীপ-বর্ত্তী হইতে থাকে ক্রমশঃ ততই অধিকতর বাঁকিয়া যায়। শেষে বিলক্ষণ বক্র হইয়া আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে। তাহাতেই সূর্য্য সম্বন্ধে আমাদের ঐ রূপ দৃষ্টি ভ্রম হইয়া থাকে। নিম্নবর্ত্তী চিত্রটি (৮ম চিত্র) দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।



৮ম চিত্র।

মনে কর 'সূ' সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। তখন প্রকৃত সূর্য্য আর দেখা যাইতেছে না। কিন্তু উহার রশ্মিপুঞ্জ 'গ' 'চ' বায়ু মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে বাঁকিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। তাহাতেই প্রকৃত সূর্য্য অদৃশ্য হইলেও 'জ' স্থানে, তাহার কিছু উপরে তাহার প্রতিরূপ বা ছায়া মাত্র দেখা যায়। 'ক' 'খ' রশ্মি পথকে কল্পনায় সরলরেখা ক্রমে বিস্তৃত করিয়া টানিলে 'জ' ঐ কল্পিত রেখাতেই পড়িবে। উদয়ের পূর্ব্বেও এই রূপে সূর্য্য দর্শন হইয়া থাকে।

আলোকের বক্রগামীতার নিয়ম।—মনে কর 'ক' 'খ' একখানি পুরু কাচ-ফলক অথবা জলপূর্ণ কাচ-পাত্র। আর 'গ' স্থান হইতে একটি বাতির আলো 'গ' 'ঘ' পথে 'ক' 'খ'-এর উপর হেলানভাবে পড়িতেছে। ঐ আলো, পতন বিন্দু 'ঘ' হইতে 'ক' 'খ'-এর মধ্যে প্রবেশ করিতে

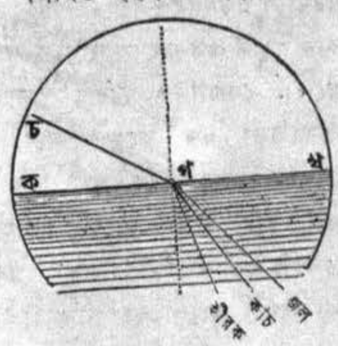


৯ম চিত্র।

কোন্‌দিকে ও কি ভাবে বাঁকিয়া পড়ে তাহার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেইটি এই,—পতন-বিন্দু ‘ঘ’-এর মধ্য দিয়া ‘ক’‘খ’-কে ভেদ করিয়া যদি একটি কল্পিত লম্বপাত করা যায়, অর্থাৎ মনে মনে একটি সরল রেখা ‘চ’‘ছ’ পতন-বিন্দুর মধ্যদিয়া লম্বভাবে টানা যায়, অথবা ‘ঘ’-এর মধ্যদিয়া ‘ক’‘খ’-কে ভেদ করিয়া লম্বভাবে ‘চ’‘ছ’ একটি কাঠী প্রবিষ্ট আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ঐ পতিত আলো ‘গ’‘ঘ’, ‘ক’‘খ’-কে ভেদ করিতে ‘ঘ’ স্থানে ‘ক’‘খ’-এর ভিতর ‘চ’‘ছ’ লম্বের অভিমুখে বা নিকটবর্ত্তী হইয়া ‘ঘ’‘জ’ পথে বাঁকিয়া পড়িবে; এবং ‘ক’‘খ’ হইতে উহার অপরদিকে বহির্গত হইতেও যে বাঁকিয়া যায়, সেই বক্রগামীতার দিক ‘জ’‘ঝ’ পথে ঐ ‘চ’‘ছ’ লম্ব হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই চিত্রখানিতে ‘ক’‘খ’ একটি কাচপাত্র মধ্যদিয়া আলোকের বক্রগতি যেরূপ দেখা যাইতে পারে সেই রূপ প্রদর্শিত হইল। এই প্রবন্ধের ৩য় চিত্রের পাত্রস্থ জলের উপরে যে স্থানে আলোক পড়িয়াছে ঐ পতন-বিন্দু ভেদ করিয়া জল মধ্যে পাত্রের তলদেশ পর্য্যন্ত যদি একটি কাঠী ধরিয়া রাখা যায় তবে ঐটি লম্বরেখা স্বরূপ হইবে। বাস্তবিক একটি কাঠী জল মধ্যে ঐ রূপ লম্বভাবে না প্রবিষ্ট করিয়া, পতন-বিন্দু ভেদ করিয়া ঐ কাঠীর স্থানীয় যদি একটি লম্বরেখা মাত্র কল্পনা করিয়া লইয়া দেখ, তবে দেখিবে যে পতিত আলো ঐ লম্বের সমীপবর্ত্তী হইয়া বাঁকিয়াছে। আবার ঐ জল পূর্ণ পাত্রকে যদি ঝুলাইয়া অথবা অন্য কোন ভাবে রাখিয়া দিয়া ঐ আলোককে পাত্রের তলদেশ ভেদ করিয়া বায়ুতে বহির্গত হইতে দেওয়া যায়, তবে দেখিবে যে উহা ঐ লম্বের দূরবর্ত্তী হইয়া, ৯ম চিত্রে ‘জ’‘ঝ’-এর ন্যায় বাঁকিয়া বহির্গত হইবে। আরও ৫ম চিত্রখানি দেখ। জলপূর্ণ পাত্রের তলদেশে যে উজ্জ্বল পদার্থ রহিয়াছে তাহার গাত্রের খানিক আলো জল মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়া বায়ুতে বহির্গত হইতে যে বাঁকিয়া গিয়া চক্ষে পড়িতেছে, ঐ বক্রীভবন-বিন্দু মধ্য দিয়া লম্ব-পাত করিলে আলোর বক্রগতি যে ঐ লম্ব হইতে দূরবর্ত্তী ইহা স্পষ্টই দেখা যাইবে। পুনরায় ৯ম চিত্রখানি দেখ; ‘ক’ ‘খ’ একটি জলপূর্ণ পাত্র, যদি উহার তলায় ‘জ’ স্থানে কোন পদার্থ রাখিয়া দিয়া ‘গ’ স্থান হইতে ‘জ’-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে ‘জ’-এর ‘গ’-এর অভিমুখের আলো ‘ক’‘খ’-এর ভিতর ‘ঘ’ পর্য্যন্ত সরলভাবে গিয়া তথায় বাঁকিয়া পড়িয়া ‘চ’‘ঘ’ লম্ব হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া ‘গ’ চক্ষে পড়িবে। এখন আলোক বক্রগামীতার নিয়মটি বোধ হয় স্পষ্ট হইয়া থাকিবে; পাতলা স্তর হইতে গাঢ় স্তর মধ্যে প্রবেশ কালে আলোক পতন স্থানের লম্বের সমীপবর্ত্তী হইয়া বক্র হয়, এবং গাঢ় স্তর হইতে পাতলা স্তরে বহির্গমন কালে পতন-বিন্দু লম্বের দূরবর্ত্তী হইয়া বাঁকিয়া যায়। আলোকের এই দুইবার বক্রগতির প্রথমটি পতন-বিন্দু-লম্বের অভিমুখী ও দ্বিতীয়টি উহার অপ বা অন্তরগামী।

স্বচ্ছ স্তরের ঘনত্বের ন্যূনাধিক্য অনুসারে আলোক তন্মধ্যে প্রবেশ কালে কম বেশী বক্র হইয়া যায়। যে স্বচ্ছ পদার্থ যে রূপ স্থূল, ঘন বা পুরু, তন্মধ্য দিয়া গমন কালে আলোক সেই পরিমাণে পতন-বিন্দু-লম্বের নিকটবর্ত্তী হইয়া বাঁকিবে। কোন কোন পদার্থ এত ঘন যে তাহারা আলোকে অত্যন্ত বাঁকাইয়া ফেলে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় পদার্থের এই গুণকে আলোক-বক্রকারীতা ধর্ম্ম কহে। আবার অনেক স্বচ্ছ পদার্থের আলোক-বক্রকারী ধর্ম্ম অতি অল্প মাত্র। বায়ু, জল, সুরা, তৈল, কাচ, হীরক প্রভৃতি পদার্থ সমূহের এই আলোক বক্রকারী গুণ অত্যন্ত বিভিন্ন। সর্ব্বতোভাবে বায়ু বিরহিত শূন্যমার্গেই আলোকের গতি ঠিক সরল পথেই হয়, মূলে বাঁকে না। তদ্ভিন্ন শূন্য হইতে যে কোন স্তরে এবং এক প্রকার স্তর হইতে অন্যবিধ স্বচ্ছ স্তরে প্রবেশ ও বহির্গমন কালে আলোক বাঁকিয়া পড়ে। আবার স্বচ্ছ স্তরের স্থূলতা ভেদে আলোকের বক্রতাও কম বেশী হয়। বায়ু হইতে জল ভেদ করিতে আলোক যে পরিমাণে বাঁকে, সুরা প্রবেশ কালে তদপেক্ষা অধিক, তৈলে তাহা অপেক্ষাও বেশী এবং হীরকে প্রবেশ কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম বক্র হইয়া থাকে। একইবিধ স্বচ্ছ পদার্থ আবার অবস্থা ভেদে কম বেশী গাঢ় হইতে পারে, তখন তাহার সঙ্গে তাহার বক্রকারী ধর্ম্মও ন্যূনাধিক লক্ষিত হয়। বায়ুর ঘনত্ব সর্ব্বত্রে সমান নহে। ধরাপৃষ্ঠোপরি উহা ঘনতম এবং পৃথিবীর ঊর্দ্ধে ক্রমশঃই অধিকতর পাতলা। সুতরাং সর্ব্ব স্থানের বায়ু সম বক্রকারী ধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে। বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা লবণ, ধূলী অথবা অন্য রূপ পদার্থ মিশ্রিত ঘোলা জল অধিকতর আলোক বক্রকারী। কাচও বিবিধ পরিমাণ মোটা হইতে পারে। সুতরাং কাচও ন্যূনাধিক বক্রকারী। হীরক ভেদ করিতে আলোক এত বক্র হইয়া যায় যে অন্য কোন পদার্থ মধ্যে তদ্রূপ হয় না। নিম্নে যে চিত্রটি দেওয়া গেল তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন গাঢ় পদার্থ ভেদ কালে আলোকের বক্রগতির কিরূপ আপেক্ষিক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, তাহাই প্রদর্শিত

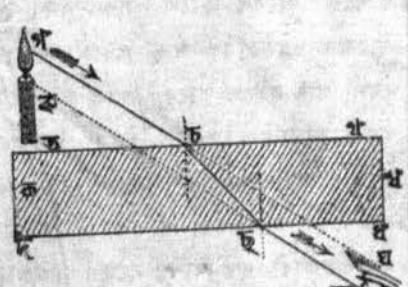
হইল। 'চ' স্থান হইতে সূর্য্যালোক অথবা বাতি, প্রদীপ কি যে কোন রূপ আলোক মূল হইতে 'চ''গ' আলোক রশ্মি হেলানভাবে 'ক''খ' স্বচ্ছ পদার্থের উপর 'গ' স্থানে পতিত হইয়াছে। 'ক''খ' যদি জল হয় তাহা হইলে 'চ''গ' আলোক বায়ু হইতে 'ক''খ' জলের মধ্যে প্রবেশ কালে 'গ' হইতে যতটা বাঁকিবে, 'ক''খ' কাচ হইলে তদপেক্ষা অধিক বাঁকিবে, এবং 'ক''খ' হীরক হইলে তন্মধ্যে প্রবেশ কালে 'চ''গ' অধিকতম বাঁকিবে। এই তিন প্রকার স্বচ্ছ স্তরে প্রবেশ কালে আলোক রশ্মি 'চ''গ' যে পরিমাণে বাঁকিয়া পড়িয়া যে রেখা পথে গমন করে তাহার প্রান্তে 'জল' 'কাচ' ও 'হীরক' লিখিত হইল। তাহাতে এই বুঝিতে হইবে যে 'ক''খ' জল হইলে 'চ''গ' 'জল' নামাঙ্কিত রেখাপথে বাঁকিয়া পড়িবে, 'ক''খ' কাচ হইলে 'কাচ' নামক ও হীরা হইলে 'হীরক' নামক রেখা পথে ক্রমে আলোক-পতন-বিন্দু-লম্বের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া বাঁকিয়া পড়িবে। 'ক''খ' যত অধিক বক্রকারী হইবে বক্রীভূত রশ্মি পতন-বিন্দুর লম্বের ততই সমীপবর্ত্তী লক্ষিত হইবে।



১০ম চিত্র।

সমতল স্বচ্ছ পদার্থ মধ্যদিয়া দৃষ্টিভ্রম হয় না।—

'ক' 'খ' একখানি কাচ-ফলক। উহার উপরিভাগ 'ত''থ' ও নিম্নদেশ 'দ''ধ' পরস্পর সমান্তরাল। 'গ' স্থান হইতে একটি বাতির আলোক 'ক''খ'-এর উপর 'চ' স্থানে হেলানভাবে পড়িতেছে। 'ক''খ'-কে 'চ' স্থানের মধ্যদিয়া লম্বালম্বি চিরিয়া ফেলিলে তন্মধ্যে আলোকের গতিপথ যেরূপ দেখা যায়, কল্পনা করা যাইতে পারে, এই প্রতিকৃতিখানি তদ্রূপ চিত্রিত হইল। তদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে এ বিষয় বুঝাইবার সুবিধা নাই। এককালে 'ক''খ'-কে একখানি প্রশস্ত স্থূল কাচ-ফলক স্বরূপ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে আবার আলোকের গতিপথ চিত্রিত করিয়া দেখান ও বুঝান অসম্ভব। সুতরাং কাচ-ফলককে লম্বচ্ছেদ দিয়া চিরিয়া ফেলিলে যেরূপ দেখায় সেইরূপই অঙ্কিত হইল। পাঠক মনে মনে 'ক''খ'-এর অপর অংশখানি উহাতে যোড়া দিয়া বুঝিবেন। এরূপ উপরি ও নিম্ন গাত্র পরস্পর সমান্তরাল স্বচ্ছ পদার্থের উপর আলোক হেলানভাবে পতিত হইয়া উহাকে ভেদ করিয়া অন্যদিকে যে পথে বাহির হয়, তাহার দিক পতন রেখার সহিত ঠিক সমান্তরাল, তাহাতেই এরূপ পদার্থ মধ্যদিয়া দেখিলে বিশেষ দৃষ্টিভ্রম হয় না। চিত্রখানি দেখিলেই এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। 'গ''চ' আলোক হেলানভাবে 'ক''খ'-এর উপর পড়িয়া 'চ' স্থান হইতে 'ক''খ'-এর ভিতর 'চ''ছ' পর্য্যন্ত 'চ'-এর লম্বের নিকটবর্ত্তী হইয়া বাঁকিয়া গিয়া 'ছ' হইতে লম্বের দূরবর্ত্তী হইয়া অপরদিকে বায়ুতে 'ছ''জ' পথে বহির্গত হয়। 'ছ''জ', 'গ''চ'-এর সহিত ঠিক সমান্তরাল। আলোক শেষ যে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া যে পথে চক্ষে পড়ে সেই স্থান হইতে সেই পথকে বিপরীত দিকে অর্থাৎ যে দিকে আলোক আছে সেই দিকে খানিক বিস্তৃত করিয়া টানিলে যে সরলরেখা অঙ্কিত হইবে সেই রেখাতেই প্রকৃত আলোকের ছায়ামাত্র প্রকৃত স্থান হইতে কিছু দূরে দেখা যায়। এই নিয়মটি পূর্ব্বে কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। এ স্থলে সেই নিয়মটি খাটাইয়া দেখা যাক্। 'গ''চ' আলোক 'ক''খ'-এর মধ্যে বাঁকিয়া পড়িয়া শেষে 'ছ' স্থান হইতে ফের বাঁকিয়া 'ছ''জ' সরল পথে চক্ষে গিয়া পড়িতেছে। ঐ 'ছ' স্থান হইতে ঐ 'ছ''জ' সরল পথকে বিপরীত অর্থাৎ আলোরদিকে বাড়াইয়া টানিলে সেই রেখার মধ্যেই 'গ' হইতে কিছু অন্তরে 'গ'-এর ছায়া মাত্র দেখা যাইবে। এ স্থলে বিন্দুময় রেখায় 'ছ''জ'-কে বিস্তৃত করা গেল। সুতরাং 'জ' স্থান হইতে 'ক''খ'-এর মধ্যদিয়া দেখিলে 'গ'-কে অল্পমাত্র 'গ'-এর এক পার্শ্বে, এ স্থলে পাঠকের বামদিকে দেখাইবে। 'গ' যদি কোন রূপ আলোক না হইয়া কোন রূপ আলোকিত পদার্থ হয়, তবে সেই পদার্থকে ঐ আলোকেরই ন্যায় ঈষৎ স্থানান্তরে দেখাইব। 'ক''খ' জল, কাচ অথবা যেরূপ পদার্থ হইবে, এবং যে পরিমাণ পুরু হইবে, আরও তদুপরি আলোক যতটা হেলানভাবে পড়িবে, তদনুসারে ঐ আলোক তন্মধ্যে অল্পাধিক বাঁকিবে।



১১শ চিত্র।

(ক্রমশঃ)

বিদ্যুৎ ও বজ্র।

(২২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

একইবিধ তাড়িতযুক্ত দুইটি পদার্থ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে প্রতিক্ষিপ্ত হয়। ৭ম চিত্রানুরূপ যন্ত্র সহযোগে শেষ পরীক্ষায় ডিম্বটির নিকট হইতে ঘর্ষিত কাচ-ফালি প্রতিক্ষিপ্ত হইল দেখিয়াছ।

শিষ্য।—তাহাতে কি বুঝিব যে সেই ডিম্বটিও তখন কাচজ বা যোগ তাড়িতযুক্ত থাকে?

গুরু।—অবশ্যই—তাহা না হইলে ঐ ডিমের নিকট হইতে ঘর্ষিত কাচ-ফালি প্রতিক্ষিপ্ত হইবে কেন?

সমধর্ম্মী দুই তাড়িত পরস্পর প্রতিক্ষেপণশীল। ইহার পূর্ব্ব পরীক্ষায় দেখিয়াছ, ঐ ডিমটি আবার লাক্ষাজ বা বিয়োগ তাড়িতযুক্ত হয়। এখন বুঝিতে হইবে যে ঐ ডিমের স্বাভাবিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইলে পরে তবে উহা তাড়িতযুক্ত হয়? যখন 'খ' (৬ষ্ঠ চিত্র) ডিমটি একবার যোগ বা কাচজ আবার বিয়োগ বা লাক্ষাজ তাড়িতযুক্ত হয়, তখন তন্মধ্যে স্বভাবতঃই ঐ দ্বিবিধ তাড়িত বর্ত্তমান থাকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিবিধ তাড়িত পরস্পর আকর্ষণশীল; সুতরাং যে যে পদার্থে এ দ্বিবিধ তাড়িতের সমান পরিমাণ একত্রে মিলিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তাহারা পরস্পরকে সমান বলে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। তখন সেই পদার্থ মধ্যে তাড়িত দুইটির কোনটিরও বলাধিক্য হইতে পাইবে না; তাহাতেই তাহার তাড়িতেরও কোনই লক্ষণ বা কার্য্য দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এখন দেখা যাক 'খ' ডিমটি কিরূপে সর্ব্বতোভাবে একইবিধ তাড়িতপূর্ণ হইয়া উঠে? যখন কাচ-দণ্ড ঘর্ষণ করিয়া 'খ'-এর নিকট ধরিলে, তখন ঐ ডিমের স্বাভাবিক তাড়িতের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিল বুঝ, 'খ'-এর স্বাভাবিক দ্বিবিধ মিশ্র তাড়িত পরস্পর পৃথক হইয়া পড়ে। যোগ বা কাচজ তাড়িত বিয়োগ বা লাক্ষাজ তাড়িতকে আকর্ষণ করে। সুতরাং 'খ'-এর বিয়োগ তাড়িতকে কাচ-দণ্ডের যোগ তাড়িত স্বাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া রাখে। তাহাতেই 'খ' এর বিয়োগ (−) তাড়িত 'গ' ভাগে আবদ্ধ থাকে। এবং যোগ তাড়িত যোগ তাড়িতকে প্রতিক্ষেপ করে, সুতরাং 'ঘ'-এর যোগ (+) তাড়িত কাচ-দণ্ডের যোগ তাড়িত হইতে দূরে অর্থাৎ 'খ'-এর অপরদিক 'ঘ' ভাগে প্রতিক্ষিপ্ত হয়। ডিমের দুই প্রকার তাড়িত এইরূপে পরস্পর পৃথকভূত হইয়া উহার যে দুই বিপরীত ভাগে অবস্থিতি করে তাহা + ও − চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত। কাচ-দণ্ডের তাড়িত যোগ, সুতরাং সেটিও + চিহ্নিত। 'খ'-এর বিয়োগ তাড়িত কাচ-দণ্ডের যোগ তাড়িত দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া 'গ' ভাগে আবদ্ধ ও উহার যোগ তাড়িত প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া 'ঘ' ভাগে মুক্ত ভাবে অবস্থিত। তখন অঙ্গুলি দিয়া 'ঘ' ভাগ স্পর্শ করিলে কি হয়?—উহার যোগ তাড়িতকে কিছুতেই টানিয়া রাখে না, বরং প্রতিক্ষিপ্ত বলিয়া কাচদণ্ড হইতে যত পারে দূরবর্ত্তী হইতে চাহে। সুতরাং আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিবামাত্র আঙ্গুল বা জীবদেহ তাড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক বলিয়া তাহার ভিতর দিয়া দেহমধ্যে শেষে পৃথিবীতে পরিচালিত হইয়া যায়। তখন কাচ-দণ্ডটি ডিমের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিলে অথবা 'ক' ধরিয়া ডিমকে স্থানান্তরিত করিলে, বিয়োগ তাড়িত মাত্র 'খ'ময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। সেই অবস্থায় 'খ'কে ঘষা কাচের কাছে অর্থাৎ যোগ তাড়িতের নিকট লইয়া গেলে তাহাকে আকর্ষণ করে, এবং ঘষা গালা বা বিয়োগ তাড়িতের কাছে ধরিলে তা'কে প্রতিক্ষেপ করে। আবার এই পরীক্ষাই যদি প্রকারান্তরে সাধন করিয়া দেখ, অর্থাৎ কাচ-দণ্ডের স্থানে লাক্ষাদণ্ড ঘষিয়া ডিমটির নিকট ধর (৬ষ্ঠ চিত্র), তাহা হইলে 'খ'-এর 'গ' ভাগে + ও 'চ' ভাগে − তাড়িত অবস্থিতি করিবে। তখন 'ঘ' ভাগ স্পর্শ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, 'ঘ' কেবল যোগ তাড়িত পূর্ণ থাকিবে, উহার বিয়োগ তাড়িত হস্তে পরিচালিত হইয়া যাইবে।

শিষ্য।—এইবার দুইটি ডিমের পরীক্ষা কিরূপ বুঝিব?

গুরু।—একটি ডিম্ব সহকারে এই পরীক্ষার ফল উত্তম রূপে হৃদ্গত হইয়া থাকিলে ডবল ডিমের পরীক্ষা অতি সহজেই বুঝিবে।

এক মাপের ও সমান উচু দুইটি কাচের গ্ল্যাসকে পরস্পর কাছাকাছি করিয়া রাখ; তা'রপর 'ক' 'খ' দুইটি সমান বড় হাঁসের ডিম লইয়া ঐ দুইটি গ্ল্যাসের উপর চিত্রবৎ শুয়াইয়া রাখ; এরূপ ভাবে রাখিবে যেন 'গ' স্থানে দুইটি ডিম পরস্পর লগ্ন অর্থাৎ ঠেকাঠেকি হইয়া থাকে। তারপর

প্রথমে কাচ-দণ্ডটি রেশমী বস্ত্র দ্বারা উত্তম রূপে ঘর্ষণ করিয়া চিত্রবৎ ডবল ডিমের একপার্শ্বে ধর। মনে কর 'খ'-এর নিকট ধরিলে। খানিকক্ষণ ঐ রূপে ধরিয়া থাকিয়া কাচ-দণ্ডটি রাখিয়া দাও। তখন একে একে পর পর গ্ল্যাসসুদ্ধ ডিম দুইটিকে ৪র্থ ও ৭ম চিত্রবৎ কাচ-ফালি ও গালার বাতির যন্ত্র দুইটির নিকট ধরিয়া দেখ। কোনই পরিবর্ত্তন দেখিবে না। তাহাতেই স্থির হইবে যে, ডিমের স্বাভাবিক অবস্থার তখনও কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। পুনরায় গ্ল্যাসসুদ্ধ ডিম দুইটিকেই পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পরের সংস্পর্শে রাখিয়া দাও; ফের কাচ-দণ্ডকে উত্তমরূপে ঘষ, 'খ'-এর



৮ম চিত্র।

খুব নিকটে অল্পক্ষণ ধরিয়া থাক; কিন্তু এইবার অপর হস্তে 'ক' শুদ্ধ অপর গ্ল্যাসটি ধরিয়া তুলিয়া লও। তখন কাচ-দণ্ডটি রাখিয়া দাও; আর 'ক'-কে লাক্ষা-বাতির যন্ত্রটির লাক্ষার নিকট ধরিয়া দেখ; এইবার ডিমটি লাক্ষা-বাতিকে আকর্ষণ করিবে। বাতি আকৃষ্ট হইয়া ডিমের দিকে অগ্রসর হইবে। ডিমকে অল্প অল্প করিয়া পেছুদিকে সরাইয়া লইয়া ঘুরাইতে থাক, বাতিও ডিমের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকিবে। তবেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে ডিমটি তখন তাড়িত যুক্ত হইয়াছে। এখন উহার তাড়িত কোন্ প্রকার অর্থাৎ উহাতে যোগ না বিয়োগ তাড়িত উত্তেজিত হয়, তাহা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। পূর্ব্বে ৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্রানুরূপ এক একটি ডিম্ব সহকারে যে কয়েকটি পরীক্ষার উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতেই এ বিষয় যথেষ্ট স্পষ্ট হইয়াছে। 'ক'-কে ঘর্ষিত লাক্ষা-বাতির নিকট ধরিলে দেখিবে তাহাকে আকর্ষণ করিবে, সুতরাং 'ক'-এর তাড়িত যে লাক্ষার তাড়িতের সমান নয় অর্থাৎ তাহা কাচজ বা যোগ তাহাতেই সপ্রমাণ হইবে। আবার 'ক'কে যদি কাচ ফালি ঘষিয়া তাহার নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতি-ক্ষেপ করিবে, তাহাতেও ঠিক হইবে যে উহার তাড়িত কাচজ বা যোগ। পুনরায় ডিম দুইটিকে গ্ল্যাসসুদ্ধ পূর্ব্ববৎ পরস্পর ঠেকাঠেকি করাইয়া রাখ। আবার কাচ দণ্ডটি ভাল করিয়া ঘষিয়া পূর্ব্বের ন্যায় 'খ'-এর নিকট ধর; কিন্তু এইবার 'খ'কে গ্ল্যাস ধরিয়া তুলিয়া লইয়া ঘর্ষিত লাক্ষা-বাতি ও কাচ-ফালির নিকট পর পর ধরিয়া দেখ; দেখিবে, 'খ' ঘষা গালা-বাতিকে প্রতিক্ষেপ করিবে, আর ঘষা কাচ-ফালিকে আকর্ষণ করিবে; তবেই স্থির হইবে যে 'খ'-এর তাড়িত বিয়োগ। এক্ষণে এই পরীক্ষাটিই প্রকা-রান্তরে সাধন করিয়া দেখ;—কাচ-দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহার স্থানে লাক্ষা-দণ্ডটি ফ্লানেল দ্বারা উত্তম রূপে ঘর্ষিত করিয়া 'ক' 'খ'-এর নিকট 'খ'-এর দিকে ধর, এবং পূর্ব্বের ন্যায় একে একে 'ক' ও 'খ'কে তুলিয়া লইয়া পূর্ব্বমত তাহাদের প্রত্যেকের তাড়িত কোন্‌বিধ তাহা পরীক্ষা করিলে দেখিবে, 'খ'-এর তাড়িত যোগ (+) ও 'ক'-এর তাড়িত বিয়োগ (−)।

এখন এই দুই ডিমের পরীক্ষার ফল পূর্ব্বোল্লিখিত এক ডিমের পরীক্ষার ফলের সহিত মিলাইয়া দেখ; তাহা হইলেই দুইটি ডিমের প্রত্যেকটি কিরূপে তাড়িতোত্তেজিত হইয়া উঠে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। কাচ অথবা লাক্ষা-দণ্ড ঘষিয়া পরস্পর সংলগ্ন ডবল-ডিমের নিকট ধরিলে, ডিম দুইটির স্বাভাবিক মিশ্র দ্বিবিধ তাড়িত বিশ্লিষ্ট হয়, অর্থাৎ পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে যে তাড়িতটি ধৃত ঘর্ষিত দণ্ডের তাড়িতের বিষম সেইটি ঐ দণ্ডের সমীপবর্ত্তী ডিমে ও যেটি তাহার সমান সেইটি দণ্ডের দূরবর্ত্তী ডিমে অবস্থিতি করে। ঘর্ষিত দণ্ডের তাড়িত ডবল ডিমের মিশ্র তাড়িতকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার অসম-ধর্ম্মীটিকে নিজ অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী ডিমে আবদ্ধ করিয়া রাখে, এবং সমধর্ম্মীটিকে প্রতিক্ষিপ্ত করিয়া দূরবর্ত্তী অপর ডিমে বিতাড়িত করে। 'গ' স্থানে দুইটি ডিম মিলিত হইয়াছে; তবেই ঐ স্থান হইতে দুইদিকে ডবল ডিমের দুই অর্দ্ধভাগ। তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ডবল ডিমের দ্বিবিধ তাড়িত দুইটি ডিমকে যেন ভাগাভাগি করিয়া লইয়া অধিকার করিয়া বসে।

ডিম্ব সহকারে যে কয়টি পরীক্ষার বিবরণ করা গেল, ঐ গুলি সাধন করিবার সময় এই কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিবে;—কাচ ও লাক্ষা দণ্ডকে ঘর্ষণ করিয়া তাড়িতো-ত্তেজিত করিবার অগ্রে উহাদের অগ্নিতে অল্প উত্তপ্ত করিয়া লওয়া আবশ্যক। ঘর্ষণী ফ্লানেল ও রেশমী বস্ত্রকেও অল্প গরম করিয়া লইবে। ঘর্ষণ কার্য্য যেন দ্রুতবেগে অথচ শিথিল বা আল্গাভাবে সাধিত হয়। লাক্ষা-দণ্ড ঘর্ষণ করিতে

করিতে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য দুই তিনটি দণ্ড মজুত রাখিবে। দণ্ড ঘষিয়াই আর কালবিলম্ব না করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিবে। দুই ডিমের পরীক্ষাতে ঘর্ষিত দণ্ড ডবল ডিমের নিকট ধরিয়া থাকিয়া ডিম দুইটিকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া লইয়া তবে দণ্ডটি রাখিয়া দিবে; এবং পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াই তাহাদের তাড়িত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিবে। সাবধান!—ডিম দুইটিকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া ফেলিবার অগ্রে যেন ঘর্ষিত দণ্ডটি রাখিয়া দিও না। এই নিয়মগুলি পালন করিলে প্রায়ই পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

ডিমের পরিবর্ত্তে তাহার স্থানে যে কোন পরিচালক পদার্থ রাখিয়া ঐ রূপে পরীক্ষা করিলে সমফলই লক্ষিত হইবে। কিন্তু অপরিচালক যেমন কাচ, গালা, ধুনা, রজন প্রভৃতি পদার্থের তাড়িত অন্যবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিতে হয়। ফলে যে কোন পদার্থ লইয়া, যাহা দ্বারাই ঘর্ষণ কর, ঐ ঘৃষ্ট ও ঘর্ষণী দুইটি পদার্থকে পূর্ব্বোক্ত কাচ-কালি ও গালা বাতির যন্ত্র সহকারে পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে তাহাদের একে একবিধ ও অপরটিতে অন্যবিধ তাড়িত উত্তেজিত হইয়াছে। ঘর্ষিত ও ঘর্ষণী পদার্থের স্বাভাবিক দ্বিবিধ মিশ্র তাড়িত পরস্পর পৃথক্ বা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া ঘর্ষিত বস্তুতে এক রকম ও ঘর্ষণীতে অপর রকম তাড়িত অবস্থিতি করে। এ স্থলে কেবল যে একটি পরিচালক পদার্থ—ডিম বাছিয়া লওয়া গেল, সে কেবল একটি মাত্র পরীক্ষা দ্বারা তাড়িতের প্রধান কয়টি গুণের কার্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য মাত্র। এখন পূর্ব্ব বর্ণিত কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা তাড়িতের এই ধর্ম্মগুলি নিঃসন্দেহে অবধারিত হইল,—জড় পদার্থ মাত্রেই যোগ বা কাচজ ও বিয়োগ বা লাক্ষাজ এই দ্বিবিধ তাড়িতের সমান অংশ মিলিত ভাবে অবস্থিতি করে। স্বভাবতঃ জড় মধ্যে তাড়িতের কোনই লক্ষণ অনুভূত হয় না। ঘর্ষণ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি কতিপয় উপায় দ্বারা সকল পদার্থেরই লুপ্ত তাড়িতকে পরস্পর পৃথগ্‌ভূত করা যায়। তখন সেই পৃথগ্‌ভূত দ্বিবিধ তাড়িতকে যদি একই পদার্থ মধ্যে অথবা দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থে সঞ্চালিত করা যায় তবেই উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে দুই তাড়িতেরই কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যায়। সমধর্ম্মী বা এক-বিধ তাড়িত যুক্ত দুই পদার্থ পরস্পর প্রতিক্ষেপ করে এবং অসমধর্ম্মী বা দ্বিবিধ তাড়িত যুক্ত দুই পদার্থ পরস্পর আকর্ষণ করে। পৃথিবীর যাবতীয় জড় পদার্থ তাড়িত সম্বন্ধে স্থূলতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি পরিচালক ও আর কতকগুলি অপরিচালক। যে সকল পদার্থ মধ্য দিয়া তাড়িত অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে, কোনই প্রতিবন্ধক পায় না, তাহারাই তাড়িতের পরিচালক; আর যে সকল পদার্থ তাড়িতের অবরোধক অর্থাৎ যাহাদের মধ্য দিয়া তাড়িত সঞ্চালিত হয় না, তাহারাই অপরিচালক। ধাতু সমূহ, জল, জীব ও উদ্ভিজ্জ শরীর প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু উত্তম পরিচালক এবং কাচ, রেশম, ধুনা, গালাদি অপরিচালক। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে অপরিচালক পদার্থ নাই। যে সকল পদার্থ অধম পরিচালক তাহাদেরই অপরিচালক বলা যায়। কোন পদার্থকে ঘর্ষণ দ্বারা তাড়িতযুক্ত করিয়া কোন পরিচালক পদার্থের সংস্পর্শে আনিলে, তাড়িতযুক্ত পদার্থের তাড়িত সেই পরিচালক পদার্থে সঞ্চালিত হইয়া গিয়া তাহাকেও তাড়িতযুক্ত করে। ইহাকেই পরিচালন দ্বারা পদার্থকে তাড়িতযুক্ত করা কহে। এ ছাড়া আর এক উপায়েও পদার্থকে তাড়িতযুক্ত করা যায়। তাহার দৃষ্টান্ত ডিমের পরীক্ষা গুলিতে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। কোন তাড়িতোত্তেজিত পদার্থের নিকট যে সকল পদার্থ থাকে তাহারাও তাড়িতোত্তেজিত হইয়া উঠে। তাড়িতোত্তেজিত পদার্থের তাড়িতের প্রভাবে তাহার সন্নিধানস্থ সহজাবস্থ পদার্থের মিশ্র তাড়িত দুইটি বিশ্লিষ্ট বা পরস্পর পৃথক হইয়া পড়ে। ডিমের নিকট ধৃত ঘর্ষিত কাচ অথবা লাক্ষা-দণ্ডের তাড়িতের প্রভাবে ডিমের স্বাভাবিক তাড়িত যে বিশ্লিষ্ট হয় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া গিয়াছে। ইহাকেই **তাড়িত-সংক্রামণ** কহে। কোন তাড়িতযুক্ত পদার্থের তাড়িত প্রভাবে তাহার সমীপবর্ত্তী সহজাবস্থ পদার্থ মধ্যে যে প্রণালীতে তাড়িত সংক্রামিত হয় অর্থাৎ সেই পদার্থও তাড়িতযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহা তাড়িতের সংক্রামণ গুণের কার্য্য। একটি তাড়িতযুক্ত ও একটি সহজাবস্থ, দুইটি পদার্থ পরস্পর সন্নিহিত হইল মাত্র—স্পর্শ করিল না বা পরস্পর সংলগ্ন হইল না, কিন্তু তাহাতেই সহজাবস্থ পদার্থটিও তাড়িতোত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইহাই সংক্রামণ গুণের কার্য্য। এবম্বিধ দুইপ্রকার তাড়িত-তরলের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তাড়িতের তাবৎ কার্য্যকলাপ যে মতানুসারে বুঝান যায়, তাহাকেই তাড়িতের দ্বিবিধ-তরল-মত (Double Fluid Theory) কহে। সিমার নামক জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই মতের উদ্ভাবক। এই মতই এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে।

যোগ বা কাচজ ও বিয়োগ বা লাক্ষাজ এই দ্বিবিধ তাড়িতের আকর্ষণ, প্রতিক্ষেপণ, পরিচালন ও সংক্রামণ, এই কয়টি প্রধান ধর্ম্ম এখন এক প্রকার বুঝিলে; আর পূর্ব্বে সূক্ষ্মাগ্রের সহিত তাড়িতের সম্বন্ধের বিষয়ও কিছু বলিয়াছি; এই গুলি সমস্ত উত্তমরূপে স্মরণ রাখিয়া বিদ্যুৎ ও বজ্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিব মনোযোগ করিয়া শুন, বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না। এ স্থলে সূক্ষ্মাগ্র সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। কোন পদার্থকে ঘর্ষণোত্তেজিত তাড়িত দ্বারা তাড়িত যুক্ত করিলে দেখা যায় যে ঐ পদার্থের আকৃতি অনুসারে তন্মধ্যে তাড়িতের অবস্থিতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ পদার্থ যদি গোলাকার হয় তবে, তাড়িত তাহার উপর সর্ব্বত্রে সমান পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া অবস্থিতি করিবে; কিন্তু গোলাকার না হইয়া যদি ঐ পদার্থ, কোণ বা সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট হয়,—নিরেট সমচতুঃষ্কোণ, ত্রিভুজ, বৃত্তসূচী, (মোচার ন্যায়) বা অন্য কোন রূপ কোণ বিশিষ্ট আকারের হয়, তাহা হইলে তাড়িত ঐ পদার্থের সূক্ষ্মাগ্র সমূহে অধিকতম সঞ্চিত হইবে, এবং ঐ সূক্ষ্মাগ্র সমূহ হইতে উহা বেগে বায়ুতে বহির্গত হইয়া বিস্তৃত হইয়া যাইতে থাকিবে। তাড়িতের এইরূপ বেগকে বিততিষা (Tension) কহে। তাড়িতযুক্ত পদার্থের সূক্ষ্মাগ্রে যে অধিকতম তাড়িত সঞ্চিত হয়, এবং তাহার অবশিষ্ট গাত্রোপরি তাড়িতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প, তদ্বিষয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝান যায়।

(ক্রমশঃ)

ট্যাঁক-ঘড়ি সম্বন্ধে গুটিকতক কথা।

যন্ত্র-বিজ্ঞান প্রসূত বিবিধ মহোপকারী যন্ত্র মধ্যে ঘড়ির প্রাধান্য কিছু সামান্য নহে। ঘড়ি আমাদিগের প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রীর মধ্যে বিশেষতঃ ট্যাঁক-ঘড়ি আমাদের সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ঘড়ি সাধারণতঃ আমাদিগের মধ্যে হার, আঙটি, ছড়ি প্রভৃতি অঙ্গভূষণ মধ্যে সৌখিন বিলাস সামগ্রী স্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে। আমরা সময়ের মূল্য তত বুঝি না, সুতরাং ঘড়িরও আদর জানি না। ঘড়ি চিনি না, ভাল দেখিয়া ঘড়ি কিনিতে পারি না, আর কিনিলেও যথা নিয়মে রাখিতে পারি না। ঘড়িকে সখের জিনিসের ন্যায় সখ ফুরাইল বদলাইলাম, ফ্যাসানের সঙ্গে পরিবর্ত্তন করিলাম, এরূপ করিলে ঘড়ি সম্বন্ধে আমাদের লাভবান্ হওয়া দূরে থাকুক বরং ক্ষতিগ্রস্থ হইবারই সম্ভাবনা। ঘন ঘন ভৃত্য পরিবর্ত্তনে যেমন কাজের ক্ষতি ও নানাবিধ অসুবিধা ঘটে, ঘড়ি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ঘড়িকে পুরাতন প্রভুভক্ত বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় দীর্ঘকাল সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য।

দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া অথবা উপযুক্ত লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রকৃত উৎকৃষ্ট ঘড়ি ক্রয় করা প্রায় ঘটিয়া উঠে না।

ব্যবসায়ীর নিকট ঘড়ি কিনিতে হইলে দুইটি বিষয় দেখিবে। সে ব্যক্তি সৎ বা বিশ্বাসযোগ্য কি না, এবং ঘড়ি সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে কি না, সে নিজেই ভাল ঘড়ি চিনে কি না? স্বয়ং ঘড়ির জহরী হইলেও সে যদি সৎ না হয় তবে সে তোমাকে ঠকাইতে পারে, আবার যদি সে সত্যপ্রিয়ও হয়, ঘড়ির বিষয়ে কিন্তু অজ্ঞ হইতে পারে; সে স্থলে তাহাকেই ঘড়ি ক্রয় করিবার সময় অন্য উপযুক্ত লোকের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং তাহারও ত ঠকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। সে নিজে ঠকিলে তোমাকেও তার সঙ্গে ঠকিতে হইবে।

ঘড়ি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে স্থলে আয় নির্ভর ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, সে স্থলে নিম্নলিখিত কয়েকটি চুম্বক উপদেশ কথঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে।

১ম।—ঘড়ি যেন যথেষ্ট পুরু বা মোটা হয়। পুরু দলের উপর চারুকার্য্য প্রভৃতি বাহ্য পারিপাট্য থাকে ভালই। অতি পাতলা বা অতি ক্ষুদ্র ঘড়ির কলাংশ অতি ক্ষীণ হয় এবং অল্পায়তন স্থান মধ্যে উত্তম রূপে চলিতে পায় না। ছড়ী, আঙটি, বোতাম বা লকেট প্রভৃতির উপর অতি ক্ষুদ্র আনুবীক্ষণিক ঘড়ি আছে। কিন্তু সেরূপ ঘড়ি নির্ম্মাতার সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক ও অধিকারীর বৃথা গৌরবের আস্পদ মাত্র,—উপকারী তত নহে।

২য়—তারিখ, পক্ষ, তিথী ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিবার কল সন্নিবিষ্ট ঘড়ি নির্ব্বাচন করিবে না। এই সকল বাজে কতকগুলি কল ঘড়ির সংকীর্ণ স্থানের খানিক অধিকার

করিয়া থাকিলে সময় নির্দ্দেশক প্রধান কলাংশের সুচারু সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মায়, আরও অধিকতর ঘর্ষণ সম্পাদন করিয়া ঘড়ীর মুখ্য কার্য্যকারিতা নষ্ট করে। ক্রনমিটর ও রিপিটর ট্যাঁক ঘড়ি এই জাতীয় হইলেও আজ কাল অতি উৎকৃষ্ট মতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত উহারা বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু তাহাদের মূল্য তেমনি অধিক।

৩য়।—লিভর ও হরিজণ্টাল এই দ্বিবিধ এস্কেপ্‌মেণ্টই ট্যাঁক-ঘড়িতে প্রশস্ত। তদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার উৎকৃষ্ট এস্কেপ্‌মেণ্ট নাই। সুতরাং কতিপয় ঘড়ি অন্যবিধ উৎকৃষ্টতর এস্কেপ্‌-মেণ্ট সমন্বিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাতে বিশ্বাস করিয়া ভুলিও না। আমাদের মতে লিভর এস্কেপ্‌মেণ্টই উৎকৃষ্ট।

৪র্থ।—জেনিভি প্রভৃতি অল্প মূল্যের সামান্য ঘড়িতে 'ফসি' ও চেনের সন্নিবেশ নাই; দম দিবার পরক্ষণে যেরূপ বলের বেগ থাকে, ক্রমে স্প্রিং খুলিতে থাকিলে তাহার সঙ্গে চাকাগুলিরও গতির বেগ হ্রাস হইতে থাকে, তাহাতেই চব্বিশ ঘণ্টা সমান বেগে চলে না, সুতরাং সময়ও ঠিক রাখে না। এটি বড় সামান্য দোষ নহে। এই দোষের পরিহার ভাল ঘড়িতে ফসির দ্বারা হইয়া থাকে। স্প্রিং—বাক্সের গাত্র ও তৎপরবর্ত্তী প্রথম চাকার সংলগ্নে একগাছি লৌহময় নমনীয় গ্রন্থিল শিকল সন্নিবিষ্ট থাকে। তাহাকেই 'ফসি'ও'চেন' কহে।

৫।—ঘড়ির আকার প্রকার ও রচনা প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, সেই মত নির্ম্মিত না হইলে ঘড়ি কখন ঠিক সময় রাখিবে না। ঘড়ি নির্ম্মাতা যদি ধর্ম্মভীরু ও সৎ হয় তবে সে ক্রেতাকে সেইগুলি সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া প্রকৃত ভাল ঘড়িই দিবে। অনেকে বিচিত্র চারুকার্য্য খচিত ও মহামূল্য প্রস্তর সন্নিবিষ্ট 'কেস্' পছন্দ করেন, কিন্তু তদ্রূপ ঘড়ি সুদৃশ্য অলঙ্কার মাত্র, তাহার সময় রাখা উপকারিতা নাই বলিলেও হয়। প্রকৃত কাজের জন্য ঘড়ি কিনিতে হইলে তা'তে আর অলঙ্কারের বাহার দেখিলে হইবে না। ঘড়িতে বাহ্যাড়ম্বর চাও ত কার্য্যকারিতা পাইবে না। উপরে চাক চিক্কণ হইলেই ভিতরে খড়গাছটি পাইবে। ঘড়ি সম্বন্ধে এই নিয়ম ধরিয়া রাখিও যে অলঙ্কার আড়ম্বর শূন্য সাদাসিদেই প্রকৃত ভাল ঘড়ির লক্ষণ।

৬।—পাশ্চাত্য আমদানী ঘড়ির মধ্যে কয়েকটি মেকর বিখ্যাত এবং বহু প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যেকেব সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু এক্ষণে এই ঘরওয়ানার পূর্ব্বমত ভাল ঘড়ি আর বাহির হয় না। ডেণ্টমেকর তার স্থান অধিকার করিয়াছে। ডেণ্টের ঘড়িগুলির গড়ন যেমন মজবুত ও সাদাসিদে তেমনি সেগুলি ভাল সময়ও রাখে। আজ কাল উচ্চ শ্রেণীস্থ বড় লোক মাত্রেই ডেণ্টের ঘড়ি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ঘড়ি অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য। ইহার নীচে রথরহাম, নিউটন, রসেল, ক্রকবাঙ্ক, বারটন প্রভৃতি কয়েকজন মেকরের ঘড়ি অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

এস্থলে ঘড়ির সদ্ব্যবহার অর্থাৎ ঘড়িকে ভাল অবস্থায় রাখিবার জন্য আমাদের কি কি কর্ত্তব্য ও কিই বা অকর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বক্তব্য আছে। প্রকৃত ভাল ঘড়ি বাছিয়া ক্রয় করা যেমন কঠিন, ঘড়িকে ভাল অবস্থায় রাখিয়া ব্যবহার করাও বড় সোজা নয়। ভাল ঘড়ি ভাল অবস্থায় রাখিতে চাও ত নিম্ন লিখিত নিয়ম কয়টি পালন করিবে;—প্রত্যহ এক সময়ে ঘড়িতে দম দিবে। রাত্রে শয়ন করিবার সময় অথবা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়াই দম দেওয়া ভাল। বেলা ১টা অথবা রাত্রের তোপের সঙ্গে দিলেও ক্ষতি নাই। ফলে প্রত্যহ একই সময়ে হইলেই হইল।

২।—পাথরের মেজে, মার্বল টপ টেবিল অথবা অতিশয় শীতল কোন পদার্থের উপর বা নিকটে ঘড়ি রাখিবে না। ইহাতে দুইটি অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; ১ম—হঠাৎ উষ্ণতা হইতে শৈত্যে পরিবর্ত্তিত হইলে আসল স্প্রিং (Main Spring) ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ২য়—অত্যন্ত ঠাণ্ডায় ঘড়ির তৈল জমিয়া যায় অথবা ঘন হইয়া পড়ে; তাহাতে চাকা সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিদ্রে অবাধে ঘুরিতে পায় না, সুতরাং ঘড়ির গতি কমবেশী হইতে পারে।

৩।—প্রতিদিন ব্যবহার অন্তে ঘড়িকে একটি ওয়াচকেস্ মধ্যে পকেটে যে ভাবে থাকে সেইরূপ ক্রমনিম্ন বা হেলান-ভাবে রাখিয়া দিবে। ঘড়িকে যখনই রাখিয়া দিবে, যেন কেস্‌মধ্যেই রাখা হয় দেখিবে। কারণ আলাভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে, দুলিতে পারে, তাহাতে ব্যালান্স বা উড্ডীন চক্র-খানির গতির ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, এবং তাহা হইলে ঘড়ির ঠিক গতির অনেক এদিক ওদিক হইবে।

৪।—ঘড়িকে সর্ব্বদা অত্যন্ত পরিষ্কার রাখিতে হইলে, দেখিও কেসের মধ্যে ঘড়ি যেন ঠিক কাপে কাপে বা দৃঢ়-ভাবে বসিয়া থাকে; আর চামড়া ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নির্ম্মিত আধার মধ্যে ঘড়ি রাখিবে না। পকেটেও রাখিবার সময় সাবর-চামড়ার টুলির ভিতর রাখিবে। তুলা, রেশম, কেলিকো কি তদ্রূপ পদার্থ মোড়া কেস্ বা পকেট মধ্যে রাখিলে সর্ব্বদা ঘর্ষণ দ্বারা ঐ সকল পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁইস ঘড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহার কার্য্যকারিতা নষ্ট করে।

ঘড়ির উপরিতন ডালা যতই টাইট্ হউক না তবুও তাহার ভিতর দিয়া সূতার খুব সরু রোঁয়া ঢুকিবেই।

৫।—ঘড়ির চাবি ছোট হইলেই ভাল, কারণ ছোট চাবিতে দম দিবার সময় সমস্ত স্প্রিং গুটাইয়া যাইবামাত্রই, প্রতিবন্ধক অনুভূত হয়—ঠিক দম থামাইবার সময় টের পাওয়া যায়; বড় চাবি হইলে তাহা হয় না, স্প্রিং-এর টান তত অনুভূত হয় না, তাহাতে উপযুক্ত দমের অধিক হইয়া পড়িয়া স্প্রিং ছিড়িতে পারে।

৬।—চাবির সমচতুঃষ্কোণ ছিদ্রটি ঘড়ির দমের সমচতুঃষ্কোণ দণ্ডটির ঠিক অনুযায়ী হওয়া উচিত, বড় না হয়,—তাহা হইলে দমের দণ্ডটি বৃথা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। চাবিটি দমের দণ্ডে ঠিক কষিয়া বসিলে দণ্ডটি ক্ষয় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

৭।—সাধারণ ঘড়ি মিলাইবার সময় কাঁটা দুইটিকে পেছুদিকে ঘুরাইলে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু সম্মুখে ঘুরাইয়া ঠিক করাই ভাল।

অতি বৃহদাকার কলও বিকল হইয়া থাকে; তখন ঘড়ির ন্যায় বহু সংখ্যক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা দন্তযুক্ত চাকা প্রভৃতি সূক্ষ্ম অংশ সন্নিবিষ্ট কলের গতির সময়ে সময়ে যে ন্যূনাধিক্য হইবে তাহার বিচিত্র কি? ঘড়ির এই রূপ ব্যতিক্রম অনায়াসেই সংশোধন করা যায়। ঘড়ি অল্প কম কি বেশী যাইলেই যে অপদার্থ হইল তাহা নহে। খুব ভাল ঘড়িও শ্লো ফাষ্ট দোষ যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়াই সে ঘড়ি পরিত্যজ্য নয়। মনে কর, দুইটি ঘড়ি কোন উৎকৃষ্ট ঘড়িওয়ালা কর্ত্তৃক এক সময়ে ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। এক মাসের শেষে তা'র একটি দেখা গেল এক কোয়াটর ফাষ্ট যাইতেছে, এবং অপরটি ঠিক সময় নির্দ্দেশ করিতেছে। এখন এই দুই ঘড়ির কোন্‌টি ভাল বলিয়া পছন্দ করিবে? যেটি ঠিক সময় রাখিল সেইটিই অবশ্য ভাল বলিয়া তুমি গ্রহণ করিবে। কিন্তু এরূপ নির্ব্বাচণে হয় ত তোমাকে ঠকিতে হইবে,—এরূপ হইতে পারে যে তুমি যেটি ভাল জ্ঞানে লইলে সেটি অপেক্ষা অপরটিই উৎকৃষ্ট। কিরূপে দেখ,—প্রথম ঘড়িটি ধর, দিন ৩০ সেকেণ্ড ফাষ্ট গিয়া ৩০ দিন বা একমাসে এক কোয়াটর ফাষ্ট দাঁড়াইয়াছে; এখন কি করিলে এই ঘড়িকে ঠিক সময় রাখান যায়? কেবল উহার ভিতরকার "শ্লো ফাষ্ট" নিবারক দণ্ডটিকে ফাষ্টের দিক হইতে অল্প শ্লোর দিকে সরাইয়া দিলেই হইবে। কিম্বা একজন বিচক্ষণ ঘড়িওয়ালার দ্বারা ঐটি ঠিক করাইয়া লইবে। তাহা হইলেই ঐ ঘড়ির দৈনিক ফাষ্ট গতিটুকুর পরিহার হইবে। কিন্তু অপর ঘড়িটি ধর, ঐ এক মাসের ভিতর অনিয়মিত রূপে কম বেশী হইয়া আসিয়াছে; প্রতিদিনই কখন কম কখন বেশী হইয়া চলিয়াছে তাহাতে এরূপ ঘটিতে পারে যে এক মাসের শেষে ঐ রূপ কম ও বেশী গতি ঠিক সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়া ঠিক সময়ই নির্দ্দেশ করিতেছে। এরূপ ঘড়িকে কখনই বিশ্বাস নাই। ইহার উপর ঠিক সময় সম্বন্ধে কখনই নির্ভর করা যায় না। ফলতঃ যে ঘড়ি নিয়মিত রূপে কম অথবা বেশী যায়, তাহা অনিয়মিত শ্লো ফাষ্টগামী ঘড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং কি নিয়মে ও কত বাড়ে বা কমে সেটি জানা থাকিলে সে ঘড়ি অত্যুৎকৃষ্ট ক্রনমিটরের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম।

এক জনের ঘড়ি মাসে এক মিনিট ফাষ্ট যাওয়ায়, সে ব্যক্তি সেই ঘড়ি নির্ম্মাতার নিকট গিয়া তদ্বিষয় জ্ঞাপন করায়, ঘড়িওয়ালা তাঁহাকে এই রূপ বুঝাইয়া দিল;—"আপনার ঘড়ি মাসে এক মিনিট মাত্র দ্রুত যায় বলিয়া আপনি অসন্তুষ্ট; ভাল আমি আপনাকে অগ্রে বুঝাইয়া দিই, তারপর আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে যে আপনি ভাগ্যবান তাহাই এরূপ ঘড়ি পাইয়াছেন। আপনি অবশ্য জানেন যে ঘড়ির গতি নিয়ামক তৌল বা উড্ডীন চক্রখানি প্রতি সেকেণ্ডে ৫ বার পার্শ্বগতি বা পরিদোলন সম্পাদন করে; তবেই প্রতিদিনে ঐ পরিদোলনের সংখ্যা চারি শত ৩২ সহস্র হইল। তারপর বিবেচনা করিয়া দেখুন ঘড়ির গতির বাধা সম্পাদক কত কারণ বর্ত্তমান আছে; তাপ ও শৈত্যে সকল বস্তুরই প্রসারণ ও সংকোচন হইয়া থাকে, গরমে বাড়ে ও ঠাণ্ডায় কমে বা সংকুচিত হয়। ঘড়ির কল ধাতুতে নির্ম্মিত এবং ধাতুও এই নিয়মের বহির্ভূক্ত নহে। তা'রপর কল মাত্রেরই গতি বায়ুর বাধা পাইয়া ঈষৎ ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। ঘড়ির কল কত সূক্ষ্ম! তা'র কার্য্যকারিতার ব্যতিক্রম যে বায়ুর ঘর্ষণে আরও অধিক হইবে, আশ্চর্য্য কি? সেই বায়ুর গুরুত্ব যখন নিত্য নহে, সকল সময়ে সমান থাকে না, সুতরাং তার সঙ্গে ঘড়ির কলও কমবেশী প্রতিবন্ধক পাইয়া থাকে, তাহাতেই শ্লো ফাষ্ট হয়। আবার প্রতিদিন একটা ঘড়ি কত নাড়াচাড়া পায়। তবেই, এত প্রতিকূল কারণ সত্ত্বেও আপনার ঘড়িটি একমাসে এক মিনিটের অধিক তফাত হয় নাই, দিনে দুই সেকেণ্ড মাত্র। তবেই হিসাব করিয়া দেখুন ঘড়ির গতি-নিয়ামক চক্র খানির প্রতি পরিদোলনে এক সেকেণ্ডের দুই শত ষোল সহস্র অংশের এক অংশ মাত্র তফাৎ হইয়াছে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার এই ঘড়ির কলের কতদূর পারিপাট্য!"

সময়ে সময়ে ঘড়ির সংস্কার কার্য্য অন্ততঃ কলে তেল দেওয়া আবশ্যক করে। তদ্ব্যতীত কোন ঘড়িই দীর্ঘকাল ঠিক চলিতে পারে না। কিছুকাল চলিলে কলে তেল শুকাইয়া যায়, ধূলী জমে এবং ঝড়তি পড়তি বা অংশ ক্ষয়ও হইয়া থাকে। তাতে সময় ঠিক রাখে না, হয় ত এককালে চলন শক্তিই রহিত হইয়া যায়। ভাল ঘড়ি ভাল রাখিতে চাও ত অন্ততঃ বৎসরে একবার পরিষ্কার করাইয়া তৈল দিয়া লইবে। এবং ঐ পরিষ্করণ কার্য্য এবং প্রয়োজন হইলে মেরামত উপযুক্ত যোগ্য কারীগরের হস্তে অর্পণ করিবে। আনাড়ী কারীগরের হাতে অতি সামান্য খেলো ঘড়িরও পরকাল নষ্ট হয়।

প্রায় সকল ঘড়িতেই শ্লো ফাষ্ট নিয়ামক একটি অনাবদ্ধ সরু-দণ্ড বা কাঁটা থাকে। তাহার এক পার্শ্বে 'Slow' ও অপরদিকে 'Fast' খোদিত থাকে। ইহা সকলেই জানেন যে ঘড়ি দ্রুত গেলে ঐ 'Slow'র দিকে ও মন্দ যাইলে 'Fast'-এর দিকে ঐ কাঁটাটি সরাইয়া দিতে হয়। এই কাজটি বড় সাবধানে ও হিসাব করিয়া করিতে হয়; গতি নিয়ামক এবম্বিধ অঙ্গগুলি অতি সূক্ষ্ম এমন কি কাঁটাটি ঈষন্মাত্র এপাশ ওপাশ অপসৃত হইলে ঘড়ির গতির প্রত্যক্ষ কম বেশী দাঁড়াইবে। সুতরাং ঘড়ি যে পরিমাণে দ্রুত বা মন্দ যায় তদনুসারে হিসাব করিয়া ঐ কাঁটা কমবেশী এপাশ ওপাশ সরাইতে হয়। এ বিষয়ের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই। কেবল বহুদর্শিতা হইতেই প্রত্যেক ঘড়ি সম্বন্ধে সেটি অবধারিত হইবে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে যখন ঘড়ি সামান্য মাত্র তফাত যাইবে তখন ঐ কাঁটা কেবল এক ডিক্রি বা ক্রম সরাইতে হইবে; তারপর ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া দেখিবে তাহার কি ফল হয়। সেই ফল দেখিয়া ঐ কাঁটা সেই মত অল্পাধিক সরাইবে। যদি ঘড়ি প্রতিদিন মনে কর ১০ মিনিট ফাষ্ট যায় তবে ঐ কাঁটাকে একেবারে 'Slow'র শেষে সরাইয়া দিয়া দেখিবে; তা'রপর প্রয়োজন হইলে ক্রমে আবার পেছুদিকে সরাইবে। কিন্তু ঐ রূপে শেষ পর্য্যন্ত সরাইয়াও যদি ফাষ্ট যায় সে স্থলে সে ঘড়িকে আর নিজে সংশোধন করিতে চেষ্টা করা বৃথা। কোন ভাল ঘড়িওয়ালা ভিন্ন আর উপায় নাই।

দিন, দুই এক সেকেণ্ড বা মাসে এক মিনিট মাত্র তফাত সংশোধন করিতে চেষ্টা পাওয়া নিষ্প্রয়োজন। ঐ তফাত যদি নিত্য বা ঠিক থাকে তবে সে ঘড়ি দোষ শূন্য অত্যুৎকৃষ্ট ঘড়ির সমতুল্য। অধিকন্তু এরূপ অতি সামান্য দোষের পরিহার করা বড়ই দুঃসাধ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে ঘড়ি নিয়মিত অনিয়মী সে ঘড়ি নির্দ্দোষ অত্যুৎকৃষ্ট ঘড়ির সমান।

কলিকাতার ইতিহাস।

(২৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ইডেন গার্ডেন—লর্ড এলেনবরা—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত—লর্ড হার্ডিঞ্জ—দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা—ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী—দ্বারকানাথের মৃত্যু—গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট—মেডিক্যাল কলেজ হস্পিটাল।

মহাত্মা অকলাণ্ডের ভগিনীগণ—(Misses Eden) ইডেন উদ্যানের স্থাপনা দ্বারায় আপনাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিয়া জান। এই উদ্যান কলিকাতার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

লর্ড অকলাণ্ডের পর লর্ড এলেনবরা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন।

এই সময়ে (১৭৬৫ শকের ভাদ্রমাস হইতে) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রের সম্পাদক হইয়া ১২ বৎসর কাল ইহার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করেন।

(ইহাঁর প্রতিমূর্ত্তি সহিত জীবনী পূর্ব্বে স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে।)

এলেনবরার পর লর্ড হার্ডিঞ্জ গবর্ণর জেনেরল হন। (১৮৪৪—১৮৪৮) এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয় দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। এইবার ইনি নিজব্যয়ে



১ লর্ড অকলাণ্ড। ৩ লর্ড হার্ডিঞ্জ ৪ লর্ড ডালহাউসি।
২ লর্ড ক্যানিং। ৫ লর্ড লরেন্স

দুইজন ও গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে দুইজন ছাত্রকে কলিকাতা মেডিকেল কালেজ হইতে বিলাতে লইয়া জান। ইঁহাদের অন্যতম ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত হইয়াছেন।

খ্রীঃ ১৮৪৬ অব্দের ১লা অগষ্ট দ্বারকানাথ বিলাতেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। ২রা ডিসেম্বর ইঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও স্মরণচিহ্ন স্থাপন জন্য কলিকাতা টাউন-হলে এক মহতী সভা সম্মিলিত হইয়াছিল।

এই সময়ে কলিকাতার গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট নির্ম্মিত হয় এবং মেডিকেল কালেজ হস্পিটালের ভিত্তি প্রোথিত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

লর্ড ড্যালহৌসী—বিডন বালিকাবিদ্যালয়—মদনমোহন তর্কালঙ্কার—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন—দেশীয়ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা—কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়—সোসাইটি ফর দি প্রোমোসন অব ইণ্ডসট্রিয়াল আর্টস্—প্রথম আর্টষ্টুডিওর কার্য্য বিবরণ—শিক্ষাদান প্রণালী—মুসে রিগো—কলিকাতার প্রথম আর্টষ্টুডিও।

খ্রীঃ ১৮৪৮ অব্দে লর্ড ড্যালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আগমন করেন। ইঁহার শাসন কাল অশান্তিময় ঘটনা জালে জড়িত। ইঁহার শাসনের ফল সিপাহী যুদ্ধ।

খ্রীঃ ১৮৫০ অব্দে মাননীয় জে, ই, ডি, বীডন সাহেবের প্রসিদ্ধ মহিলা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহাকে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ১৭৩৭ শকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺রামধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের একজন পুথিলেখক ছিলেন। তর্কলঙ্কার সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করেন। পঠদ্দশায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ সৌহৃদ্য হয়। পঠদ্দশাতেই ইনি রসতরঙ্গিনী ও বাসবদত্তা রচনা করেন। বালক বালিকাগণের প্রথম শিক্ষার্থে তিনভাগ শিশুশিক্ষা রচনা করিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর আর বড় গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইনি প্রথমে জজ পণ্ডিত পরে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হন। ১৭৭৯ শকে কান্দীগ্রামে তিনি ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

খ্রীঃ ১৮৫১ অব্দ হইতে টমসনের সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামে বিখ্যাত হয়।

সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই এখানে হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা আরম্ভ হয়। এবং দেশীয় ভাষা শিক্ষাদিবার জন্য আয়োজন হইতে আরম্ভ হয়।

কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ও এই সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল।

খ্রীঃ ১৮৫৪ অব্দে এদেশে ব্যবহারিক শিল্পের (Industrial Art) উন্নতি সাধন মানসে "সোসাইটি ফর দি প্রোমোসন অব ইণ্ডষ্ট্রীয়েল আর্টস" (Society for the promotion of Industrial Art) নামে একটি সমিতি সংগঠিত হয়। ঐ সমিতিতে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক ভদ্রলোক মিলিত হন। ইহার প্রথম অধিবেশন ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে মহাত্মা হজসন প্রাট সাহেবের আবাসে হইয়াছিল। সর সিসিল বিডন ইহার সভাপতি হন, এবং রেবরেণ্ড জে, লর্ড, উইলিয়ম মনি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হন। প্রথমতঃ স্থির হয়, ইহাতে—

১।—গঠিত দ্রব্য (Models) এবং প্রকৃত দ্রব্য (Natural objects) দৃষ্টে অঙ্কন ও প্রাসাদ সম্পর্কীয় অঙ্কন (Architectural drawings)—

২।—এচিং (Etching)-ধাতুর উপর খোদাই কার্য্য, কাষ্ঠের উপর খোদাই কার্য্য (Wood Engraving), লিথোগ্রাফি—

৩।—মৃণ্ময় পাত্র নির্ম্মাণ (Pottery) এবং মৃত্তিকা, মোম প্রভৃতিতে বিবিধ বস্তু নির্ম্মাণ প্রভৃতি—

শিক্ষা দেওয়া হইবে স্থির হয়। উচ্চ অঙ্গের শিল্পশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। যাহাতে দেশের কতকগুলি লোক সহজে জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশেই ব্যবহারিক শিল্প বিদ্যালয় (The Calcutta School of Industrial Arts) এই নামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মুসে রিগো (M. Regaud) সাহেবের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। অক্টোবর মাসে মহাত্মা রিগো ৩০০ টাকা বেতনে মডেলিং ও আর্কিটেক্‌চুরাল ড্রয়িংএর শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। তৎপর বর্ষে ফাউলার সাহেব বিলাত হইতে

আসিয়া এন্‌গ্রেভিং ও লিথোগ্রাফি ক্লাসের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অতি অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে এন্‌গ্রেভিং ক্লাস বন্ধ হয়; ফ্রেঞ্জার ও বেনেট সাহেব লিথোগ্রাফির ক্লাস চালাইয়াছিলেন। তৎপরে খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দে হুইট্‌লি সাহেব আসিয়া এন্‌গ্রেভিং ক্লাসের ভার গ্রহণ করেন, এই সময় লিথোগ্রাফি ক্লাস বন্ধ হয়।

খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন রূপ বেতন লইয়া নিম্নলিখিত বিষয় গুলি শিক্ষা দেওয়া চলিতে থাকে—

১।—মুসে বি, রিগো সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন প্রাতে ৬॥টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত মৃণ্ময় গঠন (Modelling) ও প্লাষ্টারের ছাঁচ (Moulding) নির্ম্মাণ শিক্ষা। বেতন মাসিক ১॥০ টাকা।

২।—মিঃ জর্জ হুইট্‌লির তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন ১১টা হইতে ৩টা ও একদিন অন্তর প্রাতে ৬॥টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত এন্‌গ্রেভিং শিক্ষা। বেতন মাসিক ৳০ আনা।

৩।—মুসে, বি, রিগো সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন প্রাতে ৬॥টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত ফিগার ড্রয়িং (Figure Drawing) শিক্ষা। বেতন মাসিক ৳০ আনা।

৪।—জর্জ হুইট্‌লি সাহেবের তত্ত্বাবধানে একদিন অন্তর প্রাতে ৬॥টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত ল্যাণ্ডস্কেপ ও পরিপ্রেক্ষিত ড্রয়িং (Perspective Drawing) শিক্ষা। মাসিক বেতন ৳০ বার আনা।

৫।—মুসে ম্যালিয়েট সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ফটোগ্রাফি শিক্ষা। মাসিক বেতন ১॥০ দেড় টাকা।

এই পাঁচটি ক্লাস ছিল। এই সময় মেডিকেল কালেজের নিকট পটলডাঙ্গার বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত। তৎপূর্ব্বে বিদ্যালয়ের বেতন ছিল না।

এই সময় মুসে রিগো নিজে একটি কারখানা স্থাপন করেন, তাহাতে তিনি বিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছাত্রকে লইয়া সমস্ত দিন কার্য্য করিতেন, ঐ জন্য ছাত্রগণ পারিশ্রমিকও পাইত। ছাত্রগণ গড়পড়তা মাসে ১৬।১৭ টাকা পাইত। এই সময়ই লেজিসলেটিব কৌন্‌সিল গৃহের প্লাষ্টারের কাজ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, মেসার্স চার্লস্ নেফিউ কোম্পানিদের গৃহ প্রভৃতির জন্য প্লাষ্টারের কাজ তাঁহাদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

এই সময়ে বঙ্গদেশের প্রথম আর্টষ্টুডিও স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের চারিজন ছাত্র। (দিননাথ দাস, নবীনচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল দাস ও তিনকড়ি মজুমদার) ১নং জিগ্‌জাগ্ লেন কসাইটোলায় পেন্‌টিং, লিথোগ্রাফ, ডেকোরেসন, এন্‌গ্রেভিং প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

পাণ্ডব-চরিত।

মহাভারতীয় দৃশ্যাবলী।

(২৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

তৃতীয় প্রকরণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বনান্তর।

যুদ্ধ করিতে করিতে হিড়িম্ব ও ভীমের প্রবেশ।

হিড়িম্ব।—রাক্ষসে কভু না ডরে নর; শোন্‌রে পামর! প্রবল প্রতাপে মম ভীত বনস্থলী; মোর দাপে, বনমাঝে বেগে পবন না বিলায় বায়ু; হুঙ্কারে আমার ভয়ে কাঁপে প্রাণী—বিবরে লুকায় জীব প্রাণ আশে। শক্তিধর৹ তুমি নর—ধর কিরে হৃদিমাঝে হেন উচ্চআশা—তব বাহুবলে বিনাশি আমারে রক্ষিবে আপন প্রাণ—সুষুপ্ত অন্য পঞ্চজনে? শোন্ শোন্‌রে পামর! এ দারুণ সমরে নিস্তার না পাবে আজি। বহুকাল পরে উষ্ণ ফেনিল শোনিতে তব মিটাইব তৃষা মোর। রে ভীম! তুচ্ছ নরে তৃণসম ভাবি আমি। বিনাশি তোদের নাশিব হিড়িম্বারে—কামবশে নরে বরে যেই, সে কভু নহে রক্ষণীয়া মোর।

ভীম।—বাক্যে কিবা কাজ, থাকে শক্তি পরিচয় দেহ রণস্থলে।

হিড়িম্ব।—রে বর্ব্বর! তোর কথা শুনি জলি'ছে হৃদয় মোর; শোনিত পিপাসা আশা বাড়িতেছে পলে পলে। নীচ মুখে উচ্চ ভাষা বিষম বাজিছে প্রাণে; আয় আয় রে নর, এখনি ঘুচাই বিক্রম তোর।

ভীম।— হাসি পায় তোর কথা শুনি, রে রাক্ষস! এত-ক্ষণে জানিনু নিশ্চয় দ্বিগুনিয়া জলে হ্রস্ব দীপশিখা লভিবারে শান্তি চির অন্ধকারে? রে রাক্ষস! তব পাপে পূর্ণ বনস্থলী; এবে বধি তোরে রেণু রেণু করি উড়াইব অস্থিরাশি ধুলিসাথে; আজি রক্তস্রোতে তো'র ধুইব রে পাপরাশি, পুণ্যভূমি হবে এ কানন, বিস্তারিবে শান্তি রাজ্য আপনার।

যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।—(নেপথ্যে) দেখ ভাই! দৃষ্টি নাহি চলে; উন্মত্ত বায়ুদল খেলিতেছে ধুলিসাথে, আবরিতে দশদিক; হের, পুন খেলিছে বিদ্যুৎ বনমাঝে, মেঘ কোলে সৌদামিনী যেন, হেরি তায়,ভয়ে কাঁপে বনরাজি; দেখ দেখ, কে বধে কাহারে?

অর্জ্জুন।—(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) একি ভাই! বনমাঝে কেন আজি রাক্ষস সমরে রত তুমি? আছি বাণ যুড়িয়া ধনুতে, পাইলে আদেশ, নিমেষে উড়াইব রক্ষশির।

ভীম।—(অর্জ্জুনের প্রতি) একি ভাই! কার কাছে রাখি জননীরে এসেছ হেথায়? যাও ভাই! যাও ত্বরা করি মাতৃ রক্ষা হেতু। মায়াধর রাক্ষসকুল, না জানি আবার, কোন্ মায়াজাল করেছে বিস্তার। আছি জননী চরণাশ্রয়ে জীবিত ধরায়, হারাইলে তাঁরে ত্যজিব পরাণ।

হিড়িম্ব।—(ভীমের প্রতি) নরকুলে ধন্য তুই, এতক্ষণ যুঝ মোর সাথে।

অর্জ্জুন।—হে মহাবাহো! ক্লান্ত কি হ'য়েছ তুমি রাক্ষস সমরে? নাহি ভয় ভাই! আসিয়াছি সহায়ে তোমার। আছে ছটি ভাই মাতৃরক্ষা হেতু।

ভীম।—সমরে না ডরি ভাই, স্থিরচিত্তে কর দরশন; জানিও নিশ্চয় না শাস্তিয়া পাপে কভু না ত্যজিব প্রাণ। কহ ভাই! সিংহের বিবরে পশিলে জম্বুক—ফিরে কি সে যায় আপন বিবরে?

অর্জ্জুন।—হের অমিত্রকর্ষণ! রাক্ষসের ভয়ে পলাই'ছে নিশানাথ! সাজি উষা সুন্দর বরণে হের, খুলি পুরব দ্বার বাহিরিছে ধীরে ধীরে রাক্ষস বল করিতে বর্দ্ধন। পাপাত্মা রাক্ষসে করিয়া নিপাত চল ভাই! যাই ত্বরা অন্য স্থানে, এলে উষাসতী মায়াজাল করিবে বিস্তার—নব বলে হবে বলীয়ান্ এ পামর।

ভীম।—হে অর্জ্জুন! ভুলেছ কি ভাই! বৃকোদর বল? ভারি ভূরি করেছিল রাক্ষস, ঘুচাইতে সে ভারিভূরি—করি ক্রীড়া দেখিবারে কত বল ধরে রক্ষবাহু। এখনি বিনাশি রাক্ষসে ঘুচাইব ত্রাস, সমরের সাধ মিটাইব ওর।

হিড়িম্ব।—অসহ্য ও গর্ব্ব তব; রক্ষা করি আত্মপ্রাণ সুখে রহ জননীর কাছে। অভিলাষ করেছ অন্তরে বধি মোরে সুখে রবে পঞ্চভাই জননীর সাথে। রে ভীরু! থাকিতে হিড়িম্ব জীবিত ধরায় সে দুর্ম্মদ আশা কভু না পুরিবে। আয় আয় পাপ! এখনি বিনাশি তোরে।

(যুদ্ধ করিতে করিতে ভীমের পশ্চাৎ গমন।)

অর্জ্জুন।—কি কর কি কর ভাই!

ভীম। না ডর অর্জ্জুন! (স্বগতঃ) কোথা পিতা দেব-প্রভঞ্জন! দেও শক্তি বাহুতে আমার; নমি পায়, দেও বল ঘুচাই রাক্ষস ত্রাস. বদ্ধ মায়াপাশ টুটি বাহুবলে। কোথা হরি দয়াময়!—(প্রকাশ্যে)

(হিড়িম্বকে উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ঘুরাইতে আরম্ভ।)

মায়াজাল কররে বিস্তার রক্ষিতে জীবন; নিত্য বধি প্রাণী বৃদ্ধি কর পাপ স্রোত, আজি বধি তোরে, কণ্টকহীন করিব এ বন; বিস্তারিবে শান্তিদেবী রাজ্য আপনার।

হিড়িম্ব।—(হিড়িম্বের বল প্রকাশ আরম্ভ)

ভীম।—হাসি পায় রে রাক্ষস! পড়িলে কালের কবলে প্রাণী, কে পারে রক্ষিতে তারে? মায়াধর তুমি রাক্ষস কুলে, প্রাণরক্ষা হেতু, যাদুকরী মন্ত্র—যত পার কহ মোর কাণে।

অর্জ্জুন। কহ ভাই! রাক্ষসভারে কাতর কি তুমি!

ভীম।—(সক্রোধে) কি কহিলে, ক্লান্ত আমি রাক্ষস-রণে! ছার এ রাক্ষস, উপাড়ি ভূধর পারিরে ঘুরাতে।

(বলপূর্ব্বক হিড়িম্বকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া বক্ষে জানু পাতিয়া উপবেশন।)

এই বার ফুরাইবে জীবনের আশা যত।

হিড়িম্ব।—(চিৎকার করিয়া) নারী হেতু হেন ভাগ্য ঘটিল আমার, রহিল জঞ্জাল—কিন্তু—প্রাণ—গেল—জীব—নের—সাধ—মি—টি—ল—না। (মৃত্যু)

অর্জ্জুন।—তব বাহুবলে বাঁচিল প্রাণ, এস ভাই! করি আলিঙ্গন। (উভয়ের আলিঙ্গন)

যুধিষ্ঠির।—যাঁর কৃপাবলে সুখে আছি বনে পাঁচ ভাই! জননীর সাথে; এ বিপদ সাগরে কর্ণধার যিনি, সেই শ্রীমধুসূদন দিয়াছেন বল বাহুতে তোমার, মনসাধে স্মর শ্রীমধুসূদনে।

অর্জ্জুন।—আছে দূরে বনের প্রান্তরে গ্রাম, লয়ে জননীরে চল যাই তথা ভাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—বনমধ্যস্থিত পথ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী ও হিড়িম্বা।

ভীম।—মায়াধর রাক্ষসকুলে কেমনে করিব বিশ্বাস! শুন ভাই! রাক্ষসগণ বিস্তারি মোহিনী মায়া সদা করে বৈরনির্যাতন—সেই হেতু চাহি ত্যজিবারে হিড়িম্বারে; কহ ভাই! কে চাহে পালিতে অহি, দুগ্ধ দানে? পরমান্ন বিনিময়ে কে চাহে গরল?

যুধিষ্ঠির।—কহ ভাই! তবু কি ত্যজে বৃক্ষ জড়িত লতারে?

ভীম।—জাননা জাননা তুমি রাক্ষস ছলনা; ছলনায় ভুলায় নর; ছলপাতি রাক্ষসগণ বধে প্রাণী। হেন অমঙ্গল কে চাহে রাখিতে সাথে? কিম্বা বধি রাক্ষসীরে ঘুচাই এ পাপ।

যুধিষ্ঠির।—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! ত্যজ ক্রোধ, নারীবধ উচিত না হয়; সত্য বটে হিড়িম্বা রাক্ষসী—তবু নারী সে। নারী ক্রুদ্ধ হলে কি অনিষ্ট সম্ভবে? মিনতি আমার ত্যজ ক্রোধ ভাই! বধিলে রমণী অকলঙ্ক পাণ্ডব কুলে কলঙ্ক রটিবে; কু-যশ গাইবে লোকে। পুন ভিক্ষাআশে এসেছে রমণী ভিক্ষুকেরে তোষ ভিক্ষাদানে।

হিড়িম্বা।—(কুন্তীর প্রতি) আর্য্যে! জান তুমি দুর্ব্বল কত রমণী হৃদয়, পুন বিকল করেছে মন পঞ্চশরে। হেন দেবরূপ হেরিলে নয়নে, আছে কি জগতে নারী যেবা না চায় ভজিতে? তাই রূপহেরি ভুলিয়াছি আমি। সত্য বটে জন্ম মম রক্ষ-কুলে, সত্য বটে, শোনিতে পূর্ণ করে উদর রাক্ষসগণ, কিন্তু দেবি! জানিও নিশ্চয় গড়ে নাই বিধি কভু রাক্ষসীরে ভিন্ন প্রকরণে। কহ যশস্বিনী! ফুটে নাকি গো কুসুম-রতন কণ্ট-কের বনে বিলাইতে সৌরভ চারিদিকে?—কিম্বা পাষাণ হৃদয় ভূধররাজি তোষে না কি তৃষিত পথিক-ব্রজে বারিদানে? শুন দেবি! পুত্রে তব বরিয়াছি আমি, প্রাণ মন করেছি অর্পণ; আশ্রয় পাইব আশে, ছিন্ন করি ভ্রাতৃপ্রেমডুরি ভিখারিণী সম। যাচিতেছি দেবরূপী বৃকোদর প্রেম। মিনতি আমার, দেও আজ্ঞা পুত্রে তব প্রেমদানে তুষিতে আমারে। আশা পূর্ণ হলে পুন এনে দিব তনয়ে তোমার।

যুধিষ্ঠির।—শুন সুমধ্যমে! যথেচ্ছায় করহ বিহার বৃকোদর সাথে দিবাভাগে; এলে নিশা রব পাঁচ ভাই জননী নিকটে।

ভীম।—(লজ্জানম্র মুখে) যথা ইচ্ছা দেব! (হিড়িম্বার প্রতি) হে রাক্ষসি! ভ্রাতৃ আজ্ঞা করিব পালন; কিন্তু, পূর্ণ হ'লে কাল আর না ভজিবে মোরে।

হিড়িম্বা।—আজ্ঞাবহ দাসী তব, প্রভু আজ্ঞা করিবে পালন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—হিমালয়-পর্ব্বত।

হিড়িম্বা ও ভীম।

হিড়িম্বা।—দেখ নাথ! বহিতেছে কল্লোলিনী দূরে ধিরি ধিরি, বিতরিতে প্রেমনীর জগত মাঝারে, পুনঃপ্রেম, সেই



হিড়িম্ব বধ।

হেতু ভূধর না পারে আঁটিতে উহারে। কভূ বাধা নাহি মানে, দূরাদূর সুখাসুখ অন্ধপ্রেম। প্রেমিক যে জন, বিনায় প্রেম-ধন, আশা নাহি করে কিছু।

ভীম।—কহ রে রাক্ষসি! বিরাজে অদূরে নিত্য নব শোভা ধরে মোহন উদ্যান যেই, ওই কি মানস সরোবর? শুনিয়াছি ঋষি মুখে কুসুম-কুন্তল-ভূষা বসন্ত বাস করে ওই স্থানে; চারিপাশে বন, বিশাল কানন, নিত্য নব ভাব ধরে। আসেন আপনি উষা, সঙ্গিনী ফুলদল সাথে—জাগাইতে ঋতুরাজে, যবে ভ্রমেন উদ্যানে পিককুল ডাকে, পঞ্চমে বীণা আপনি বাজে বনদেবী করে, রাজহংস খেলে জলে, অপ্সরা নাচে তালে তালে।

হিড়িম্বা।—সত্য নাথ! হেন মধুমাখা স্থান আর নাই জগত মাঝারে; হেরিলে জুড়ায় আঁখি। শুনিয়াছি দেবগণ আসেন এ স্থানে বিহারের হেতু; চল নাথ বিহারিব দোঁহে ওই স্থানে দেবে না জানিবে।

ভীম।—শুন প্রিয়ে! আর নাহি রব, মাতৃপাশে যাব; কি জানি আমা হেতু ভাবেন জননী বুঝি; হেরে সে চরণ জুড়াইব পরাণ আমার।

হিড়িম্বা।—শরমে না সরে বাণী; শুন নাথ! পুরিয়াছে আশা মম। প্রতিজ্ঞা পালিব, পুন ফিরে দিব, তোমারে, হে প্রাণেশ্বর! তব ভ্রাতৃগণ কাছে। এক ভিক্ষা আছে হৃদে, হে হৃদয় ঈশ্বর! আছে উদরে আমার,দাস তব, কভু কি স্মরিবে তারে প্রয়োজন হ'লে—কিম্বা দাসী বলে অভাগীরে কভু?

ভীম।—রবে পুত্র মম সাথে বিপদের কালে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—বনাভ্যন্তর।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কুন্তী।

যুধিষ্ঠির।—না বধ না বধ উহারে ভীম; আছে সুখে শাবকের সাথে, বধিলে উহারে শিশু না বাঁচিবে, অনাহারে ত্যজিবে জীবন। ভ্রমি বনে বনে আনিয়াছি বহু ফল, ফলমূলে যাবে ক্ষুধা! নিবারিতে ক্ষুধা প্রাণীবধ উচিত না হয় ভাই।

ব্যাসের প্রবেশ।

দেখ দেখ জননিগো! এসেছেন কোন মহাজন আমাদের মাঝে! পিতামহ! প্রণমি চরণে (কুন্তীর সহিত সকলের ব্যাসকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান) দাদা! আছে কি আজিও সৌভাগ্য হেন পাণ্ডব ললাটে—মিলিবে দরশন তোমা হেন জন, দুঃখার্ণবে পাবে সুধার ধারা।

নকুল।—দাদা! এতদিন পরে পড়িল কি মনে তোর, ভিখারী পাণ্ডবে?

ব্যাস।—ভুলি নাই, ভুলি নাই তোদের ভাই; হৃদিমাঝে নিত্য হেরি রূপরাশি; তব স্মৃতি লয়ে করি ধ্যান দিবানিশি।

যুধিষ্ঠির।—ভিখারী পাণ্ডব কি দিবে তোমারে? ধরিত্রী আপনি ধরেছেন তৃণদল বসি তদুপরে করহ বিশ্রাম ভাই।

সকলের উপবেশন।

ভ্রমি বনে বনে ফল মূল আনিয়াছি মোরা।

সহদেব।—দাদা! তুই কিছু খাবি? এ প্রাচীন বয়সে অনেক ঘুরেছিস্, অসুখ হয়েছে কত।

ব্যাস।—কিছু নাহি খাব ভাই, সুখে থাক্ তোরা, তাতেই আমার সুখ। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) শুনেছি ভাই কৌরব ছলনা, ছলপাতি লভিয়াছে রাজ্য; দেছে বনে পাঁচ ভাই জননীর সাথে। কাতর না হও, বহুসুখ রয়েছে সঞ্চিত তোদের। কৌরব পাণ্ডব ভিন্ন নাহি মোর কাছে, তবু দীন যে জন তারে দয়া করি আমি। আসিয়াছি তোদের মঙ্গল হেতু। শুন ভাই! ইচ্ছা মোর রহ জননীর সাথে একচক্রা মাঝে। (কুন্তীর প্রতি) হে জীবৎপুত্রি! জ্যেষ্ঠ পুত্র তব ধর্ম্মপরায়ণ, ভীমার্জ্জুন ভুজবলে ধর্ম্মের সহায়ে সসাগরা ধরা করিবে অধিকার, রাজগণ সেবিবে চরণ; হবে অনুষ্ঠান রাজসূয় যজ্ঞ—সুখে রবে পুত্র তব; রহ একচক্রামাঝে ব্রাহ্মণ আশ্রয়ে, একমাস কাল পুন পাবে দরশন মোর।

[ব্যাসকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—একচক্রা কুটীর।

কুন্তী ও ভীম।

কুন্তী।—বহুক্ষণ হেরি নাই নকুল অর্জ্জুনে, কোথা গেল তারা?

(নেপথ্যে ক্রন্দন শব্দ।)

শুন ভীম! আছি সুখে ব্রাহ্মণ আলয়ে; বড় যত্ন করেন দ্বিজ মোদের, নিত্য ভাবি কি উপায়ে শোধিব কৃতজ্ঞতা তাহার;বোধ হয় ব্রাহ্মণের ঘটেছে বিপদ।

ভীম।—জননিগো! কি হেতু কাঁদেন ব্রাহ্মণী, ত্বরা করহ নির্ণয়; যেবা হয়, প্রতিজ্ঞা আমার সাধিব মঙ্গল তার।

(নেপথ্যে পুনরায় ক্রন্দন শব্দ।)

দেখ দেখ জননি! আবার—কেন পুন কাঁদেন ব্রাহ্মণী। যাও ত্বরা দেখ কি অমঙ্গল ঘটেছে উহার।

[দ্রুতবেগে কুন্তীর প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, পুত্র, কন্যা ও কুন্তী।

ব্রাহ্মণ।—ধিক্ সে জন, দাসভাবে সেবে অন্যে যেই। হায়, হায়, আছি কোন সুখে ধরিয়া জীবন; ধনআশা কেন করে নর নরকের হেতু? কি উপায়ে পাইব নিস্তার বুঝিতে না পারি। ত্যজি গৃহ পলাইব পুত্র কন্যা লয়ে; বনে বনে ফিরি কাটাইব জীবন—তবু দেশে নাহি রব—কোথা যাব; আছে কি হেন নিঃশঙ্ক স্থান জগত মাঝারে? (ব্রাহ্মণীর প্রতি) প্রিয়ে জান তুমি এই ভয় হেতু কহেছিনু তোরে ত্যজিবারে গৃহ; হায়, বিধি বাম মোর প্রতি সেই হেতু তুমিও সাধিলে বাদ। কথা না শুনিলে—সবংশে মজিলে; এবে গৃহ শূন্য হইল আমার।

ব্রাহ্মণী।—অপত্য লইয়ে তুমি রহ গৃহে, আমি যাব রাক্ষসের কাছে। কহ নাথ! প্রাণ রক্ষা হেতু কেমনে বিসর্জ্জিবে দাসী পতি পুত্র কন্যা? আমি গেলে অপত্য বাঁচিবে সুখে রবে চিরকাল।

ব্রাহ্মণ।—প্রিয়ে! ছিন্ন হ'ল ,হৃদয় আমার আর না শুনিতে পারি। (ক্রন্দন)

ব্রাহ্মণী।—প্রাণেশ্বর! কেঁদ না কেঁদ না আর; জন্মিলে মরিবে নর, শোক কর কেন তার হেতু। পুত্র কন্যা সকলি তোমার হেতু; থাকিলে জীবিত তুমি তারাও বাঁচিবে, কিন্তু একা নারী কেমনে বাঁচাব তায়। স্বধর্ম্ম পালিব পতিরে বাঁচাব, নারী ব্রত উদ্যাপিব আমি, পরলোকে লোভিব অনন্তস্বর্গ।

কন্যা।—শুন তাত! রোদন না কর; আমি যাব রাক্ষসের কাছে। পিতৃ গৃহে চিরকাল কন্যা নাহি রবে; বয়স্থা হইলে পাঠাইবে পতিগৃহে, আমারে প্রেরিলে সর্ব্বদুঃখ যাবে দূরে। শুন পিতা! মঙ্গলসাধন হেতু লোকে করে সন্তান হেন কামনা; সুসময় কভু না ছাড়িব, কথা না শুনিব, আপনি যাইব তথা; বাঁচাইব জনক জননী মম, অঋণী হইব ভবে। (সকলের ক্রন্দন)।

পুত্র।—না কাঁদ না কাঁদ জননি আমার! রহ সবে কুঠির ভিতরে আমি যাব রাক্ষস বধের হেতু।

কুন্তী।—কহ গো! কাঁদ কি হেতু তোমরা সকলে—কহ মোরে, যেবা হয় সাধিব মঙ্গল তব।

ব্রাহ্মণ।—তপোধনে! নরসাধ্য নহে বিদূরিতে মোর দুখ, কহ কি হবে শুনিয়া তায়? কিন্তু একান্ত হে মনস্বিনি! ইচ্ছা যদি শুনিবারে দুঃখের কারণ মোর, শুন কহিতেছি আমি। অতুল বিক্রমশালী বক নামধারী আছে রাক্ষস এক, নিজ ভুজবলে রক্ষা করে দেশ; প্রভাবে তাহার হিংস্র জীব যত পলায়েছে দূরে। করেছে নিয়ম জনগণ সাথে প্রতিদিন প্রতিগৃহ হ'তে যাবে প্রাণী ভোজ্য ভক্ষ্য লয়ে আহারের হেতু; প্রাণী যত যাবে সকলে খাইবে, কেহ না ফিরিবে আর,; যেবা লঙ্ঘিবে নিয়ম সবংশে মরিবে। আছে রাজা এক বেত্রকীয়-গৃহে, নির্ব্বোধ সে জন প্রজাসুখ কভু নাহি ভাবে মনে। আজি পর্য্যায় আমার—কিন্তু উপায় না পাই কেমনে পাইব ত্রাণ, বাঁচাইব প্রাণ।

কুন্তী।—শুন ব্রাহ্মণ তনয়! না করিও ডর, করিয়াছি স্থির কি উপায়ে পাইবে ত্রাণ। নাই কাজ প্রেরিয়া তনয়ে তব, শিশুমতি তারা নিস্তার না পাবে। আছে পাঁচ পুত্র মোর, একজনে প্রেরিব রাক্ষস সমীপে।

ব্রাহ্মণ।—শুন ভদ্রে! আছ আশ্রয়ে আমার; রাখিবারে আত্মপ্রাণ কেমনে মৃত্যু মুখে পাঠাব তোমারে? পূজ্য অতিথি সর্ব্বকালে। না না, এ প্রাণ থাকিতে কভু না পারিব তাহা, সকলে যাইব রাক্ষসের কাছে তবু অতিথি রাখিব ঘরে। কহ দেবি! কেমনে অধর্ম্ম সাধিব, ব্রহ্মহত্যা কেমনে করিব?

কুন্তী।—সত্য বটে হে ব্রাহ্মণ কুমার! অতিথি সর্ব্বদেবময়; কিন্তু কহ আছে কি জননী যেবা চাহে পাঠাইতে পুত্রে যমের নিকটে? শুন শুন ব্রাহ্মণ তনয়, জীবনের ডর না করিও তুমি বিশেষতঃ বলবান, তেজস্বী মন্ত্রসিদ্ধ পুত্র মোর।

ব্রাহ্মণ।—যেবা হয় কর স্থির, পাপভাগী হব মাত্র আমি।

পট পরিবর্ত্তন।

ভীম।—ক্রমে বাড়ে ক্রন্দনের রোল; বিপদ—বিপদ, কি বিপদ সম্ভবে উহার?

ব্রাহ্মণ ও কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী।—তারিতে ব্রাহ্মণে যাও পুত্র! তুমি রাক্ষস সমীপে; বধি তায় গৃহেতে ফিরিবে; আসিলে এখানে ভয়শূন্য হইবে ব্রাহ্মণ, নিদ্রা যাবে সুখে, পুত্র কন্যা সাথে।

ভীম।—জননিগো! পালিব আদেশ তব; না রাক্ষসে মারি, ফিরিব না গৃহে; নিঃশঙ্ক করিব একা? কর আশীর্ব্বাদ জননি আমার, কৃতকার্য্য হই যেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।



বেহুলা।

"ভেসেছি নদীজলে, যা'ব যে কোথা চ'লে,
জানি না, জানি না গো কোথা যে এসেছি ;
কেবল জানি, পতি সহিতে ভেসেছি।
হারা'য়ে ধ্রুবতারা, হ'য়েছি পথহারা,
ভাসিনু সারানিশি, কাঁদিনু সারানিশি;
নদীর জলে গেল নয়ন-জল মিশি'।
বাড়িয়া নদীজল, ডাকি'ছে কলকল,
বলি'ছে মোরে যেন, 'ভেসে যা, অভাগিনি!
হারা'য়ে ধ্রুবতারা, হ'লি গো পথহারা,
আবার পা'বি তা'রে, পোহা'লে নিশীথিনী।'
আশার ছলনায়, দারুণ ভাবনায়,
স্বপন একি দেখি,—'ভেসে যা, অভাগিনি!
আবার পা'বি তা'রে পোহা'লে নিশীথিনী।'
হইলে নিশি ভোরা, মেলে কি ধ্রুবতারা,
প্রভাত-আলোকে যে, সে তারা ডুবে যায় ;
পোহা'লে নিশীথিনী কেমনে পা'ব তায় ?
না না না, তাই বটে, এ তারা দিনে ফোটে,
এ ধ্রুব নিশাকালে নয়ন মুদে রয় ;
প্রভাতে জেগে করে আশারে আলোময়।

(রাগিণী জয়জয়ন্তী।)

"তবে পোহা গো রজনি !
চ'লে যা, চ'লে যা, মা ! ছাড়িয়ে ধরণী।
খুলে ফেল্ তোর হীরার হার,
ভুলে যা তোর ধরা-বিহার,

তোর আশাকে ভুলে গিয়ে,
মোর আশাকে আশা দিয়ে,
যা গো জননি!—
তোর হৃদয়মণি-চাঁদ সরিয়ে নে,
ফিরে দে মোর হৃদয় মণি।

"কই গো যামিনীদেবি! অভাগীর এ মিনতি,
শুনিলি না কাণে;
যে স্নেহে পাষাণ গলে, সে স্নেহের রেখাটিও
নাহি তোর প্রাণে?
মা মা ব'লে এত ডাকি, একদিঠে চেয়ে আছি,
মা গো, তোর পানে;
এ অভাগী মেয়েটিরে, ফিরে চা মা, যা না ফিরে
আপনার স্থানে।
মা আমার, মা আমার, কাঁদিতে পারিনে আর,
আকুল নয়ানে;
মৃত পতি কোলে নিয়ে, মৃত সম হ'য়ে আছি
জীবন্ত পরাণে।

"মাগো, মোর কেহ নাই, নাহি জুড়া'বার ঠাঁই,
পতিরে হারা'য়ে আমি হারা'য়েছি সবি;
আনন্দ-বাসরে মোর প্রবেশিয়া কাল-চোর
চুরি ক'রে নিয়ে গেছে আনন্দের ছবি।
সেই তুই, এই তুই, সেই আমি, এই আমি,
সেই পতি, এই পতি, সবি-সেই এই;
কিন্তু এই অভাগীর দগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
সেই-এই এক-করা সেইটি তো নেই।
সেইটি পা'বার তরে কদলীর ভেলা'পরে
কত দিন ধ'রে ভাসি জলে;
যে দিকে নদীর গতি, সেই দিকে ভেসে যাই
সতীপ্রাণ মৃতপতি কোলে।
নিশি গো! জান তো তুমি, তোমারি অঞ্চলতলে
সুকঠিন লোহার বাসরে,
রুষ্টা মনসার ভয়ে, হরিষে বিষণ্ণ হ'য়ে,
ছিনু আমি প্রাণে যেন ম'রে।
কি জানি কি-যেন হয়, পলে পলে এই ভয়
প্রবেশিল মনে খুলি' চিন্তার কপাট;
পতি মোর নিদ্রা যান, নব বিবাহের গান
গাহিতে লাগিল তাঁ'র স্বপনের হাট।
হেন কালে কালফণী, সূত্রের সঞ্চারে পশি'
লোহার বাসরে,
অলক্ষ্যে আমার, হায়, দংশিল পতির গায়
ক্ষুদ্র ফণা ধ'রে।
মনসার আশা পূর্ণ হইল, জননি!
শুভ বিবাহের দিনে
হারাইনু ধ্রুবতারা—হৃদয়ের মণি।

"দারুণ হতাশ শোকে মা গো!
মান্দাসে চড়িয়া তাই, কোথায় যে ভেসে যাই,
কিছুই ঠিকানা নাই, মাগো!
মোর মত অভাগিনী, কেউ নাই ত্রিজগতে,
মোর মত কেবা অনাথিনী!
এমন বৈধব্য-দাহ কোথা কি ভুঞ্জি'ছে কেহ,
জান যদি, বল, নিশীথিনি?
তা' হ'লে তাহার পাশে এখনি যাইয়া আমি
ক'ব মোর বিষাদের কথা;
যে জন ব্যথার ব্যথী, সেই জন ব্যথা বুঝে,
পরে কি পরের বুঝে ব্যথা?
তা' যদি বুঝিত কেউ, তা' হ'লে কি তুই, নিশি,
পাষাণীর মত হ'য়ে এখনো থাকিস্?
এখনি যেতিস্ চ'লে, মঙ্গল-প্রভাত-প্রভা
এখনি ফুটিত পূবে উজলিয়া দিশ।
বড়ই অভাগী আমি, হায়,
তাই নিশি কৃপায় না চায়!



স্বর্গীয় মহাত্মা শম্ভুনাথ পণ্ডিত

(রাগিণী সুরঠ।)

"নদী গো! নিশি যায় না;
অভাগীর পানে চায় না।
তুই মা, ব'লে দে না, ব'লে দে না—
নহে মেয়ে তোর ধ্রুবতারা পায় না।
তোরি কলকল-কথা
বাঁচা'য়েছে মোর আশা-লতা,
কিন্তু নিশি বোঝে না ব্যথা
কঠিন পরাণে;—
বড় ভয়, কি জানি কি হয়,
ক্ষীণপ্রাণা আশা-লতা প্রাণে বুঝি রয় না।
আমার হ'য়ে যামিনীরে যেতে বল্,
মুছে দে মা আমার নয়ন-জল,
যেন আমি ধ্রুবতারা হইনে হারা,
ওমা ভয়হরা তটিনি;—
আশা মোর হতাশ হ'লো, ভরসা দিতে আর না।"

হ'য়ে বালা আকুল-পরাণ,
গেয়ে হেন বিষাদের গান,
লক্ষেন্দ্র* স্বামীর মৃত কায়
কোলে ল'য়ে জলে ভেসে যায়।
নদীকূলে তরুর উপর
ঘুমাইতেছিল পাখিকুল;
শুনে তা'রা করুণার স্বর
ছাড়ে স্বর হইয়া আকুল।
বেহুলার শোকোচ্ছ্বাস-গান,
তটিনীর জলোচ্ছ্বাস-তান,
বিহঙ্গের স্বরোচ্ছ্বাস-তান
এক সঙ্গে মিলিত হইয়া,
কি-এক হৃদয়ভেদী রবে
পূরিল নীরব দশ দিশি
ঘুমন্ত আকাশে জাগাইয়া।
ধীরে ধীরে ত্রিবেণীর ঘাটে
বেহুলার ভেলা উপনীত;
সতীর পূরা'তে অভিলাষ
পূরবে তপন সমুদিত।
বেহুলার ধ্রুবতারা জাগা'বার তরে
আকাশের ধ্রুবতারা ডুবিল উত্তরে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

* ইঁহার প্রচলিত নাম নখিন্দর।

স্বর্গীয় জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সদাশিব পণ্ডিত। সদাশিব কাশ্মীরীয় ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ছিলেন এবং তদানীন্তন সদর আদালতের পেস্কার পদে কিছুকাল অধিষ্ঠিত থাকেন। শম্ভুনাথকে তাঁহার পিতার অনুমত্যানুসারে, তাঁহার মাতুল, দত্তক পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করেন।

কলিকাতার জল বায়ু শম্ভুনাথের স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না বলিয়া, তিনি লক্ষ্ণৌয়ে তাঁহার মাতুলের নিকট প্রেরিত হন। তথায় তিনি উর্দ্দু ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। পরে ইংরাজী শিক্ষার জন্য তাঁহাকে কাশীতে পাঠান হয়। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শম্ভুনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া 'ওরিএন্ট্যাল সেমিনরিতে' ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয়ে তিনি সাহিত্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন, কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রাদিতে মূলেই ব্যুৎপন্ন হইতে সক্ষম হন নাই। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, এবং ২০৲ টাকা বেতনে সদর আদালতের রেকর্ড রক্ষকের (Record Keeper) সহকারী পদে নিযুক্ত হন। এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত আদালতের দলিলাদির অনুবাদ করিয়া মাসে বেতনাধিক আরও কিছু উপায় করিতেন। মেশুয়ার্স ম্যাকলাউড ও ফ্রেঞ্চ কোম্পানি ঐ অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সর রবর্ট বারলোর অধীনে ডিক্রিজারী মুহরীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ পদের কার্য্য তিনি অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসাভাজন হন।

তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি থাকিয়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে একখানি যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে স্বকৃত টীকা ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সন্নিবিষ্ট বেকনের প্রবন্ধ (Bacon's Essays) পুস্তকের একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। সাহিত্যাধ্যাপক পণ্ডিতবর কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন্ উহার বড় আদর করিতেন। তাহার পর তিনি ডিক্রিজারী আইন সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচার করেন। এতদ্দ্বারা তিনি গবর্ণমেণ্ট ও সদর জজগণের প্রভূত প্রতিষ্ঠাভাজন হন। অতঃপর শম্ভুনাথ কোর্টের রিডর (Reader) পদের প্রার্থী হন; কিন্তু তাহাতে তিনি সফল মনোরথ না হওয়ায় উকিল হইয়া আদালতে প্রবেশ লাভ করিবেন স্থিরসংকল্প করেন। তদানীন্তন কোর্টের রেজিষ্ট্রার কার্পাট্রিক সাহেব তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট প্রশংসা পত্র প্রদান করেন; তাহার বলে তিনি ওকালতী পরীক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হন; এবং ১৬ই নবেম্বর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সনন্দ প্রাপ্ত হন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ফৌজদারী আইনের জনৈক বিশিষ্ট উকীল বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইয়া উঠেন। এই সময়ে তিনি 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে আইন বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। সেই গুলি পাঠে কোর্টের জজেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এই সময়ে কলিকাতা 'স্কুলবুক সোসাইটি', পিয়রসন্ সাহেব কৃত বাক্যাবলীর পুনর্মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ করায়, অনরেবল বেথুন সাহেব ঐ গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিবার অভিপ্রায়ে তন্মধ্যে আইন সংক্রান্ত কথা ও আইন আদালত সম্পর্কীয় কতিপয় প্রবন্ধ সমন্বিত গুটিকতক পৃষ্ঠা সন্নিবেশিত করিবার জন্য, শম্ভুনাথকে অনুরোধ করেন। শম্ভুনাথ উক্ত বাক্যাবলীর এই অভাব পূরণ করিয়া দেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিম্নপদস্থ সরকারী (Junior Government Pleader) উকীলের পদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। এই পদারূঢ় হইবার অব্যবহিত পরেই গভর্ণমেণ্ট একটি খুনী মকদ্দমায় তৎপক্ষ সমর্থনার্থ তাঁহাকে মুরশিদাবাদে প্রেরণ করেন। ঐ মকদ্দমায় বাঙ্গালার নবাব নাজিমের আমুদআলি খাঁ বাহাদুর নামক জনৈক প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যতর কতিপয় মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ একটি কৃতদাস হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হন। গভর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী হইয়া ঐ মকদ্দমা চালান। ১৮৫৫ অব্দে গভর্ণমেণ্ট শম্ভুনাথকে প্রেসিডেন্সি কালেজের রেগুলেসন আইনের অধ্যাপকের পদে মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। এই কাজে তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল অধিষ্ঠিত থাকেন, এবং তন্মধ্যে তাঁহার আইন বক্তৃতা গুলির কতিপয় সংখ্যা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। ১৮৬১ অব্দে তিনি গভর্ণমেণ্ট 'সিনিয়র প্লিডরের' পদে উন্নীত হন। ইতিপূর্ব্বে বাবু রমাপ্রসাদ রায় ঐ পদস্থ ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তদানীন্তন চিফ্‌যষ্টিস্ সর্ বারনেস্ পিকক্ সাহেব শম্ভুনাথকে একখানি পত্র লিখিয়া জানিতে ইচ্ছা করেন, যে তিনি জজের পদে অধিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করেন কি না। যথা সময়ে ভারতবর্ষীয় 'সেক্রেটরি অব ষ্টেট—সর্ চার্লস্ উডের নিকট হইতে শম্ভুনাথের জজিয়তী মঞ্জুর হইয়া 'রএল লেটর পেটেণ্ট' আসিয়া পঁহুছিল। শম্ভুনাথ ঐ উচ্চপদ স্বীকার করিলেন। ভারতবাসীর পক্ষে এই পদ প্রাপ্তি কিছু কম শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় নহে। শম্ভুনাথ অতি অল্পকাল মধ্যে প্রধান জজ সমভিব্যাহারে লাখরাজ ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবস্থা নিষ্পত্তি করণে প্রধান উদ্যোগী হইয়া প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন তাহাতে অচিরেই তিনি সর্ব্বলোকরঞ্জন হইয়া উঠেন।

শম্ভুনাথ স্ত্রী-শিক্ষার প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার কন্যাকে বেথুন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন।

শম্ভুনাথ অতীব বিনয়নম্র ও ধীর প্রকৃতিক ছিলেন। এবং তাঁহার এরূপ দানশীল স্বভাব ছিল যে তাঁহার আয়ের এক তৃতীয়াংশ নিয়মিত রূপে দীন দরিদ্রগণকে ঔষধ বিতরণে এবং বহু সংখ্যক অনাথা ও গরীব বালককে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ জন্য অর্থ সাহায্য দানে নিয়োজিত হইত। তিনি মৎস্য ধরিতে বড় ভাল বাসিতেন।

শম্ভুনাথ ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পৃষ্ঠব্রণ (Carbuncle) রোগে আক্রান্ত হন, এবং ১৮৬৭ অব্দে, ৬ই জুন তারিখে স্বজন বন্ধু বান্ধবকে কাঁদাইয়া,—হাইকোর্টের জজগণকে গভীর শোক মগ্ন করিয়া পরলোক গমন করেন।

মাননীয় জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত অতিশয় ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে যেমন মানসিক অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিলেন, তেমনি আবার দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া রূপে গুণে মূর্ত্তিমান করিতে কৃপণতা করেন নাই। সহৃদয় পাঠক অপর পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রতিকৃতি খানি দৃষ্টে আমাদের এই বাক্যের সার্থকতা অনুভব করিবেন।

তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

THE ELECTRIC TELEGRAPH.

(২৪৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

১ম পরীক্ষা—একখণ্ড পরিষ্কার দস্তা লইয়া তাহার খানিকটা যদি উপরকার ঠোঁট ও দন্তপাতির মধ্যে এরূপ ভাবে চাপিয়া রাখা যায়, যে তাহার বাকী অংশটুকু বাহির হইয়া থাকে, তাহার পর একটি টাকা কি আধুলি অথবা একখণ্ড রূপা কি সোণা লইয়া, জিহ্বা বাড়াইয়া তাহার উপর রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যতক্ষণ ঐ দুইটি ধাতু ঐ রূপ পৃথগাবস্থায় থাকিবে—পরস্পরের সংস্পর্শে না আসিবে, ততক্ষণ কোনই পরিবর্ত্তন অনুভব করা যাইবে না। কিন্তু জিহ্বাকে অল্প তুলিয়া তদুপরিস্থিত রৌপ্যকে ঐ দস্তার সহিত সংলগ্ন করিয়া দিবামাত্রই অর্থাৎ ধাতু দুইটির ধার বা কিনারা পরস্পর যেমন ঠেকাঠেকি হইবে, অমনি তীব্র কষায় আস্বাদন অনুভূত হইবে। এস্থলে মুখের লালা এবং ঐ দুইটি ধাতুর পরস্পর সংযোগে রাসায়নিক কার্য্য ও তাহা হইতে তাড়িত-বলের উদ্রেক হইয়া থাকে। ঐ কষায় আস্বাদন তাড়িত-বলের স্বাদ বলিতে হইবে। জিহ্বাকে নামাইয়া ধাতুদ্বয়কে পরস্পর পৃথগভাবে রাখ, তৎক্ষণাৎ ঐ আস্বাদন তিরোহিত হইবে। উহাদের পুনঃ একত্রিত কর, পুনরায় ঐ রূপ আস্বাদন অনুভব করিবে। ঐ দস্তা ও রূপার পরস্পর এই রূপ সংমিলন সময়ে অন্ধকার গৃহে তাড়িতালোকও দৃষ্ট হয়। জ্যোৎস্নার ন্যায় ঈষৎ আলোক-আভা দস্তা ও রূপার মধ্যে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

২য়—পিত্তল, কাঁশা, তামা প্রভৃতি ধাতু-পাত্র অম্ল সহযোগে যে বিকৃত ভাবাপন্ন হয় তাহাকেই আমরা সচরাচর চলিত ভাষায় 'কলঙ্কিত' হওয়া বলি। তাহাও কেবল রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল মাত্র। এবং তাহারও ঐ বিকৃত (কষায়) আস্বাদন তাড়িত-বলেরই স্বাদ।

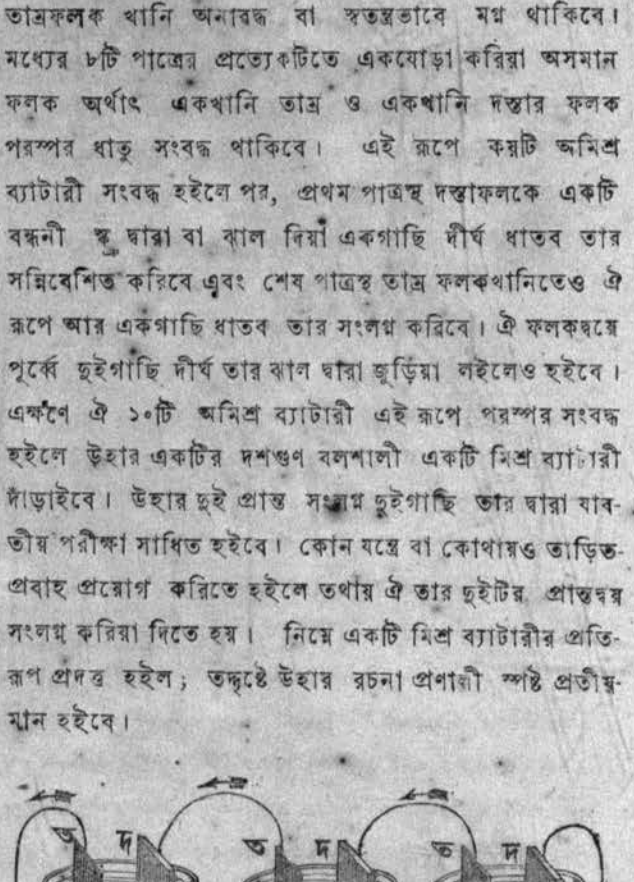
৪র্থ—কাঁশার পাত্রে নারিকেলের জল রাখিয়া যে খাইতে নিষেধ তাহাও বোধ হয় ঐ ধাতু ও জলের পরস্পর সংযোগে যে রাসায়নিক কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাতে ঐ নারিকেল জল বিকৃতগুণ হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া।

কিন্তু এই সকল স্থলে রাসায়নিক কার্য্যোৎপন্ন তাড়িতের অন্য কোন রূপ লক্ষণ সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

রাসায়নিক কার্য্য মাত্রই গতিশীল তাড়িতের মূল। যেখানে রাসায়নিক কার্য্য, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে রাসায়নিক ক্রিয়ার সহিত তাড়িত-বলের সত্তা উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ এরূপ অনেক রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখা যায়, যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাড়িত বল প্রবাহিত হয় বলিয়া জানা যায় না। উপযুক্ত উপায় অভাবে সে সকল স্থলে উৎপন্ন তাড়িত লুপ্ত ভাবেই থাকিয়া যায়। ধাতু ও অম্লাক্ত জলের পরস্পর রাসায়নিক কার্য্য হইতে যে তাড়িত-প্রবাহের উৎপত্তি হয় তাহাই ব্যাটারী রূপ উপায় দ্বারা আয়ত্ত করা যায়। ব্যাটারী, তাড়িত ধরিবার যেন ফাঁদ স্বরূপ। জড় জগতে প্রতিনিয়ত বিস্তৃত আয়তনে কত শত রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। দহন-কার্য্য মাত্রই রাসায়নিক কার্য্যের ফল। অথবা দহন-কার্য্য ও রাসায়নিক ক্রিয়া এ দুই একই শক্তি। প্রতিদিন কত শত মণ কয়লা বিবিধ বাষ্পীয় যন্ত্র চালাইবার জন্য পুড়িয়া থাকে। কয়লা অতি সুলভ বলিয়া, বাষ্পীয় যন্ত্রজাত অধিকাংশ সামগ্রী সুলভ। কয়লার দহন-কার্য্য যখন রাসায়নিক ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার সহিত যে অপরিমিত তাড়িত-বলেরও উৎপত্তি হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে এ পর্য্যন্ত কোন উপযুক্ত উপায়ের অভাবে, দহন-কার্য্য রূপ রাসায়নিক কার্য্য হইতে তাড়িত-বল সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই,—উৎপন্ন হইয়া গুপ্ত ভাবেই থাকিয়া যায়। ব্যাটারী রূপ উপায় আবিষ্কৃত না হইলে ঐ রূপ রাসায়নিক ক্রিয়া জনিত তাড়িত-বলও আজ পর্য্যন্ত গুপ্ত থাকিত, মানবেরও কোনও উপকারে আসিত না। ধাতু ও জলের পরস্পর রাসায়নিক কার্য্য হইতে যে তাড়িত-বলের উৎপত্তি হয়, সেই দ্বিবিধ তাড়িত-প্রবাহকে যেন ধরিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যাটারীর কৌশলময় সংযোজনা,—ব্যাটারী পাত্রে অম্লাক্ত জল ও তন্মধ্যে দ্বিবিধ ধাতুর দুইখানি ফলক, এবং ঐ ফলক দুইখানি আবার দুইটি সুদীর্ঘ তার সংবদ্ধ। মানব বুদ্ধি-বলের কি অদ্ভুত

মহিমা! জড় তামা দস্তার ঘাড়ে যেন যোয়াল দিয়া, জলে ডুবাইয়া, দ্রাবকে পুড়াইয়া, কি পরমাশ্চর্য্য শক্তি উদ্ভূত করিতেছে; আবার সেই শক্তিকে সংযোজক তারদ্বয় রূপ ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া আজ্ঞাকারী ভৃত্য স্বরূপ করিয়া, তাহা দ্বারা কত হিতকর কার্য্যই সমাধা করাইয়া লইতেছে! তাড়িত তত্ত্বালোচনার আরও উন্নত অবস্থায় এরূপ অন্য উপযুক্ত উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে যে তদ্দ্বারা দহন-কার্য্যাদি অতি সুলভ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেও তাড়িত-প্রবাহ আয়ত্ত করা যাইতে পারিবে। তখন এত অল্প ব্যয়ে প্রভূত তাড়িত-বল সংগ্রহ করা যাইবে যে, তখন ব্যয়সাধ্য গ্যাস ও তেলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রে তাড়িতালোক প্রবর্ত্তিত হইবে, এবং যাবতীয় বাষ্পীয় যন্ত্রের স্থানে সুলভ, অনায়াস-চালিত অথচ অধিকতর বলশালী তাড়িত-যন্ত্রের নিয়োগ হইবে। তখন টাকায়, সময়ে, কত রকমে কতদিকে কত যে সুবিধা হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক্ষণে ব্যাটারীই তাড়িত-বলোৎপাদনের একমাত্র উপায়; এবং উহাতে দস্তা দ্রাবকাদির প্রভূত ব্যয়; সুতরাং তাহার সঙ্গে বিস্তর টাকারও শ্রাদ্ধ। তাহাতেই এক্ষণে তাড়িত-শকট কেবল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষকের টেবিল মাত্র ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং আরও কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় তাড়িত-যন্ত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচকের পরীক্ষণাগার মাত্রই শোভিত করিয়া থাকে।

একযোড়া মাত্র ফলক বিশিষ্ট ব্যাটারীকে সামান্য অমিশ্র ব্যাটারী কহে। ধাতুময় ফলক-যোড়া ও তদাধার পাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ব্যাটারীর বল ইচ্ছামত বা প্রয়োজনানুরূপ বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া যায়। এবম্বিধ বহুসংখ্যক ফলক সমন্বিত ব্যাটারীকে মিশ্র ব্যাটারী কহে। কতিপয় অমিশ্র ব্যাটারীকে পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া মিশ্র ব্যাটারী রচনা করিতে হইলে, সেইগুলিকে পর পর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; তদনন্তর তাহাদের অসমান ফলককে ক্রমে ধাতব তার অথবা পাত দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দিলেই মিশ্র ব্যাটারী হইল। মনে কর দশটি অমিশ্র ব্যাটারিকে সংযুক্ত করিয়া একটি মিশ্র ব্যাটারী করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক ব্যাটারী পাত্রে একখানি তাম্র ও একখানি দস্তা ফলক অম্লাক্ত জল মধ্যে নিমজ্জিত আছে। সে স্থলে অগ্রে প্রথম পাত্রের তাম্রফলক ও দ্বিতীয় পাত্রের দস্তাফলককে একফালি সরু তামার পাত দিয়া পরস্পর সংবদ্ধ করিবে। তামার পাতের একপ্রান্ত তাম্রফলকের এক প্রান্তদেশে ও উহার অপর প্রান্ত দস্তা ফলকের এক প্রান্তদেশে ঝাল দিয়া জুড়িয়া দিলেই হইবে। এই রূপে দুই খানি করিয়া অসমান ফলক অর্থাৎ একখানি তামার ও এক খানি দস্তার ফলকে পরস্পর ধাতুপাত দ্বারা সংবদ্ধ হইলে, দশটি অমিশ্র ব্যাটারীর ২০ খানি ধাতব ফলকে ৯ যোড়া দাঁড়াইবে। তার প্রথম পাত্রের দস্তাফলক ও শেষ পাত্রের তাম্রফলক খানি অনাবদ্ধ বা স্বতন্ত্রভাবে মগ্ন থাকিবে। মধ্যের ৮টি পাত্রের প্রত্যেকটিতে একযোড়া করিয়া অসমান ফলক অর্থাৎ একখানি তাম্র ও একখানি দস্তার ফলক পরস্পর ধাতু সংবদ্ধ থাকিবে। এই রূপে কয়টি অমিশ্র ব্যাটারী সংবদ্ধ হইলে পর, প্রথম পাত্রস্থ দস্তাফলকে একটি বন্ধনী স্ক্রু দ্বারা বা ঝাল দিয়া একগাছি দীর্ঘ ধাতব তার সন্নিবেশিত করিবে এবং শেষ পাত্রস্থ তাম্র ফলকখানিতেও ঐ রূপে আর একগাছি ধাতব তার সংলগ্ন করিবে। ঐ ফলকদ্বয়ে পূর্ব্বে দুইগাছি দীর্ঘ তার ঝাল দ্বারা জুড়িয়া লইলেও হইবে। এক্ষণে ঐ ১০টি অমিশ্র ব্যাটারী এই রূপে পরস্পর সংবদ্ধ হইলে উহার একটির দশগুণ বলশালী একটি মিশ্র ব্যাটারী দাঁড়াইবে। উহার দুই প্রান্ত সংলগ্ন দুইগাছি তার দ্বারা যাবতীয় পরীক্ষা সাধিত হইবে। কোন যন্ত্রে বা কোথায়ও তাড়িত-প্রবাহ প্রয়োগ করিতে হইলে তথায় ঐ তার দুইটির প্রান্তদ্বয় সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। নিম্নে একটি মিশ্র ব্যাটারীর প্রতিরূপ প্রদত্ত হইল; তদ্দৃষ্টে উহার রচনা প্রণালী স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।



১১শ চিত্র।

মিশ্র ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয় সংলগ্ন তার দুইটি পরস্পর সংলগ্ন বা একত্রিত হইলে, অথবা ঐ তার প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে, তাহাদের সংস্পর্শে কোনরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধাতব সংযোগ বা অন্য কোন রূপ পরিচালক পদার্থ থাকিলে, তাড়িত স্রোত, সমস্ত ব্যাটারী ও যোজক তার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। ঐ স্রোত পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়মানুসারে প্রথম পাত্রের দস্তাফলক হইতে ক্রমে পর পর অপর ব্যাটারীগুলি দিয়া শেষ ব্যাটারীর তাম্রফলকে, তথা হইতে তাহার সহিত

সংযুক্ত তারে, তা'র পর ঐ তার হইতে অপর তরি মধ্য দিয়া, প্রথম ব্যাটারী-পাত্রের দস্তাফলককে গিয়া পুনঃ প্রবিষ্ট হয়। এই স্থানে বুঝিতে হইবে, প্রথম ব্যাটারী-পাত্রটির মধ্যে প্রথমে যদি তামার ফলকখানি রাখিতে, (যেমন ১১শ চিত্রে) তাহা হইলে ১০ম পাত্রের শেষ ফলকখানি দস্তার হইত, এবং তাড়িত-স্রোতের গতির দিকও পরিবর্ত্তিত হইত,—শেষ ব্যাটারীর দস্তাফলক হইতে তাড়িত-স্রোত নির্গত হইয়া, ক্রমে সকল পাত্রগুলির মধ্যদিয়া, প্রথমটির তাম্রফলকে পহুঁছিয়া, পরে তৎসংলগ্ন তারদিয়া অপর যোজক তারটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, শেষ ব্যাটারীর দস্তাফলকে পুনঃ প্রবেশ করিত।

মিশ্র বা সংযুক্ত ব্যাটারীর কতিপয় নিয়ম অবধারিত হইয়াছে। রচনাকালে সেইগুলি পালন না করিলে ব্যাটারীর বলের অনেক ব্যতিক্রম হইবে। প্রতি পাত্রের অর্থাৎ এক একটি ব্যাটারীর দুইখানি ফলক পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকিবে না। দুইখানি ফলককে পরস্পরের বিপরীত দিকে পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী করিয়া, পৃথগভাবে পাত্রস্থ জল মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখিবে। প্রতিপাত্রে সমান পরিমাণ জল ও দ্রাবক ঢালিবে। ফলকগুলিও সমস্ত এক মাপের হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ তাহাদের সকলগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বা দল যেন সমান হয়। একখানি ফলক যে পরিমিত ঘন ফল যুক্ত হইবে সকলগুলিই যেন তদ্রূপ হয়। ব্যাটারীর এই একটি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে বহু সংখ্যক ফলক-রাশি জনিত তাড়িতের পরিমাণ-সমষ্টি সেই রাশিতে সর্ব্ব ন্যূনায়তন ফলকের উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ ব্যাটারী বিভিন্নায়তন যত সংখ্যক যোড়া ফলক দ্বারা নির্ম্মিত হউক না কেন, তন্মধ্যে সর্ব্ব ন্যূনায়তন যে যোড়া সেই-পরিমিত তত সংখ্যক যোড়া অন্য এক ব্যাটারীর যে বল, তাহারও সেই বল দাঁড়াইবে। যেমন একগাছি শিকলের একটি মাত্র গ্রন্থি যদি হীনবল বা অন্য গুলির অপেক্ষা কম মজবুত থাকে, তবে সমগ্র শিকলগাছটি সেই পরিমাণে হীনবল হইয়া পড়ে, তদ্রূপ বহুসংখ্যক যোড়া ফলক সমন্বিত মিশ্র ব্যাটারীর সকল ফলক সমপরিমিত না হইলে, কার্য্যে প্রত্যেক ফলক তন্মধ্যে সর্ব্বন্যূনায়তন ফলক পরিমিত দাঁড়ায়।

একটি দৃষ্টান্ত দেখিলেই এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকবর সর্ হম্‌ফ্রে ডেভী যে মিশ্র ব্যাটারীর সাহায্যে পটাস্ (Potass) ক্ষার বিশ্লিষ্ট করেন, তাহা তিন প্রকার তিনটি মিশ্র ব্যাটারী আবার পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া একটি প্রচণ্ড বলশালী অতি-মিশ্র ব্যাটারী হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমটিতে চতুর্ব্বিংশতি যোড়া দ্বাদশ বর্গ ইঞ্চ বিস্তৃত তাম্র ও দস্তার ফলক থাকে। দ্বিতীয়ে একশত যোড়া ছয় বর্গ ইঞ্চ ও তৃতীয়টিতে দেড় শত যোড়া চারিবর্গ ইঞ্চ তাম্র ও দস্তার ফলক ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ দুইশত চুয়াত্তর যোড়া বিভিন্নায়তনের ফলক ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্ব ন্যূনায়তন যোড়ার পরিমাণ চারি চারি বর্গ ইঞ্চ ছিল; তাহাতেই প্রত্যেকে চতুঃবর্গ ইঞ্চ পরিমিত দুইশত চুয়াত্তর যোড়া ফলক বিশিষ্ট হইলে ব্যাটারীর যে বল দাঁড়ায়, ডেভীর উক্ত ব্যাটারীরও সেই বল মাত্র দাঁড়াইয়াছিল। এই মিশ্র ব্যাটারী সহকারে ডেভি পটাস্ বিশ্লেষণ উদ্দেশে কতিপয় পরীক্ষা করেন। তাহার পূর্ব্বে পটাস্ অমিশ্র উপাদান পদার্থ বলিয়া জানা ছিল। ডেভী খানিকটা পটাস্ লইয়া দ্রব করিয়া তাহাতে তাড়িত-স্রোত প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন, তাহা হইতে ধাতব পদার্থ নিঃসৃত হইল। তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রকৃত নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে মনের স্থৈর্য্য পুনঃ সংস্থাপন করিয়া পরীক্ষা পুনরারম্ভ করেন। ইহার পরে 'রয়েল সোসাইটির' কর্তৃপক্ষীয়গণ ডেভীর ব্যবহারের নিমিত্ত ছয়শত যোড়া ফলক বিশিষ্ট একটি মিশ্র ব্যাটারী প্রস্তুত করাইয়া দেন। তাহার পর চাঁদা দ্বারা দুই সহস্র যোড়া ফলক বিশিষ্ট একটি সুবৃহৎ ও প্রভূত বলশালী মিশ্র ব্যাটারী তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। তাহার সাহায্যে তিনি অপরাপর বিবিধ মিশ্র পদার্থের বিশ্লেষণ সাধনে সক্ষম হন। ব্যাটারীর এই বিশ্লেষণী শক্তির আবিষ্ক্রিয়া হওয়ায় রাসায়নিক তত্ত্বানুসন্ধান সম্বন্ধে ইহা মহোপকারী হইয়া দাঁড়াইল। ডেভী কর্ত্তৃক ব্যাটারী সহযোগে পূর্ব্বোক্ত ধাতু সম্বলিত পটাস্ ক্ষারের বিশ্লেষণ সম্বন্ধে এ স্থলে একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কথিত আছে বিখ্যাত সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন শুনেন যে জনৈক বিলাতী বিজ্ঞানবেত্তা কর্ত্তৃক বিশ্লেষক ব্যাটারী যন্ত্র সহযোগে ক্ষার সমূহের বিশ্লেষণ সংঘটিত হইয়াছে, তখন তিনি পারিস্ ইন্‌স্টিউটের পণ্ডিতগণকে অতি ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঐ আবিষ্ক্রিয়া ফরাসীদেশে সর্ব্বাগ্রে কেন না হইল? তদুত্তরে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যথেষ্ট বলশালী ব্যাটারীর অভাবই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহা শুনিয়া সম্রাট তৎক্ষণাৎ ঐ রূপ বলশালী একটি ব্যাটারী প্রস্তুতের আজ্ঞা দিলেন। কিছু

দিন পরে, ব্যাটারী নির্ম্মিত হইলে, তিনি তদ্দর্শনে একদিন ইন্‌সটিটিউটের বাটীতে গমন করেন। এবং এরূপ আগ্রহাতিশয়ের সহিত ব্যাটারীর উভয় প্রান্তস্থ তার দুইটি ধরিয়া এককালে জীহ্বাগ্রে স্থাপন করিলেন যে উপস্থিত পরীক্ষক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে নিবারণ করিবার সময় পাইলেন না। তাহাতে তিনি একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যাঁহার প্রবল প্রতাপে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ কিছু কাল কম্পিত কলেবর হইয়াছিল, এবং ভীমপরাক্রমে অগণন শত্রু সেনা শঙ্কুল কত রণক্ষেত্রে যিনি অক্ষুণ্ণ ছিলেন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষকে আজ এক পল্টন তামা দস্তার ফলকে, বিনা যুদ্ধে, নিঃশব্দে নিমেষ মধ্যে হতজ্ঞান করিয়া ধরাশায়ী করিল! পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহার অভ্যস্ত মৌনাবলম্বন করিয়া ব্যাটারীর বল পরীক্ষার্থে তথায় আর বিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাগত হন। ইহার পর তিনি আর কখন এ বিষয় সম্বন্ধে কোন উল্লেখ অথবা ব্যাটারীর নাম মাত্রও করেন নাই। [ক্রমশঃ।

আলোক-চিত্র।

(PHOTOGRAPHY.)

(২৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

আলোক পূর্ব্বোক্ত রূপে অধিক বাঁকিলেই আলোকিত পদার্থ কেবল অল্প স্থানান্তরে দেখাইবে, অর্থাৎ 'ক' 'খ'-এর (১১শ চিত্র) মধ্যদিয়া দৃশ্য পদার্থ স্বস্থান হইতে অল্পমাত্র উপরে বা নীচে অবস্থিত বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ঐ আলোকের বক্রতা যদি 'ক' 'খ'-এর মধ্যে সামান্যমাত্র হয়, সে স্থলে বুঝিয়া দেখ, ঐ আলোক 'ক' 'খ'কে শেষে যে স্থানে পরিত্যাগ করিয়া বায়ুতে বহির্গত হইয়া সরল পথে গিয়া চক্ষে পড়িবে, সেই স্থান হইতে ঐ সরল রেখাকে বিপরীত দিকে অর্থাৎ আলোকিত পদার্থের দিকে বিস্তৃত করিয়া টানিলে, সেই বিস্তৃত রেখা, পতন রেখা-পথের অতি সন্নিহিত হইয়া যাইবে, অথবা তাহার সহিত সংমিলিত হইয়া যাইতেও পারে। সুতরাং 'ক' 'খ'-এর মধ্যদিয়া দৃশ্য পদার্থ হয় অল্পমাত্র স্থানান্তরে না হয় স্বস্থানে দেখাইবে। 'গ' 'চ', 'ক' 'খ'-এ প্রবেশ করিতে যতটুকু বাঁকে, অর্থাৎ পতন-বিন্দু 'চ'এর লম্বের যতটুকু নিকটবর্ত্তী হয়, 'ক' 'খ' হইতে বহির্গমন কালেও আবার উহা ঠিক ততটুকুই বাঁকে, অর্থাৎ বহির্গমন-বিন্দু স্বস্থানেই 'ছ'-এর লম্ব হইতে ততটুকু দূরবর্ত্তী হইয়া বাঁকিয়া বহির্গত হয়; তবেই পতিত আলোকের দিকান্তর হয় না। যে দিক হইতে যে পথে আসিয়া 'ক' 'খ'-এ পড়ে, বিপরীত দিকেই সেই ভাবেই বহির্গত হইয়া গিয়া চক্ষে পড়ে। পূর্ব্ব পরীক্ষা কয়েকটিতে, যে স্থলে দৃশ্য পদার্থ সমূহ হইতে আলো বাঁকিয়া গিয়া শেষে যে স্থান হইতে একটি সরল রেখা পথে চক্ষে গিয়া পড়ে, সেই স্থান হইতে ঐ সরল রেখা পথকে ঐ পদার্থেরই দিকে বিস্তৃত করিয়া টানিলে, ঐ সরল পথ দৃষ্টি নিষ্পাদক রশ্মিপথের ক্রমশঃই অন্তর হইয়া যাইতে থাকে। সুতরাং দৃশ্য পদার্থও স্বস্থান হইতে অন্তরে দেখায়; অর্থাৎ ঐ পদার্থ দর্শন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভ্রম হইয়া থাকে। কিন্তু সমতল স্বচ্ছ পদার্থ মধ্যদিয়া দৃষ্টিভ্রম অধিক হয় না, কারণ তদ্রূপ পদার্থে আলোকের পতন-পথ ও বহির্গমন পথ পরস্পর সমান্তরাল। সেই জন্যই আমাদের চক্ষু ও দৃশ্য পদার্থ মধ্যে সমতল ও সর্ব্বত্র সমস্থূল কাচ-ফলক, জল প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দৃশ্য পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয় না। এ স্থলে কেবল এইটি বিবেচ্য আছে যে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় ও দৃশ্য পদার্থ মধ্যবর্ত্তী সমতল স্বচ্ছ পদার্থ যদি সমস্থূল না হয় অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমান পুরু না হয়—উচ নীচ বা বন্ধুর হইলে, তন্মধ্যদিয়া দৃশ্য পদার্থ সমূহ বিকৃত (Distorted) দেখাইবে। কারণ কমবেশী স্থূল পদার্থ মধ্যে আলোকও কমবেশী বাঁকিবে। দ্বার জানালাদির শার্শির কাচ বেশ মসৃণ ও সমস্থূল না হইলে, তন্মধ্য দিয়া বহির্দ্দেশের কি বাহির হইতে গৃহাভ্যন্তরে দ্রব্যাদির বিকৃত মূর্ত্তি দেখা যায়। কিন্তু কাচগুলি সমস্থূল সমতল ও উত্তম রূপ মসৃণ হইলে ও অধিক মোটা না হইলে, তন্মধ্য দিয়া প্রায় দৃষ্টিভ্রম হয় না।

ত্রিপার্শ্ব বিশিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থ মধ্যদিয়া দৃশ্য পদার্থ স্বস্থান হইতে অনেক উপরে দেখায়।— ১২শ চিত্রে 'ক' একটি ত্রিপার্শ্ব বিশিষ্ট কাচ। এই রূপ কাচকে ইংরাজিতে প্রিজম্ (Prism) বলে। ঝাড়ের কলম এই রূপ কাচের অতি সামান্য দৃষ্টান্ত। ইহার তিন পার্শ্বে যুক্ত আকার যেন একটি বিস্তৃত নিরেট ত্রিভুজ স্বরূপ। এবম্বিধ কাচমধ্যে আলোক অধিক বক্র হইয়া পড়ে এবং ইহার ভিতর দিয়া কোন পদার্থ যেরূপ দেখায় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। 'ক'-এর যে কোন এক পার্শ্বে আলোক পতিত হইলে, তন্মধ্যে ঐ আলোকের গতি-পথ চিত্র দ্বারা দেখাইয়া বুঝাইতে হইলে, এস্থলে 'ক' যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, উহাকে ঐ রূপে রাখিয়া বুঝান অসম্ভব।



১২শ চিত্র।

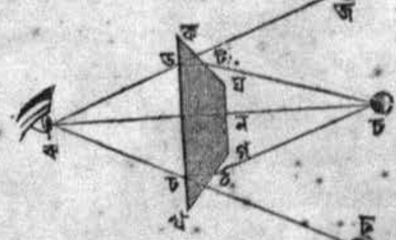
তন্নিমিত্ত 'ক'-কে আড়ভাবে লম্ব ছেদ দিয়া চিরিয়া ফেলা হইয়াছে, এরূপ মনে করিতে হইবে; তাহা হইলে ঐ চেরা প্রান্তদেশের আকার ১৩শ চিত্রের 'ক' 'খ' 'গ' চিহ্নিত ত্রিভুজের আকার হইবে। আলোক-রশ্মির গতি-পথ ঐ ত্রিভুজেরই গাত্রের উপর দিয়া যায়, বুঝিতে হইবে। ত্রিপার্শ্ব-কাচ খানিকে এই রূপে ছেদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলে, আলোকের গতিপথ তন্মধ্যে স্পষ্টই চিত্রবৎ দৃষ্ট হইবে। কাচখানির ছিন্ন অপর খণ্ডটির ছেদিত মুখ 'ক' 'খ' 'গ'-এর উপর মুখে মুখে, (মনে মনে) যোড়া দিয়া বুঝিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এখন 'ক'-এর (১২শ চিত্র) মধ্যে আলোকের কিরূপ বক্রগতি হয় দেখা যাক্। 'ঘ' স্থান (১৩শ চিত্র) হইতে একটি বাতির আলোক, 'ঘ' 'চ' পথে হেলান ভাবে 'চ' স্থানে পড়িতেছে, মনে কর। 'চ' হইতে কাচের মধ্যে



১৩শ চিত্র।

প্রবেশ কালে, 'ঘ' 'চ' যে পথে বাঁকিয়া পড়ে, সেই পথ 'খ' 'গ'-এর সহিত সমান্তরাল। সেই পথ 'চ' 'ছ' দ্বারা চিহ্নিত হইল। 'ঘ' 'চ', প্রিজমের মধ্যে 'চ' 'ছ' পথে বক্র হইয়া পড়িয়া 'ছ' স্থানে পুনরায় বাঁকিয়া 'ছ' 'জ' পথে গিয়া বাহির হইয়া 'জ' স্থানে চক্ষে প্রবেশ করিতেছে। তখন ঐ চক্ষু 'ঘ'-কে কোথায় দেখিতে পাইবে, স্থির করিতে হইলে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিলেই হইবে। সেই নিয়মটি এস্থলে আর একবার উল্লেখ করা যাউক্। পরীক্ষাধীন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পুনরোক্তি অন্য বিষয়ের ন্যায় বিরক্তিজনক হয় না। বরং বার বার উল্লেখে অধিকতর স্পষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। আলোক কোন পদার্থ মধ্যে বক্রীভূত হইয়া শেষে যে স্থানে বাঁকিয়া বাহির হইয়া, একটি সরল রেখা ক্রমে চক্ষে গিয়া পড়ে, সেই বিন্দু হইতে ঐ সরল রেখা পথকে যদি বিপরীত দিকে বিস্তৃত করিয়া টানা যায়, তবে ঐ রেখাপথ মধ্যেই দৃশ্য পদার্থের ছায়া মাত্র, দেখা যাইবে। 'জ' 'ছ'-কে চিত্রবৎ বিন্দুময় রেখায় বিপরীত দিকে বাড়াইয়া টানিলে ঐ রেখার 'ঝ' স্থানে 'ঘ'-কে দেখাইবে। এই রূপে 'ঘ' স্থানে যে কোন পদার্থই থাকুক, তাহাকে 'জ' স্থান হইতে ত্রিপার্শ্ব বিশিষ্ট কাচ মধ্য দিয়া দেখিলে, 'ঝ' স্থানে দেখাইবে, অর্থাৎ 'ক' 'খ' 'গ' চিহ্নিত ত্রিভুজের শিরভাগের নিকটবর্ত্তী দেখাইবে। এই রূপে ত্রিপার্শ্ব বা ত্রিকোণ-কাচ বা প্রিজমের মধ্য দিয়া দৃশ্য পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয়।

চতুঃপার্শ্ব বিশিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থ মধ্যদিয়া দৃশ্য পদার্থ তিন স্থানে তিনটী দেখায়।—'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' (১৪শ চিত্র) একখানি চারিপার্শ্ব বিশিষ্ট কাচখণ্ড। 'ক' 'খ' ও 'গ' 'ঘ' চিহ্নিত দুইদিক সমতল ও পরস্পর সমান্তরাল। এবং 'ক' 'ঘ' ও 'খ' 'গ' চিহ্নিত দুই পার্শ্ব দিক ক্রমনিম্ন ক্ষেত্র। এরূপ কাচখণ্ডের সমতল 'ক' 'খ' দিক হইতে উহার মধ্যদিয়া অপর দিকে কোন বস্তু দেখিলে, কাচখণ্ডের যে কয় দিকের উপর ঐ বস্তুটি হইতে আলোক-কিরণ পতিত হয়,



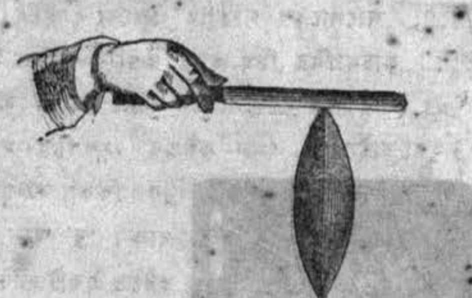
১৪শ চিত্র।

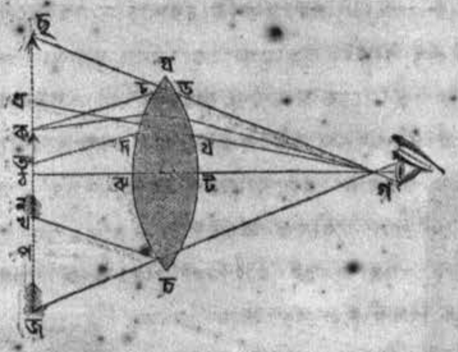
ঐ বস্তু তত সংখ্যক দেখায়। মনে কর 'চ' চিহ্নিত একটি মটর কলাই দেখা যাইতেছে। ঐ কলাইটি তাহা হইলে 'ছ', 'চ' ও 'জ' চিহ্নিত তিন স্থানে তিনটি দেখা যাইবে। কাচখণ্ডের একদিকে 'ঝ' স্থানে চক্ষু ও অপর দিকে 'চ' স্থানে কলাইটি রহিয়াছে। 'চ' হইতে যত আলোক-রশ্মি ঐ কাচ মধ্যদিয়া গিয়া ঐ চক্ষে পতিত হয়, সে গুলি সব ঐ কাচের অপর তিনদিকের উপর পতিত হইয়া কাচে প্রবিষ্ট হয়। কতক-

গুলি রশ্মি 'গ' 'ঘ', কতকগুলি 'খ' 'গ' ও আর কতিপয় 'ক' 'ঘ' এর উপর পতিত হয়। যে গুলি 'গ' 'ঘ'এর ঠিক মধ্যদেশের উপর সরল বা লম্বভাবে পড়ে, সেগুলি আদৌ না বাঁকিয়া সরল রেখা-পথে কাচ মধ্যদিয়া গিয়া 'ঝ' চক্ষে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতেই 'ঝ' চক্ষু 'চ' স্থানেই প্রকৃত কলাইটি দেখে। কিন্তু 'খ' 'গ' ও 'ক' 'ঘ' চিহ্নিত অপর দুই পার্শ্বের উপর যে রশ্মি সমূহ হেলান ভাবে পতিত হয়, সে গুলি বাঁকিয়া গিয়া কাচে প্রবেশ করে এবং কাচ হইতে বহির্গত হইয়াও আবার বাঁকে। তাহাতেই কাচের ঐ দুইদিকের মধ্যদিয়া ঐ কলাইয়ের আর দুইটি প্রতিরূপ দেখা যায়। চিত্রটি একটু বুঝিয়া দেখিলেই ইহার কারণ উপলব্ধি হইবে। 'চ' হইতে একটি রশ্মিপুঞ্জ সরল ভাবে 'ন' স্থানে কাচে পড়িয়া তাহার মধ্য দিয়া সরল ভাবেই গিয়া, 'ঝ' চক্ষে পড়ে। ঐ রশ্মিপুঞ্জ মূলেই বক্রীভূত হয় না। সুতরাং ঐ চক্ষু 'চ'কে স্বস্থানেই দেখে। আবার 'চ'এর আর এক রশ্মিপুঞ্জ 'চ' হইতে 'ক' 'ঘ'-এর উপর 'ট' স্থানে হেলান ভাবে পড়ে। তাহাতেই উহা ঐ স্থানে বাঁকিয়া পড়িয়া 'ট' 'ড' পথে কাচের ভিতর প্রবেশ করে, এবং 'ড' স্থান হইতে কাচের বাহির হইতেও ফের বাঁকিয়া পড়িয়া 'ড' 'ঝ' পথে গিয়া চক্ষে পতিত হয়। সুতরাং 'চ' 'ট' রশ্মির শেষ বক্রীভবন বিন্দু 'ড' স্থান হইতে 'ঝ' 'ড'কে অপরদিকে 'ড' 'জ' পর্য্যন্ত বাড়াইয়া টানিলে, জ স্থানে 'চ'এর প্রতিরূপ বা আর একটি কলাই দেখা যায়। ঐ রূপে আবার 'চ'এর আর একটি রশ্মিপুঞ্জ কাচের 'খ' 'গ' দিকের উপর 'ঠ' স্থানে পড়িয়া, 'ঠ' 'ঢ' পথে কাচ মধ্যে বাঁকিয়া গিয়া, পুনরায় 'ঢ' স্থানে বক্র হইয়া বহির্গত হইয়া 'ঢ' 'ঝ' পথে চক্ষে পড়ে। সুতরাং তাহার শেষ বক্রীভবন বিন্দু 'ঢ' হইতে 'ঝ' 'ঢ'কে 'ঢ' 'ছ' পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলে 'ছ' স্থানে 'চ'এর আরএকটি প্রতিরূপ বা ছায়া দৃষ্ট হইবে। তাহাতেই এরূপ কাচ মধ্যদিয়া দৃশ্য পদার্থ তিনস্থানে তিনটি দেখায়। কাচ-খণ্ডের 'ক' 'খ' চিহ্নিত সমতল দিকের মধ্যভাগের উপর, সরল রশ্মিপুঞ্জের পথে যদি কোন অস্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান রাখা যায়, তাহা হইলে 'ঝ' চক্ষু 'চ'কে না দেখিয়া 'খ' 'গ' ও 'ক' 'ঘ' চিহ্নিত দুই পার্শ্বের মধ্যদিয়া 'ছ' ও 'জ' স্থানে 'চ'য়ের দুইটি প্রতিরূপ মাত্র দেখিবে।

দ্বিন্যুব্জাকার স্বচ্ছ পদার্থ মধ্যদিয়া দৃশ্য বস্তু প্রসারিত দেখায়।—দুই দিক ন্যুব্জ আকৃতির পদার্থকে ইংরাজিতে ডবল কন্‌ভেক্স (Double Convex) বলে। দুইখানি সরা পরস্পর কিনারায় কিনারায় জোড়া দিলে দ্বিন্যুব্জ আকৃতি ধারণ করে। এরূপ পদার্থের দুইদিক স্ফীত, মধ্য মোটা ও ক্রমে ধার পাতলা। ইহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত স্থল আছে। কচুরী ও গুড় পিঠের আকারও দ্বিন্যুব্জ। টাকঘড়ির দুইখানি উপরিতন আবরণ-কাচকে সরার ন্যায় ধারে ধারে যোড়া দিলেও দ্বিন্যুব্জাকার ধারণ করে। ১৫শ চিত্র একটি দ্বিন্যুব্জ কাচের প্রতিকৃতি। এরূপ দ্বিন্যুব্জ স্বচ্ছ পদার্থ মধ্যদিয়া দৃশ্য বস্তুর গাত্র বিকীর্ণ আলোক রশ্মি সমূহ অধিক পরিমাণে বক্র হইয়া পড়ে। সেই জন্য দৃশ্য-বস্তু তন্মধ্যদিয়া সেই মত প্রসারিত দেখায়, অর্থাৎ অনেক বড় দেখায়। ১৭শ চিত্রটি বুঝিয়া দেখিলে এই প্রসারণ প্রণালী অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থের আকার কিরূপে বর্দ্ধিত দেখায়, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। দ্বিন্যুব্জ স্বচ্ছপদার্থের মধ্যদিয়া আলোকের গতি-পথ কিরূপ বক্র হয়, তাহা বুঝাইতে ঐ দ্বিন্যুব্জ পদার্থকে লম্বচ্ছেদ দিয়া চিরিয়া ফেলিলে যেরূপ দেখায়, ১৭শ চিত্র সেইরূপ আকৃতিতে চিত্রিত হইল। তন্মধ্যে আলোর গতিপথ স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে। দ্বিন্যুব্জ কাচকে যে ভাবে ছুরীকা দ্বারা ছেদিত হইয়াছে মনে করিতে হইবে, তাহা ১৬শ চিত্রে প্রদর্শিত হইল। দ্বিন্যুব্জ পদার্থের দুই পার্শ্বের ঠিক মধ্যদেশ পরস্পর সমান্তরাল, অর্থাৎ ঐ স্থানের ন্যুব্জতা মূলে নাই,—ঐ স্থানের দুই দিক পরস্পরের অভিমুখে মূলে বাঁকে না। সুতরাং ঐ স্থান বা দ্বিন্যুব্জাকার স্বচ্ছ পদার্থের ঠিক মধ্যদেশ দিয়া যে কিরণপুঞ্জ গমন করে, সেগুলি আদৌ বাঁকে না। ক্রমে দুই পার্শ্বের উপরিভাগ অধিকতর ন্যুব্জ হইয়া বা পরস্পরের দিকে বাঁকিয়া গিয়া ধার বা কিনারায় মিলিত হইয়াছে। সুতরাং মধ্যদেশ হইতে ক্রমে ধারদিকের উপর পতিত রশ্মিপুঞ্জ ক্রমশঃই অধিকতর বক্র হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে ও বাহির হইতেও ক্রমে অধিকতর বক্র হয়। ১৭শ চিত্রটি দেখিয়া বুঝিলেই এ বিষয় স্পষ্ট হইবে।


১৫শ চিত্র।


১৬শ চিত্র।



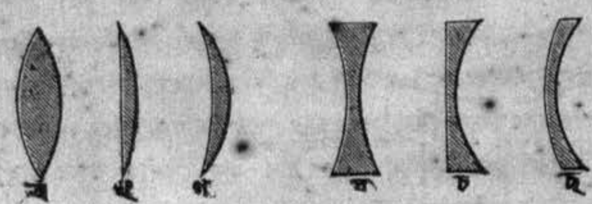
১৭শ চিত্র।

'গ' চিহ্নিত স্থান হইতে 'ঘ' 'চ' চিহ্নিত দ্বিন্যুব্জ কাচ মধ্যদিয়া 'ক' 'খ' চিহ্নিত শরটিকে দেখিলে অর্থাৎ 'ঘ' 'চ' চিহ্নিত একটি দ্বিন্যুব্জ কাচের এক দিকে 'ক' 'খ' চিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র শর রাখিয়া দিয়া, কাচের অপরদিকে, শর হইতে ৬ ইঞ্চি আন্দাজ তফাতে চক্ষু রাখিয়া দেখিলে, ঐ শরটিকে 'ছ' 'জ' চিহ্নিত প্রমাণ দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত বা প্রসারিত দেখাইবে। আলোকের বক্রীভবন এই প্রসারণের মূল। 'ক' 'খ'-এর গাত্র হইতে যে সকল আলোক-রশ্মি 'ঘ' 'চ'-এর উপর পড়ে, সে গুলি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া বক্র হইয়া যায়, আবার 'ঘ' 'ট' 'চ' চিহ্নিত দিকে বাহির হইতেও বাঁকিয়া পড়িয়া 'গ' চিহ্নিত চক্ষে প্রবিষ্ট হয়। কেবল 'ক' 'খ'-য়ের 'ঠ' চিহ্নিত ঠিক মধ্যদেশের আলোক মূলে না বাঁকিয়া সরল পথে গিয়া চক্ষে পতিত হয়। এ স্থলে 'ক' 'খ'-য়ের কেবল মাত্র কতিপয় আলোক-রশ্মির পথ প্রদর্শিত হইল। 'ঠ' চিহ্নিত ঠিক মধ্যদেশের রশ্মিপুঞ্জটি 'ঠ' 'ঝ' 'ট' 'গ' চিহ্নিত সরল পথে গিয়া চক্ষে পড়ে; তাহাতেই 'গ', 'ক' 'খ'-য়ের মধ্য দেশকে ঐ স্থানেই অর্থাৎ উহার প্রকৃত স্থানেই দেখে। 'ক' চিহ্নিত শরাগ্রের রশ্মি পুঞ্জ 'ঘ' 'চ'য়ের উপর 'ঢ' চিহ্নিত স্থানে পড়িয়া 'ঢ' 'ড' চিহ্নিত পথে বাঁকিয়া 'ঘ' 'চ' প্রবিষ্ট হয়; আবার বাঁকিয়া 'ড' 'গ' চিহ্নিত পথে গিয়া শেষে চক্ষে পড়ে। 'ক' 'ঢ' চিহ্নিত রশ্মির শেষ বক্রীভবন বিন্দু 'ঢ' হইতে 'গ' 'ড'কে সরল রেখায়, অপরদিকে বিস্তৃত করিলে, 'ছ' চিহ্নিত স্থানে 'ক' দৃষ্ট হইবে। এই রূপে 'ত' চিহ্নিত স্থানের রশ্মি 'দ' স্থানে পড়িয়া 'ঘ' 'চ'য়ের ভিতর 'দ' 'থ' চিহ্নিত পথে বাঁকিয়া বহির্গত হইয়া 'থ' স্থানে পুনরায় বাঁকিয়া, 'থ' 'গ' পথে গিয়া চক্ষে পড়ে। 'ত' 'দ' রশ্মির শেষ বক্রীভবন বিন্দু 'থ' হইতে 'গ' 'থ'কে সরলরেখা পথে বাড়াইয়া টানিলে 'ধ' স্থানে 'ত' দৃষ্ট হইবে। এই রূপে শরের অধোদেশের 'খ' প্রান্ত 'জ' স্থানে ও 'ন' ভাগ 'প' স্থানে দেখাইবে। তাহাতেই সমগ্র ক্ষুদ্র 'ক' 'খ' শর, 'ছ' 'জ' চিত্রানুরূপ প্রসারিত বা বর্দ্ধিত দেখায়। ১৪শ চিত্রানুরূপ যদি শরটির দিকে 'ঘ' 'চ'য়ের তিনটি মুখ থাকিত, তাহা হইলে 'গ' স্থান স্থিত চক্ষু ঐ শরকে তিনস্থানে তিনটি দেখিত। কিন্তু 'ঘ' 'চ'য়ের দুই মাত্র ন্যুব্জ উপরিদেশ বলিয়া তন্মধ্য দিয়া দৃশ্য শরটি কেবল বড় দেখায়।

বিষমস্থূল বা মধ্য মোটা ও ধার ক্রমে সরু অথবা এক কথায় দ্বিন্যুব্জ কাচের ভিতর দিয়া পদার্থের প্রকৃত আকার কিরূপে প্রসারিত দেখায় বা ছোট জিনিস কিরূপে বড় দেখা যায়, তাহা একপ্রকার দেখা গেল। এখন বুঝিতে হইবে যে, এ প্রকার স্বচ্ছ পদার্থ আলোককে যে পরিমাণে বা যতটা বাঁকাইতে পারিবে, তন্মধ্য দিয়া দৃশ্য পদার্থ ততগুণ বড় দেখাইবে; আর স্বচ্ছ পদার্থ যে পরিমাণে বিষম স্থূল, অর্থাৎ যত মধ্য মোটা ও ধার পাতলা হইবে, তাহার আলোক বাঁকাইবার ক্ষমতাও তত অধিক হইবে। তবেই দ্বিন্যুব্জ স্বচ্ছ পদার্থের ন্যুব্জতার কম বেশীর উপর তাহার প্রসারণ গুণের ন্যূনাধিক্য নির্ভর করে। এই রূপ প্রসারণ-কাচকে ইংরাজীতে Double Convex Lens কহে। দ্বিন্যুব্জ লেন্স ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার লেন্স আছে। কাচ ব্যতীত অন্যান্য বিবিধ স্বচ্ছ পদার্থেও লেন্স নির্ম্মিত হইতে পারে। কাচের লেন্সই প্রায় সকল দৃষ্টি-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। স্থূল কাচকে ঘষিয়া লেন্স প্রস্তুত করিতে হয়। বিষমস্থূল স্বচ্ছ পদার্থের এই আলোক বক্রকারী স্বাভাবিক গুণ অবলম্বন করিয়া লেন্স প্রস্তুত হইয়াছে। আবার কমবেশী মোটা কাচ লইয়া, ঘর্ষণ কালীন উহাকে ইচ্ছামত কমবেশী ন্যুব্জাকার করিয়া উহার প্রসারণ গুণ ইচ্ছামত বাড়ান যায়। দ্বিন্যুব্জ লেন্স অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, চসমা, ফটগ্রাফি-যন্ত্র প্রভৃতি আরও কত মহোপকারী যন্ত্রের প্রধানতম অঙ্গ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই প্রসারণ-কাচ বা লেন্সের গুণে ছোট বস্তু বড় দেখায়, চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র জিনিস দেখা যায়, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ইহারই গুণে দূরস্থিত বস্তু বর্দ্ধিতাকার দেখায় বলিয়া যেন কাছে দেখা যায়। এবং ইহার আর একগুণে ফটগ্রাফি যন্ত্রে ইহার নিয়োগ হইয়াছে।

এখন চিত্রটি আর একবার দেখ। 'ঘ' 'চ'য়ের 'ঘ' 'ঝ' 'চ' চিহ্নিত পার্শ্বের উপর পতিত আলোক-রশ্মি সমূহ, 'ঘ' 'চ' প্রবেশ কালে বক্র হয়, আবার উহার অপর পার্শ্বে বাহির হইতেও বক্র হয়; তাহার ফলে রশ্মি সমূহ পতনদিগের

বিপরীত দিকে অর্থাৎ লেন্সের অপর দিকে, ক্রমে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়া শেষে একটি বিন্দুতে গিয়া সঞ্চিত হয়। দ্বিন্যুব্জ স্বচ্ছ পদার্থের এক পার্শ্বে কোন আলোকিত পদার্থের আলোক হউক অথবা সূর্য্যের কিম্বা দীঁপের আলোকই হউক, যে কোন আলোকই পতিত হইলে, সেই আলোক লেন্স প্রবিষ্ট হইয়া উহার অপরদিকে কিছু দূরে একটি বিন্দুতে গিয়া মিলিত হয়। এই রূপ আলোক-সঞ্চয়ী অন্যবিধ লেন্স আছে। তদ্ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার লেন্স আছে সে গুলি আলোক-রশ্মিকে পরস্পর হইতে ক্রমান্তর-মুখী করে। এই দুই শ্রেণীর লেন্স ছয় প্রকার আছে; নিম্নে তাহাদের প্রতিরূপ দেওয়া গেল।



১৮শ চিত্র।

চিত্রের প্রথম তিন প্রকার লেন্সের মধ্য মোটা ও ধার পাতলা এবং উহারা আলোক-সঞ্চয়ী অর্থাৎ উহাদের এক পার্শ্ব দিকে আলোক পতিত হইলে সেই আলোক অপর দিকে একটি বিন্দুতে গিয়া সঞ্চিত হয়। পরবর্ত্তী তিনটির মধ্য সরু ও ধার মোটা; সুতরাং উহারা প্রথম তিনটির বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ উহারা আলোক সঞ্চারী অর্থাৎ আলোক উহাদের মধ্যদিয়া গিয়া সঞ্চিত না হইয়া ছড়াইয়া পড়ে বা ক্রমান্তর-মুখী হয়।

"ক"—ইহা দ্বিন্যুব্জাকার লেন্স। ১৭শ চিত্রের 'ঘ' 'চ' লেন্স এই জাতীয়।

"খ"—এই প্রকার লেন্সের একদিক সমতল ও অপর পার্শ্ব ন্যুব্জ; ইহাকে সমতল-ন্যুব্জাকার লেন্স বলা যায়।

"গ"—ইহার এক পার্শ্ব ন্যুব্জ ও অপর পার্শ্ব গভীর। এরূপ লেন্সকে গভীর-ন্যুব্জ লেন্স কহে।

"ঘ"—ইহার দুই দিক গভীর ও চারিধার মোটা। ইহাকে দ্বিগভীর লেন্স কহে।

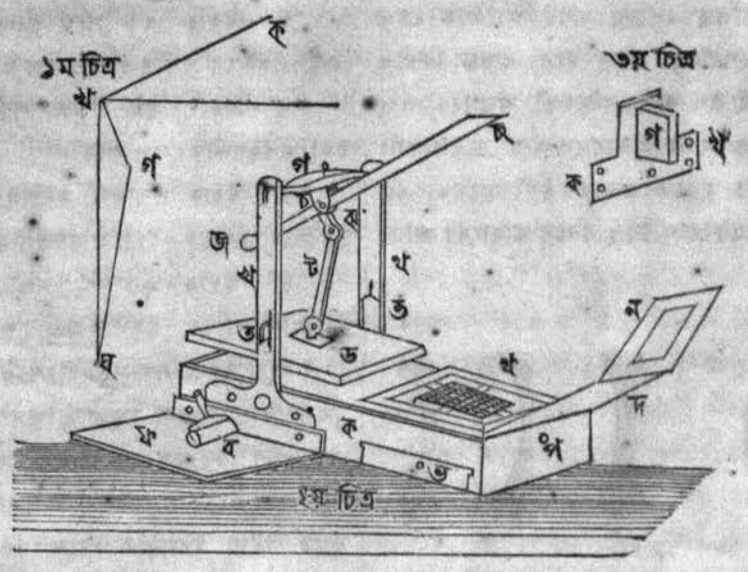
"চ"—ইহার একদিক সমতল ও অপরদিক গভীর এবং চারিধার মোটা। ইহাকে সমতল-গভীর লেন্স কহে।

"ছ"—ইহার একপার্শ্ব গভীর, অপর পার্শ্ব ন্যুব্জ ও চারিধার মোটা। ইহাকে গভীর-ন্যুব্জ লেন্স কহে।

আলোক-সঞ্চয়ী লেন্সের আলোক-বিন্দু, অক্ষ-বিন্দু বা ফোকস্ স্থির করিবার প্রণালী।—লেন্স বা প্রসারণ-কাচের উপাদান অর্থাৎ উহা যে প্রকার দ্রব্যে নির্ম্মিত হয়, এবং উহার ন্যুব্জতা বা মধ্যদেশের স্থূলতা যত সেই অনুসারে উহার মধ্যদিয়া আলোকের গতি কম অথবা বেশী বক্র হয়; সুতরাং উহার একপার্শ্বে পতিত আলোক উহার মধ্যদিয়া গিয়া অপর পার্শ্বে বহির্গত হইয়া তদনুসারেই উহার নিকটে অথবা দূরে সঞ্চিত হয়। বিভিন্ন স্থূল লেন্স মধ্যে আলোক কম বেশী বাঁকিয়া যায়, এবং অপর পার্শ্বে লেন্স হইতে কম বেশী দূরে সঞ্চিত হয়। আলোক লেন্স মধ্যদিয়া বাহির হইয়া যে বিন্দুতে সঞ্চিত হয় তাহাকে আলোক-বিন্দু বা অক্ষ-বিন্দু (Focus) কহে। এই অক্ষবিন্দু স্থির করিবার নিয়ম আছে।

[ক্রমশঃ।

সকল রকমে সুবিধাজনক হ্যাণ্ড প্রেশ।



আজকাল হ্যাণ্ড-প্রেশের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, লেটর-হেড্, বিজ্ঞাপন, হ্যাণ্ডবিল, এবং দাখিলা, চেক, চালান প্রভৃতি ছোট ছোট কার্য্যের জন্য প্রেশের প্রয়োজন সকলেরই হইয়া থাকে। একটি হ্যাণ্ড-প্রেশ দ্বারা সেই সমস্ত কার্য্য, ঘরে বসিয়া সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। আমরা আজ একটি নূতন হ্যাণ্ডপ্রেশের প্রস্তত প্রণালী পাঠক মহোদয়গণকে উপহার দিব। এই প্রবন্ধ শীর্ষে তাহার প্রতিরূপ-চিত্র প্রদান করা গেল। ইহার গুণ এই যে, অতি অল্প খরচে, সামান্য উপকরণে ও অনায়াসে যে কেহ প্রস্তত করাইয়া লইতে পারেন, অথচ এরূপ মুদ্রা-যন্ত্র এত হাল্কি, ছোট ও সহজ-গঠন, যে ইচ্ছামত অনায়াসে যেখানে সেখানে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে,—এক স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় না. এবং সহজে বিকলও হয় না। এরূপ একটি মুদ্রাযন্ত্র কাহার না বাঞ্ছনীয় ?

এক্ষণে ইহার প্রস্তত্ প্রণালী অগ্রে বলিব। শেষে ইহার মূল সূত্রটি অর্থাৎ কি যন্ত্র-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবলম্বনে ইহা কল্পিত, সেইটি অতি সংক্ষেপে বুঝাইব।

২য় চিত্রে 'ক' একখানি মজবুত কাঠের ফ্রেম — ২১ ইঞ্চ লম্বা, ৯ ইঞ্চ চওড়া ও ৪ ইঞ্চ গভীর ; শাল কাঠের হইলে ভাল হয়। উহার দুই পার্শ্বে 'খ' 'খ' চিহ্নিত ১১ ইঞ্চ চওড়া ও ৩ ইঞ্চ মোটা বা পুরু পেটা লোহার পাত, তিনটি স্ক্রু দ্বারা আঁটা। ঐ স্ক্রু তিনটি, ফ্রেমের ভিতর দিয়া বরাবর এ পার ওপার পর্য্যন্ত পরান এবং একদিকে ফ্রেমের বহির্গাত্রের সহিত তিনটি আবরণ স্ক্রু বা বোল্ট দিয়া দৃঢ়ভাবে আঁটা। ঐ পার্শ্ব-পাত দুইখানির উপর দিক একটি মজবুত এড়ো লোহা দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ। ঐ এড়ো লোহার দুই প্রান্ত, পার্শ্ব-পাত দুইটির গায়ে খাঁজ মধ্যে বসান। প্রান্ত দুইটি পার্শ্ব লৌহ পাতের সমান চওড়া ও পুরু, কিন্ত ক্রমে মধ্যদেশ চওড়া ; কারণ ঐ খানে 'চ' চিহ্নিত দুইখানি চিত্রবৎ লৌহপাত সংবদ্ধ। ঐ পাত দুইখানির মধ্যে এপার ওপার পর্য্যন্ত সংবদ্ধ একটি মোটা লৌহ শলাকায় 'ছ' 'জ' চিহ্নিত একটি দণ্ড-যন্ত্র বা হাতল পরান। হাতলটি এককালে উহাতে বদ্ধ নহে, তুল-দাঁড়ির ন্যায় শিথিল ভাবে সংলগ্ন। 'ছ' 'জ' চিহ্নিত দণ্ড-যন্ত্রের নীচদিকের গাত্রের উপর একখানি লৌহপাত স্ক্রু করা ; সেই পাতের উপর আবার ১ ইঞ্চ চওড়া ও ৩ ইঞ্চ পুরু 'ঝ' চিহ্নিত একটি লৌহ দণ্ডের এক প্রান্ত এককালে আঁটা। ঐ দণ্ডের নিম্ন প্রান্তে 'ট' চিহ্নিত আর একটি দণ্ড ৩/৮ ইঞ্চ চওড়া ও ১/৪" বা সিকি ইঞ্চ পুরু, খিলেন করিয়া পরান, অর্থাৎ এককালে আঁটা নয়। 'ট'য়ের অপর প্রান্ত 'ঠ' চিহ্নিত একখানি লৌহ পাতে ঐ রূপ খিলেন করিয়া পরান। 'ঝ' ও 'ট' চিহ্নিত দণ্ড দুইটির দৈর্ঘ্য গতিমধ্যক স্থান হইতে দেড় ইঞ্চ ও সাড়ে তিন ইঞ্চি। 'ঠ' চিহ্নিত লৌহ পাত খানি 'ড' চিহ্নিত চাপ ফলকের উপর সংবদ্ধ। এই ফলককে ইংরাজীতে 'প্লাটেন' কহে। ইহা আধ ইঞ্চ পুরু একখানি শক্ত কাষ্ঠ খণ্ড ; ইহার নিম্নদেশে একখানি সমতল মসৃণ ঢালাই

লোহার পাত স্ক্রু দিয়া মোড়া। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 'ছ' ধরিয়া নীচু করিলে, 'ঝ' ও 'ট' চিহ্নিত দণ্ড দুইটি ক্রমে সরল বা লম্বভাবে দাঁড়াইবে। তাহা হইলেই 'ড'ও তার সঙ্গে নামিতে থাকিবে ; আবার 'ছ'কে তুলিয়া ধরিলে 'ড'ও উঠিতে থাকিবে। 'ড'য়ের এই উপরি ও নিম্ন গতি নিয়ামক একটি অঙ্গ আছে ; অর্থাৎ 'ড' ঠিক লম্বভাবে 'খ' 'খ'য়ের মধ্যে এপাশ ওপাশ না সরিয়া, স্বস্থানে নামে ও উঠে, সেই জন্য 'ত' 'ত' চিহ্নিত স্থানে, 'খ' 'খ'য়ের গাত্রে দুইটি দীর্ঘ ছেদ আছে। আর ঐ ছেদের রুজু রুজু, 'ড'য়ের উভয় পার্শ্বে, তৃতীয় চিত্রবৎ দুইটি অঙ্গ স্ক্রু দিয়া আঁটা। ঐ চিত্রে 'ক' 'খ' চিহ্নিত লৌহ পাত 'ড'য়ের পার্শ্বে পাঁচটী স্ক্রু দ্বারা আবদ্ধ ও 'গ' ভাগ ২য় চিত্রের 'খ' 'খ' চিহ্নিত পার্শ্ব-পাতের 'ত' 'ত' চিহ্নিত দীর্ঘ ছেদের মধ্যে পরিহিত। 'গ', 'ড'য়ের সহিত ছেদ মধ্যে উঠিতে ও নামিতে থাকে, অথচ 'ড'কে এপাশ ওপাশ সরিতে দেয় না। 'ড'য়ের এই গতি নিয়ামক অঙ্গ দুইটির উচ্চতা একটু হিসাব করিয়া ঠিক করিতে হয়। 'খ' 'খ'য়ের দীর্ঘ ছেদের ভিতর উহার যে অংশটুকু কার্য্য করিবে অর্থাৎ গ (৩য় চিত্র) য়ের উচ্চতা ঠিক এই রূপ হিসাবে করিবে,—'ট' চিহ্নিত দণ্ড, 'ঠ' চিহ্নিত ফলকে যে গ্রন্থিতে সংলগ্ন অর্থাৎ যে থিলেন স্থানে 'ট' দণ্ড গতিপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করে, সেই গ্রন্থির ঠিক মধ্য দিয়া, 'ড'য়ের সহিত সমান্তরাল ভাবে যদি একটি সরল রেখা কল্পনা করা যায়, তবে ঐ সরল রেখার দুই প্রান্ত বিস্তৃত করিলে, 'ড'য়ের দুই পার্শ্বস্থ উক্ত গতি নিয়ামক 'গ' (৩য় চিত্র) নামক অঙ্গের ঠিক মধ্য দিয়া যাইবে, অর্থাৎ 'গ'য়ের যে স্থান ঐ সরল রেখার প্রান্তদ্বয় স্পর্শ করিবে তথা হইতে 'গ'য়ের উপরি ও নিম্নদেশ যেন সমদূরবর্ত্তী হয়। এই হিসাবের ব্যতিক্রম হইলে 'ড', 'খ' 'খ'য়ের মধ্যে অবলীলাক্রমে ও না বাঁকিয়া চুরিয়া, উঠা নামা করিতে পারিবে না। তাহাতে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে। 'থ', দশ ইঞ্চ লম্বা ও সাঁড়ে আট ইঞ্চি চওড়া একটি কাঠের বাক্স। ইহা 'চেজ' ও 'ক্যারেজের' কার্য্য করে। এই বাক্সের কিনারা বা চারি ধার ১ ইঞ্চ পুরু রাখা আবশ্যক, করিণ বাক্সের মধ্যে টাইপ সাজাইয়া, গুলিদিয়া, 'ম্যাটার লক্ আপ' করিতে গেলে, কিনারা কম জোর থাকিলে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই বাক্সের গভীরতা হরফের উচ্চতা প্রমাণ (টাইপ হাইট,) আর ইহার তলা আধ ইঞ্চ পুরু। 'ক' চিহ্নিত ফ্রেমের ভিতর দিকের চারিধারে অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমিত ধারিকাটা বা খাঁজকাটা আছে। ঐ খাঁজের উপর 'থ' চিহ্নিত বাক্স বসিয়া 'ক'য়ের লম্বালম্বি অগ্র পশ্চাৎ সরিতে পারে, অথচ পার্শ্বে বাহির হইয়া পড়িবে না,—ফ্রেম মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। 'থ'য়ের গাত্রে 'প' স্থানে একটি গোল হাতল পরান। ঐটি ধরিয়া উহাকে 'ড' চিহ্নিত প্লাটেন বা চাপ-ফলকের নীচে ঠেলিয়া দেওয়া যায়, ও তথা হইতে আবার টানিয়া বাহির করিয়া আনা যায়। 'দ' চিহ্নিত 'টিম্-পান' ও 'চ' চিহ্নিত 'ফ্রিস্কেট', ঐ বাক্সের সহিত সাধারণ প্রেশের ন্যায় সন্নিবেশিত। 'ফ' চিহ্নিত মসী-ফলক (Inking table), কাষ্ঠের ফ্রেমের উপর একখানি ঢালাই লোহার ফলক আঁটা। উহা 'ক' ফ্রেমের সহিত দুইটী থম্ব স্ক্রু দ্বারা আঁটা থাকে। কার্য্য শেষে, প্রেশ তুলিয়া রাখিবার সময়, 'ফ' য়ের স্ক্রু দুইটী খুলিয়া উহাকে উল্টাইয়া, 'ক' য়ের নিচে তদনুযায়ী একটী খাঁজ মধ্যে রাখিয়া, ঐ স্ক্রু দুইটিরই দ্বারা আবার আবদ্ধ রাখিলেই হয়। 'ব', কালি-রোলর। 'ভ' স্থানে 'ক'য়ে একটি টানা দেরাজ আছে ; তন্মধ্যে গুলি, রোলর, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখা যায়। 'ঞ'-স্থানে একটি ভার সংলগ্ন ; ঐ ভারে প্লাটেন বা চাপ-ফলককে প্রতি চাপের পর আবার তুলিয়া দেয়, ও তুলিয়াই রাখে। 'ছ' 'জ' দণ্ডের 'ছ' 'চ' চিহ্নিত ভাগ এরূপ দীর্ঘ করিবে যেন 'ছ' ধরিয়া নামাইয়া সমতল ভাবে আনিলে উহার দৈর্ঘ্যতা 'ক' য়ের প্রান্ত অতিক্রম না করে, অর্থাৎ 'ক'য়ের অপেক্ষা বেশী লম্বা না হয়, তাহা না হইলে 'ছ' স্থানে অধিক চাপ প্রয়োগ করিলে সমস্ত যন্ত্রটি উল্টাইয়া যাইতে পারে। এই যন্ত্রটীতে উহা ১৬ ইঞ্চি দীর্ঘ। 'খ' 'খ' চিহ্নিত পার্শ্ব-ফলক দুইখানির উচ্চতা এমত পরিমাণে রাখিবে যে, 'ছ' 'জ' ঠিক সমতল অবস্থায় না আসিতে আসিতেই 'ড' এ প্রয়োজনানুরূপ চাপ পড়ে। তাহাতেও যদি অল্প তফাৎ দাঁড়ায়, তবে টাইপ বাক্স 'থ'য়ের তলদেশে প্রয়োজন মত অল্প চাঁচিয়া বা ঘষিয়া ফেলিয়া অথবা কাগজের ভাঁজ জোড়া দিয়া, বাক্সকে নীচু অথবা উচু করিলেই তাহার নিরাকরণ হইবে। 'গ' চিহ্নিত এড়ো লৌহ-দণ্ডের মাথায় একটি বড় রকমের স্ক্রু পরান থাকে ; ঐ স্ক্রুর মুখের দিক 'গ'য়ের নীচ দিকে বাহির হইয়া থাকে, এবং স্ক্রু ঘুরাইয়া ঐ মুখের দিক অল্প বা অধিক বাহির করা যায়। 'ছ' 'জ' নামক দণ্ড নামাইয়া ধরিলে, উহার 'চ' 'জ' য়ের উপরিদেশ ঐ স্ক্রুর মুখে ঠেকে। তাহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তাহা দ্বারা প্রেশের চাপ নিয়মিত হইয়া থাকে। ছাপা কার্য্য ভেদে কম বেশী চাপ আবশ্যক হয়। যতটা চাপের দরকার, 'ছ' 'জ' কে সেই মত নামাইলেই হইবে। উক্ত স্ক্রুটিও সেই মত 'গ' য়ের নিচু দিকে বাড়াইয়া রাখিলে, 'ছ' 'জ' তাহাতে ঠেকিয়া ঠিক প্রয়োজন মত

নামিবে,—তাহার অধিক নামিতে পারিবে না; সুতরাং, আবশ্যক মতের অধিক চাপও পড়িবে না। এখন এই মুদ্রা-যন্ত্রের কার্য্য প্রণালী বোধ হয় স্পষ্ট হইয়া থাকিবে। 'থ' চিহ্নিত টাইপ বাক্সে 'ম্যাটার' সাজাইয়া, গুলি আঁটিয়া দৃঢ় ভাবে বসান হইলে, 'ফ' চিহ্নিত মসি-ফলকে কালি দিয়া, 'ব' চিহ্নিত রুল দিয়া বেশ করিয়া কালি মাড়িয়া সর্ব্বস্থানে সমান বিস্তৃত করিবে। তার পর, 'দ' ও 'ন' চিহ্নিত টিম্‌পান্ ও ফ্রিস্‌কেট্ তুলিয়া রাখিয়া, হরফ গুলির উপর ঐ রুলটি টানিয়া কালি দিবে। তাহার পর 'দ' নামক টিমপানে একখণ্ড কাগজ সংলগ্ন করিয়া দিয়া, 'ন' নামক ফ্রিস্‌কেট্, 'দ'য়ের উপর চাপা দিয়া ফেলিবে এবং তা'র পর, 'দ' ও 'ন' সর্ব্ব-শুদ্ধ 'থ'য়ের উপর, বাক্সের ডালার ন্যায়, চাপা দিবে; শেষে 'প' হাতল ধরিয়া 'থ' কে 'ড' য়ের নীচু পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া 'ছ' কে নামাইয়া ধরিয়া চাপ দিবে। 'ছ' 'জ', 'গ'য়ের স্ক্রুতে ঠেকিয়া প্রয়োজন মতই নামিবে। চাপও প্রয়োজন অনু-রূপ পড়িবে। তখন ফের 'ছ' কে তুলিয়া রাখিয়া দিয়া, 'প' ধরিয়া 'থ'কে টানিয়া বাহির করিয়া রাখিয়া, 'দ' ও 'ন' তুলিয়া ফেলিয়া, 'দ' হইতে কাগজ খানি তুলিয়া লইয়া দেখিবে, উহা সুন্দর ছাপার অক্ষরে অঙ্গ ভূষিত করিয়া আসিয়াছে। যতগুলি কাগজ ছাপিবার প্রয়োজন, ততবার এইরূপ প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ সম্পন্ন করিতে হইবে।

প্রায় সকল মুদ্রাযন্ত্রই মিশ্র দণ্ড-যন্ত্র অবলম্বনে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আমাদের এই ক্ষুদ্র হ্যাণ্ড-প্রেশেও ঐ মিশ্র দণ্ড-যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ বড় বড় প্রেশে মিশ্র দণ্ড-যন্ত্র যে ভাবে নিযুক্ত হয়, এই প্রেশে তাহার ভিন্নরূপ সন্নিবেশ স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। তাহাতে সাধারণ প্রেশ অপেক্ষা ইহাতে কত অধিক সুবিধা তাহা পরে দেখাইব।

১ম চিত্রে 'ক' 'খ' 'গ' একটি অবলম্বমধ্যক দণ্ড-যন্ত্র; 'খ' স্থানে সমকোণে (Right angle) বক্র, এবং ঐ অবলম্ব স্থানে একটি কীলক দ্বারা স্বস্থানে এরূপে বদ্ধ যে 'ক' ধরিয়া ঘুরাইলে 'ক' 'খ' 'গ' চিহ্নিত সমগ্র দণ্ডটি কীলককে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে পারে। ঐ দণ্ড-যন্ত্রের নিম্ন প্রান্ত 'গ' স্থানে 'গ' 'ঘ' চিহ্নিত আর একটি দণ্ড, আর একটি কীলক দ্বারা সংযুক্ত, কিন্তু 'গ' স্বস্থানে এককালে আবদ্ধ নহে, অর্থাৎ 'ক' স্থান ধরিয়া নামাইলে 'গ', 'খ' 'ঘ'য়ের অভিমুখে সরিতে থাকিবে। 'গ' 'ঘ'য়ের প্রান্ত এরূপে আবদ্ধ যে উহা কেবল 'খ' 'ঘ' চিহ্নিত সরল রেখা পথেই গতিযুক্ত হইতে পারে। এক্ষণে 'ক' স্থানে যদি কোন বল প্রয়োগ করিয়া,—ঐ স্থানে হাত দিয়া ধরিয়া 'ক' 'খ'কে 'খ' 'চ' চিহ্নিত সমতল ভাবে আনা যায়, তাহার ফলে 'খ' 'গ' ও 'গ' 'ঘ' ক্রমশঃ সরিয়া গিয়া 'খ' 'ঘ' চিহ্নিত লম্ব রেখা-পথে দাঁড়াইবে। সুতরাং 'গ' প্রান্তদেশ অবনত হইয়া পড়িবে।

'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' (২য় চিত্র) একটি বিমিশ্র দণ্ড-যন্ত্র স্বরূপ। এক্ষণে এরূপ যন্ত্রে বল ও ভারের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ অর্থাৎ উহার এক প্রান্ত 'ক' স্থানে বল প্রয়োগ করিলে অপর প্রান্ত 'ঘ' স্থানে কত চাপ পড়িবে, তাহা অনায়াসেই স্থির করা যায়। দণ্ড-যন্ত্রের লাভ গননার মূল সূত্র এই যে, অবলম্ব-স্থান হইতে বল-প্রয়োগ স্থানের দূরত্ব যত অল্প হয় ততই বলের লাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ একগুণ বলে অনেক গুণ ভার বহন বা চাপ প্রদান করা যাইতে পারে। দণ্ড-যন্ত্রের প্রত্যেক ভুজ মাপিয়া উহার বল ও ভারের পরস্পর সম্বন্ধ বা লাভ লোকসান ঠিক করা যায়। এস্থলে 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' য়ের লাভ কসিয়া দেখিলে স্থির হইবে যে, বল ১ সের হইলে আর 'গ' 'খ' 'ঘ' চিহ্নিত কোণ ৩' তিন ডিগ্রি মাত্র কম হইলে ভার ২২৬০·১৮ সের হইবে; অর্থাৎ 'ক' কে ১ সের পরি-মিত বলে নামাইয়া ধরিলে, 'ঘ' স্থানে ২২৬০·১৮ সের চাপ পড়িবে। ২০ সের বলে 'ক' চাপিলে, ২২৬০·১৮×২০ =৪৫২৩·৬ সের চাপ 'ঘ'য়ে পড়িবে।

আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রে এরূপ একটি দণ্ড-যন্ত্রের নিয়োগ আব-শ্যক, এবং আজও তাহার অভাব আছে যে, উহার প্রযুক্ত একই বল, যন্ত্রের গঠন কৌশল গুণে ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে। 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' চিহ্নিত (১ম চিত্র) দণ্ড যন্ত্রের যেরূপ গঠন তাহার গুণে 'ক' 'খ' 'চ' চিহ্নিত কোণকে ক্রমশঃ যত কমাইবে অর্থাৎ 'ক' 'খ'কে ক্রমশঃ যত নীচে আনিবে, 'ঘ' স্থানে ততই অধিক চাপ পড়িবে। 'ক 'খ', 'খ 'চ চিহ্নিত সম-তল রেখা ক্রমে আসিলে, চাপ সর্ব্বাধিক দাঁড়াইবে। ২য় চিত্র-বৎ মুদ্রাযন্ত্রে 'ছ' 'চ' 'ঝ' 'ঠ' ঐ রূপ দণ্ড-যন্ত্র। 'ছ' ধরিয়া নীচে আনিতে যতক্ষণ চাপ-ফলক 'ড' কোন বস্তুর সংস্পর্শে না আইসে—কোনও প্রতিবন্ধক না পায়, ততক্ষণ লাভ ন্যূন-তম, কিন্তু টাইপের উপর আসিয়া ঠেকিলেই চরম লাভ বা চাপ প্রাপ্ত হয়। তখন 'খ' 'গ' (১ম চিত্র) ও 'গ' 'ঘ' 'খ' 'ঘ' লম্ব রেখা ক্রমে দাঁড়ায়। তবেই এই মুদ্রা-যন্ত্রে বল-ভুজ অতি সঙ্কীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া কার্য্য করে, অথচ উহার প্রযুক্ত বল তন্মধ্যে ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া টাইপের উপর চাপ-ফলকে চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। সাধারণ প্রেশে বল-

ভুজকে অধিক স্থান ব্যাপিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহাতে যন্ত্রের এক দিক হইতে অপর দিকে টানিয়া প্রায় অর্দ্ধ বৃত্তা-কার পথে ঘুরাইতে হয়। অধিকন্তু এই হ্যাণ্ড প্রেশের মিশ্র-দণ্ড-যন্ত্র যে ভাবে সন্নিবিষ্ট, তাহাতে যন্ত্রটি চালাইতে উহাকে একস্থানে আবদ্ধ রাখিতে হয় না। দণ্ড-যন্ত্রের প্রকারান্তর সমাবেশে. প্রেশকে চালাইতে একস্থানে বদ্ধ রাখিতে হয়।

এই হাত মুদ্রাযন্ত্রটি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও ইহা ক্রীড়নক নহে। অকটেভো আকারেরমুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুসারে প্রয়োজন মত এইরূপ প্রেশ বৃহদাকার করিয়া লইলে, তদ্দ্বারা সাধারণতঃ সকল ছাপার কার্য্যই সম্পন্ন হইবে, অথচ এ প্রকার হ্যাণ্ড-প্রেশ সকল রকমে সুবিধা জনক।

বিদ্যুৎ ও বজ্র।

(পরিশিষ্ট।)

শিষ্য।—বিদ্যুৎ কাহাকে বলে?

গুরু।—কোন মেঘের সঞ্চিত তাড়িত মেঘান্তরে গমন অথবা পৃথিবীস্থ কোন পদার্থোপরি পতন কালে যে প্রখর জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাকেই বিদ্যুৎ কহে।

শিষ্য।—বিদ্যুৎপাতের কারণ কি?

গুরু।—অতি বিততিষা (Tension) বিশিষ্ট দ্বিবিধ তাড়িত পূর্ণ দুইখানি মেঘ পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইলেই, ঐ তাড়িত-দ্বয় পরস্পর মিলিত হয়; অর্থাৎ একখানি মেঘ অধিক পরিমাণে তাড়িত যুক্ত হইয়া অন্য একখানি মেঘের অথবা পৃথিবীস্থ কোন পদার্থের নিকট আসিয়া তন্মধ্যে উহার বিপরীত বর্ণ তাড়িত সংক্রামিত করে; তখন ঐ দুই প্রকার তাড়িতের বিততিষা মধ্যবর্ত্তী অপরিচালক বায়ুর প্রতিবন্ধকতা নিব-ন্ধন ক্রমিক বাড়িতে থাকে; পরিশেষে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়া পরস্পর বিদ্যুৎ রূপে সংমিলিত হইয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর সংক্রামিত তাড়িতও কখন কখন উর্দ্ধে বিদ্যুতাকারে উঠিয়া মেঘের তাড়িতের সহিত সংমিলিত হইতে দেখা যায়।

শিষ্য।—মেঘে তাড়িত জন্মিবার কারণ কি?

গুরু।—১ম; ভূপৃষ্ঠস্থ জল, জীবদেহ ও উদ্ভিদ-শরীরস্থ রসাদি তরল-পদার্থ মাত্রই ক্রমাগত সূর্য্যোত্তাপে কিয়ৎ পরিমাণে বাষ্পীভূত হইতেছে; সেই বাষ্প ঊর্দ্ধগামী হইয়া মেঘকে তাড়িত পূর্ণ করে।

২য়; ভূপৃষ্ঠে ও তদুপরিস্থ বায়ুমণ্ডলে অনবরত বিবিধ রাসায়নিক কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। তজ্জনিত বাষ্পও ঊর্দ্ধগামী হইয়া গিয়া মেঘকে তাড়িত পূর্ণ করে।

৩য়; বিভিন্ন তাপক্রম বিশিষ্ট দুইটি বায়ুস্রোত অর্থাৎ একটি অল্প ও আর একটি অধিক উষ্ণ বায়ু প্রবাহের পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারাও তাড়িত উৎপন্ন হয়। সেই তাড়িতও মেঘে গিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে।

শিষ্য।—ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় কত উর্দ্ধে তাড়িত মেঘ অব-স্থিতি করে?

গুরু।—কখন দুই বা আড়াই ক্রোশ উর্দ্ধে, কখনও বা এত নিকটে যে ভূপৃষ্ঠ প্রকৃত স্পর্শ করে। কিন্তু চতুর্দ্দশ শত হাত উর্দ্ধে অবস্থিত মেঘ হইতে প্রায় বিদ্যুৎপাত হয় না।

শিষ্য।—বৃক্ষ, মন্দিরচূড়া, জীবদেহ প্রভৃতি উচ্চ পদার্থের উপরই কেন বিদ্যুৎপাৎ হইয়া থাকে?

গুরু।—যেহেতু ঐ সকল উচ্চ পদার্থ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ ও তাড়িতপূর্ণ মেঘের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের হ্রাস হইয়া থাকে; অর্থাৎ দ্বিবিধ তাড়িত তদ্দ্বারা পরস্পরের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে, তখন মেঘস্থ অধিকতর তাড়িত সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পদার্থের তাড়িতের সহিত আসিয়া মিলিত হয়।

শিষ্য।—বিদ্যুৎ কখন্ অগ্নিরূপে প্রকাশমান হয় ও কখ-নই বা হয় না?

গুরু।—বায়ুর মধ্য দিয়া গমন কালে বিদ্যুৎ বা তাড়িত নিজ স্ফুলিঙ্গ রূপে প্রকাশমান হয়; বায়ু অপরিচালক বলিয়া উহা তাড়িতকে অলক্ষিত ভাবে পরিচালিত করিতে পারে না। কেবল পরিচালক পদার্থ মধ্য দিয়াই তাড়িত অদৃশ্য-ভাবে সঞ্চালিত হয়, তখন উহা স্ফুলিঙ্গ রূপে প্রকাশমান হয় না।

শিষ্য।—বিদ্যুৎপাতে কখন্ ও কি নিমিত্ত মনুষ্য ও

অন্যান্য জীব হত হয় এবং কখনই বা কেবল মাত্র আঘাত পায়?

গুরু।—বিদ্যুৎ জীব দেহের মধ্য দিয়া গমন করিতে জীবকে যে নষ্ট করে, তাহার কারণ এই, তদ্দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ শিরা সমস্ত এরূপ বেগে আন্দোলিত হয়, যে তাহারই বলে প্রাণ নাশ হয়। কিন্তু যখন অধিক পরিমাণে তাড়িত শরীর মধ্য দিয়া গমন না করে, তখন প্রাণ নাশ না হইয়া আঘাত মাত্র পাওয়া যায়।

শিষ্য।—বজ্র কাহাকে বলে?

গুরু।—বিদ্যুৎ-পতনকালে তাহার গতি-পথের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বায়ু সঙ্কুচিত বা ঘনীভূত হইয়া যায়। বিদ্যুৎ চলিয়া গেলে পর সেই বায়ু প্রসারিত হইয়া বেগে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় যে ভীষণ শব্দ হয়, তাহাকেই বজ্র কহে।

শিষ্য।—বিদ্যুৎপাত হইবার ক্ষণেক পরে কেন বজ্রধ্বনি শ্রুত হয়?

গুরু।—বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি উভয়েরই এক সময়েই উৎপত্তি। কিন্তু বিদ্যুৎ বজ্রাপেক্ষা কোটী গুণ অধিক বেগে গমন করে। তাড়িতবেত্তাগণ সুনিপুণ পরীক্ষা দ্বারা অবধারিত করিয়াছেন, যে তাড়িত এক সেকেণ্ডে ২৮৮০০০ মাইল বা ১৪৪০০০ ক্রোশ গমন করে। আর শব্দ ঐ সময়ে অনেক কম দূর যায়। তাড়িত-স্রোত এক মিনিটে পৃথিবীকে ৪৮০ বার বেষ্টন করিয়া আসিবে, কিন্তু বজ্রধ্বনি ঐ সময়ে ১৩ মাইল মাত্র যাইবে। সুতরাং বিদ্যুৎপাত হইবার কিছুক্ষণ পরে বজ্রধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়।

শিষ্য।—বিদ্যুৎ প্রকাশমান হইবার যত পরে বজ্রধ্বনি শুনা যায়, সেই সময় ঠিক্ করিয়া রাখিয়া, পৃথিবী হইতে সেই তাড়িত-মেঘ কত ঊর্দ্ধে অবস্থিত তাহা কিরূপে বলা যায়?

গুরু।—বিদ্যুৎ প্রকাশমান হইবা মাত্রই দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু বজ্রধ্বনি ৭৬০ হাত গমন করিতে এক সেকেণ্ড লইবে; সুতরাং বিদ্যুৎ ও বজ্রের মধ্যে ৫ সেকেণ্ড অতিবাহিত হইলে জানা যাইবে যে ঐ তাড়িত-মেঘ ৩৮০০ হাত অন্তরে আছে।
৭৬০ × ৫ = ৩৮০০ হাত।

শিষ্য।—ঝড়, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎপাত কালে কিরূপ স্থান পরিত্যাগ করা উচিত?

গুরু।—বৃক্ষমূল, উচ্চ বাটী ও মন্দিরাদি এবং নদী বা স্রোতবাহী জলের ধার, এ সমস্তের নিকটেও থাকিবে না।

শিষ্য।—তাহার কারণ কি?

গুরু।—বৃক্ষ, মন্দির-চূড়া প্রভৃতি উচ্চ পদার্থের উপরই বিদ্যুৎপাতের অধিক সম্ভাবনা। তাহাদের নিকটে থাকিলে, বিদ্যুৎ তাহাদের ছাড়িয়া জীব দেহ মধ্য দিয়াই গমন করিবে। তাড়িতের এই একটি প্রধান ধর্ম্ম, যে উহা উৎকৃষ্ট পরিচালক নিকটে পাইলে তন্মধ্য দিয়া যাইবার জন্য অধম পরিচালক পরিত্যাগ করে। জীবদেহ আভ্যন্তরীণ রসাধিক্য বশতঃ বৃক্ষাদির অপেক্ষা উত্তম পরিচালক; খোলা মাঠে বা বাটী বৃক্ষাদি শূন্য স্থানে নদী বা স্রোতবাহী জল থাকিলে, সেই মাঠের অন্যত্রে বিদ্যুৎপাত না হইয়া ঐ জলেই হইবে। কারণ জল উত্তম তাড়িত পরিচালক। আবার সেই জলের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিলে উচ্চ স্থান পাইয়া বিদ্যুৎ মস্তকে পড়িয়া দেহমধ্য দিয়া পরে ঐ জলে যাইবে।

শিষ্য।—বিদ্যুৎ কি জীবদেহ ও বৃক্ষাদির ঠিক মধ্য দিয়া গমন করে?

গুরু।—জীবদেহের মধ্য দিয়া যায়, কারণ তথায়ই সর্ব্বাধিক রস পায়; কিন্তু বৃক্ষাদির ত্বকের নীচে দিয়া অর্থাৎ ছাল ও কাষ্ঠের মধ্যে যেখানে সর্ব্বাধিক রস পায় সেই স্থান দিয়াই সঞ্চালিত হয়।

শিষ্য।—ঝড় বৃষ্টির সময় লৌহ নির্ম্মিত বাটীর মধ্যে বাস করা ভয়াবহ কি না?

গুরু।—না; কারণ তাহা হইলে বিদ্যুৎ লৌহময় দেয়াল দিয়া ভূপৃষ্ঠে পরিচালিত হইয়া যাইবে। দেয়াল ছাড়িয়া গৃহের কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে যাইবে না; যেহেতু লৌহই তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচালক।

শিষ্য।—বিদ্যুৎপাত কালে গৃহের কোন্ স্থান পরিত্যাজ্য ও কোথাই বা নিরাপদ?

গুরু।—গৃহের দেয়াল হেলান দিয়া বা স্পর্শ করিয়া থাকিবে না। কারণ বাটীতে বিদ্যুৎপাত হইলে, বিদ্যুৎ দেয়াল দিয়াই পরিচালিত হয়, তখন দেয়ালের সংস্পর্শে কোন উৎকৃষ্ট পরিচালক পাইলে তন্মধ্য দিয়া গমন করিবে। সেই জন্য গৃহের মধ্যস্থলই ভয়শূন্য।

শিষ্য।—বিদ্যুৎপাত কালে এক গৃহে অধিক লোক থাকা কর্ত্তব্য নহে কেন?

গুরু।—দুইটি কারণে;—১ম, অনেক লোক একত্রে এক ব্যক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর পরিচালক হইয়া দাঁড়ায়। ২য়; অনেক লোকে একত্রে এক স্থানে নিশ্বাস প্রশ্বাস করিলে, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ও ঊর্দ্ধতলস্থ বায়ু দূষিত বাষ্পে পরিপূরিত হইয়া তাড়িতের উত্তম পরিচালক হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতে বাটীতে বিদ্যুৎপাত হইলে, বিদ্যুৎ বাটীর দেয়াল ছাড়িয়া

ঐ বাষ্প দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ঐ লোকের দল মধ্যেই পড়িবে।

শিষ্য।—ঐ কারণে আর কিরূপ স্থান শঙ্কাযুক্ত?

গুরু।—নাট্যশালা, যথায় অনেক লোক একত্রে সমবেত হয়; এবং গাভী মেষাদি পশুর পালের নিকট থাকিবে না।

শিষ্য।—দৈবক্রমে ঝড় ও বৃষ্টির সময় বাহিরে থাকিলে, কিরূপ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য?

গুরু।—উচ্চ বৃক্ষ অথবা বাটী হইতে অন্ততঃ ২০, ৩০ ফিট অন্তরে থাকিবে। গাড়ীর মধ্যে থাকিলে, গাড়ীর পার্শ্ব দিক্ ঠেশ দিয়া বসিবে না; অথবা তা'র চারিদিকের কোন স্থান স্পর্শও করিয়া থাকিবে না। প্রথমটির তাৎপর্য্য এই, উচ্চতর বাটী বা বৃক্ষের উপর বিদ্যুৎপাত হইলে, তথা হইতে বিদ্যুৎ ২০, ৩০ ফিট অন্তরে আর যাইবে না। মাঠে পড়িলে ও কোন বৃক্ষ নিকটে থাকিলে, উহার অন্ততঃ ২০ ফিট অন্তরে থাকিবে। পরিচ্ছদাদি উত্তমরূপে জলে ভিজাইয়া ফেলিবে; তাহাতে যদিও শরীরোপরি বিদ্যুৎপাত হয়, বিদ্যুৎ সিক্ত পরিচ্ছদরূপ উত্তম পরিচালক দ্বারাই পরিচালিত হইয়া যাইবে; দেহ মধ্যে আর প্রবেশ করিবে না। ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে পরিমাণ ঘর্ষণোত্তেজিত তাড়িত একটি ইন্দুরের দেহমধ্য দিয়া সঞ্চালিত করিয়া দিলে ইন্দুরটির মৃত্যু ঘটে, উহাকে জলে ভিজাইয়া সেই পরিমাণ তাড়িত প্রয়োগ দ্বারা উহাকে মারা যায় না।

শিষ্য।—বিদ্যুৎপাত কালে লৌহ নির্ম্মিত খাটে শয়ন করা অথবা লোহময় আবরণে শরীর আবৃত রাখা ভয়াবহ কি না?

গুরু।—না; কারণ ধাতু জীবদেহাপেক্ষা উত্তম পরিচালক বলিয়া বিদ্যুৎ দেহ মধ্যে আর প্রবেশ না করিয়া তদ্দ্বারাই সঞ্চালিত হইয়া যাইবে।

শিষ্য।—বিদ্যুৎ বাটীতে পতিত হইয়া সরল রেখা পথে গমন না করিয়া, ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় কেন?

গুরু।—বিদ্যুৎ পার্থিব কোন পদার্থের উপর পড়িয়া ভূপৃষ্ঠাভিমুখে প্রধাবিত হয়। নিরবচ্ছিন্ন পরিচালক পাইলে আর ইতস্ততঃ না করিয়া তাহার দ্বারাই সঞ্চালিত হইয়া যায়; কিন্তু তদ্রূপ পরিচালক প্রায় পায় না; ইষ্টক প্রভৃতি যে সকল উপকরণে বাটী নির্ম্মিত হইয়া থাকে, সে সকল তত ভাল পরিচালক নহে। তাহাতে বাটীর অনেক স্থানে বিদ্যুৎ প্রতিবন্ধক পায়, অর্থাৎ উহার গতির ব্যাঘাৎ জন্মায়। আবার অনেক স্থলে বিবিধ পরিচালক পদার্থও পায়, যথা জানালার লৌহময় গরাদে, পাখা, ঝাড় প্রভৃতির দোলন শিক, ধাতুময় সিন্দুক, প্যাটরা, বাসন ও অন্যান্য ধাতুপাত্র। বিদ্যুৎ বাটীতে পড়িয়া ভূপৃষ্ঠে যাইবার জন্য যেন একটি ধাতুময় রাস্তা খুঁজিয়া লয়। চতুঃপার্শ্বে ধাতু পাইলে এদিক্ ওদিক্ করিয়া তন্মধ্য দিয়াই ভূপৃষ্ঠে গমন করে।

শিষ্য।—বিদ্যুৎ কখন কখন বাটীর কোন কোন অংশ ও বৃক্ষাদির শাখা প্রভৃতি ভঙ্গ করে কেন?

গুরু।—বিদ্যুৎ বাটীতে পড়িয়াই নিকটে যে কোন পরিচালক পায়, তাহারই ভিতরে বেগে প্রবেশ করে, আবার তাহাকে ছাড়িয়া অন্য এক পরিচালকে প্রবেশ করে; এইরূপে এক পরিচালক হইতে অন্য পরিচালক দিয়া ভূপৃষ্ঠে যায়। তখন পথি মধ্যে যে কোন অপরিচালক পদার্থ প্রতিবন্ধক পায় তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। তাড়িত প্রচণ্ড বলশালী, তাহার গতিরোধক কাহারই বাধা মানে না।

শিষ্য।—তাড়িতের সংক্ষোভ বা আঘাত শরীরের গ্রন্থি অর্থাৎ কনুই, হাঁটু প্রভৃতি গাঁইট-স্থানেই অধিক বোধ হয় কেন?

গুরু।—কারণ ঐ সকল স্থলে অধিক পরিমাণে হাড় থাকায়, তাড়িতের গতির অধিক ব্যাঘাত জন্মায়।

শিষ্য।—বিদ্যুৎ লৌহ-ফলকের ন্যায়, এরূপ সংস্কারের মূল কি?

গুরু।—মাটির ভিতর যাইবার সময় বিদ্যুৎ এরূপ গর্ত্ত করিয়া যায়, যে তাহা লৌহ-ফলক কৃত বলিয়া বোধ হয়; ওরূপ গর্ত্ত হইবার কারণ এই, মাটিতে 'সিলিকন্' নামক এক প্রকার যৌগিক পদার্থ প্রায় সিকি ভাগ প্রমাণ মিশ্রিত আছে। বিদ্যুৎ মাটির ভিতর যত দূর প্রবেশ করে, তত দূর মাটির ঐ পদার্থ দ্রব করিয়া যায়। তাহাতেই ততদূর লৌহ-ফলক কৃত গর্ত্তের ন্যায় চিহ্নিত হইয়া যায়। ঐ গর্ত্ত কখন কখন ২৪ হাত পর্য্যন্ত ভিতরে গিয়া থাকে।

শিষ্য।—বিদ্যুৎপাত হইতে কি কোন আশু হিত সাধিত হইয়া থাকে?

গুরু।—হয়। তৎস্থানের বায়ু দুইটি কারণে অনেকাংশে বিশুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়;—১ম, বিদ্যুৎ সংযোগে ভূবায়ুস্থ অম্লকর (Oxygen) বাষ্পের রূপান্তর হইয়া 'অজোন্' (Ozone) নামক এক প্রকার বাষ্প উদ্ভূত হয়। ঐ অজোন্ বড় উপকারী। ভূপৃষ্ঠ হইতে যে সমস্ত উদ্ভিদ্ এবং জীব-শরীরী পদার্থ পচিয়া পূতিগন্ধ যুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাকে এই বাষ্প বিনষ্ট করে। ইহা গন্ধকীয় গন্ধ বিশিষ্ট। ২য়,

বিদ্যুৎপাত কালীন ভূবায়ুর যে বিলোড়ন বা আন্দোলন সংঘটিত হয়, তদ্দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ বদ্ধ বায়ু ঊর্দ্ধ গমন করে এবং উপরিতনস্থ পরিশুদ্ধ বায়ু ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে।

শিষ্য।—বিদ্যুদ্দণ্ড কাহাকে বলে?

গুরু।—বিদ্যুৎপাত হইতে বাটী ইত্যাদি সংরক্ষণ হেতু যে সূচীর ন্যায় অগ্রভাগ বিশিষ্ট লৌহদণ্ড বাটীর পার্শ্বে স্থাপিত হয়, তাহাকে বিদ্যুদ্দণ্ড কহে।

শিষ্য।—ঐ দণ্ড দ্বারা কিরূপে বাটী প্রভৃতি রক্ষিত হয়?

গুরু।—বিদ্যুদ্দণ্ড স্থাপনের দুইটি উদ্দেশ্য,—প্রথম,—বাটী, মন্দির প্রভৃতির উপর বিদ্যুৎপাত নিবারণ করা; দ্বিতীয়,—বিদ্যুৎপাত অনিবার্য্য হইলে, তখন বাটী রক্ষা করা। প্রথম উদ্দেশ্য এই রূপে সাধিত হইয়া থাকে; বাটীর উপরিতন আকাশে যেমন তাড়িত মেঘ আসিয়া জমিতে থাকে, তাহার প্রভাবে বাটীর ও তৎসঙ্গে ভূপৃষ্ঠের স্বাভাবিক তাড়িত, সংক্রামণ গুণে বিশ্লিষ্ট বা পরস্পর বিযুক্ত হয়। তন্মধ্যে যে তাড়িতটী ঐ তাড়িত-মেঘস্থ তাড়িতের অসমান, সেইটি ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়, ও তাহার সমান বর্ণটি ভূপৃষ্ঠে প্রক্ষিপ্ত হয়। তখন সূক্ষ্মাগ্রের ধর্ম্মানুসারে ঐ আকৃষ্ট তাড়িত, দণ্ডের অগ্রভাগ হইতে বিকীর্ণ হইতে থাকে; এবং অল্পে অল্পে মেঘের বিষম তাড়িতের সহিত মিলিত হইয়া উহাকে নিশ্চেষ্ট বা সাম্যাবস্থ করে। তাহাতেই বাটীর উপর অধিক পরিমাণে তাড়িত জমিতে পায় না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই,—হঠাৎ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তাড়িতপূর্ণ একখানি মেঘ বায়ুবেগে দণ্ডের উপরে আসিয়া পড়িলে, তখন ঐ দণ্ডের আর প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু বিদ্যুৎ উত্তম পরিচালক পাইয়া বাটীতে আর না পড়িয়া ঐ দণ্ডেরই উপর পড়িবে, ও তাহারই ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইয়া যাইবে। সুতরাং বাটী অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

শিষ্য।—বিদ্যুদ্দণ্ড কি প্রণালীতে নির্ম্মিত ও স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য?

গুরু—১ম,—পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে দণ্ডের চতুর্দ্দিকে উহার উচ্চতার দ্বিগুণ ব্যাসার্দ্ধ পরিমিত স্থান উহা দ্বারা রক্ষিত হয়; অর্থাৎ দণ্ডের উচ্চতা ৮ ফিট হইলে, উহার চারি দিকে ১৬ ফিটের মধ্যে যত স্থান আছে, সমস্ত তদ্দ্বারা রক্ষিত হইবে। এইরূপে দণ্ডের উচ্চতা ৯ ফিট হইলে ১৮ ফিট, ১০ ফিট হইলে ২০ ফিটের মধ্যে যত স্থান তৎ সমস্ত তাহা দ্বারা সংরক্ষিত হইবে। সুতরাং বাটীর আয়তন অনুসারে দণ্ডের উচ্চতা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

২য়,—দণ্ডের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও লৌহ অপেক্ষা তাম্রের হইলে ভাল হয়। লৌহাপেক্ষা তাম্র উৎকৃষ্ট পরিচালক।

৩য়,—দণ্ডের অধোভাগের বেড় যেন অন্ততঃ ৭ ইঞ্চের কম না হয়।

৪র্থ,—বাটীর এক পার্শ্বে, লম্বভাবে, দণ্ডটি স্থাপিত হইবে। তাহার অগ্রভাগ যেন বাটীর উচ্চতা কতক পরিমাণে অতিক্রম করিয়া বা ছাড়াইয়া থাকে।

৫ম,—দণ্ডের সহিত বাটীর ধাতব সংযোগ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ উহা হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় না থাকে।

৬ষ্ঠ,—দণ্ডের আয়তন বা বেড় যথেষ্ট মোটা হওয়া চাই। সরু হইলে তন্মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ সঞ্চালন কালে উহা গলিয়া যাইতে পারে।

৭ম,—দণ্ডের কোনও অংশ ভাঙ্গা-চুরা না হয়, অথবা সরু মোটাও না হয়।

৮ম,—বাটীর যেদিকে দণ্ড স্থাপিত হইবে, সেই দিকে বাটীর ভিতরে অধিক পরিমাণে ধাতুময় সামগ্রী না থাকে।

শিষ্য।—বিদ্যুৎপাত বা বজ্রাঘাতে মৃত্যুতে কোন যন্ত্রণা আছে কি না?

গুরু।—কিছুমাত্র নাই।

শিষ্য।—তাহার কারণ কি?

গুরু।—মস্তিষ্ক আমাদের সকল অনুভূতির মূল। দেহমধ্যে, বাহ্য ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া, মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তর শিরা বিস্তৃত আছে। শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ত্বগিন্দ্রিয়ের ঐ সকল শিরা দ্বারা সেই আঘাত মস্তিষ্কে চালিত হয়, তবে আমরা সেই আঘাত জনিত কষ্ট অনুভব করি। বিদ্যুতের আঘাত এত তীব্র ও ক্ষণস্থায়ী যে উহা শিরা সকলকে এককালে নষ্ট করে। সুতরাং তাহারা ঐ আঘাত মস্তিষ্কে সঞ্চালন করিতে আর সময় পায় না, তাহার অগ্রেই মৃত্যু ঘটে। তাহাতেই সে আঘাতের কষ্ট আর অনুভব করিতে হয় না।

কলিকাতার ইতিহাস।

(২৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

ষোড়শ অধ্যায়।

বিধবা বিবাহ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী—ডেলহৌসীর কার্য্যত্যাগ—লর্ড ক্যানিং—প্রথম নাট্যাভিনয়—প্রথম ঐক্যতান-বাদ্য সৃষ্টি—শকুন্তলা অভিনয়—বিধবা বিবাহ অভিনয়—প্রসিদ্ধ নাট্যামোদীগণ—সংগীত সংস্কার ও পাথুরিয়া ঘাটার রাজভ্রাতৃদ্বয়—ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দান—কেশব চন্দ্রের জীবনী—সোম প্রকাশ ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়—মহারাজ্ঞীর ঘোষণা পত্র—উপসংহার।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে আর্ট ষ্টুডিওর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা এক্ষণে আর বর্ত্তমান নাই।

খ্রীঃ ১৮৫৬ অব্দে জগদ্বিখ্যাত দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে বিধবাবিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ হয়।

যদিও সুপরিচিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই, তথাপি এই প্রবন্ধের রীতি অনুসারে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রকটিত হইল।

ইনি জেলা হুগলির অন্তর্গত খানাকুলের সন্নিহিত বীরসিংহ (বীরসিঙা) গ্রামে ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যকালে সামান্য রূপ পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিয়া ৯ বৎসর বয়সে পিতার নিকট কলিকাতায় আসেন। ১৮২৯ অব্দের ১লা জুন এখানে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। ইহাঁর পিতার অবস্থা ভাল ছিল না, এজন্য ইহাঁকে কদর্য্য স্থানে বাস, সামান্য দ্রব্য ভক্ষণ ও কুৎসিত শয্যায় শয়ন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৭৪৬ অব্দের নবেম্বর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করেন। খ্রীঃ ১৮৩৯ অব্দে "হিন্দু-ল" বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন। কালেজে মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার প্রিয়তম সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইনি প্রথমে ফোর্টউইলিয়ম কালেজে পণ্ডিত হন, তৎপরে সংস্কৃত কালেজের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হন। কিন্তু সেক্রেটারির সহিত মতের অনৈক্য হওয়াতে কর্ম্ম ত্যাগ করেন। তৎপরে ফোর্টউইলিয়ম কালেজের হেড কেরাণী, পরে সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক হন। এই সময়ে পূর্ব্বতন সেক্রেটারি পদত্যাগ করাতে ইনি তৎপদে নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত কালেজ কিরূপে চালিত হওয়া উচিত তৎপক্ষে এডুকেশন কৌন্সিলে এক রিপোর্ট করেন, তদ্দর্শনে কৌন্সিল সন্তুষ্ট হন এবং কিছুদিন পরে সেক্রেটারি ও এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি এই দুই পদ উঠাইয়া দিয়া প্রিন্সিপাল পদ সৃষ্টি করিয়া সেই পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার কথিত উপায়ে এক্ষণে কালেজে শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে তিনি বিদ্যালয় সমূহের এসিষ্ট্যাণ্ট ইনেস্পক্টর হন। ১৮৮৫ অব্দে কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পদত্যাগ করেন। ইনি ক্রমে ক্রমে বাসুদেব চরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ, জীবন চরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা ব্যাকরণ, তিন ভাগ কৌমুদী, বাঙ্গালা শকুন্তলা, বিধবা বিবাহ উচিত কি না? ২ খণ্ড, ২ ভাগ বর্ণপরিচয়, চরিতাবলী, কথামালা, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ, সীতার বনবাস, চতুর্থ ভাগ কৌমুদী, ভ্রান্তিবিলাস, বহু বিবাহ হওয়া উচিত কি না? প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন; প্রথম খানি এবং আরও কতকগুলি পুস্তক অপ্রকাশিত আছে। এতদ্ব্যতীত ঋজুপাঠত্রয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থও তিনি সংকলিত ও প্রকাশিত করেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ইনি নিজ পুত্রকে বিধবার সহিত বিবাহ দিয়াছেন।

ইহাঁর স্থাপিত মেট্রপলিটন বিদ্যালয়ও ইহাঁর একটি কীর্ত্তি। বোধ হয় উহা শাখাদি পরিবৃত হইয়া চিরকাল তাঁহার নামের পতাকা স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিবে।

ইং খ্রীঃ ১৪৫৬ অব্দেই—ইদন উদ্যানে, ব্রহ্ম দেশীয় পাগোদা আনীত হইয়া স্থাপিত হয়। এই অব্দেই ডালহৌসি পদত্যাগ করেন এবং তৎপদে মহাত্মা ক্যানিং আগমন করেন।

এই সময়ে এদেশে প্রথম নাট্য অভিনয় আরম্ভ হয় এবং পাথুরিয়া ঘাটার রাজ পরিবারে প্রথম ঐক্যতান-বাদ্য সৃষ্ট হয়।

খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দে সিমুলিয়ার আশুতোষ দেব (ছাতু



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।



স্বর্গীয় মহাত্মা আশুতোষ দেব।



স্বর্গীয় মহাত্মা প্রতাপ নারায়ণ সিং।

বাবু) মহাশয়ের বাটীতে শকুন্তলা নাটক প্রথম অভিনীত হয়। বঙ্গ রঙ্গভূমির সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ মৃত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহাতে শকুন্তলা সাজিতেন।

তৎপরবৎসর কলুটোলার মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসনে স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিধবা বিবাহ নাটক অভিনীত হয়, বঙ্গরঙ্গভূমির বর্ত্তমান সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায়—তাহাতে নায়িকা সুলোচনার অংশ অভিনয় করিতেন।

আশুতোষ দেব মহাশয় নিতান্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন; তাঁহার রচিত অনেক গীত আজিও বর্ত্তমান আছে। মৃত মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ, পাইক পাড়ার মৃত রাজা প্রতাপ নারায়ণ সিংহ, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র ইঁহারা নাট্যামোদী ছিলেন।

ক্যানিং সাহেবের সময়েই সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে পাথুরিয়া ঘাটার রাজপরিবারে প্রথম ঐক্যতান বাদ্য সৃষ্ট হয়। রাজভ্রাতৃদ্বয় যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন, মৃত সংঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে মৃত সংগীত শাস্ত্রের এক প্রকার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন বলা যাইতে পারে।

খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দে কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দান করেন।

ইনি খ্রীঃ ১৮৩৮ অব্দের ১৯ এ নবেম্বর কলিকাতার অন্তঃপাতী কলুটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺প্যারী মোহন সেন। কেশব চন্দ্র সুবিখ্যাত অভিধানকার রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র; অতি অল্প বয়সেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অষ্টম বর্ষ বয়সে ইনি হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন। এখানে তিনি সেকেণ্ড সিনিয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এক্ষণকার বি, এ, পরীক্ষার্থিদিগকে যতদূর পড়িতে হয় তিনি ততদূর পড়িয়াছিলেন। যৌবনে ইনি ইংরাজ কবিদিগের কাব্য পড়িতে বড়ই ভাল বাসিতেন। সেক্সপিয়রের রচনা এত ভাল বাসিতেন, যে তিনি ১৮৫৭ অব্দে নিজ পৈতৃকবাস-গ্রামে হ্যামলেট অভিনয় করেন, সেই অভিনয়ে তিনি রঙ্গ-মঞ্চ ও দৃশ্য পট নিজে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৮৫৫ অব্দে ইনি কলুটোলায় একটি বাল্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তথায় বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি দরিদ্র বালক ও শ্রমজীবিদিগকে শিক্ষা দিতেন।

খ্রীঃ ১৮৫৬ অব্দের ২৭ এ এপ্রেল তাঁহার বিবাহ হয়। হাবড়ার সন্নিহিত বালি গ্রামের চন্দ্র কুমার মজুমদারের কন্যা ইঁহার সহধর্ম্মিণী। ইনি ধর্ম্ম গ্রন্থ আলোচনা করিতে বড় ভাল বাসিতেন। বাইবেল তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। লাট পাদরী বাবল সাহেবের নিকট তিনি বাইবেল পাঠ করিতেন।

ব্রাহ্ম বলিয়া আদি সমাজে প্রবেশের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি পক্ষে তিনি অশেষ যত্ন করেন।

খ্রীঃ ১৮৫৯ অব্দে ইনি আচার্য্য দেবেন্দ্র নাথের সঙ্গে সিংহলে গমন করেন। ইহার পরে তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকটিত করেন। এই সময়েই সংগীত সভা স্থাপিত হয়। জাতি ভেদ ত্যাগ, ব্রাহ্মসামাজিক অনুষ্ঠান, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি তাঁহার সভায় আলোচ্য ছিল।

বিধবা বিবাহ সমর্থন জন্য তিনি খ্রীঃ ১৮৫৯ অব্দে, কলুটোলায় মেট্রপলিটন বিদ্যালয়ে উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন, এই সম্প্রদায়ে তিনি নিজে অভিনয় শিক্ষক ছিলেন।

সংগীত প্রচার হইলেই ব্রাহ্ম প্রচারক দলের সৃষ্টি। ইনি নিজে প্রথম বয়সেই বোম্বাই ও মান্দ্রাজে প্রচার কার্য্য করিয়া ছিলেন।

খ্রীঃ ১৮৬৮ অব্দে তিনি ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাতে নিজের ধর্ম্ম মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

ইনি আজন্ম বাগ্মী। ইহার বাগ্মীতার পরিচয় আমাদের দিতে হইবে না। সমস্ত পৃথিবীই বিশেষ রূপে অবগত আছে।

তাঁহার মত বৈপরীত্যে তিনি আদি সমাজ ছাড়িয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন।

ইহার পরই ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়া লন।

তৎপরে তিনি বিলাতে গমন করেন। সে সমুদায় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা প্রস্তাব বর্দ্ধিত করিব না, শুদ্ধ এই মাত্র বলিব যে বিলাতে তিনি রাজনৈতিক আলোচনাও করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে আসিয়া তিনি যে সকল কার্য্য করেন, তাহার মধ্যে ভারত সংস্কারক সভা স্থাপন করেন। সুলভ সাহিত্য প্রচার, দাতব্য, শ্রমজীবিদিগকে শিক্ষা দান, স্ত্রী শিক্ষা প্রচার, সুরাপান নিবারণ এই পাঁচ বিভাগে সভা বিভক্ত। প্রথম বিভাগ হইতে 'সুলভ সমাচার' স্থাপিত হয়। দাতব্য বিভাগ হইতে

সুশিক্ষা দানে সাহায্য প্রদত্ত হয়। শ্রমজীবিদের জন্য একটি ব্যবস্থা ও স্ত্রীলোকদের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। শেষ বিভাগ হইতে 'মদ না গরল' নামে এক খানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইত।

কুচ বিবাহ সম্বন্ধে আমরা এ প্রস্তাবে কোন কথাই বলিব না। সে দিনকার ঘটনা যিনি যে ভাবে লইয়াছেন তিনি সেই ভাবে গ্রহণ করুন; যদি এ সম্বন্ধে ভাল কবিয়া কিছু জানিবার অভিপ্রায় থাকে "কেশব চরিত" পাঠ করুন, এই মাত্র বলিতে পারি।

কুক্ষণে তাঁহার এমন রোগ জন্মিল যে এ জগতে তাহা আর আরোগ্য হইল না।

১২৯০ সালের ২৫ এ পৌষ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কেশব চন্দ্র এ দেশের উন্নতির এক প্রধান মূল বলিতে হইবে।

খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর মাস হইতে সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার প্রথম হইতে সম্পাদকতা করেন।

১৭৪২ শকে (খ্রীঃ ১৮২০ অব্দে) কলিকাতাস্থ দক্ষিণ চাঙ্গাড়ি পোতা গ্রামে ৺ হর চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক বংশ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। খ্রীঃ ১৮৩২ অব্দে সংস্কৃত কালেজে প্রবেশ করিয়া খ্রীঃ ১৮৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় অধ্যয়ন করেন, পরে ঐ কলেজে পুস্তকাধ্যক্ষ হন। অতি অল্প দিন পরেই তথাকার ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। যৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল হন তৎকালে ইনি কিছুদিন তাঁহার সহকারী ছিলেন। তৎপরে বহুকাল সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। তৎপরে বহু দিন পেন্সন লইয়া জন্ম ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন। ইনি যৎকালে সংস্কৃত বিদ্যালয়ে, শিক্ষকতা করিতেন সেই সময় স্বদেশে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; বহু দিন নানা দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শেষ দশায় বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হন। তদানুষঙ্গিক কারবাঙ্কল রোগে ৫৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সোম প্রকাশ আজিও প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু আগের সে প্রভা এখন নাই।

সিপাহী যুদ্ধের অবসানে মহারাণী স্বীয় করে ভারত রাজ্য গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তিনি যে ঘোষণা পত্র প্রকাশিত করেন তাহাতে সমস্ত ইংরাজাধিকৃত ভারতের দুঃখ-সম্পদের দায়িত্ব তিনি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন।

ঐ সকল অতি অল্প দিনের ঘটনা; যাঁহারা এ সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাঁহারা এখন ও অনেকেই জীবিত আছেন। ইহার পর কলিকাতার উন্নতি যদিও খুব দ্রুত হইয়াছে তথাপি তাহা আজি ও সাধারণের স্মৃতিপথে জাগরূক আছে, এজন্য আমরা এই খানেই কলিকাতার ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম।

সম্পূর্ণ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

মহানুভব ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

যে মহাত্মা সদাশয় ব্যক্তির মৃত্যুতে বঙ্গদেশ-মধ্যে আজ সর্ব্বত্রই হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে,—ইংরেজি ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রে ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছে, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবনী নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। কোন পত্রিকাতেই উক্ত মহোদয়ের প্রতিরূপ প্রকাশিত হয় নাই, এজন্য আমরা তাঁহার একখানি চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকটন করিলাম। প্রতিরূপ খানি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ৪০ বৎসর বয়সের। এই প্রতিরূপ মুদ্রাঙ্কনের পর তিনি ২২ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় হুগলী জেলাধীন খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ রাধানগর গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। এই গ্রাম, দ্বারকেশ্বর নদীতটে অবস্থিত বলিয়া নৈসর্গিক দৃশ্যে যেরূপ চিত্তাকর্ষক, বিশ্ব-বিখ্যাত রাজা রাম মোহন রায়ের জন্মভূমি বলিয়াও তদ্রূপ বিখ্যাত ও পবিত্র।



স্বর্গীয় মহাত্মা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

প্রসন্ন কুমারের পূর্ব্বপুরুষেরা "বসু" উপাধিধারী ও বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন কায়স্থ। কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন দ্বিজের সমভিব্যাহারে যে পাঁচজন কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন, দশরথ বসু তাহার অন্যতম। তিনিই বাঙ্গালা দেশীয় যাবতীয় 'বসু' দিগের আদি পুরুষ। দশরথের অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ শ্রীরাম পর্য্যন্ত ঐ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তদীয় তনয় রত্নেশ্বর, "সর্ব্বাধিকারী" এই প্রার্থনীয় উপনামে সুশোভিত হন। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাম নারায়ণ উক্ত পদবী ব্যতীত "মুন্সী" এই গৌরবাত্মক অতিরিক্ত উপাধি প্রাপ্ত হন এবং আভিজাত্য বৃদ্ধির কারণ স্বীয় বংশের প্রথানুসারে "নবরঙ্গ" কুল্ব করেন। রামনারায়ণের চারি পুত্রের মধ্যে এস্থলে জ্যেষ্ঠ মদন মোহন ও দ্বিতীয় মথুরামোহনের নাম উল্লেখ-যোগ্য। মদন মোহনের পুত্র সীতানাথ "রাজা" উপাধি ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—ইহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নয়। ইনিই প্রসন্ন কুমারের জ্যেষ্ঠ তাত এবং ইঁহারই উদ্যমে ও উদ্যোগে তাঁহার প্রথমতঃ হিন্দু কালেজে শিক্ষার সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত মথুরামোহন সর্ব্বাধিকারীর প্রথম পুত্র যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী প্রসন্ন কুমারের জনক।

উপরি বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বংশাবলী-পাঠে, প্রসন্ন কুমারের পিতৃ পুরুষগণ যে নবাব সরকারে বিষয় কর্ম্ম ও স্বশ্রেণীস্থ সমাজ মধ্যে বংশ মর্য্যাদা প্রভৃতি গুরুতর বৈষয়িক ও সামাজিক ক্রিয়ায় পুরাকাল হইতেই প্রখ্যাত হইয়া আসিয়াছেন, তাহা সকলেরেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু জগতের নিয়মে অদ্য যাহার উত্থান, কল্য তাহার পতন; এই নিয়ম-প্রভাবে যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর তাদৃশ বিষয়-বিভবাদি ছিল না।

প্রসন্ন কুমারের পিতা অতি বিচক্ষণ, অমায়িক ও স্বাধীন ভাবাপন্ন ব্যক্তি এবং তাঁহার মাতাও সর্ব্বাংশে স্বীয় ভর্ত্তার যোগ্য-ভার্য্যা ছিলেন। তিনি শান্তশীলা, পতিব্রতা ও যার পর নাই ধর্ম্মিষ্ঠা কামিনী ছিলেন। দুরদৃষ্ট ক্রমে অধিক কাল এই সাধ্বী নারীর যত্নে ও স্নেহে সংবর্দ্ধিত হওয়া, প্রসন্ন কুমারের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। না হউক তন্নিবন্ধন তাঁহার বা তাঁহার সহোদর সহোদরাদের বিশেষ মনঃপীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। ভ্রাতৃবর্গ ও ভগ্নীগণের পরিপালনে তাঁহার এত আগ্রহ ছিল যে, কোন আগন্তুক সেই অচিন্ত্য কাণ্ড সহসা প্রত্যক্ষ করিলে, চমকিত হইয়া যাইত। প্রসন্ন কুমার, প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মজুমদার নামক এক গুরুমহাশয়ের সন্নিধানে স্বগ্রামে পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা ও শুভঙ্করী অঙ্ক শিক্ষা করেন। তদনন্তর স্বনাম-খ্যাত রমাপ্রসাদ রায় মহোদয়ের রঘুনাথ পুরের বাটিতে উক্ত রায় মহাশয়ের নিকট তাঁহার কিছু কাল ইংরেজি শিক্ষা চলে। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে খিদিরপুরে লইয়া আইসেন। এখানে পূর্ব্ব বর্ণিত রাজা সীতানাথের বাসায় থাকিয়া, কলিকাতার পটলডাঙ্গাস্থিত হিন্দু কালেজে তাঁহাকে নিত্য পদব্রজে গতি বিধি করিতে হইত। এই সময় তাঁহাকে কি উৎকট শারীরিক শ্রম করিতে হইয়াছিল, ভাবিয়া দেখিলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। পাঠক মহাশয়, কলিকাতা ও খিদিরপুরের বর্ত্তমান অবস্থা বিস্মৃত হইয়া, চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের উক্তি কতদূর প্রামাণিক। অসাধারণ অধ্যবসায়শালী লোক ভিন্ন অন্যের পক্ষে এরূপ আয়াস স্বীকার করা বাস্তবিকই স্বপ্নের অগোচর। জ্যেষ্ঠ তাত রাজা সীতানাথের কর্ত্তৃত্বাধীনে হিন্দু কালেজে পাঠাভ্যাস চলিতেছিল বটে, কিন্তু প্রত্যহ পদব্রজে পটলডাঙ্গায় আগমন কি সহজ কার্য্য? সুতরাং শ্যামবাজারস্থ আত্মীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষের ভবনে কয়েক মাস অবস্থিতি পূর্ব্বক বিদ্যানুশীলনে ব্যাপৃত থাকেন। এখানকার নিশাকালীন অধ্যয়ন-কাহিনী এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত। সে এক অসাধ্য সাধনা! অধিক রজনীতে যখন উক্ত বাটীর সকলেই নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন, সেই ঘোর গভীর নিশীথে তিনি এক মনে গ্যাসের আলোকে পাঠাভ্যাস করিতেন; কেবল দুই এক দিবস নয়—প্রতি রাত্রিতে এই রূপ ঘটিত। এই রূপ কষ্ট স্বীকার করাতেই হিন্দু কালেজে তাঁহার লেখা পড়া চলিতে থাকে। তাঁহার নাম উত্তরোত্তর চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রামচন্দ্র মিত্র, ষ্টাইন্, মিডল্টন্, হালফোর্ড, হেড মাষ্টার জোন্স প্রভৃতি কালেজের শিক্ষাদাতারা তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়স, সেই সময় (১৮৪৭-৪৮ খৃঃ) তিনি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তখনকার "The influence of climate on national character." অর্থাৎ "জাতীয় চরিত্রের উপর জল বায়ু মৃত্তিকার প্রভাব" বিষয়ক প্রবন্ধ তাঁহার লেখনীমুখ হইতে বিনির্গত হয়। উহার রচনা করিয়া তিনি পারিতোষিক লাভ করেন। উহাতে নিরর্থক শব্দাড়ম্বরের লেশ মাত্রও নাই, বরং সুযুক্তিসম্পন্ন উত্তমোত্তম ভাবে পরিপূর্ণ। ঐ প্রস্তাবই তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি প্রচারের প্রথম ও শেষ নয়। উচ্চ

শ্রেণীতে উঠিবার পূর্ব্বেই মাসিক আট টাকা নিয়মে দুই বৎসর কাল ক্রমাগত বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পরে উচ্চতর বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ধার্ড সাহেবের প্রদত্ত ৮৲ টাকা, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রদত্ত ২০৲ টাকা, ঠাকুর-পরিবার দত্ত ৩০৲ টাকা ও বর্দ্ধমান রাজ-দত্ত ৪০৲ টাকা বৃত্তি ক্রমান্বয়ে উপভোগ করিতে থাকেন। চারি বৎসর ব্যাপিয়া কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। এই সময় মুর্শিদাবাদের নবাব হিন্দু কালেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়া যে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার বিতরণের সঙ্কল্প করেন, প্রসন্নকুমার তাহার ২৫ টী প্রাপ্ত হন। কালেজের প্রিন্সিপাল্ কার্ ও গণিত শাস্ত্রাধ্যাপক রিস্ সাহেবের তিনি নিতান্ত স্নেহাস্পদ প্রিয়তম ছাত্র হইয়া উঠেন। রিস্ সাহেব জ্যোতিষ শাস্ত্রানুশীলনে একান্ত অনুরাগী ছিলেন, সুতরাং উক্ত বিদ্যার বড়ই গৌরব করিতেন, তিনি স্বীয় ছাত্র দগকে প্রায়ই সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণ গণনার দুরূহ প্রশ্ন সমাধান করিতে বুলিতেন। এ বিষয়ে প্রসন্নকুমার তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিলেন। এতদ্ব্যতীত "উচ্চতম ছাত্রবৃত্তি, উচ্চতম পুরস্কার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার-সূচক পদক" প্রভৃতি প্রাপ্তিও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। পরিশেষে তিনি 'লাইব্রেরী পরীক্ষা' নামক এক অতি দুঃসাধ্য ব্যাপারে অগ্রসর হন। শুভাদৃষ্ট ক্রমে তাহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা হয়। উক্ত পরীক্ষা এক প্রকার মহাদুর্ঘট ক্রিয়া। হিন্দু কালেজের পুস্তকালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল বিদ্যা, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনচরিত, দর্শন শাস্ত্রাদি ভূরি ভূরি বিষয়ের গ্রন্থ থাকিত। পরীক্ষক সেই স্তূপাকার পুস্তক রাশির মধ্যে যে যে পুস্তক হইতে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারই সদুত্তর দিতে যিনি পারগ হইতেন, তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইত। বলা বাহুল্য, প্রসন্ন বাবুর অদৃষ্টও সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইয়া সর্ব্বাধিকারী মহোদয় কলেজ হইতে কার্য্যভূমিতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই "The relative and absolute advantages of literature and science in a Collegiate education" অর্থাৎ "কলেজ সংক্রান্ত শিক্ষায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল"—নামে এক সারগর্ভ সুন্দর সন্দর্ভ বিটন্ সভায় পাঠ করেন। উহার ভাষা যেমন হৃদয়গ্রাহিণী, তেমনই সুযুক্তি পূর্ণ। বিদ্বৎ-সমাজে উহার সমাদরের পরিসীমা নাই।

বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ সম্মানিত হইয়া বিটন্ মহোদয়ের সাহায্যে প্রসন্ন বাবু সর্ব্ব প্রথমে লবণ সংক্রান্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক প্লাউয়েন্ সাহেবের অধীনে ৮০৲ টাকা বেতনে জনৈক সহকারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। দৈব ঘটনায় উক্ত কার্য্য একেবারে রহিত হইয়া যাওয়ায়, অগত্যা তাঁহাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। তথনও বিটন্ সাহেব যথোচিত যত্ন চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন কি, তিনি তদানীন্তন ছোট লাটের অধস্তন সেক্রেটরি সিসিল বিডন্‌কেও প্রসন্নকুমার বাবুর কার্য্যের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তদ্দ্বারা কোন ফল হয় নাই। তাহার কারণ বিটন্, সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের আনুপূর্ব্বিক গুণ কীর্ত্তন করিয়া যে পত্র লেখেন, বিডন্ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহা দ্বারা প্রসন্ন বাবুর কোনই উপকারের সম্ভাবনা রহিল না। বিডন্ সাহেব এই উপলক্ষে তাঁহার প্রতি যে বিরূপ হইয়া রহিলেন, তাহা পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে; ভবিষ্যতে তাহাতেই অনেক অনিষ্ট ঘটে।

বিটন্ সাহেবের ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি কিছু দিন হিন্দু কালেজের অন্যতম শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন; তথা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক বেতনে দেড় বৎসরের জন্য ঢাকা কলেজে প্রেরিত হন। তথা হইতে দ্বিতীয় বার হিন্দু কলেজে আগমন করেন। উভয় স্থলে মহাসমাদরে ও সম্ভ্রমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া অশেষ সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন। অতঃপর মহামনাঃ বিদ্যাসাগর মহানুভবের প্রযত্নে সংস্কৃত কালেজের হেড মাষ্টারের পদে নিয়োজিত হওয়ার পর দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার যশঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এ সময়ে অর্থাৎ ১২৬২ সালের ২১শে চৈত্রে (১৮৫৫ খৃঃ) পাটীগণিত প্রণীত হয়। ইহাতে তাঁহার নাম দেশ বিদেশে বিঘোষিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে। হেড মাষ্টারের কার্য্য হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রিন্সিপালের আসনে সমাসীন হন। ইহারই কিছু দিন পূর্ব্বে স্বগ্রাম রাধানগরে নিজ ব্যয়ে সংস্কৃত কালেজের প্রণালী ক্রমে এক অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চশ্রেণী ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়। এই সরলান্তঃকরণা, মুগ্ধস্বভাবা নারী যাদৃশী গুণবতী সতী, ধর্ম্ম কর্ম্মেও তাদৃশী নিষ্ঠাবতী ছিলেন। না হইবে কেন? তিনি হরিপাল নিবাসী যে হলধর ঘোষের স্নেহময়ী সুতা, সেই হলধর সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির। যাহা হউক, বনিতা বিরহে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কিয়দ্দিন কাতর হইয়া উঠেন। কিন্তু নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া সে শোক পরিহার করেন।

সংস্কৃত কালেজের সর্ব্বাধ্যক্ষের পদ অধিক দিন সুখ-স্বচ্ছন্দে

ভোগ করা তাঁহার অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই। প্রেসিডেন্সি কালেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল্ সটক্লিফ্ সাহেবের সহিত সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয় লইয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মনোবাদ উপস্থিত হয়। তৎকালে প্রেসিডেন্সি কালেজের স্বতন্ত্র গৃহ ছিল না। সংস্কৃত কালেজের কতক অংশে ও বর্ত্তমান আলবার্ট কালেজের কিয়দংশে উহার অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদিত হইত। সটক্লিফ্ প্রস্তাব করেন, সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ের গৃহটী তাঁহাকে ব্যবহার জন্য দিতে হইবে। তাহাতে প্রসন্ন বাবু এই আপত্তি করেন, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে সমস্ত দুর্লভ হস্ত লিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা দ্বিতল ভিন্ন অন্যত্র রাখিলেই নষ্ট হইয়া যাইবে; তাহার জন্য দায়ী কে? সটক্লিফের একথা ভাল লাগিল না। তজ্জন্য তিনি তদানীন্তন ডিরেক্টর এটকিন্সনের সঙ্গে কৌশল করিয়া অবশেষে বিডনকেও হস্তগত করেন। পাঠক মহাশয়! পূর্ব্বে যে বিডন্, প্রসন্ন বাবুর অসাধারণ যোগ্যতায় সন্দিহান হন, ইনিই সেই ব্যক্তি। ইনি এখন ছোট লাট—বঙ্গের হর্ত্তাকর্ত্তা। এই ষড়যন্ত্রের ফল এই হইল যে, পুস্তকালয়ের জন্য প্রসন্ন বাবুকে চিন্তিত হইতে হইবে না, সটক্লিফ তাহার ব্যবস্থা যাহা হয় করিবেন; ডিরেক্টর, সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করেন। এ বন্দোবস্তে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ কেন সম্মত হইবেন? সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিলে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উদার-হৃদয়, সংস্কৃত কালেজের হিতাকাঙ্ক্ষী উড্রো সাহেব অবশেষে ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া ঐ মহানর্থকর বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন। বলা বাহুল্য এই সূত্রে প্রসন্ন বাবুকে পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করা হয়। এই উপলক্ষে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা "হরির লুট" দেন এবং তাঁহার জন্ম ভূমিস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও আত্মীয়গণের উদ্যোগে স্কুল-গৃহ যামিনীযোগে বিবিধ আলোক মালায় সজ্জীভূত হয়। পল্লীগ্রামে এরূপ মহোল্লাসকর অভিনব ব্যাপার সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

এটকিন্‌সনের সঙ্গে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মনোবাদ স্থায়ী হয় নাই। যখন বি, এ, ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব হয়, তখন তিনি প্রসন্ন বাবুর মতে সম্মতি প্রদান করেন।

বসো বেলমুড়ায় প্রসন্ন বাবু দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রথমা প্রণয়িনীর গর্ব্ভে এক মাত্র কন্যা ও দ্বিতীয়া ভার্য্যার গর্ব্ভে তিনটি কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। পুত্রটি অকালে কাল কবলিত হয়।

সংস্কৃত কালেজের কর্ম্ম করিতে করিতে একবার তিনি বহরমপুর কালেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ হইয়া বহরমপুরে গমন করেন। অতঃপর স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ইন্‌সপেক্টর হন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যক্ষয় হইতে ছিল বলিয়া তিনি স্বেচ্ছায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সাহিত্য ও ইতিবৃত্তের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। তথনও তিনি সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ রহিলেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের পদ তাঁহার প্রকৃত পদ নহে। গত বর্ষে তিনি পূর্ণ পেন্সন লাভ করিয়া বিশ্রাম সুখ সেবা করিতেছিলেন। কিন্তু হায়, কঠোর কালের তাহা সহ্য হইল না। ২০ মাস বৃত্তি উপভোগ করিতে না করিতেই, ৬২ বৎসর বয়সে নির্ম্মম যম গত ৫ ই নবেম্বর (২০ শে কার্ত্তিক) দিবা ৪ টা ৪০ মিনিটের সময় তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। স্থানাভাবে অতি সংক্ষেপে মৃত মহাত্মার জীবনবৃত্ত এই স্থানেই আমাদিগকে উপসংহার করিতে হইল। বঙ্গদেশে এমন কেহই নাই, যিনি এই নিষ্কলঙ্ক, আড়ম্বরবিহীন, অমায়িক মহাত্মার নাম ও গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া গভীর হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আন্তরিক প্রগাঢ় শোক-ভরে বিলাপ ও পরিতাপ না করিয়াছেন। তাঁহার প্রশান্ত দর্শন, নিরভিমান, দিব্যজ্যোতিম্মান্ বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, আর আমরা অতুল আনন্দ ও অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইব না! ভাই বঙ্গবাসী! এস, সেই গম্ভীর মূর্ত্তি, সরল স্বভাব, অকপট, স্বদেশ হিতৈষীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাঁহার কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়া, আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দি।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ রায়।



ফুল-মালা।

চুপ্ কর্—চুপ্ কর্, সই।
দু'জনেই চুপ্ ক'রে রই।
রাশি রাশি শুষ্ক পাতা
চারি ধারে আছে পাতা;
বাড়াস্ নি পা দু'খানি,
তা' হ'লে এখনি
মড়্ মড়্ শব্দ হ'বে; স্তব্ধ সমীরণ
জেগে উঠে জাগা'বে গো ও দু'টি নয়ন।

লুকিয়ে লুকিয়ে বায়ু ঘোরে,
নিশ্বাস ফেলো না, সখি, জোরে;
নিশ্বাসের শব্দ নিয়ে
এখনি ওখানে গিয়ে
ফুঁ দেবে ও দু'টি কাণে
নিঠুর বাতাস;
নিঝুম ঘুমন্ত আঁখি জাগিবে তাহায়,
চেয়ে দেখা হ'বে না যে, ও যদি গো চায়।

ওই বায়ু বহে সর্ সর্,
আমার আঁচল খানা ধর্;
নহিলে বায়ুর ঘায়
এখনি উঠিবে তায়
কেঁপে কেঁপে উড়ে উড়ে
পত পত রব।
পোড়া আঁচলের ডাকে ও জেগে উঠিবে,
লজ্জায় আঁচলে মুখ ঢাকিতে হইবে।

ধীরে তোর হাত খানি নেড়ে
দে তো ওই পাখীটেরে তেড়ে,
ঘাড় নেড়ে গলা ছেড়ে
স্তব্ধতার তার ছিঁড়ে
চিচিকুচি কিচিমিচি
মিছিমিছি করে।
ওড়ে না যে পোড়া পাখী! দে তো ফুল ছুড়ে।
আমি লুফে ধরি ফুল, ভূঁয়ে পাছে পড়ে।

আয়, সই, দু'জনে মিলিয়ে,
চুপি চুপি মুঙে মুঙে মুঙে
একটি একটি কোরে
ধীরে ধীরে—অতি ধীরে
সরাইয়ে একধারে
রাখি পাতাগুলি ;
তা'র পর চুপি চুপি গুটি গুটি গিয়ে
দিয়ে আসি ফুল-মালা গলে দোলাইয়ে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

মুমূর্ষু কবি ও ভাঙা বীণা।

স্বপনের ডালি লয়ে, দুরাশা রূপসী যবে
হৃদয়ে পশিত মোর আসি ধীরে ধীরে।
মোহময় তুলি তান, ভুলাত নিদ্রিত প্রাণ—
ঢালিত ছলনা-হাসি হৃদয়-তিমিরে।
চমকে ভাঙিত ঘোর, চমকে জাগিত মোর
বিশ্ববিষজরজর বিধুর পরাণ।
লয়ে ছলনার জাল, পলাইত কুহকিনী—
বিশ্ব-মরু-মায়াবিনী-মরীচি-সমান।
স্তম্ভিত নিশীথে তবে, তোমারে লইয়া বুকে,
ছুটিয়ে যেতাম চলে আলু থালু বেশে।
জোছনার সাথে যথা তটিনী নাচিয়ে যায়,
বসিতাম উভে সেই স্বরগের দেশে।
ধীরে ধীরে তোর তারে, আবেগ-আকুল প্রাণে—
মধুর মধুর সেই দিতাম ঝঙ্কার।
নীরব কবির প্রাণে, বেহাগে গাইতে গান,
কাঁদিয়ে কাঁদাতে তুমি হৃদয় আমার।
শুনে সে মোহন তান, পাগল তটিনী প্রাণ,
ধীরে ধীরে হৃদি'পরে তুলিত লহর।
তোর ওই তার দিয়ে, তরল চাঁদের স্রোত
নাচিয়ে গড়ায়ে বহে যেত তর তর।
ফুলের জগতে যথা, আলো করি দশ দিক্
শুয়ে থাকে ফুলরাণী ফুলের শয্যায়।
চারি পাশে ফুলবালা, আদরে যতনে কত
ছড়ায়ে ফুলের হাসি চামর দুলায়।
তোর সে মোহন গান, লুটায়ে পড়িত প্রাণে
সুরে ভরা মাতোয়ারা শুধু হায় হায়।
চকিতে জাগিত রাণী, ব্যাকুল পরাণে কত
কাঁদিয়ে ভাসা'ত ফুল পাগলের প্রায়।
যেন কি হারান কথা, যেন কি হারান গান
যেন কি হারান প্রাণ প্রাণে যেত মিশি।
এলায়ে পড়িত হায়, প্রাণের বাঁধন, তাই
ছাইত আঁধার ঘোর যেন দশ দিশি।
মদনের বাণ হেন, কি শর হানিত প্রাণে—
বিঁধিত সূচীর ন্যায় কুসুম-শয়ন।
ছুটিয়ে আসিত রাণী, শুনিতে প্রাণের কথা
নীরবে ঝরিত শুধু নীরব নয়ন।
ভাঙা প্রাণে ভাঙা গান, স্বপ্নময় সেই তান,
শুনিত সুষমা সতী পরম যতনে।
সুরেতে মিলায়ে সুর, সুদূর সুনীল নভে
গাইত কত কি গান বসি আনমনে।
নগনা মগনা যত—সাগরেতে জলবালা
নেচে নেচে চলে যেত লহরে লহরে।
সাগরের ছেটো মেয়ে শুধুই নাটেতে মন
তালে তালে ভেসে যেত, করে ধ'রে ধ'রে।

কি তান ধরিয়ে তুই, কাহার ভাবেতে রে,
ভুবন ভুলালি হায় মোহন সঙ্গীতে।
আধ আধ মনে হয়, আবার মিলায়ে যায়
চপলা চমক হেন আসে যেন চিতে।
তোঁহারি প্রসাদে বীণে, স্বরের লহর তুলে,
আনন্দে খেলেছি কত অপ্সরার সনে।
তোর সাথে সাথে বীণে, স্বরের লহর তুলে,
গেয়েছি কতই গান আপনার মনে।
সুখের সে দিন গেছে, কোথা চলে নাহি জানি,
আনমনে ডাকি কত কাঁদিতে কাঁদিতে।
আশার কুহক পেয়ে, দেখি গগনেতে চেয়ে
সারা রাত কেটে যায় চাহিতে চাহিতে।
তবুত আসে না ফিরে, সুখের সে সব দিন,
কলঙ্কের রেখা শূন্য প্রভার জীবন।
শীর্ণ দেহে জীর্ণ মন,তাহে বিষাদ স্বপন,
হৃদয়ে বহ্নির রাশি করিছে দহন।
নয়নেতে অশ্রুধার, নয়নে শুকায়ে যায়,
কানে কানে কিসে বলে শুধু হায় হায়।
পেচকের বাসা হল, মট ছেড়ে চলে গেল,
প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি কি জানি কোথায়।
নিবিতে হাসিছে শুধু, কিসের কুহকে ভুলে,
জীবনের অনুজ্জ্বল তৈলহীন দীপ।
জগতে দেখিনু যাহা, ধুয়ে পুঁছে গেছে সব,
আছে মাত্র অন্ধকারে শুধু টিপ্ টিপ্।
আবার যদি রে তুই, প্রাণাধিক ভাঙা বীণে!
ছড়াতে পারিস সেই ভৈরবীর তান।
প্রাণহারা পথহারা পথিকে যদি রে পুনঃ
পারিস বলিয়া দিতে পথের সন্ধান।
আঁখির সমুখে যদি, আনিতে পারিস তুই,
প্রেমানন্দ ঢলঢল স্বরগের ছবি।
এজীর্ণ আঁধার ঘরে, দেখাইতে পার যদি,
উষার মধুর হাসি প্রভাতের রবি।
তবে জীবনের ভার, খেদের রবে না আর,
হেসে হেসে চলে যাবে নাচিতে নাচিতে।
আমি বারিধির কণা, মিশাব বারিধি মাঝে,
স্বরগের চিরপ্রেম পুলকিত চিতে।
কাঁদিয়ে সাধিরে তোরে, বাজ বীণা বাজ পুনঃ,
বহে যাক ধীরে ধীরে যমুনা উজান।
আনন্দ—আনন্দ মাতা, পাখী শাখী লতা পাতা,
হয়ে যাক সবে মিলে একই পরাণ।

* * * *

নীরবে থাকিলি তুই, বুঝেছি বুঝেছি হায়,
এজগতে নাহি কভু প্রাণ বিনিময়।
ডুবে যা চাঁদের আলো, নিবে যা নিবন্ত প্রাণ,
বিদেশী প্রবাসী মোরা এ বিশ্বের নয়।
জ্বলন্ত চিতার মাঝে, প্রাণে প্রাণে সুরে মিশে,
আয় আয় আয় ভাই উভয়ে মিশাই।
পুড়ে যাক অশ্রুধার, পুড়ুক বিষাদ ভার,
জ্বলে জ্বলে পুড়ে সবে হয়ে যাক্ ছাই।

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।

তাজমহল।

আমরা এই সংখ্যার সহিত পাঠক মহোদয়গণকে প্রসিদ্ধ তাজমহলের একখানি বৃহৎ লিথগ্রাফি প্রতিকৃতি উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। উহাতে তাজের নদী-তীরাভিমুখী দৃশ্যটি চিত্রিত হইয়াছে।

জগদ্বিখ্যাত তাজমহল সম্রাট্ সাজিহান ও তাঁহার প্রিয় মহিষীর সমাধিমন্দির (কবর বা মস্‌জিদ্)। ইহার অসাধারণ গঠন প্রণালী ও অঙ্গসৌষ্ঠবাদির পারিপাট্য সর্ব্বজাতীয় দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

১৭শ শতাব্দিতে সম্রাট্ সাজিহান, মম্ তাজমহল নাম্নী নিজ প্রিয়তমা মহিষীর সদ্‌গুণাদি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই সমাধি মন্দির প্রস্তুত করেন। সম্রাজ্ঞীর পূর্ব্ব নাম আর জাম্মেদ বন্নু ছিল। পরে সম্রাট্‌মহিষী হইয়া তিনি মম্‌তাজি জুমানি অর্থাৎ 'আদর্শ গুণান্বিতা' নামে আখ্যাত হন। তাজের নির্ম্মাণকার্য্যে রাজ, মজুর ও কারিকরাদিতে ২০,০০০ বিশ হাজার লোক ২২ বাইশ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ব্যাপৃত থাকে। ইহা আগ্রা সহরের সীমান্তে অবস্থিত; এবং ইহার সমস্তই অতি উৎকৃষ্ট শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার চারি কোণে চারিটি অত্যুচ্চ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মিনর্ উঠিয়াছে। ঐ মিনরচতুষ্টয় অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত ও হরিত বর্ণ প্রস্তর বিনির্ম্মিত দ্বিতল ছাদের উপর স্থাপিত। মস্‌জিদের অভ্যন্তরে ঠিক্ মধ্যদেশে একটী সুপ্রশস্ত কক্ষ, তন্মধ্যে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর সমাধিবেদি অবস্থিত। ভিতরকার মেজে বা তলদেশ সম চতুষ্কোণ প্রস্তরমণ্ডিত দেয়াল, পরদা, সমাধিবেদী প্রভৃতি সমস্ত নানা বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরখোদিত ফুল, স্মারক লিপি, ও কোরাণের বয়াতাদিসম্বলিত কারুকার্য্য খচিত এবং তৎসমস্ত কার্ণিলিয়ন্, লাপেজ্, লাজুলি ও জাস্‌পর নামক সুন্দর ও বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা মোজেক গঠনপ্রণালীঅনুযায়ী রচিত। মস্‌জিদ্‌টি আজ পর্য্যন্ত এরূপ সম্পূর্ণ ও নূতন অবস্থায় রহিয়াছে যে, উহা অধুনা নির্ম্মিত বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। ইহা বহুসংখ্যক প্রস্তরময় স্তম্ভ ও গম্বুজ সম্বলিত লোহিত বর্ণ দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

অনেকানেক সুবিখ্যাত ইংরাজ মহাশয়গণ তাজের সৌন্দর্য্য দেখিয়া এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এবম্বিধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কারুকার্য্যখচিত মনোহর অট্টালিকা পৃথিবীর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই।

নিবেদন।

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে ও গ্রাহক মহোদয়গণের অনুগ্রহে শিল্পপুষ্পাঞ্জলির প্রথম বর্ষ পূর্ণ হইল। এই এক বৎসর কাল আমাদিগের সঙ্কীর্ণ ক্ষমতা অনুসারে আমরা যৎসামান্য শিল্প ও সাধারণ সাহিত্যপুষ্প সংগ্রহ করিয়া সাধারণকে অঞ্জলি প্রদান করিলাম। তাঁহাদের তৃপ্তিসাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। তবে যে আমাদের আন্তরিক ভক্তি ও যত্নের ত্রুটী নাই, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। এক্ষণে আমরা এরূপ ভরসা করি যে, যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহান্বিত করিয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যতেও তদ্রূপ কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন, এবং অপরসাধারণে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করিবেন।

শিল্প বিজ্ঞানের বহুল প্রচার এই পত্রিকার প্রধানতম উদ্দেশ্য হইলেও ইহাতে যে পদ্য উপন্যাসাদি সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে, সে কেবল প্রধান উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে সহায়তার জন্য মাত্র। এই উপন্যাস ও পয়ারপ্লাবিত দেশে শুদ্ধ নীরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধপূর্ণ পত্রিকার স্থায়িত্ব এক প্রকার অসম্ভব; সুতরাং পাঁচ রকম মনোরঞ্জন বিষয় রূপ ঠেক্‌নার আবশ্যক। তাহাতেই আমাদিগকে তিক্তরসাশ্রিত বিজ্ঞানকে পদ্য উপন্যাসাদি মিষ্ট রসের অনুপান মিশ্রিত করিয়া সাধারণ সমক্ষে ধারণ করিতে হয়,—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি'কে পাঁচ ফুলের ডালি সাজাইতে হয়।

শিল্প বিজ্ঞানের অভাবে দেশের এই দুর্গতি, এবং উহাদের উন্নতির উপর দেশের সম্পত্তি নির্ভর করে, ইহা এক্ষণে

সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় সেই বিজ্ঞানেরই উপর দেশের লোকের অনুরাগ নাই। রঙ্গরস ব্যতীত আর কিছুতেই পাঠকের মন উঠে না। কবি অনেক দুঃখেই কাঁদিয়া ছিলেন,—

"হায়!—এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা"

অপর সাধারণের কথা কি বলিব, দেশের মুখপাত—কৃতবিদ্যমণ্ডলীর অগ্রণী—দেশীয় সংবাদ পত্রাদির সম্পাদক মহাশয়গণ, শিল্প বিজ্ঞানের বহুল প্রচার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কেবল সুদীর্ঘ নম্বরওয়ারি প্রবন্ধ লিখিয়াই নিরস্ত হন। শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক পত্রিকা সমূহের সুদীর্ঘ সমালোচনা করা দূরে থাকুক তৎসমস্তের প্রাপ্তিস্বীকার মাত্রও তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না। বিজ্ঞান শিল্প ব্যতীত ভারতের গত্যন্তর নাই, ইহা বলিয়া ত প্রায় সকল সংবাদ পত্রকেই চীৎকার করিতে দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলিকে তাঁহারা যথেষ্ট উৎসাহ দেন কৈ?

আবার দুঃখের বিষয় যে, কেহ কেহ আমাদিগের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুলি ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ বিচার ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। মৌলিক বিজ্ঞান বিষয় না পাইলে যদি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশ করা না হয়, তবে ত এখন দুই এক যুগ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা অপ্রকাশিত রাখিতে হয়। অধিকন্তু আবিষ্কৃত তাবৎ বৈজ্ঞানিক সত্য গুলি অধিকৃত না হইলে কি অভিনব সত্যের আবিষ্কার করা যায়? পাশ্চাত্য যে সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান ও সাধারণ সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকার আদর্শ আমরা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি, তৎসমস্তের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুলি ও কেবল পুথিগত মাত্র। যে গুলি শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা তাহাতেই পুথিগতের সহিত মৌলিক ফল গবেষণার সমস্ত সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

মূল বিজ্ঞান ব্যতীত আমরা কোনও শিল্পেরই আলোচনা করিব না। কোন একটি বিশেষ শিল্পের সহিত তাহার বিজ্ঞানাংশ সম্যক্ আলোচিত হইলে, তদাশ্রিত আরও বহুবিধ শিল্প ও যন্ত্রাদির মূল তত্ত্ব ও কার্য্যপ্রণালীর মর্ম্মভেদ হইয়া থাকে।

চিত্রাদির উপর আমাদিগের এরূপ লক্ষ্য থাকিবে যে মূল প্রবন্ধ পাঠ না করিয়াও কেবলমাত্র চিত্রগুলি পর পর দেখিয়া যাইলেই আলোচ্য বিষয় একরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

দেশীয় ও স্বদেশসংক্রান্ত বৈদেশিক বিখ্যাত মহাপুরুষগণের প্রতিকৃতিসম্বলিত সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং রামায়ণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের দৃশ্যাবলীর চিত্র প্রকাশ করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। এতৎপক্ষে সর্ব্বসাধারণকে আমরা সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, যিনি যে কোন মহাত্মার কোনরূপ প্রতিকৃতি ও জীবনী সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, তাঁহার নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

এস্থলে পত্রিকার কিছু অনিয়মিত রূপে প্রকাশ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। যেরূপ বহুচিত্র সমন্বিত করিয়া পত্রিকা প্রকাশ করিতে হয়, তাহাতে অল্প কালবিলম্ব অনিবার্য্য হইয়া উঠে। বিশেষতঃ লিথো-চিত্রগুলি একটু পরিষ্কার করা সময় সাপেক্ষ। ইহার উপর আবার বড় লোকের ফটো সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে বড়ই বেগ পাইতে হয়। পরিশেষে অনুগ্রাহক গ্রাহক, পাঠক ও সর্ব্বসাধারণ মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে, ভবিষ্যতের জন্য আমরা যেরূপ সুব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাতে তাঁহারা পত্রিকার উত্তরোত্তর সমধিক উন্নতি দেখিতে পাইবেন।

শিল্পপুষ্পাঞ্জলি সম্ব... সংবাদ পত্রাদির অভিমত।

"শিল্পপুষ্পাঞ্জলি নামক মাসিক পত্রিকাটি ... হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং উহা অতি ক...র মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।"

...বাসী।

...এপ্রেল।

"শিল্পপুষ্পাঞ্জলি যে অতি উৎকৃষ্ট সচিত্র ...পত্র এ কথা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। ইহাতে ... সাহিত্য সহজ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, পদ্য, নাটক, ... উপন্যাস, এবং খোদিত ও লিথগ্রাফ দুই প্রকারের অ...র সুন্দর চিত্র থাকে। আমরা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম।"

দৈনিক।

১৮ই চৈত্র মঙ্গলবার সন ১২৯২ সা... ৩০ এ মার্চ্চ।

"১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যাতে যে রূপ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল. ইহার ৪র্থ সংখ্যাতেও সেই ...প পারদর্শিতা দেখান হইয়াছে। 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' যেরূপ নি...পুণতার সহিত পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আমাদিগের ...শা হইতেছে যে, এই পত্রিকাখানি বাস্তবিকই দেশের এ...কটী গুরুতর অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবে।"

ঢাকা প্রকাশ।

ইং ১৮৮৬। ৪ঠা এপ্রিল।

"শিল্পপুষ্পাঞ্জলির দৈনন্দিন উন্নতি দর্শন করিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি; আমাদের দৃঢ়তর আশা হই...তেছে, 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলির' দ্বারায় দেশে অনেক উপকার, ...বিশেষ শিল্পের অনেক উন্নতি সংসাধিত হইবে। আমরা কা...য়মনোবাক্যে ইহার দীর্ঘ জীবন অকাঙ্ক্ষা করি।"

পূর্ব্ববাসী।

১৮৮৬ ইং ... এপ্রেল।

"শিল্পপুষ্পাঞ্জলির চিত্রগুলি দেখিয়া অনেকে ... বিলাতি ছবি মনে করেন কিন্তু আমরা জানি যে আর্টি...প্রেশ হইতে ইহা বাহির হইতেছে; তথায় এই প্রকার সুন্দর ছবিই প্রস্তুত হইয়া থাকে। লিখিত বিষয়গুলি নানা প্রকার এবং সুপাঠ্য। দেশীয় প্রত্নকর্ম্মবিদেরা যদি এই পত্রিকায় আপন আপন অনুসন্ধান ফল অর্পণ করেন তাহা হইলে আরও সুন্দর হইবে। ইহার মূল্য সুলভ, বাৎসরিক তিন টাকা মাত্র।"

ভেরি ও কুশদহ।

১১ই পৌষ ১২৯২।

"তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র সম্বন্ধে প্রস্তাবটি সরল ও সুন্দর ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে ও চিত্রগুলি সুন্দর হইতেছে।"

চারু বার্ত্তা।

ময়মনসিংহ। সহরসেরপুর,—সোমবার ৩১শে চৈত্র ১২৯২ সন।

"এই সংখ্যায় ইলেক্‌ট্রিক্ টেলিগ্রাফ শীর্ষে অতি উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান সন্নিবেশিত হইতেছে। ইহা প্রথমতঃ অনেকের কর্কশ বোধ হইলেও ইক্ষু পাবের ন্যায় ইহার অভ্যন্তরে মিষ্ট রস আছে। এই পত্রিকায় সাধারণের উৎসাহ দান আমাদের প্রার্থনীয়। ইহা দেশের একটী অভাব মোচনের অঙ্কুরস্বৎ।"

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

সন ১২৯২ সাল, ২৭ এ চৈত্র বুধবার।

"শিল্পপুষ্পাঞ্জলি অতি দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে।"

চারু বার্ত্তা।

সহরসেরপুর,—সোমবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সন।

"এই পত্রিকা খানি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়; রাশি রাশি সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া আমাদের মাথা ঘুরিতে থাকে, যখন 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' আসিয়া হস্তে পতিত হয়, তখন ইহার অন্তরস্থ সুদৃশ্য ছবি দেখিয়া মনে নব আনন্দের সঞ্চার হয়। এবার ইহাতে পাঁচখানি বড় বড় লিথগ্রাফি ছবি এবং বিস্তর সুন্দর সুন্দর কাষ্ঠে খোদিত ছবির সহিত নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক শিল্প, ইতিহাস, জীবন চরিত ও পৌরাণিক প্রবন্ধ গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। লেখা গুলি যেমন সুন্দর ছবি গুলি কোন অংশে তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে, বিলাতি ছবি বলিয়া

অনেকে ভ্রমে পতিত হন। দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় পাঠকগণ এমন সুন্দর বস্তুকে আজও আদর করিতে শিখিল না।"

ভেরি ও কুশদহ।

বঙ্গাব্দ ১২৯৩—১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ইং—২৮মে—১৮৮৬।

"Silpapushpanjali" is edited by Babu Amritalal Banerjee, and published by Babus Kalidas Pal and Beharylal Roy. This is a Magazine of Art in Bengali and contains, besides, a variety of literary matter which cannot fail to render the magazine, a most delightful and agreeable one. The portraits and illustrations are excellent, and cannot be surpassed by the productions of any other native artist in India. The literary portion contains a serial tale, original poems, chapters on scientific and useful subjects illustrated by neatly executed diagrams; a serial account of the ancient history of Calcutta, many other entertaining papers on miscellaneous subjeccts, The Magazine therefore deserves the support of all friends of Literature and the Arts, and the editor and artists are to be congratulated on the superior quality of their Magazine. Art will go on flourishing as years roll by, and with the growing prosperity of Art would it be too much to predict an unprecedented prosperity for the only Magazine which represents Art in Bengal? We therefore, recommend our Bengali readers to lose no time in sending in their subscriptions to the manager of the Shilpapooshpanjali and thereby encourage the foremost artist in Bengal."

THE BEAVER.
Chandernagore, Saturday,
May 29, 1886.

---

* * * * *

"The delay has only afforded us ample time to give it a careful perusal. We have no hesitation in expressing it as our deliberate opinion, that it is a un...que thing o[f] its kind in Bengali literature. The ...erpress is excellent, and the illustrations refle[ct] great [cr]edit on the artists. We also observe with satisfaction as well that the literary treatment is ...ell chosen. We wish our contemporary every [succe]ss and strongly recommend the Bengali c[om]munity to patronize the publication as a pioneer ...ar in the province."

THE INDIAN ECHO.

"ইহাতে তড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র (সচিত্র), চিত্র বিদ্যা (সচিত্র), ...লোক চিত্র (সচিত্র) বিষয়ক অনেক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। এ...উন্ন কলিকাতার ইতিহাস (সচিত্র), এবং কণককমতা ও পাণ্ডব চরিত (সচিত্র) নভেলদ্বয় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হ...তেছে। এইরূপ একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রের বরাব...ই অভাব ছিল, শিল্পপুষ্পাঞ্জলি সেই অভাব পূরণ করিয়াছে। চিত্র গুলি অতি সুন্দর হইয়াছে।"

আনন্দ বাজার পত্রিকা।

কলিকাতা—১৫ই আষাঢ়। সোমবার ১২৯৩ সাল, ২৮ এ জুন।

"'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' উপযুক্ত সময়েই কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্প, বাণিজ্য ও ...র সম্বন্ধীয় পত্রিকার বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয় এবং নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। 'শিল্প-পুষ্পাঞ্জলির' যে সংখ্যাই পাঠ করিয়াছি, তাহতেই পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহার চিত্র গুলি দেখিয়া ততোধিক প্রীতি লাভ করিয়াছি। দেশীয় শিল্প-সাহিত্য-জগতে শিল্প-পুষ্পাঞ্জলি একখানি অপূর্ব্ব জিনিস। দেশে এরূপ পত্রিকা পূর্ব্বে ছিল না এই অর্থে 'অপূর্ব্ব' নহে। আকৃতি, প্রকৃতি, বিষয়-গৌরব, সকল বিষয়েই এখানি অপূর্ব্ব। এক কথায়, ইহার লেখা ভাল, ছাপা ভাল, ছবি ভাল, কাগজ ভাল, উদ্দেশ্য আরও ভাল। শিল্প-পুষ্পাঞ্জলির গুণজ্ঞ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন অতি সুলেখক, ...হার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুলি অতি উচ্চ দরের। ইহাতে বি...ন-সম্মত অনেক শিক্ষিতব্য বিষয় আছে। সম্পাদকের ...নিপুণ পরিচালনায় এবং উৎকৃষ্ট লিপি কুশলতায় শিল্পপুষ্পাঞ্জলির দিন দিন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।"

শ্রীমন্ত সওদাগর। ৮ই নবেম্বর ১৮৮৬।
